—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' প্রাপ্ত—

বিজ্ঞান ভারতী

॥ বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যামূলক অভিধান ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সংকলিত

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নব সংস্করণ)

একমাত্র পরিবেশক :

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৪৯।১এ, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা ২৬

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, 1961
প্রথম প্রকাশ : জুলাই, 1954

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে
প্রকাশিত ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার
সাধনের উদ্দেশ্যে স্বল্প মূল্য নির্ধারিত।

মূল্য : পাঁচ টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

ঃ সূচীপত্র ঃ

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসূর্যেন্দু বিকাশ কর, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা, শ্রীহৃষীকেশ রায় প্রমুখ সুধীবৃন্দের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সাহায্যের ফলে এই অভিধান সংকলনের কার্য সম্ভব হয়েছে। ইঁহারা নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে যেরূপ শ্রম স্বীকার করেছেন, তার জন্যে আমি ইঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়া পরিচিত-অপরিচিত যে সকল সহৃদয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি এই অভিধান প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বিজ্ঞান ভারতী

(পরিবর্ধিত নব সংস্করণ)

—গ্রন্থকারের নিবেদন—

'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানখানা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে নব কলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হলো। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এরূপ একখানা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া খুবই আশার কথা; কারণ এথেকে বুঝা যায়, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটছে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে এটা দেশের পক্ষে বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হতেই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সুধিজনের নিকট 'বিজ্ঞান ভারতী' বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই অভিধানখানাকে বাংলা ভাষায় একটি মূল্যবান সংযোজন বলে 'নরসিংদাস পুরস্কার' দানে সমাদৃত করেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক পুস্তক হিসেবে অভিধানখানার বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছেন; আর তার ফলেই পুস্তকখানার মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে।

'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানের এই নব সংস্করণে বহু চিত্র ও নতুন শব্দের ব্যাখ্যা, নতুন নতুন সব জ্ঞাতব্য বিষয়, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি বহু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। বস্তুতঃ অভিধানখানাকে অধিকতর তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তকখানার বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা দেশের বিজ্ঞানানুরাগী সুধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বাংলার ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী,

দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীদের

কল্যাণে এই অভিধান গ্রন্থ

উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হলো। লোক-শিক্ষার প্রয়োজনে এরূপ একখানা পুস্তকের বাস্তবিকই অভাব ছিল, সে অভাব পূরণ করবার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 'বিজ্ঞান ভারতী' নামে এই অভিধান রচনা করে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার পথ যথেষ্ট সহজ ও সুগম করেছেন বলে আমি মনে করি।

পুস্তকখানা কেবল বিজ্ঞানের পারিভাষিক অভিধান নয়; বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যেরও সহজ ব্যাখ্যা এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কাজেই বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুগুলোর সঙ্গে মৌলিক পরিচয় লাভের পক্ষে পুস্তকখানার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান যুগে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও ভাবধারার সঙ্গে অন্ততঃ সাধারণভাবেও সকলেরই পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। এজন্যে আমার বিশ্বাস, দেশের প্রত্যেক জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তির নিকট 'বিজ্ঞান ভারতী' সমাদৃত হবে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি এই পুস্তক থেকে সহজে আয়ত্ব করতে পারবে। 'বিজ্ঞান ভারতী' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন ও আলোচনায় বিশেষ সাহায্য করবে, এবং একখানা প্রয়োজনীয় তথ্য পুস্তক হিসাবে দেশের জনসাধারণের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

দেশের ঘরে ঘরে এই অভিধানখানা সমাদৃত হোক; জনে জনে, বিশেষতঃ আমাদের ছাত্রছাত্রীগণ পুস্তকখানা পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করুক, এই আমার কামনা। ইতি—

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা, ১০ই জুন, ১৯৫৪

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এরূপ একখানা সহজ অভিধানের প্রয়োজন আছে, যা থেকে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলোর সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটতে পারে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজ সব রকম উন্নতি ও অগ্রগতির মূল-সূত্র বিজ্ঞান ; বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ তাই বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী সকলেরই সমান। আমাদের দেশেও আধুনিক বিজ্ঞানের সাধনা ক্রমেই প্রসার লাভ করছে ; কাজেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদানের মূল তথ্য সম্পর্কে সকলেরই ঔৎসুক্য লক্ষিত হচ্ছে ; সাধারণ আলাপ আলোচনায়ও তাই আজকাল স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের কথা উঠে পড়ে। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যাদি সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। এজন্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মৌলিক তথ্যাদি মাতৃভাষায় যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে পরিবেশন করাই এই অভিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শব্দ নির্বাচন—'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ইংরেজী শব্দগুলো বাংলা বানানে বার্ণানুক্রমিকভাবে বিবৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের মূল শব্দরাজির আন্তর্জাতিক রূপ রক্ষা করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি ; এর ফলে সর্বসম্মত ও সর্বত্র প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তথ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর স্থায়ী পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে। আভিধানিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিবৃতির জন্যে অবশ্য বাংলা পরিভাষা যথাসম্ভব ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দ নির্বাচনে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল তথ্যাদি সম্পর্কীয় ও সাধারণ জ্ঞাতব্য শব্দাদিরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাংলা বানানে ইংরেজী শব্দের মূল উচ্চারণ বজায় রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ; অবশ্য কোথাও কোথাও দেশীয় উচ্চারণের সৌকর্যার্থে সামান্য ব্যতিক্রমও করতে হয়েছে। বৈদেশিক শব্দের যথাযথ উচ্চারণ বাংলায় সর্বত্র নিখুঁতভাবে রক্ষা করা দুরূহ, সন্দেহ নেই।

পরিভাষা—ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের জন্যে বহুদিন থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছে; ফলে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যথেষ্ট প্রচলিতও হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাংলা পরিভাষা সর্বাংশে প্রকৃত অর্থবোধক হয় না, কষ্টকল্পিত ও নিরর্থক হয়ে পড়ে; এজন্যে এরূপ বাংলা পরিভাষা এ পুস্তকে যথাসম্ভব বর্জন করে ইংরেজী শব্দই বিশেষ তাৎপর্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানে বিশেষ প্রচলিত ও যথাযথ অর্থবোধক বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলো মাত্র আমরা ব্যবহার করেছি।

বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর বাংলা ব্যাখ্যার মধ্যেও ইংরেজী শব্দই স্বকীয় তাৎপর্যসহ ভাবপ্রকাশক ভঙ্গিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতির পরিভাষা অম্লজান, উদ্‌জান প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নি; কারণ এগুলো থেকে অক্সাইড পারঅক্সাইড, হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন অনুযোজক শব্দ গঠন করা সুষ্ঠভাবে সম্ভব হয় না। কিন্তু টেম্পারেচার—উষ্ণতা, বয়েলিং-পয়েন্ট—স্ফুটনাংক, ইকোয়েটর—বিষুববৃত্ত প্রভৃতি পরিভাষা সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছে। কেহ কেহ ইন্‌কিউবেটর, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা উষ্ণকক্ষ, হিমকক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার করেন, এরূপ না করাই ভাল। ইঞ্জিন, সেল, ডায়নামো, কমিউটেটর, কম্পাস, গ্যালভ্যানোমিটার প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্রাদি বিষয়ক শব্দের যথাযথ আন্তর্জাতিক রূপ বজায় রাখাই বিধেয়। আবার অনেকে ক্যালসিয়াম, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি শব্দকে ক্যালসিয়ম, প্ল্যাটিনম প্রভৃতি লিখে থাকেন; এরূপ বিকৃতিরও আমরা পক্ষপাতী নই। অক্সি-অ্যাসিডকে অক্সি-অম্ল, অ্যালকোহলকে কোহল, ক্যাথোড-রে-টিউবকে ক্যাথোড-রশ্মি নল লেখাও গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট ও নিরর্থক বলে আমরা মনে করি।

মোট কথা, আমরা এই পুস্তকে বৈজ্ঞানিক শব্দের মূল ধ্বনি ও রূপ যথাসম্ভব বজায় রেখে বাংলায় গ্রহণ করেছি। এভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দরাজি ক্রমে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য

সমৃদ্ধ হবে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দূর হবে। অধিকন্তু এর ফলে শিক্ষার্থিগণের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানশিক্ষার পথও বহুল পরিমাণে সুগম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ ছাড়া সংখ্যাসূচক প্রতীক চিহ্নগুলোও এই পুস্তকে সর্বত্র 1, 2, 3,··· ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে; যেহেতু রাসায়নিক সংকেত সূত্রাদিতে রোমান হরফ ও সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা অপরিহার্য; বাংলাভাষায় এ-সবের রূপান্তর সম্ভবও নয়। আবার এর ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে বলে আমরা মনে করি। আমাদের মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অনুশীলনে এই রীতিই সমীচীন।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—বিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্দাদির মূল তথ্য ও তাৎপর্য সহজভাবে বিবৃত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বহু জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সহজ ব্যাখ্যা অল্প কথায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করতে হয়েছে; কারণ সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সংকলন করাই অভিধানের রীতি—অভিধানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। এজন্যে কোন কোন স্থলে বিবৃতি অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে, তথ্যবিশেষে মতদ্বৈধের অবকাশও অসম্ভব নয়। সহজবোধ্য বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয়তো সর্বত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানের অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ও মূল তথ্যের প্রাথমিক ধারণা পরিবেশন করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানখানা দেশের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই আমরা কৃতার্থ হবো।

বাংলা ভাষায় এরূপ বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম। বিশেষতঃ নানারূপ অসুবিধা ও ব্যস্ততার মধ্যে এর সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন করতে হয়েছে। কাজেই কোথাও কোথাও ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি হয়তো থেকে গেছে; অতএব আমরা দেশের সহৃদয় সুধীসমাজের সহযোগিতাপূর্ণ

মতামত সর্বতোভাবে কামনা করছি। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে যে কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশিষ্ট—অভিধানের শেষে বিজ্ঞানবিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদত্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যাপারে বিভিন্ন পদার্থের ডেন্সিটি, গলনাংক, স্ফুটনাংক, বিভিন্নরূপ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি, সৌর পরিবারের বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, ইত্যাদি বহু বিষয় বিজ্ঞানানুরাগীদের প্রায়শঃই প্রয়োজন হয়। এজন্যে এরূপ বিভিন্ন তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান ভারতী'তে যে সকল বাংলা পরিভাষা গৃহীত হয়েছে সেগুলোর একটা বাংলা বর্ণানুক্রমিক তালিকা মূল ইংরেজী শব্দসহ প্রদত্ত হয়েছে; এ থেকে বাংলায় বহু সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ সহজে পাওয়া যাবে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধাদি রচনার জন্যে লেখকগণের ও বিজ্ঞানানুরাগী সাধারণ পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংকলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা অবলম্বনে বিভিন্ন পরিভাষিক শব্দের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে উক্ত তালিকার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হলেও মূল তালিকার ধারা যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে। ইতি—

১৫ই জুলাই, ১৯৫৪

৪২/১এ, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা ২৬ — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সংকেত

এই অভিধানে বিভিন্ন ব্যাখ্যাদির মধ্যে অন্যত্র দ্রষ্টব্য শব্দের পরে এই ↑ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে ; ↑ মানে 'অন্যত্র দেখুন'।

রাসায়নিক সূত্রাদির অর্থবোধের জন্যে পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট 'মৌলিক পদার্থের তালিকা' থেকে বিভিন্ন মৌলের সাংকেতিক চিহ্ন দেখতে হবে ; যেমন—

N—নাইট্রোজেন   Na—সোডিয়াম

Ca—ক্যালসিয়াম   C—কার্বন ; ইত্যাদি

এ থেকে—

NH_3 — অ্যামোনিয়া (একটা নাইট্রোজেন পরমাণু ও তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটা অ্যামোনিয়া-অণু) বুঝতে হবে।

এইরূপ, H_2O — জল (দুটা হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটা অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে গঠিত তরল পদার্থ) জলের একটা অণু।

বিজ্ঞান ভারতী

বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যামুলক অভিধান

অক্টা, অক্টো — আট গুণ, অষ্ট-সংখ্যক; যেমন, অক্টোপাস—অষ্টভুজ সামুদ্রিক জীব; অক্টাহেড্রন—সমান আটতলবিশিষ্ট আকৃতি।

অক্টোপাস

অক্টোপড — অষ্ট সংখ্যক পদ বা অঙ্গবিশিষ্ট জীব; যেমন, অক্টোপাস।

অক্টাগন — অষ্টভূজ জ্যামিতিক ক্ষেত্র; যে সামতলিক ক্ষেত্র আটটি সরল রৈখিক ভূজ বা বাহুদ্বারা সীমাবদ্ধ।

অক্ট্যাণ্ট — বৃত্তের অষ্টমাংশ। কোন জ্যামিতিক বৃত্তের দুটি ব্যাসার্ধ 45° কোণে অঙ্কিত হলে তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ।

অক্টেন — প্যারাফিন ↑ জাতীয় একটি হাইড্রোকার্বন ↑; তরল পদার্থ, স্ফুটনাঙ্ক 126° সেন্টিগ্রেড। আণবিক সূত্র C_8H_{18}; মোটর স্পিরিট বা পেট্রলের ↑ কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'অক্টেন-রেটিং'।

অক্টেভ-ল — বিজ্ঞানী নিউল্যাণ্ডস্ মৌলিক পদার্থগুলোর ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ নিয়ম বা সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন। এর মূল তথ্য অনেকটা মেণ্ডেলিফের 'পিরিয়ডিক্-ল'-এরই ↑ অনুরূপ। কিন্তু বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ↑ করেছিলেন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ-গুলোর একটা সুসম্পূর্ণ পর্যায়ক্রমিক তালিকা, যাকে বলা হয় 'পিরিয়ডিক টেবল' (পরিশিষ্ট ↑); আর এর মূল সূত্রটাকে বলে পিরিয়ডিক্-ল ↑। নিউল্যাণ্ডস্-এর এই 'অক্টেভ-ল' অসম্পূর্ণ হলেও অন্য-নিরপেক্ষভাবেই তিনি এটা স্থির করেছিলেন।

অক্টাভো — মুদ্রণকার্যে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ। এক তা কাগজকে এদিক-ওদিক করে তিন বার ভাজ করলে যে আকার হয় এবং যাতে 16 খানা মুদ্রিত পৃষ্ঠা (এক ফর্মা) পাওয়া যায়।

অক্লুসান — কোন নলপথে তরল পদার্থের চলাচল অবরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা, যেমন, **কুরোনারি অক্লুসান**—ধমনীর রক্ত কোন স্থানে জমাট বেঁধে

হৃৎপিণ্ডে রক্তের চলাচল বন্ধ হওয়া। আবার, তরল বা কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে কোন গ্যাস আবদ্ধ থাকা; যেমন, ঢালাই লোহার কোথাও ফেঁপে বাতাসের বুদ্‌বুদ আবদ্ধ থাকে। এভাবে আবদ্ধ গ্যাসকে (বায়ু) বলে **অক্লুডেড** গ্যাস।

অকাল্‌টেসান — জ্যোতির্বিজ্ঞানে গগন পর্যবেক্ষণকালে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চাতে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্য হওয়া। দর্শকের দৃষ্টি থেকে কোন গ্রহের দ্বারা তার কোন উপগ্রহ আচ্ছাদিত হয়ে সাময়িকভাবে অদৃশ্য থাকার অবস্থা।

অক্সিজেন — একটি মৌলিক গ্যাস, সাংকেতিক চিহ্ন O; বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 16, পারমাণবিক সংখ্যা 8; অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে বায়ুতে মিশে আছে; আয়তনে বায়ুর প্রায় এক পঞ্চমাংশ। সব রকম দহনকার্য ও জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া এ ছাড়া চলে না। হাইড্রোজেন ↑ গ্যাসের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে জলের উৎপত্তি। ধাতব খনিজের সঙ্গে প্রচুর সংমিশ্রিত রয়েছে। লোহার সঙ্গে এর মিলনের ফলে লোহায় মরিচা ধরে — লোহার অক্সাইড ↑ তৈরী হয়। তরল বায়ু থেকে আংশিক বাষ্পীভবন-প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায়। জলে সামান্য দ্রবণীয়। 1774 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিস্টলি ↑ আবিষ্কার করেন।

অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম (শিখা)— অক্সিজেন ↑ ও অ্যাসিটিলিন ↑ গ্যাস দুটিকে মিশিয়ে একসঙ্গে প্রজ্বলিত করলে যে উচ্চ তাপের (প্রায় 3300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) তীব্র অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৃথক নলের মধ্য দিয়ে এসে ওই
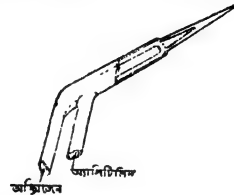
অক্সি-অ্যাসিটিলিন বার্ণার

দুটা গ্যাস এক মুখে মিশে বেরোয়; এই মিশ্রিত গ্যাস জ্বালিয়ে দিলে অত্যুত্তপ্ত অগ্নিশিখার সৃষ্টি করে। এর তাপে কঠিন ধাতব পদার্থ গালিয়ে জোড়া লাগানো হয়; এই প্রক্রিয়াকে বলে **ওয়েল্ডিং** ↑ ।

অক্স্যালিক অ্যাসিড — সাদা স্ফটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ; জলে দ্রবণীয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $(COOH)_2 . 2H_2O$; নানা রকম রঞ্জক-দ্রব্য, কালি, মেটাল-পলিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে দরকার হয়। এর জলীয় দ্রব লাগালে কালির দাগ উঠে যায়; এর সঙ্গে একটু অ্যামোনিয়া ↑ দিয়ে রোদে রাখলে আরও ভাল কাজ হয়ে থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ থেকে বিভিন্ন অক্স্যালেট সল্ট ↑ উৎপন্ন হয়।

অটো — শব্দার্থ হলো স্বয়ংক্রিয়, বা আপনা-থেকে; যেমন, অটোমেটিক পিস্তল, অটো-জাইরো ↑, ইত্যাদি।

অটোক্লেভ — বাক্সের মত আধার-যুক্ত বিশেষ এক রকম তাপ-যন্ত্র; অত্যুত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত রেখে এই আধারের মধ্যে কোন বস্তু 100° সেন্টিগ্রেডেরও অধিক তাপে উত্তপ্ত রাখা যায়। ক্ষতচিকিৎসার তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে; এই প্রক্রিয়াকে 'স্টেরিলাইজ' করা বলে।

অটোগেমিক — যে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী গর্ভকোষ ও পুংকোষের (স্ত্রী-পুরুষের) মিলন ব্যতীত আপনা থেকেই এককভাবে বংশবৃদ্ধি করে।

অটোজাইরো — উপরে ঘূর্ণায়মান পাখাযুক্ত হেলিকপ্টার ↑ শ্রেণীর এক রকম বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র বিমান-পোত। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘূর্ণায়মান এই পাখার সাহায্যে বাতাস কেটে অটোজাইরো সোজা উপরে উঠে যেতে পারে।

অটোজাইরো

অডিবিলিটি লিমিট — বাতাসে প্রতি সেকেণ্ডে কমপক্ষে 30 থেকে উর্ধে 30,000 বার স্পন্দনের শব্দতরঙ্গ মানুষের কানে ধরা পড়ে; এর বেশী বা কম স্পন্দন-বিশিষ্ট তরঙ্গের শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। প্রতি সেকেণ্ডে শব্দতরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার এই সীমাকে বলে অডিবিলিটি-লিমিট্। এর বেশী সংখ্যক স্পন্দনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গকে বলে 'আল্ট্রাসোনিক'।

অণ্টোজেনি — কোন প্রাণীবিশেষের জৈববিবর্তন বা বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাবিবরণী বা ইতিহাস। জীব-বিজ্ঞানের এই শাখাকে বলা হয় **অণ্টোলজি**। সমষ্টিগতভাবে কোন প্রাণী-গোষ্ঠির (ফাইলাম ↑) জৈব বিবর্তনের ইতিহাসকে বলে **ফাইলো-জেনি**।

অপ্থেল্মিয়া — চোখের রোগ-বিশেষ; অক্ষিগোলকের প্রদাহ ও স্ফীতাবস্থা। জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগ। রোগী থেকে সুস্থ লোকের চোখে সংক্রামিত হতে পারে; আবার মাতার কোন গোপন ব্যাধির জীবাণুর প্রভাবে নবজাতকেরও হতে দেখা যায়।

অপ্থ্যাল্মোস্কোপ — চক্ষুপরীক্ষার যন্ত্র বিশেষ; যাতে চোখের দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। 'অপ্-থ্যাল্ম্স' মানে 'চোখ'।

অপ্সোনিন্স — জীবের রক্তে যে-সব সূক্ষ্ম জৈব উপাদানের কার্যকারিতায় শ্বেতকণিকাগুলি কোন বহিরাগত রোগ-জীবাণুকে দ্রুত ধ্বংস করতে পারে। কোন ব্যক্তির রক্তে কোন বিশেষ জীবাণুকে বিপর্যস্ত করবার যতটা শক্তি থাকে তার পরিমাপক তুলনামূলক সাংকেতিক সংখ্যাকে বলে **অপসোনিক ইণ্ডেক্স**; টিকার

বীজের প্রভাবে রক্তে এই শক্তি বা 'অপ্সোনিক ইণ্ডেক্স' বৃদ্ধি পায়।

অপোজিসান — জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ ; নিজ নিজ কক্ষ-পথে পরিক্রমাকালে কোন গ্রহ যখন পৃথিবী ও সূর্যের সমস্থত্রে আসে এবং পৃথিবী থাকে মাঝে, তখন ঐ গ্রহটি 'অপোজিসান' অবস্থায় আছে বলা হয়।

অপ্টিমাম — সর্বোৎকৃষ্ট ; যেমন, 'অপ্টিমাম টেম্পারেচার' হলো কোন জীবের (বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার) পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বা সব চেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা।

অপ্টিক অ্যাক্সিক — কোন পদার্থের কৃষ্ট্যাল ↑ বা স্ফটিকের অভ্যন্তরে যে নির্দিষ্ট দিকে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত করলে তা বিভিন্ন রঙের বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট না হয়ে সমবর্ণেই প্রতিসরিত হয়। এক কথায় বলা যায়, আলোকের (স্ফটিকাভ্যন্তরস্থ) অক্ষপথ।

অপ্টিক্স —আলোকের ধর্ম ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

অফ্সেট প্রিণ্টিং — কোন অমসৃণ কাগজেও রঙিন ছবি ছাপবার এক রকম উন্নত প্রণালী। রাবার বা অনুরূপ কোন নরম পদার্থের পাতের উপরে বিশেষ কৌশলে প্রথমে উদ্দিষ্ট ছবির এক-এক বর্ণের উল্টা প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত হয় ; পরে যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে কাগজে বিভিন্ন বর্ণ ধারাবাহিকভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়।

অব্জেকৃটিভ — দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে-সব লেন্স ↑ দৃশ্য বস্তুর অভিমুখে সংলগ্ন থাকে। আর, ওই সব যন্ত্রের যে-দিকে চোখ লাগানো হয় সেদিককার লেন্সকে বলা হয় 'আই-পিস'।

অবটিউস অ্যাঙ্গল্ — এক সমকোণ বা 90° ডিগ্রি অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু 180° ডিগ্রি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ।

অম্ব্রোমিটার — বৃষ্টিমান যন্ত্র বা রেইন-গেজ ↑ ; কোন স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্দেশক যন্ত্র। 'অম্ব্রো' মানে রেইন বা বৃষ্টি।

অর্কিড — এক শ্রেণীর মনোরম সপুষ্পক উদ্ভিদ ; এদের কতকগুলি আছে পরগাছা শ্রেণীর। এদের ফুল সাধারণতঃ বিভিন্ন বর্ণে বৈচিত্র্যময় সুদৃশ্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার বিভিন্ন গোত্রের অর্কিড পা ও য়া গেছে। ভারতে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট অর্কিড জন্মে।

অর্কিড

অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রি — জৈব বা অঙ্গারক রসায়ন-বিদ্যা; কার্বো-রসায়ন। উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহ থেকে প্রাপ্ত, বা অঙ্গারঘটিত পদার্থাদির গুণ, ধর্ম, গঠন প্রভৃতি বিষয়ক রসায়ন শাস্ত্র।

অর্গ্যানোথেরাপি — চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ ; যাতে কোন রোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কোন সুস্থ জীবের বিশেষ গ্ল্যাণ্ড ↑ বা জৈবগ্রন্থি অস্ত্রোপচারের দ্বারা সংযোগ করা হয় ; অথবা, সেই গ্রন্থির নির্যাস (যেমন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের ↑) রোগীর দেহে ইন্‌জেক্‌সন করে প্রবিষ্ট করা হয়।

অর্গ্যাণ্ডি — হাল্‌কা, সূক্ষ্ম ও খড়্‌খড়ে সুতীবস্ত্র বিশেষ ; ব্যবহারিক নাম।

অর্গানোসল — কোন তরল জৈব রাসায়নিক (অর্গ্যানিক ↑ বা কার্বনজ যৌগিক) পদার্থের মাধ্যমে তৈরী কোলয়ড্যাল সল্যুসান (কোলয়েড ↑)।

অর্গ্যানোমেটালিক কম্পাউণ্ড — ধাতব পরমাণুর সঙ্গে জৈব রাসায়নিক (অর্গ্যানিক ↑) কোন পরমাণু-গোষ্ঠির মিলনে উৎপন্ন কোন যৌগিক পদার্থ, যেমন—লেড-টেট্রাইথাইল।

অর্ডিনেট — সমতলস্থ কোন বিন্দুর অবস্থান-নির্দেশক লম্ব-স্থানাঙ্ক বা 'y' কোঅর্ডিনেট ; বাংলায় বলা হয় বিন্দুর কটিপদ। (অ্যাব্‌সিসা ↑)

অর্থো-অ্যাসিড — যে অ্যাসিড ↑ কোন অক্সাইডের ↑ সঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক জলীয় অণুর মিলনে গঠিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। রাসায়নিক বিচারে যে-কোন অ্যাসিডকেই মূলতঃ এক বা একাধিক জলীয় অণুর সংযোগে গঠিত কোন অক্সাইডরূপে কল্পনা করা যায়। এভাবে সর্বনিম্ন সংখ্যক জলীয় অণু থাকলে তাকে মেটা-অ্যাসিড ↑, এবং সর্বাধিক সংখ্যক থাকলে অর্থো-অ্যাসিড বলা হয়। যেমন—মেটাসিলিসিক অ্যাসিড (H_2SiO_3)-কে মনে করা যায় SiO_2+H_2O ; কিন্তু অর্থোসিলিসিক অ্যাসিড (H_4SiO_4)-কে SiO_2+2H_2O ; এভাবে একে দু'টি জলীয় অণুবিশিষ্ট সিলিকা ↑, বা সিলিকন ↑ অক্সাইডরূপে পরিকল্পিত হয়।

অর্থোক্রোমেটিক ফিল্ম — 'অর্থো' মানে সোজাসুজি, অথবা যথাযথ ; 'ক্রোমেটিক' মানে বর্ণময়। আলোক-চিত্রের যে ফিল্মে ↑ বিভিন্ন বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য সাদা কালো ছবিতে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে এরূপ ফিল্ম বিশেষতঃ সবুজ, নীল ও বেগুনী বর্ণ (আলোক) সুগ্রাহী হয়ে থাকে ; এর ফলে ফটোগ্রাফির ↑ আলোছায়ার কৌশলে এতে অধিকতর স্বাভাবিক ছবি ওঠে।

অর্থোক্লেজ — ফেলস্পার ↑ শ্রেণীর খনিজ প্রস্তর বিশেষ ; অ্যালুমিনিয়াম ও পটাসিয়ামের যুক্ত সিলিকেট ↑। এর বিশেষত্ব হলো, আঘাতে এর কৃষ্ট্যাল-গুলি পরস্পরের লম্বভাবে (অর্থোগ-ন্যাল ↑) দু'দিকে ফেটে ভেঙ্গে যায়।

অর্থোগন্যাল — লম্বভাবে অবস্থিতি ; দু'টি সরলরেখা পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করলে তাদের বলা হয় পরস্পরের 'অর্থোগন্যাল'।

অর্থোগ্রাফিক প্রোজেক্সন — গৃহাদির যে নক্সা অঙ্কনে কেবল মাত্র প্রান্তীয় রেখাগুলি মূলবস্তুর অনুরূপ সমান্তরাল ভাবে হুবহু অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ যে নক্সায় দৃষ্টি কোণানুরূপ-ভাবে (অর্থাৎ পার্সপেক্টিভ ↑) বস্তুর অবস্থান-বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্যে অসমান্তরাল রেখাবিন্যাস করা হয় না।
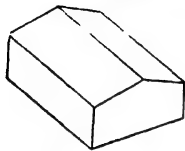
অর্থোগ্রাফিক প্রোজেক্সন

অর্থোপিডিক সার্জারি — অস্ত্র-চিকিৎসার পদ্ধতি বিশেষ; যাতে দেহের (বিশেষতঃ শিশুদেহের) কোন ভগ্ন বা বিকৃতাঙ্গের অস্থি, অথবা অস্থি-সন্ধি অপসারিত করে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।

অর্থোসেণ্টার — ত্রিভুজের লম্ববিন্দু; কোন জ্যামিতিক ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দুত্রয় থেকে বিপরীত বাহু-ত্রয়ের উপরে অঙ্কিত লম্ব-রেখা তিনটির ছেদবিন্দু।
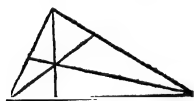
অর্থোসেণ্টার

অর্থোপটেরা — আরসোলা জাতীয় যে-সব পতঙ্গের সামনের পক্ষদ্বয় অপেক্ষাকৃত পুরু ও শক্ত; কিন্তু পেছনের পাখা-জোড়া পাতলা জালি পর্দায় তৈরী। (চিত্রে একদিকের পক্ষ দ্বয় দেখানো হয়েছে)

অর্থোপটেরা

অর্পিমেণ্ট — এক রকম হলদে খনিজ পদার্থ; স্বভাবজাত আর্সেনিক ট্রাইসাল্ফাইড (As_2S_3), বিষাক্ত পদার্থ। বাংলায় বলে হরিতাল।

অরবিট — কক্ষ; নির্দিষ্ট ভ্রমণ-পথ। গ্রহাদি যে-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আবার, পরমাণুর সংগঠক ইলেক্‌ট্রনগুলো ↑ যে-পথে নিউ-ক্লিয়াসের ↑ চারিদিকে ঘোরে।

অরোগ্রাফিক রেইন — পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত মেঘের বর্ষণে যে বৃষ্টিপাত হয় (অরো=পার্বত্য)।

অরোরা অস্ট্রালিজ — দক্ষিণ মেরুজ্যোতি; দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের আকাশে যে জ্যোতিপ্রভা দৃষ্ট হয়। উত্তর মেরুঅঞ্চলের আকাশে একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন অনুরূপ জ্যোতিপ্রভাকে বলে 'অরোরা বোরিয়ালিস' ↑।

অরোরা-বোরিয়ালিস — উত্তর-মেরু-প্রভা; পৃথিবীর উত্তর-মেরু-প্রদেশের আকাশে যে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হয়। এর বর্ণালীতে প্রধানতঃ লাল ও সবুজ বর্ণের আভাই বেশী। সম্ভবতঃ সূর্য থেকে তড়িতাবিষ্ট কণিকা-ধারা বিচ্ছুরণের ফলে এরূপ বর্ণচ্ছটা প্রতিভাত হয়ে থাকে। বায়ু-কণিকা আয়নান্বিত হয়ে তার তড়িৎ-বিচ্ছুরণের ফলেও এরূপ হতে পারে। যখন সৌর কলঙ্কের আধিক্য ঘটে তখনই এই আলোকচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

অর্মোলু — তামা ও দস্তার (জিঙ্ক ↑) এক প্রকার ধাতু-সংকর বিশেষ, যা দেখতে অনেকটা যেন সোনার মত বর্ণবিশিষ্ট হয়।

অল্‌ফ্যাক্টরি — গন্ধ বা ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় ; যেমন — 'অল্‌ফ্যাক্টরি অর্গ্যান' হলো ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকার অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি, যা গন্ধের অনুভূতি জাগায়।

অলিয়োরেজিন — যে রেজিনে ↑ উদ্ভিজ্জ উদ্বায়ী তৈলাংশ কতকটা সংমিশ্রিত থেকে যায়। 'অলিয়ো' মানে 'অয়েল' অর্থাৎ তেল সংযুক্ত।

অলিভাইন — লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ↑ ধাতুদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থো-সিলিকেট [$(MgFe)_2SiO_4$]-এর বিশেষ নাম। এরূপ খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ ভূ-স্তরের গভীরে ও সমুদ্রের তলদেশের কঠিন প্রস্তরাভ্যন্তরে পাওয়া যায়। স্ফটিকাকারের বিশুদ্ধ অলিভাইন মূল্যবান, সৌখিন ও সুদৃশ্য প্রস্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অলিয়াম — ঘনীভূত (কন্‌সেণ্ট্রেটেড) গন্ধকাম্ল ; নির্জল বিশুদ্ধ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, ↑ H_2SO_4 ; যাতে জলীয় অংশ প্রায় থাকে না। অনাবৃত রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে এ-থেকে সব সময় সাল্‌ফার-ট্রাইঅক্সাইডের (SO_3) ধূম নির্গত হতে থাকে ; তাই একে **ফিউমিং সাল্‌ফিউরিক** অ্যাসিডও বলে।

অলেইক অ্যাসিড — একটি তরল অসম্পৃক্ত জৈব (অর্গ্যানিক) অ্যাসিড ; বিভিন্ন তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থে এর বিভিন্ন গ্লিসারাইড ↑ পাওয়া যায়। এর গ্লিসারাইড যৌগিকের ভাগ যত বেশী থাকবে জৈব তৈল বা চর্বি তত নরম, মসৃণ ও তৈলাক্ত হবে।

অল্টার্নেটিং কারেণ্ট — সংক্ষেপে এ. সি. (তড়িৎপ্রবাহ) ; যে তড়িৎ-প্রবাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে। এরূপ প্রবাহে তড়িৎশক্তি প্রথমে একদিকে সর্বোচ্চ চাপ-সীমায় পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে সে-চাপ মন্দীভূত হয়, এবং বিপরীত দিকে সর্বনিম্ন সীমায় দ্রুত নেমে যায়। প্রবাহপথে তড়িৎশক্তির এরূপ পর্যায় ক্রমিক অতিদ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকে — প্রতি সেকেণ্ডে তড়িৎ প্রবাহের এরূপ দিক পরিবর্তনের পৌনঃপৌনিক সংখ্যাকে বলা হয় 'ইলেক্‌ট্রো ফ্রিকোয়েন্সি' ↑। এ. সি. তড়িৎপ্রবাহে সাধারণতঃ সেকেণ্ডে 50 ফ্রিকোয়েন্সি রাখা হয়, কিন্তু রেডিও ↑, রাডার ↑ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা কয়েক হাজারও করা প্রয়োজন হয়।

অল্টিচিউড — সাধারণ অর্থে 'উচ্চতা' ; কোন স্থানের অল্টিচিউড বললে সাগরপৃষ্ঠ থেকে সে-স্থানের উচ্চতা বুঝায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অল্টিচিউড বলতে ভূ-সমান্তরাল থেকে তার কৌণিক উচ্চতা (অ্যাঙ্গুলার হাইট ↑) বুঝতে হয়।

অল্টিমিটার —কোন স্থানের উচ্চতা (অল্টিচিউড) নিরূপণ করবার জন্যে

ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। নানারকমের আছে (হিপ্সোমিটার ↑)।

অলিফাইন — ইথিলিন ↑ শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম; এদের **অলিফিন্স**ও বলা হয়। এদের সাধারণ রাসায়নিক ফর্মুলা হলো C_nH_n বিভিন্ন সংখ্যক কার্বন ↑ ও হাইড্রোজেন অণুর মিলনে এগুলো গঠিত হয়।

অয়েল অব ভিট্রিয়ল — সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের ↑ (H_2SO_4) বিশেষ নাম। বাংলায় বলে গন্ধকাম্ল।

অস্‌মোসিস — সূক্ষ্ম পর্দাবিশেষের মধ্যে দিয়ে জল বা অপর কোন দ্রাবক পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয়। এরূপ পর্দার ভিতর দিয়ে দ্রাবক তরল পদার্থ টি নিসৃত হয়, কিন্তু দ্রাব্য পদার্থ আটকে যায়। অসমান ঘনত্বের দুটি দ্রবের মধ্যে এরূপ পর্দা দিলে অল্প ঘনত্বের দ্রব থেকে দ্রাবকের এই গতির (অস্‌মোসিস) প্রভাবে জল বা যে-কোন তরল দ্রাবক অধিক ঘনত্বের দ্রবের দিকে প্রবাহিত হয়ে উভয়ের ঘনত্ব সমান করতে চায় (হাইপার টোনিক ↑)।

অস্‌মিয়াম — একটি মৌলিক ধাতু; সাদা, স্ফটিকাকার, কঠিন পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Os; পারমাণবিক ওজন 190·2, পারমাণবিক সংখ্যা 76; সবচেয়ে ভারী ধাতব পদার্থ। প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। দুর্লভ মুল্যবান ধাতু।

অস্‌মিরিডিয়াম — অস্‌মিয়াম, ইরিডিয়াম ↑ ও সামান্য প্ল্যাটিনামের সংমিশ্রণে তৈরী একটি সংকর-ধাতু (অ্যালয় ↑); অত্যন্ত কঠিন, মরিচা ধরে না — মুল্যবান ঝর্ণা কলমের নিবের অগ্রভাগে লাগানো হয়।

অস্ট্রিচ — উটপাখি, পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহদাকার পক্ষী; উচ্চতায় অনেক সময় আট ফুট পর্যন্ত হয়। উড়তে পারে না, দেহের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়ের সঞ্চালনে এদের দ্রুত ধাবনে সাহায্য হয় মাত্র। স্ত্রী-পক্ষীর পালক ধূসর বর্ণের; পুং-পক্ষীর পালক হয় প্রায়শঃ কৃষ্ণবর্ণ। আরব ও আফ্রিকায় এদের আদি আবাস। এদের বংশ ক্রমে লোপ পাচ্ছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এদের কৃত্রিম পালনভূমি তৈরী করা হয়েছে। এদের পালকের ব্যবসায় লাভজনক—পাশ্চাত্য রমণীর টুপি সুশোভিত করতে ও সৌখীন ব্যাজন তৈরী করতে এদের পালক উচ্চ মুল্যে প্রচুর বিক্রয় হয়।

অস্ট্রিচ

অসিলেটিং কারেণ্ট — অল্টার্নেটিং কারেণ্ট ↑, বা এ. সি. তড়িৎ-প্রবাহ; যাতে প্রবাহের গতিপথ সেকেণ্ডে

শত বা সহস্র বার এদিক-ওদিকে পরিবর্তিত হয়।

অসিলোস্কোপ — স্পন্দন-নির্দেশক যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে সব রকম বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা কম্পন ধরা পড়ে, এবং সেই কম্পনের গতি-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। অনেক যন্ত্রে আবার স্পন্দনের রেখা-চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায়—এই রেখা-চিত্রকে বলে **অসিলোগ্রাফ**। (ভূ কম্পন নির্দেশক যন্ত্রের নাম সিস্মোমিটার ↑)

অ্যা

অ্যাক্টিনিয়াম—তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাকটিভ ↑) মৌলিক পদার্থ বিশেষ; সাংকেতিক চিহ্ন Ac, অ্যাটমিক নাম্বার ↑ 89; এই দুষ্প্রাপ্য পদার্থটি ইউরেনিয়াম ↑ খনিজ থেকে 1899 খৃঃ বিজ্ঞানী ডিবার্নে (Debierne) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

অ্যাক্টিনোমিটার — সূর্যালোকের অদৃশ্য রশ্মির তীব্রতা ও তেজশক্তি পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ।

অ্যাক্টিনিক - রে — সূর্যালোকের সংগঠক রশ্মিমালার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-(ওয়েভ-লেংথ ↑) বিশিষ্ট অতি-বেগুনি রশ্মি; সূর্যালোকের এই অদৃশ্য অংশই ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ↑ উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফিল্মে ছায়াপাত হয়।

অ্যাক্টিভেটেড কার্বন — বায়ু-শূন্য পাত্রে কাঠ উত্তপ্ত করে (পুড়িয়ে) যে কয়লা বা চারকোল ↑ তৈরি হয়। এরূপ কাঠকয়লার গ্যাস-শোষণের ক্ষমতা সমধিক বলে সাধারণতঃ গ্যাস-মাস্কে ↑ (মুখসে) ব্যবহৃত হয়। আবার, কোন দ্রবণ থেকে তার মধ্যে দ্রবিত রঞ্জক পদার্থ পরিপোষণের ক্ষমতাও এর আছে।

অ্যাক্টিনো মা ই সি ন — কতকটা তারকাকৃতি ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) জাতীয় সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীবাণু। সাধারণ ছত্রাকের মত এ-গুলিরও স্পোরের ↑ সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয়। এই ছত্রাকের জন্যেই আলোবাতাস-হীন আবদ্ধ ঘরে এক রকম সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। এর আক্রমণে গরু প্রভৃতি জন্তুর জিভ ফুলে শক্ত হয়ে ওঠে — এ রোগকে বলা হয় **অ্যাক্টিনোমাইকোসিস**।

অ্যাক্রোমেটিক লেন্স — বিভিন্ন প্রতিসরণ-ক্ষমতার কাচের সংযোগে তৈরী বিশেষ এক রকম যুগ্ম লেন্স ↑। সাধারণ একক লেন্সে প্রতিসরিত প্রতিচ্ছবির প্রান্তদেশে বিভিন্ন বর্ণাভা পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু এই লেন্সের প্রতিসরণে প্রতিসরিত রশ্মিমালায় ঐ-রকম প্রান্তীয় বর্ণাভা থাকে না, হুবহু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

অ্যাক্রোমেটিন — উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবকোষের (সেল ↑) সংগঠক যে উপাদান কোন রঞ্জক পদার্থেই রঞ্জিত হয় না, সর্বদা নিজস্ব স্বাভাবিক স্বচ্ছ অবস্থায় থেকে যায় (ক্রোমেটিন ↑)।

অ্যাক্রিফ্লেভিন — আলকাতরা (কোল্‌টার ↑) থেকে নিষ্কাশিত জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষণে প্রস্তুত হলদে এক প্রকার জীবাণু-প্রতিষেধক (অ্যান্টিসেপ্টিক ↑) পদার্থ। এর জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা স্বভাবতঃই প্রবল; আবার রক্তের সিরামের ↑ সংস্পর্শে এই শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

অ্যাক্সিলারেসন—ত্বরণ; চলমান বস্তুর গতি-বৃদ্ধির হার। গতিবেগের হ্রাসের হারকে বলে **রিটার্ডেসন** ↑। উপর থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে পতনকালে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভি-টেসন ↑) প্রভাবে সকল বস্তুর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 32 ফুট করে বৃদ্ধি পেতে থাকে; এই নির্দিষ্ট বৃদ্ধি-হারকে বলা হয় 'অ্যাক্সিলারেসন ডিউ টু গ্রাভিটেসন', অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণ। স্থিরাবস্থা থেকে বস্তুটি যখন পড়তে থাকে তখন প্রথম সেকেণ্ডের অন্তে তার গতিবেগ হবে প্রতি সেকেণ্ডে 32 ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ড অন্তে হবে প্রতি সেকেণ্ডে 64 ফুট—এভাবে পতনের গতিবেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। গতিবেগের এই ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেসন '32 ফুট প্রতি সেকেণ্ড/সেকেণ্ড' বলে প্রকাশ করা হয়। নিক্ষিপ্ত গোলা-গোলি প্রভৃতি চলমান বস্তুর এরূপ অ্যাক্সিলারেসন বা রিটার্ডেসন থাকতে পারে, না থাকলে তার গতি হবে স্থির, অর্থাৎ প্রারম্ভিক গতি বরাবর একই থাকবে, সমকালে সমান দূরত্ব অতিক্রম করছে, বুঝতে হবে।

অ্যাক্সিলারেটর—ত্বরক; যার প্রভাবে কোন কিছুর গতি ত্বরান্বিত হয়। যে যন্ত্রাংশের সাহায্যে মোটরগাড়ীর গতিবেগ প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো যায় তাকে বলে অ্যাক্সিলারেটর। অন্যপক্ষে, যে সব পদার্থের প্রভাবে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়—যেমন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (খাদ্য-লবণ) মেশালে সিমেণ্ট ↑ জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অতি দ্রুত জমে যায়; ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যানিলিন ↑ প্রভৃতি মেশালে রাবারের ভ্যালকা-নাইজিং ↑ প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ায় এসব পদার্থকে সাধারণতঃ বলে **ক্যাটালিষ্ট** ↑; কখন কখন অ্যাক্সিলারেটর-ও বলে।

অ্যাকাউষ্টিক্স — শব্দ-বিজ্ঞান; শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান।

অ্যাকোয়া — জল; রসায়নবিদ্যায় জল বা অ্যাকোয়া বুঝাতে সংক্ষেপে Aq লেখা হয়।

অ্যাকোয়া ফর্টিস — প্রায়-নিরূদক বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3; (কন্‌সেণ্ট্রেটেড)।

অ্যাকোয়া রিজিয়া — এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। স্যাক্‌রায়া সোনা গলাতে ব্যবহার

করে ; সোনা, রূপা প্রভৃতি 'নোবেল মেটাল' ↑ এতে গলে যায়, যা অপর কোন অ্যাসিড এককভাবে পারে না। এই মিশ্রণ খোলা রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে হলদে হয়ে যায় — নাইট্রোসিল-ক্লোরাইড জন্মায় ও ক্লোরিন ↑ গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়।

অ্যাকোয়েরিয়াম — যে সব কৃত্রিম জলাধারে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষিত করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা তাদের জীবনধারা পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষাগারে এ-গুলি হয় কাচের তৈরি। শখ করে অনেকে কাচের ছোট অ্যাকোয়েরিয়ামে রঙিন মাছ ও সুদৃশ্য জলজ উদ্ভিদ পালন করেন।

অ্যাকোয়াস — জলীয়, জলযুক্ত। কোন দ্রবের দ্রাবক জল হলে তাকে অ্যাকোয়াস সল্যুসন ↑ বলে। আবার, জলজ উদ্ভিদকে বলে **অ্যাকোয়েটিক প্ল্যাণ্ট**।

অ্যা কো না ই ট — এক প্রকার উদ্ভিদের বিষাক্ত রস ; উদ্ভিদটাও এই নামে পরিচিত। একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ পদার্থ, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় বলে 'কাঠবিষ'।

অ্যাকুমুলেটর — যে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রাখা হয়। একে এক রকম সেল ↑ বলাও যেতে পারে ; যার মধ্যে তড়িৎ সঞ্চিত করে রেখে দরকার মত ব্যবহার করা যায়। এজন্যে একে **স্টোরেজ ব্যাটারি**-ও ↑ বলে। সাধারণ লেড্-অ্যাকুমুলেটরে একটা কাঁচ-পাত্রের মধ্যে দুখানা সীসার প্লেট পাশাপাশি সামান্য ব্যবধানে জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এদের মধ্যে পজিটিভ প্লেটখানার গায়ে লেড-পারক্সাইড (PbO_2) মাখানো থাকে। ওই সীসক-প্লেট দুখানার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় সীসা ও সাল্ফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। এর ফলেই তড়িৎশক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। এই অ্যাকুমুলেটর থেকে তড়িৎশক্তি ব্যবহারের সময় বিপরীত ধারায় রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে থাকে, ফলে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি সংযোজক তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ এরূপ অ্যাকুমুলেটর মোটর গাড়ীতে তড়িৎস্ফুরণ (স্পার্কিং) ও আলো জ্বালবার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
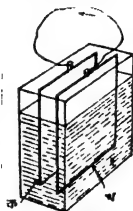
অ্যাকুমুলেটর

অ্যাগার-অ্যাগার — নানা প্রকার সামুদ্রিক গুল্ম থেকে যে এক রকম আঠালো পদার্থ পাওয়া যায় ; এর রাসায়নিক গঠন কার্বোহাইড্রেটের ↑ মত। গরম জলে মিশে যায়, পরে ঠাণ্ডা হলে ক্রমে ঘন জেলির ↑ আকারে থিতিয়ে পড়ে। জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এই জেলির মাধ্যমে

জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধি করিয়ে নানা রকম গবেষণা করা হয়।

অ্যাগেট — এক রকম প্রস্তর বিশেষ, মূলতঃ সিলিকা ↑ (SiO_2)। অত্যন্ত কঠিন বলে ঘর্ষণে তেমন ক্ষয়ে যায় না। সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রের ফাল্‌ক্রাম ↑ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়; কঠিন বস্তু পেষণের যোগ্য হামান-দিস্তাও অ্যাগেট প্রস্তরে তৈরী হয়ে থাকে।

অ্যাগোনিক লাইন — পৃথিবীর যে সব স্থানে কম্পাসের ↑ কাটা চৌম্বক মেরুর (ম্যাগ্নেটিক পোল ↑) দিকে সুনির্দিষ্টরূপে প্রসারিত থাকে, অর্থাৎ কোন ডেক্লিনেসন ↑ থাকে না; মানচিত্রে এইরূপ সব স্থানের সংযোজক রেখাকে বলে অ্যা. লাইন.।

অ্যাজো — দু'টি নাইট্রোজেন ↑ পরমাণুর পরস্পর যুক্ত সমাবেশ (N.N) রসায়ন শাস্ত্রে এই নামে পরিচিত। একে দ্বি-নাইট্রোজেন র‍্যাডিক্যাল ↑ বলা যায়। এর প্রভাবে রঞ্জক পদার্থের বর্ণ-স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাকে বলা হয় **অ্যাজো ডাই**।

অ্যাজোট — নাইট্রোজেন ↑ গ্যাস। শব্দার্থ 'নিষ্ক্রিয়'; পূর্বে নাইট্রোজেন গ্যাস এই নামে পরিচিত ছিল।

অ্যাজাইড—হাইড্রোজোইক (HN_3) অ্যাসিডের ধাতব সল্টের সাধারণ নাম; যেমন—সোডিয়াম অ্যাজাইড, NaN_3। সীসা (লেড্ ↑) প্রভৃতি ভারী ধাতুর অ্যাজাইড সল্ট সাধারণতঃ বিস্ফোরক-ধর্মী হয়ে থাকে।

অ্যাজিয়াম — দিগংশ; ভূপৃষ্ঠ থেকে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশক কৌণিক পরিমাণ (অ্যাঙ্গুলার মেজার ↑)। কোন স্থান থেকে কোন গ্রহ বা নক্ষত্র গগনমণ্ডলের কোন্ দিগংশে অবস্থিত তা যে কোণ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

অ্যাজুরাইট — স্বভাবজাত বেসিক ↑ কপার কার্বনেট; তামার একটা রাসায়নিক যৌগিক, $2CuCO_3.Cu(OH)_2$; নীলবর্ণের একটা খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক উপায়ে এ থেকে তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

অ্যাটম — পরমাণু; রাসায়নিক মতে মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ; সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম পদার্থ-কণিকা। (অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণু-বিভাজনও (ফিসন ↑) সম্ভব হয়েছে; ইলেক্ট্রন ↑, প্রোটন ↑, প্রভৃতি কণিকায় পরমাণু গঠিত)।

অ্যাটম বম্ — পারমাণবিক বোমা, যার বিস্ফোরণে মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত হয়ে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো হান প্রথমে ইউরেনিয়াম ↑ পরমাণুর ফিসন ↑ ঘটাতে সমর্থ হন। ইহার উপর ভিত্তি করেই পরে আমেরিকায় মিত্রপক্ষীয় বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় কার্যকরীভাবে পারমাণবিক বোমা তৈরী করা সম্ভব হয়। জাপানের হিরোসিমা নগরীতে প্রথম

'অ্যাটম-বম্' বিস্ফোরিত হয়েছিল। ইউরেনিয়াম-পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে মন্দগতি নিউট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে ক্রমাগত ভগ্ন করবার ব্যবস্থা করায় এই প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটে। এই বোমা এমনভাবে তৈরী হয় যাতে কোটি কোটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ↑ ক্রমাগত ভাঙতে থাকে, আর তা থেকে বিমুক্ত শক্তি এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগেরও কম সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে নিউক্লিয়ার-ফিসন ↑। প্রকৃত-পক্ষে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ অসংখ্য ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সমষ্টি ; একে বলে চেইন-রিঅ্যাক্সন ↑। জটিল ব্যবস্থায় ইউরেনিয়াম ↑ বা প্লুটো-নিয়াম ↑ ধাতুর বিশেষ বিশেষ আইসোটোপের ↑ ফিসন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

অ্যাটমাইজার — মেঘায়ন যন্ত্র ; যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন তরল পদার্থকে বায়ুর চাপে মেঘ বা কুয়াশার ধোঁয়ার মত সূক্ষ্ম কণি-কায় রূপান্তরিত করা যায়। সরু নল-পথে আবদ্ধ পাত্রের তরল পদার্থের অভ্যন্তরে সবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়ে তার চাপে তরলের এই রূপান্তর ঘটানো হয়।

অ্যাটমাইজার

অ্যাট্মোলিসিস — গ্যাস-পরিস্রুতি ; গ্যাসীয় সংমিশ্রণ থেকে বিভিন্ন গ্যাসের ↑ পৃথকীকরণ, অর্থাৎ পরিস্রাবণের প্রক্রিয়া। বিশেষ এক প্রকার পাতলা পর্দার (মেব্রেন ↑) ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে বিভিন্ন গ্যাস বিভিন্ন গতিতে ঐ পর্দা ভেদ করে বেরোয় এবং কৌশলে তাদের পৃথক করা যায়। এটা অনেকটা তরল পদার্থের 'ফ্রাক্সন্যাল ডিস্টিলেসন' ↑ প্রক্রিয়ার মত।

অ্যাটমিক এনার্জি — পারমাণবিক শক্তি ; পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙলে যে-শক্তির উদ্ভব হয়। বিশেষ জটিল ব্যবস্থায় পদার্থকে এভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিখ্যাত সমীকরণ, $E=mc^2$, এই সত্যই প্রতিপন্ন করছে। এখানে E হলো এনার্জি বা শক্তি, m বস্তু-ভর এবং c আলোর গতি। আলোর গতি হলো সেকেণ্ডে 1,86,326 মাইল। এই হিসেবে পঞ্চাশ টন কয়লা পুড়িয়ে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, মাত্র এক গ্র্যাম ↑ পদার্থের (ইউরেনিয়ামের) বিলুপ্তি ঘটিয়ে ততটা প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানের মতে পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ এক ; পদার্থের অস্তিম বিশ্লেষণ বা বিলুপ্তিতে শক্তির উদ্ভব, এবং শক্তির ঘনীভূত সংযোজনে পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক ওয়েট — পারমাণবিক ওজন ; কোন মৌলিক পদার্থের এক-একটি পরমাণুর স্বকীয় ওজন-পরিমাণ।

অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে বিভিন্ন পদার্থের এই পারমাণবিক ওজন তুলনামূলকভাবে হিসাব করে স্থির করা হয়।

অ্যাটমিক থিওরি — পারমাণবিক মতবাদ। পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ডিমোক্রিটাস ↑ সাধারণভাবে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানী ড্যাল্টন ↑ সেই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং পারমাণবিক গঠনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও সূত্র প্রবর্তন করেন। ভারতের প্রাচীন আর্যঋষিগণও পদার্থের গঠনে অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা মতবাদ প্রচার করেছিলেন। যাই হোক, এভাবে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু হিসাবে ধরা হলো। কোন একটি পদার্থের সব পরমাণু সর্বতোভাবে একই রকম (আইসোটোপের ↑ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রভেদ দেখা যায়); বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। দুইটি পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর জুড়ে গিয়ে পদার্থ দুটির রাসায়নিক মিলন ঘটায় এবং যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। আধুনিক মতবাদ (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑) অবশ্য ড্যাল্টনের উল্লিখিত মতবাদ থেকে অনেকাংশে বিভিন্ন।

অ্যাটমিক নাম্বার — পরমাণবিক সংখ্যা। কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যতগুলো ইলেক্ট্রন পরিভ্রমণ করে সেই সংখ্যাকে বলে ওই পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। এই সংখ্যা আবার নিউক্লিয়াসের সংগঠক প্রোটন ↑ সংখ্যারও সমান।

অ্যাটমিক পাইল—যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনিয়াম ↑ পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার কাজ চালানো হয়। এই প্রক্রিয়া গ্র্যাফাইট ↑ বা ভারীজল (হেভি ওয়াটার ↑) দিয়ে মন্দীভূত করে প্লুটোনিয়াম ↑ সৃষ্ট করা হয়; অথবা, তার তাপ নিয়ন্ত্রণ করে 'রেডিও-অ্যাক্টিভ' ↑ পদার্থ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক হিট্ — পারমাণবিক তাপ। কোন মৌলিক পদার্থের বিশেষ তাপের (স্পেসিফিক হিট ↑) পরিমাণ-প্রকাশক সংখ্যাকে তার পারমাণবিক ওজন (গ্র্যাম ↑) সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সব কঠিন পদার্থেরই এই পারমাণবিক তাপ মোটামুটি 6 ক্যালোরি ↑, স্বাভাবিক তাপ হ্রাস পেলে পারমাণবিক তাপও হ্রাস পায়।

অ্যাটমিক ষ্ট্রাক্চার — পরমাণুর গঠন। পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুকে বলা হয় **নিউক্লিয়াস** ↑। এই সব নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঋণ-তড়িৎযুক্ত **ইলেক্ট্রন** ↑ কণিকাগুলো বিভিন্ন পথে ঘুরছে।

বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সংগঠনে এই ইলেক্ট্রন কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন। আবার প্রত্যেকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছে ধন-তড়িৎযুক্ত কয়েকটি **প্রোটন** ↑ ও তড়িৎবিহীন কয়েকটি **নিউট্রন** ↑ কণার সমবায়ে। প্রোটন ও নিউট্রনের প্রত্যেকটির ভর (মাস্ ↑) হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের প্রায় সমান; কিন্তু ইলেক্ট্রন কণিকার ভর হাইড্রোজেন-পরমাণুর 1840 ভাগের একভাগ মাত্র, অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পক্ষান্তরে প্রোটনের তড়িৎশক্তি ইলেক্ট্রনের তড়িৎশক্তির সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী। কোন একটি পরমাণুর গঠনে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা তার চারদিকের ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রন-সংখ্যার সমান। পরমাণুর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও বস্তুগত পার্থক্য নির্ভর করে তার ইলেক্ট্রন সংখ্যা ও তাদের গতি-প্রকৃতির উপর। কোন পদার্থের এই ইলেক্ট্রন-সংখ্যাকেই বলা হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা, বা **অ্যাটমিক নাম্বার** ↑। দুইটি পদার্থের রাসায়নিক মিলন তাদের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ইলেক্ট্রন কণিকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও স্থান বিনিময়ের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে।

অ্যাটমস্ফিয়ার — পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল; নানারকম গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। সম্পূর্ণ শুষ্ক ও বিশুদ্ধ অবস্থায় বায়ুতে থাকে 78·08% নাইট্রোজেন, 20·95% অক্সিজেন, ·93% আর্গন ↑ ·03% কার্বন ডাই-অক্সাইড ↑; এছাড়া নিয়ন হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন্ নামক কয়েকটি ইনার্ট গ্যাস ↑ বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে মিশে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর এই গ্যাসীয় পরিমাণের সামান্য তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ বায়ুতে আবার সামান্য জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড ↑, ওজোন ↑, গন্ধকজাত রাসায়নিক পদার্থ, ধূলিকণা প্রভৃতিও সংমিশ্রিত থাকে। ভূপৃষ্ঠের সকল পদার্থের উপর বায়ুমণ্ডলের একটা চাপ সব সময়েই পড়ছে — সমতল ভূমিতে এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে মোটামুটি 14·72 পাউণ্ড ↑। বিভিন্ন উচ্চতায় ও বিভিন্ন সব প্রাকৃতিক কারণে এই বায়ুমণ্ডলীয়-চাপের কিছু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

অ্যাট্রপিন—'বেলেডোনা' উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাষিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ; বিবিধ রোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়, হাঁপানি ও শূলবেদনায়ও ফলপ্রদ। চোখে দিলে চক্ষু-তারকার সম্প্রসারণ ঘটায় — চক্ষু পরীক্ষায়ই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অ্যাডিটিভ কম্পাউণ্ড — দুটি রাসায়নিক পদার্থের পরস্পর সামগ্রিক মিলনে যে একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, যেমন — ইথিলিন ↑ + ক্লোরিন ↑ = ইথিলিন ডাইক্লোরাইড :

$C_2H_4 + Cl_2 = C_2H_4Cl_2$ (অ্যাডিটিভ কম্পাউণ্ড)।
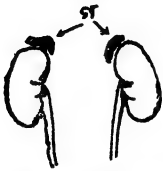
অ্যাড্রিনেলিন গ্ল্যাণ্ডস্‌ — দেহের অভ্যন্তরস্থ মূত্রাশয় দুটার ঊর্ধ্বভাগের সঙ্গে প্রায় সংলগ্ন ক্ষুদ্র (ছবিতে গ-চিহ্নিত) গ্রন্থিদ্বয়।

অ্যাড্রিনেলিন গ্ল্যাণ্ডস্‌

এই গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের ↑ মধ্যস্থ মেডুলা থেকে সময় সময় অ্যাড্রিনেলিন নামক এক প্রকার হর্মোন ↑ নির্গত হয়ে রক্তে মিশে যায়। অকস্মাৎ ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি উত্তেজনার ফলে এই রস-নিঃসরণ ঘটে।

অ্যাডেনিন — মাংসপেশীর অভ্যন্তরস্থ একটা জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। পেশীর সংকোচন-কালে পদার্থটার রাসায়নিক গঠন স্বতঃই বদলে গিয়ে বিভিন্ন সহজতর জৈব পদার্থ সাময়িক-ভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

অ্যাঞ্জিয়োস্পার্ম — গুপ্তবীজী। যে সব উদ্ভিদের বীজ বীজাধারে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে; অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদই এই শ্রেণীর। কিন্তু পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় উদ্ভিদের বীজাধার থাকে না, এদের বলে **জিম্‌নোস্পার্ম** ↑ (মুক্তবীজী উদ্ভিদ)।

অ্যাংস্ট্রম — সুইডেনবাসী পদার্থবিদ, জন্ম 1814 খৃঃ, মৃত্যু 1876 খৃঃ। তড়িৎচুম্বকীয় বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য পরিমাপের যান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবক; নামানুসারে উক্ত পরিমাপের একক হয়েছে অ্যাংস্ট্রম $=10^{-10}$ মিটার ↑। সাধারণতঃ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যই এই এককে প্রকাশিত হয়; অবশ্য রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে ↑), কস্‌মিক রশ্মি ↑ প্রভৃতির অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও এতে প্রকাশ করা চলে।

অ্যান্‌থার — ফুলের যে কোষাধারে রেণু উৎপাদিত হয়। পরাগ-কোষ।

অ্যান্‌থারিডিয়াম — ফার্ন ↑ ও মস্‌ ↑ জাতীয় নিম্নস্তরের উদ্ভিদের পুং-কোষ সমন্বিত জৈবাঙ্গ।

অ্যান্‌থেল্‌মিনিক — ক্রিমি-বিনাশক ঔষধ; পেটের বিভিন্ন ক্রিমি যে-সব ঔষধে বিনষ্ট বা নির্গমিত হয়; যেমন — স্যান্‌টোনিন ↑ প্রভৃতি।

অ্যানথ্রাসিন — আলকাতরা (কোলটার ↑) থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যা থেকে অ্যালিজারিন ↑ শ্রেণীর গাঢ় লাল রঙের রঞ্জক-পদার্থ প্রস্তুত হয়। **'অ্যান্‌থ্রা'** মানে 'কোল' বা কয়লা।

অ্যান্‌থোসায়েনিন্‌স — যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ফুলের বিভিন্ন বর্ণ বিকশিত হয়। **অ্যান্‌থো** শব্দের মানে 'পুষ্পসম্বন্ধীয়'। আবার **অ্যান্‌থাস** মানে পুষ্পান্বিত, যেমন— **নিক্‌ট্যান্‌থাস** হলো কেবল মাত্র রাত্রিকালে বিকশিত হয় এমন পুষ্পসমন্বিত (বৃক্ষ)।

অ্যান্‌থ্রোপোলজি — মানবজাতি সমন্ধীয় বিজ্ঞান; বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠির

উৎপত্তি,ক্রমবিকাশ, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞান।

অ্যান্‌হাইড্রাইড— নিরুদক পদার্থ; যে সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ওয়াটার-অব-কৃষ্ট্যালিজেসন ↑ থাকে, উত্তাপ প্রয়োগে তাদের থেকে জল বিমুক্ত করলে সেই সব পদার্থের আন্‌হাইড্রাইড তৈরী হয়; যেমন, নীল স্ফটিকাকার তুঁতে (ব্লু ভিট্রিয়ল ↑) উত্তপ্ত করলে তার ওয়াটার-অব-কৃষ্ট্যালিজেসন চলে গিয়ে যে সাদা গুঁড়া পড়ে থাকে তাকে বলে তুঁতের অ্যান্‌হাইড্রাইড। আবার বলা যায়, কোন পদার্থের আন্‌হাইড্রাইড হলো সেই পদার্থ, যা জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে উক্ত পদার্থটি উৎপন্ন হয়; যেমন,সাল্‌ফার ট্রাই-অক্সাইড ↑ (SO^3) গ্যাস হলো সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) অ্যান্‌হাইড্রাইড।

অ্যান্টেনা — (1), শুঙ্গ, শোঁয়া। কীট-পতঙ্গের সূক্ষ্ম অঙ্গবিশেষ; জীব-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ। (2) রেডিও গ্রাহকযন্ত্রের 'অ্যারিয়াল' বা আকাশ-তার, যার মাধ্যমে বেতার-তরঙ্গ এসে যন্ত্রে পৌছায়।

অ্যান্‌থ্রাক্স— এক রকম জীবাণু-ঘটিত মারাত্মক পশু-রোগ; বিশেষতঃ ভেড়ার চামড়া ও পশম থেকে এই রোগের ব্যাচিলাস ↑ মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে থাকে। এজন্যে এই রোগ 'উল-সর্টারস্ ডিজিজ' নামেও পরিচিত। এ-রোগের জীবাণু-গুলোকেও 'আন্‌থ্রাক্স' বলে।

অ্যান্‌থ্রাক্স

অ্যান্‌থ্রাসাইট — এক শ্রেণীর শক্ত কয়লা। এতে কার্বনের ভাগ অনেক বেশী, সামান্য কিছু হাইড্রোকার্বন-ও ↑ মিশ্রিত থাকে। সাধারণ কয়লার চেয়ে এর তাপ-শক্তি অনেক বেশী।

অ্যান্টিজেন — যে সব জৈব পদার্থ (যেমন, জীবাণুর দেহ-নিঃসৃত জৈবরস) জীবের রক্তে স্বতঃই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা (অ্যান্টিবডি ↑) বৃদ্ধি করে।

অ্যান্টিপাইরেটিক—অ্যাস্পিরিন ↑ প্রভৃতি যে সব ভেষজ পদার্থ দেহের তাপ কমিয়ে দেয়; এরূপ ঔষধকে **ফেব্রিফিউজ**-ও বলা হয়।

অ্যান্টিমনি — একটা মৌলিক ধাতব পদার্থ — সাদা, স্ফটিকাকার, ভঙ্গুর। এর পারমাণবিক ওজন 121·76; সাংকেতিক চিহ্ন Sb (ষ্টিবিয়াম)। সাধারণতঃ অক্সাইড ও সাল্‌ফাইড অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। অ্যান্টিমনি সাল্‌ফাইড যৌগিককে বাংলায় বলে রসাঞ্জন বা সুর্মা। ছাপার টাইপ তৈরীর কাজে সীসার সঙ্গে কিছু অ্যান্টিমনি মিশ্রিত করা হয় (টাইপ মেটাল ↑)।

অ্যান্টিবায়োটিক — বিভিন্ন শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক ছত্রাক বা জীবাণুরা যে-সব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে; যার প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ জীবাণু ধ্বংস হয়, বা তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত

হয়ে থাকে। জীবাণু-ঘটিত বিভিন্ন রোগে এরূপ বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ কার্যকরী ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ↑ প্রভৃতি অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক (প্রতিষেধক) ঔষধ আবিষ্কৃত ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়েছে।

অ্যাণ্টিডোট — প্রতিবিষ বা বিষঘ্ন পদার্থ, যাতে কোন বিশেষ বিষক্রিয়া নাশ করে। এ রকম ঔষধ প্রয়োগে বিষের শক্তি রাসায়নিক উপায়ে প্রশমিত হয়ে থাকে; আবার অনেক সময় তাকে অদ্রাব্য করে ফেলা হয়, যাতে সে-বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে আর প্রাণহানি ঘটাতে পারে না।

অ্যাণ্টিবডি — বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক উপায়স্বরূপ (ইমিউনিটি ↑) জীবের রক্তে রোগ-জীবাণু ঢুকলে স্বভাবতঃই যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, বা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীবাণুদের বিষ-রস নির্বিষ হয়ে পড়ে।

অ্যাণ্টিপোড— ভূ-বিপরীত স্থানদ্বয়; ভূ-গোলকের বিপরীত দুইদিকে সম-সূত্রে অবস্থিত দুই স্থানকে পরস্পরের অ্যান্টিপোড বলে, যেমন—ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া।

অ্যাণ্টিফেব্রিন — অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যানিলিনের ↑ সংযোগে প্রস্তুত **অ্যাসিট্যানিলাইড** নামক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। পূর্বে জ্বরের ঔষধ হিসাবে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হোত।

অ্যাণ্টিসেপ্টিক— বীজবারক; জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক পদার্থ। যে সব রাসায়নিক পদার্থ দেহের ক্ষতে বা কাটা-ছেঁড়ায় লাগালে জীবাণুর আক্রমণ ও কার্যকারিতা প্রতিরুদ্ধ হয়, যেমন — আয়োডিন ↑, কার্বলিক অ্যাসিড ↑, আইডোফর্ম ↑ ইত্যাদি।

অ্যাণ্ড্রোগাইন্স — উভয়-লিঙ্গী উদ্ভিদ, যে সব উদ্ভিদের বীজোৎপাদক পুষ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে। (**অ্যাণ্ড্রো** = পুং-সত্ত্বা, **গাইন** = স্ত্রী-সত্ত্বা)

অ্যানাটমি — শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা; চিকিৎসা-শাস্ত্রের অঙ্গ বিশেষ। দেহের অস্থি-সংস্থান, মাংসপেশী, শিরা-ধমনী প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

অ্যানাল্‌জেসিক—ব্যথা-বেদনানাশক ঔষধ। অ্যাস্পিরিন, অ্যান্টিপাইরিন প্রভৃতি নানা রকম অ্যানাল্‌জেসিক ঔষধ আছে। এসব খেলে দেহের আভ্যন্তরীণ সব রকম ব্যথা-বেদনার উপশম হয়। আবার কোকেন ↑ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগে স্থানীয়ভাবেও বেদনা দূর হয়। এইরূপ বিভিন্ন সব ভেষজ পদার্থকেই সাধারণভাবে বলে অ্যানাল্‌জেসিক।

অ্যানালিসিস — বিশ্লেষণ; রসায়ন বিদ্যায় যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থের উপাদানগত গুণ বা পরিমাণ নিরূপিত হয়। বিশ্লেষণের তৌলিক

(গ্র্যাভিমেট্রিক), মাত্রিক (কোয়ান্টিটেটিভ), আঙ্কিক (কোয়ালিটেটিভ) প্রভৃতি নানারকম ব্যবস্থা আছে।

অ্যানিমিয়া—রক্তাল্পতা-রোগ বিশেষ; যাতে রক্তের লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন ↑ হ্রাস পেয়ে দেহ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, কঠিন রোগের বিষক্রিয়ায়, বা অত্যধিক রক্ত ক্ষরণে দেহের এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে।

অ্যানিয়ারোবিক — অবায়ুজীবী; যে-সব জীবাণু বায়ুহীন পরিবেশেই বেঁচে থাকে, যেমন—অ্যানিয়ারোবিক ব্যাক্টিরিয়া ↑ হলো অ বা য়ু জী বী জীবাণু। (আবার **অ্যারোবিক** মানে বায়ুজীবী, যেমন — টিটেনাস রোগের জীবাণু।)

অ্যানিরয়েড — শব্দার্থ হলো, তরল-পদার্থবিহীন। বিশেষ এক রকম চাপ-মান যন্ত্রকে (ব্যারোমিটার ↑) বলে 'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার'। বায়ুর চাপ মাপবার জন্যে এই যন্ত্রে সাধারণ ব্যারোমিটারের মত পারদ বা অন্য
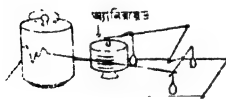
অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার

কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। এ যন্ত্রে থাকে একটা ধাতুনির্মিত বায়ুশূন্য চ্যাপ্টা পাত্র — দু'দিকে ঢেউ-খেলানো পাতলা ধাতব ঢাক্না। বায়ুমণ্ডলের চাপ কম-বেশী হলে ওই পাতলা ঢাক্নাটা ওঠা-নামা করে। যান্ত্রিক কৌশলে ওই সামান্য ওঠা-নামার হার পরিবর্ধিত করে মাপা হয়—একটা কাঁটা ঘুরে যায় স্কেলের উপরে। ওই কাঁটা আবার একটা ঘূর্ণায়মান ড্রামের গায়ে রেখাপাত করেও বায়ুর চাপ নির্দেশ করতে পারে।

অ্যানিলিন — অ্যা মি নো-বে ঞ্জি ন নামক এক প্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থের ব্যবহারিক নাম। কোল-গ্যাস ↑ উৎপাদনের সময় কয়লা থেকে উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় বেঞ্জিন ↑। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেঞ্জিনকে নাইট্রোবেঞ্জিনে পরিবর্তিত করা হয়—তা থেকে আবার অ্যামিনো-বেঞ্জিন বা অ্যানিলিন তৈরী হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণহীন, কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে এর রং গাঢ় বাদামী হয়ে যায়। বিষাক্ত পদার্থ। নানা রকম রং, ঔষধ ও প্লাস্টিক ↑ শিল্পে অ্যানিলিন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান।

অ্যানিম্যল-চার্কোল — জীব-জন্তুর হাড় বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে কয়লা তৈরী হয়। এতে থাকে 10% কার্বন, ও 90% ক্যাল্সিয়াম ফস্ফেট ↑ প্রভৃতি অজৈব পদার্থ। চিনি, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ বর্ণহীন সাদা ধব্ধবে করবার জন্যে এদের জলীয় দ্রবকে এরূপ কয়লার ভিতর দিয়ে চুইয়ে ফিল্টার ↑ করে নেওয়া হয়।

৭৭৮-২

অ্যানিলিং — উত্তপ্ত পদার্থ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা। পুড়িয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যাদি তৈরী করবার সময় ধাতুর আণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে যায়, কতকটা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। পদার্থের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আবার ফিরিয়ে আনবার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কাঁচও 'অ্যানিল' করা হয়—উপযুক্ত কৌশলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা (অ্যানিলিং) করে কাঁচকে টান-শূন্য করে তার সহজ-ভঙ্গুরতা দূর করা হয়ে থাকে।

অ্যানেস্থেটিক — যে সকল ঔষধ প্রয়োগে জীবদেহ অসাড় ও অনুভূতি-শূন্য হয়। জীবদেহে এরূপ অ্যানেস্থেসিয়া বা অসাড়তার অবস্থা স্থান বিশেষে বা সামগ্রিকভাবে হতে পারে; যেমন, ক্লোরোফর্ম ↑ প্রয়োগে জীবদেহ সমগ্রভাবে অসাড় অচেতন হয়ে পড়ে; আবার কোকেন ↑ প্রভৃতি ইন্‌জেক্‌সন করে দিয়ে দেহের স্থান-বিশেষ অনুভূতিশূন্য করা যায়। এ জাতীয় সব রকম ঔষধকেই অ্যানেস্থেটিক বলা হয়। (অ্যানাল্‌জেসিক ↑)

অ্যানোডাইন —বেদনানাশক ঔষধ; প্রয়োগে দেহের তাপ কমে, ব্যথা বেদনা দূর হয়। অ্যাস্পিরিন, ফেনাসিটিন প্রভৃতি অ্যানাল্‌জেসিক্ ↑ ঔষধ; আফিম, মর্ফিয়া, ক্লোরাল প্রভৃতি বিভিন্ন নার্কোটিক ↑ বা ঘুমের ঔষধ এবং বিভিন্ন অ্যানেস্থেটিক ↑ ঔষধ—এরূপ সব পদার্থকেই সাধারণ-ভাবে অ্যানোডাইন বলা হয়।

অ্যাপারচার — ছিদ্র-পথ; আলোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিতে যে ছিদ্রপথে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করানো হয়।

অ্যাপেণ্ডিক্‌স —বৃহদন্ত্রের ডানদিকস্থ ঊর্ধ্বমুখী কোলন ↑ অংশের নিম্নভাগে সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটা সরু বদ্ধমুখ নল:

অ্যাপেণ্ডিক্‌স

কোলনের সঙ্গে এটা যেন একটা বোঁটার মত সংলগ্ন হয়ে আছে। এর প্রদাহ এবং স্ফীতি-জনিত বিশেষ রোগকে বলা হয় **অ্যাপেণ্ডিসাইটিস**। প্রদত্ত চিত্রে 'ক' কোলন, 'প' পাকস্থলী, আর তীর-চিহ্নিত হলো অ্যাপেণ্ডিক্‌স।

অ্যাপিক্যাল্‌চার— মধুমক্ষিকা পালন ও সংরক্ষণ বিদ্যা। পুষ্টিকর, সুমিষ্ট ও ভেষজ গুণসম্পন্ন মধুর জন্যে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে মৌমাছি পালন এখন একটা লাভজনক ব্যবসায়। **অ্যাপিস্‌** মানে মৌমাছি।

অ্যাপোথিক্যারিজ ওয়েট — ডাক্তারী ঔষধাদির ইংলণ্ডীয় মাপ; কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম ওজন-পরিমাণ:

1 গ্রেণ = ·0648 গ্র্যাম
20 গ্রেণ = 1 স্ক্রুপল
24 গ্রেণ = 1 পেনিওয়েট

3 স্ক্রুপল = 1 ড্রাম (Drachm)
4 ড্রাম = 1 আউন্স, ট্রয়

অ্যাপোথিক্যারিজ মেসার — তরল ঔষধাদির ইংলণ্ডীয় ডাক্তারী আয়তনিক মাপ :

1 মিনিম = ·0591 সি. সি. (1 ফোঁটা)
60 মিনিম = 1 ড্রাম = 3·55 সি. সি.
8 ড্রাম = 1 আউন্স
= 28·41 সি. সি.
20 আউন্স (তরল) = 1 পাইণ্ট
= 568 সি. সি.

অ্যাফোনিয়া — স্বরভঙ্গ রোগ ; স্বর-নালির বিকৃতি, বা অত্যধিক ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে-যাওয়ার অবস্থা।

অ্যাফিলিয়ন — কোন গ্রহের উপবৃত্তীয় কক্ষপথের (অরবিট ↑) যে বিন্দু সূর্য থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী।

অ্যাব্‌ডোমেন — প্রাণিদেহের ফুসফুসাংশের নিম্নবর্তী অংশ, যেখানে পরিপাক ও প্রজনন যন্ত্রাদি অবস্থিত। পেট বা উদর দেশ। কীট-পতঙ্গাদির তৃতীয় দেহাংশ — (1) মস্তক, (2) থোরাক্স ↑, (3) অ্যাব্‌ডোমেন।

অ্যাব্রেসিভ — যে সকল সুকঠিন পদার্থের চূর্ণ দিয়ে ঘসে ধাতব বস্তুকে পরিস্কৃত ও মসৃণ করা হয় ; যেমন— এমারি ↑, কার্বোরাণ্ডাম ↑, বালুকা প্রভৃতি।

অ্যাব্‌সিসা — পরস্পর সমকোণে ছেদী দুটি অক্ষরেখা (চিত্রে XX' এবং YY') থেকে সমতলস্থ কোন বিন্দুর লম্ব-দূরত্ব দিয়ে ঐ বিন্দুর সঠিক অবস্থান প্রকাশ করা হয়। মান-চিত্রে বা গাণিতিক বর্গলেখ-কাগজে এই উপায় অবলম্বিত হ'য়ে থাকে।

X' M X
Y'
অ্যাব্‌সিসা

চিত্রে P বিন্দুর অবস্থান PN এবং PM, অর্থাৎ OM এবং ON দৈর্ঘ্য দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। এই দৈর্ঘ্যের একক অঙ্কদ্বয়কে বলে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক (কোঅর্ডিনেটস ↑)। এদের মধ্যে OM দৈর্ঘ্যাঙ্ককে বলা হয় P বিন্দুর **অ্যাব্‌সিসা**, বাংলায় বলে ভূজ ; আর ON দৈর্ঘ্যাঙ্ক হলো P বিন্দুর **অর্ডিনেট** ; বাংলায় বলে কটি।

অ্যাব্‌সোলিউট অ্যাল্‌কোহল — প্রায়-নিরুদক কোহল। বিশুদ্ধ ও তীব্র ইথাইল-অ্যাল্‌কোহল ↑, যাতে প্রায় 99% কোহলের ভাগ বর্তমান, জল মোটামুটি 1% মাত্র থাকে।

অ্যাব্‌সোলিউট জিরো — সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সেণ্টিগ্রেড ↑ তাপমানের হিসেবে এই তাপ হলো −273° ; সেণ্টিগ্রেড মাপের মত অ্যাব্‌সোলিউট মাপেও হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধানকে 100 ডিগ্রিতে বিভক্ত করা হয় ; কাজেই সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রিকে অ্যাব্‌সোলিউট ডিগ্রিতে (°A বা °K) নিতে হলে তার সঙ্গে 273 যোগ করতে হয়।

অ্যাবারেসন — জ্যোতির্বিজ্ঞার পর্যবেক্ষণের সময়ে বিভিন্ন কারণে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভ্রম ঘটে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে দর্শকের দৃষ্টিকোণ নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে ; এর ফলে দৃশ্যতঃ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থানের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার ফলে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের ↑ মধ্য দিয়ে ওই আলোকরশ্মি প্রতিসরণের জন্যেও এরূপ দৃষ্টিভ্রম বা অ্যাবারেসন ঘটে থাকে।

অ্যাভয়ড়ুপয়েজ ওয়েট — ইংলণ্ডীয় বাজার ওজন :

437½ গ্রেণ = 1 আউন্স
= 283 গ্র্যাম ↑
16 আউন্স বা
7000 গ্রেণ = 1 পাউণ্ড
14 পাউণ্ড = 1 ষ্টোন
2 ষ্টোন = 1 কোয়াটার
4 কোয়াটার = 1 হন্দর
20 হন্দর বা
2240 পাউণ্ড = 1 টন
(প্রায় 27 মণ)

অ্যাভালাঞ্চ — পর্বতগাত্র থেকে বরফ ও তুষার-সহ স্খলিত প্রস্তররাশির নিম্ন উপত্যকায় পতন। এর বিশাল ও প্রবল পতনে অনেক সময় পার্বত্য পথ ও লোকবসতি বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়।

অ্যাভোগেড্রো, কাউণ্ট অ্যামাডিও — ইটালিবাসী বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1776 খৃঃ, মৃত্যু 1856 খৃঃ। উদ্ভাবিত গ্যাসীয় সূত্র 'অ্যাভোগেড্রোজ-ল' রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সম্ভব করেছে।

অ্যাভোগেড্রোজ-ল — বিজ্ঞানী অ্যাভোগেড্রোর নির্ধারিত নিয়ম বা তথ্য। তথ্যটা হলো এই যে, একই তাপ ও চাপে সমান আয়তনের সকল গ্যাসের মধ্যেই সর্বদা সমান সংখ্যক গ্যাসীয় অণু থাকবে।

অ্যাম্পিয়ার — তড়িৎ-প্রবাহ পরিমাপের একক ; ফরাসী বৈজ্ঞানিক অ্যাম্পিয়ারের নামানুসারে। এক অ্যাম্পিয়ার মানে, সিল্ভার-নাইট্রেট দ্রবের মধ্যে যে-টুকু তড়িৎপ্রবাহের ফলে প্রতি সেকেণ্ডে ·001118 গ্র্যাম সিল্ভার বা রৌপ্য ইলেক্ট্রোলিসিস্ ↑ প্রক্রিয়ায় পৃথক হয়ে যায়।

অ্যাম্পিউল — মুখবদ্ধ ক্ষুদ্র কাঁচপাত্র, যার মধ্যে বিভিন্ন ঔষধের দ্রবণ

অ্যাম্পিউল

সংরক্ষিত করে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা দূর করা হয়।

অ্যামর্ফাস — দানাযুক্ত বা স্ফটিকাকার নয় এমন ; যে কঠিন পদার্থের কোন রকম নির্দিষ্ট আকারের দানা বা স্ফটিক (ক্রিস্ট্যাল ↑) নেই, যেমন—কাঁচ, রজন, রাবার ইত্যাদি।

অ্যামাল্গাম — পারদ-সংকর ; মার্কারি ↑ বা পারা সংযুক্ত মিশ্র-ধাতু

(অ্যালয় ↑)। প্রায় সব ধাতুর সঙ্গেই পারদের ধাতু-সংকর হয়, কিন্তু লোহার সঙ্গে পারা মেশে না। স্বর্ণরেণু মিশ্রিত পাথর বা বালি থেকে অ্যামাল্‌গাম প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ পৃথক করা যায়।

অ্যামাটল — তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ; সাধারণতঃ 80% অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও 20% টি. এন. টি (T. N. T.) ↑, অর্থাৎ ট্রাইনাইট্রোটলুইন-এর সংমিশ্রণে এই বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

অ্যামাইড — বিভিন্ন অ্যামাইন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ; অ্যামোনিয়ার ↑ রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন যৌগিক। কোন জৈব অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑ দিয়ে অ্যামোনিয়ার (NH_3) এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্যুত করে যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ গঠিত হয় তাদের বলে **অ্যামাইড**; যেমন—অ্যাসিট্যামাইড, CH_3CONH_2

অ্যাম্ফিবিয়া — জীব সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ধারায় মৎস্য ও সরীসৃপের মা ঝা মা ঝি পর্যায়ের প্রাণী, যেমন —ব্যাং, শামুক, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর জীব-শ্রেণী।

অ্যাম্ফিবিয়া

অ্যামমিটার — বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র-বিশেষ; যান্ত্রিক কৌশলে এর সাহায্যে অ্যাম্পিয়ার ↑ এককে তড়িৎপ্রবাহ মাপা হয়।

অ্যামিথিষ্ট — বেগুনী রং-এর এক রকম বালুকা-প্রস্তর বা কোয়ার্টজ ↑; স্ফটিকাকার উজ্জ্বল বর্ণের প্রস্তর বিশেষ, রাসায়নিক হিসাবে অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক (SiO_2) সিলিকন-ডাইঅক্সাইড ↑।

অ্যামিবা— এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু। এক-কোষী প্রাথমিক জীব; প্রস্থে এরা এক ইঞ্চির প্রায় একশ ভাগের এক ভাগ। একটা থেকে দুটা,

অ্যামিবা

দুটা থেকে চারটা, এভাবে নিজ দেহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে এরা বংশ বৃদ্ধি করে। এদের দেহ জেলির মত থল্‌থলে পদার্থে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এরা এগিয়ে চলে।

অ্যামোনিয়া — এক রকম উগ্র গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস, জলে দ্রবণীয়। হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিলনে উৎপন্ন একটি গ্যাসীয় যৌগিক। আণবিক সূত্র NH_3; এর জলীয় দ্রবে থাকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, NH_4OH; ক্ষারধর্মী পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত

করা যায়। কয়লা থেকে কোল-গ্যাস ↑ তৈরীর সময় উপজাত পদার্থ হিসেবেও প্রচুর অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। জমির সার ও বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করবার কাজে যথেষ্ট দরকার। শীতল কক্ষ বা রেফ্রিজারেটর ↑ যন্ত্র তৈরী করতেও প্রচুর তরলায়িত অ্যামোনিয়া লাগে।

অ্যারোগ্রাফ — জিনিসপত্রে রং করবার জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র-বিশেষের ব্যবহারিক নাম। এর সাহায্যে বিভিন্ন জিনিসের উপর সমানভাবে রং-এর পাতলা আস্তরণ দেওয়া যায়। যন্ত্রের সূক্ষ্মাগ্র-মুখে তরল রং বাষ্পাকারে নির্গত হয়। এর 'ব' নল পথে বাতাস প্রবেশ করানো হয়, তার চাপে 'ন' ছিদ্রপথে রং সূক্ষ্ম কণিকায় বেরিয়ে জিনিসে লাগে।

অ্যারোগ্রাফ

অ্যারোনটিক্স — বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যে গগন-পর্যটন সংক্রান্ত বিবিধ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

অ্যাল্‌কেমি —প্রাচীন যুগের 'কিমিয়া' বা রসায়নবিদ্যা। সেকালে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে) এক শ্রেণীর তথাকথিত বিজ্ঞানী যে-সব কৌশলে প্রধানতঃ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই অ্যাল্‌কেমিষ্টরা রসায়নবিদ্যার সঙ্গে নানা রকম তন্ত্রমন্ত্র, যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব মিশিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে 'জীবন-রসায়ন' ও 'পরশপাথর' আবিষ্কারের এক চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ব্যবস্থার বিশেষ যোগাযোগে মানুষের ব্যাধিশূন্য দীর্ঘজীবন লাভ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবার উপায় বার করাই ছিল তাঁদের কাম্য। ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটতে এঁদের এই উদ্ভট প্রচেষ্টা অবাস্তব প্রতিপন্ন হয় এবং অ্যাল্‌কেমি যুগ শেষ হয়।

অ্যাল্‌কালি — ক্ষারধর্মী পদার্থসমূহ ; কতকগুলো ধাতুর হাইড্রক্সাইড ↑। জলে দ্রবণীয়। অ্যালকালি পদার্থ-গুলি অ্যাসিডের শক্তি প্রশমিত করে, উভয়ের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম ↑ প্রভৃতিকে বলে অ্যাল-কালি ধাতু ; কারণ, এদের হাইড্রক্সাইড যৌগিকই হলো অ্যাল্‌কালি।

অ্যাল্‌কালয়েড — বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। নিকোটিন ↑ কুইনিন ↑, কোকেন ↑, মর্ফিন ↑ প্রভৃতি সবই এরূপ উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌কালয়েড। এদের সকলেরই একটি উপাদান নাইট্রোজেন, আর এরা সামান্য কিছু অ্যাল্‌কালি বা ক্ষারধর্মী হয়। এজন্য বাংলায় এদের বলা হয় **উপক্ষার**। জীবদেহের উপর এদের বিশেষ বিশেষ ভেষজ গুণ প্রকাশ পায়।

অ্যাল্‌জি — অপুষ্পক উদ্ভিদ বিশেষ, শৈবালশ্রেণী। এদের প্রকৃত মূল থাকে না; মূলের মত একটা অংশ এঁটে পাথরের উপরেও জন্মায়। জলজ অ্যাল্‌জিও অনেক আছে। জলজ ও স্থলজ শত শত প্রকারের অ্যাল্‌জি বা 'শেওলা' দেখা যায়।

অ্যাল্‌জাব্রা — বীজগণিত; বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানের জন্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যার প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের গণিতশাস্ত্র। মিশরীয়গণ তিন হাজার বছরেরও আগে এই সূত্র-গণিত বা বীজগণিত উদ্ভাবন করেন বলে কথিত হয়। প্রাচীন ভারতেও এর প্রভূত প্রসার ও উন্নতি ঘটেছিল। একে গণিতের উন্নত স্তর বলা যায়; সংখ্যা-গণিতে যার সমাধান দুঃসাধ্য, বীজগণিতের অনির্দিষ্ট প্রতীক-সূত্র প্রয়োগে তা বিশেষ সহজসাধ্য হয়ে থাকে।

অ্যালয় — সংকর ধাতু; দুই বা ততোধিক ধাতুর সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতু তৈরী হয়। কখন কখন বিভিন্ন ধাতুর যৌগিক মিলন ঘটিয়ে, কখন বা কেবলমাত্র সংমিশ্রণে সংকর-ধাতু সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধাতুর কাঠিন্য বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করে বিশেষ কাজের উপযোগী করবার জন্যে এরূপ বিভিন্ন ধাতু-সংকর তৈরী করা হয়।

অ্যাল্‌কোহল—জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ; বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ সঙ্গে অক্সিজেনের (হাইড্রক্সিল ↑) মিলনে বিভিন্ন অ্যাল্‌কোহল উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ইথাইল অ্যাল্‌কোহল, C_2H_5OH, বুঝায়। শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি গাজিয়ে (ফার্মেণ্টেসান) তৈরী হয়। বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ, বলে 'স্পিরিট অব ওয়াইন'।

অ্যাল্‌বুমেন — প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ, যা ডিমের শ্বেত-অংশে এবং প্রাণী-দেহের বিভিন্ন জৈব বস্তুতে বর্তমান। আবার বিভিন্ন শস্যবীজেও বিভিন্ন অ্যাল্‌বুমেন রয়েছে— গম, রাই, বার্লি প্রভৃতিতে **লুকোসিন** নামে; মটর, সয়াবিন প্রভৃতিতে **লিগোমেলিন** নামে পরিচিত পৃথক পৃথক শ্রেণীর অ্যাল্‌বুমেন আছে।

অ্যালাম — ফিট্‌কিরি; পটাসিয়াম সাল্‌ফেট ও অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট মিলে 24-টি জলীয় অণু নিয়ে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে; ($K_2SO_4 . Al_2(SO_4)_3 . 24H_2O$); একে বলে **পটাস্ অ্যালাম**। স্ফটিকাকার, জলে দ্রবণীয়। এর সাহায্যে জলের ময়লা থিতিয়ে পড়ে। রঞ্জক পদার্থ, অগ্নিনিরোধক দ্রব্য ও অন্যান্য নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতে এর দরকার হয়। সাধারণতঃ অ্যালাম বলতে পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট বুঝালেও রাসায়নিক হিসেবে একই গঠনের বিভিন্ন লবণ (সল্ট ↑) মিলিত হয়ে যে স্ফটিকাকার যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় তাকেই বলা হয়

অ্যালাম

অ্যালাম ; যেমন, ফেরিক-অ্যালাম, ক্রোম-অ্যালাম ↑ ইত্যাদি।

অ্যালার্জি — বিশেষ বিশেষ প্রোটিন ↑ পদার্থের প্রভাবে দেহের আকস্মিক অসুস্থতা লক্ষিত হয়, যেমন — কোন কোন লোক ডিমের শ্বেতাংশ সামান্য পরিমাণে খেলেও অসুস্থ হয়ে পড়ে, একেই বলে অ্যালার্জি অবস্থা। কারো দুধ সয় না, কারো মাংস,—অ্যালার্জি দেখা দেয়। কেবল খাদ্যই নয়, কোন বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে, বা ঘ্রাণেও কারো কারো নানা রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়। মোট কথা, কোন বস্তু বিশেষের প্রভাবে দেহের সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক প্রকাশকেই বলা হয় অ্যালার্জি।

অ্যালিমেণ্টারি ক্যানাল—খাদ্যনালি; ভুক্ত খাদ্যবস্তুর পরিচলন-পথ। মুখ-গহ্বর থেকে যে দীর্ঘ নলপথ পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি (ইন্টেস্টাইন ↑) সহ মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত। সাধারণতঃ মানুষের অ্যা. ক্যা. দৈর্ঘে প্রায় 30 ফুট হয়ে থাকে।

অ্যালিকোট পার্ট — কোন রাশির পূর্ণসংখ্যায় সম্পূর্ণ বিভাজ্য অংশ। যে সংখ্যা কোন বৃহত্তর সংখ্যার গুণনীয়ক, যেমন — 2 হলো 10 এর একটা অ্যা. পা. ; কিন্তু 3 নয়।

অ্যালিফেটিক কম্পাউণ্ড— যে সব জৈব রাসায়নিক যৌগিকের আণবিক সংগঠনে কার্বন-পরমাণুর সারিবদ্ধ (চক্রাকার নহে) সংযোগ থাকে, যেমন—ইথেন ↑, CH_3CH_3 ; বুটেন, $CH_3.CH_2.CH_2.CH_3$, ইত্যাদি ; কিন্তু, বেন্জিন ↑ C_6H_6, নহে।

```
 H   H   H   H
 |   |   |   |
H—C—C—C—C—H
 |   |   |   |
 H   H   H   H
```

অ্যালিফাটিক কম্পাউণ্ড
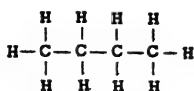
অ্যাসিটিক ↑ অ্যাসিড, অ্যাসিটোন ↑ প্রভৃতিও এই শ্রেণীর যৌগিক।

অ্যালুভিয়্যাল — নদ্যানীত ; কর্দম মৃত্তিকাদি যে-সব পদার্থ নদীস্রোতে বাহিত হয়ে এসে একস্থানে সঞ্চিত হয়, যেমন—'অ্যালুভিয়্যাল ক্লে' হলো নদীবাহিত কর্দম। এসব পদার্থকে আবার কখন কখন এক কথায় বলে **অ্যালুভিয়াম**।

অ্যালোট্রপি — পৃথক ভৌত-ধর্ম ও আকার বিশিষ্ট একই মৌলিক পদার্থ (বহুরূপ)। দৃশ্যতঃ বাহ্যিক বিভিন্নতা, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মে অভিন্ন পদার্থ ; যেমন—সালফার ↑ বা গন্ধকের নানা রকম অ্যা-পি. আছে।

অ্যালুমিনিয়াম — মৌলিক ধাতু ; সাদা, হাল্‌কা ও উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Al ; পারমাণবিক ওজন 26·97, পারমাণবিক সংখ্যা 13 ; প্রধানতঃ **বক্সাইট** নামক এক রকম খনিজ থেকে নিষ্কাশিত হয়। হাল্‌কা বলে অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন ধাতুসংকর নানা কাজে, বিশেষতঃ বিমানপোত তৈরী করতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। অ্যালুমিনিয়ামে গৃহস্থালীর নানা রকম তৈজসপত্র ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি তৈরী করা হয়।

অ্যালুমিনা—অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3 ; বক্সাইট ↑, কোরাণ্ডাম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম - ব্রাস — পিতল বা ব্রাস ↑ প্রধানতঃ তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরী একটি সংকর-ধাতু। এর সঙ্গে সামান্য অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে এই বিশেষ সংকর-ধাতুটা তৈরী হয়।

অ্যালুমিনিয়াম - ব্রোঞ্জ — ব্রোঞ্জ প্রধানতঃ তামা ও টিনের সংকর-ধাতু ; এর সঙ্গে সামান্য (4% থেকে 13%) অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে যে সংকর-ধাতু তৈরী হয়।

অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড— সাধারণতঃ ভিটামিন-সি নামে পরিচিত একটি খাদ্য-প্রাণ। সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। বিভিন্ন ফল ও তাজা শাক সব্জিতে পাওয়া যায় (ভিটামিন ↑)।

অ্যাস্ফ্যাল্ট — আল্কাতরার মত কালো আঠালো এক রকম পদার্থ ; এর প্রধান উপাদান হলো বিটুমেন্ ↑ । সাধারণ কথায় একে বলে পিচ্ ; সহরের রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক হ্রদের তলায় ও কোন কোন স্থানের চুনা-পাথর ও বেলে-পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় অ্যাস্-ফ্যাল্ট প্রচুর পাওয়া যায়।

অ্যাস্বেস্টস—এক শ্রেণীর সিলিকেট ↑ পদার্থের বিশেষ নাম। প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম-ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ও অন্যান্য ধাতব সিলিকেট বা বালুকাদির মিলনে উৎপন্ন একটা রাসায়নিক পদার্থ। জিনিসটা অদাহ্য বলে অগ্নি-নিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আঁসযুক্ত জিনিসের সঙ্গে মাখিয়ে মিশিয়ে নানা আকারের অদাহ্য অ্যাস্বেস্টস সিট্ তৈরী হয়ে থাকে।

অ্যাসিটোন — তরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ, CH_3COCH_3 ; বর্ণহীন, দাহ্য, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। স্ফুটনাংক 56·5° সেন্টিগ্রেড। অ্যাসিটোনকে কখন কখন 'ডাইমিথাইল-কিটোন' ও বলা হয়। উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাগে ; বিশেষতঃ সেলুলোজ-অ্যাসিটেট্ রেয়ন ↑, অর্থাৎ কৃত্রিম রেশম তৈরীর জন্যে এর বিশেষ প্রয়োজন। চর্বি ও রজন জাতীয় পদার্থ অ্যাসিটোনে গলে যায়।

অ্যাসিটিক অ্যাসিড — বর্ণহীন তরল অম্ল-পদার্থ। রাসায়নিক সূত্র CH_3COOH ; ভিনিগারের ↑ মধ্যে পাওয়া যায় বলে একে **ভিনিগার-অ্যাসিড**ও বলা হয়। উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে জমে যায়, তখন একে 'গ্ল্যাসিয়াল' অ্যাসিটিক অ্যাসিড বলে। বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে এর যথেষ্ট দরকার। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন

অ্যাসিটেট সল্ট ↑ তৈরী হয় ; যেমন—লেড্ অ্যাসিটেট, যাকে 'সুগার-অব-লেড' বলে ; রঞ্জন-শিল্পে যথেষ্ট দরকার হয়। কৃত্রিম রেশম (অ্যাসিটেট-সিল্ক ↑) শিল্পে অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান।

অ্যাসিটিলিন—বর্ণহীন, দাহ্য, বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ, C_2H_2 ; গ্যাসটা জ্বালালে বেশ উজ্জ্বল আলো ছড়ায়। সাধারণ কার্বাইড ↑ গ্যাস-বার্ণারে এই অ্যাসিটিলিন গ্যাসই জ্বালানো হয়। ক্যাল্সিয়াম কার্বাইডে ↑ জল দিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে গ্যাসটা উৎপন্ন হয় ; $CaC_2 + 2H_2O =$ C_2H_2 (অ্যাসিটিলিন) + $Ca(OH)_2$ (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑ বা চূন)। ওয়েল্ডিং-এর কাজে অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম ↑ সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজন হয়।

অ্যাসিটেট সিল্ক — কৃত্রিম রেশম ; আজকাল ইহা রেয়ন ↑ নামে পরিচিত। তুলা, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি সেলুলোজ জাতীয় পদার্থের উপর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক রকম সাদা নরম পদার্থের সৃষ্টি হয় ; এই পদার্থ টা হলো সেলুলোজ অ্যাসিটেট ↑। যন্ত্রের সাহায্যে এর থেকে সূক্ষ্ম সূত্র তৈরী হয় এবং সেই সূতায় রেশমের মত বস্ত্রাদি বোনা হয়। এই হলো কৃত্রিম রেশম, বা 'আর্টিফিশিয়াল সিল্ক'।

অ্যাসিড — অম্ল, তেজাব (হিন্দি) ; কোন ধাতুর সংস্পর্শে যে-পদার্থের হাইড্রোজেন-পরমাণু বিমুক্ত হয়ে যায়, আর ওই ধাতুর পরমাণু তার স্থান অধিকার করে ধাতব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ অ্যাসিডের স্বাদ অম্ল ; এর সংস্পর্শে বিভিন্ন বস্তু পুড়ে ক্ষয়ে যায়। যে কোন অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল-লিট্মাস (একটি উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক পদার্থ) লাল হয়ে যায়। অ্যাসিড মাত্রেরই হাইড্রোজেন একটি অপরিহার্য উপাদান। এর জলীয় দ্রবে ওই হাইড্রোজেন আয়নায়িত হয়ে পড়ে, এবং কোন ধাতব বেসের ↑ সংস্পর্শে সহজেই বিমুক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন সল্টের উৎপত্তি ঘটে।

অ্যাসিড-সল্ট — অ্যাসিডের সঙ্গে কোন ধাতুর মিলনে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ (সল্ট ↑) তৈরী হয় এবং হাইড্রোজেন বিমুক্ত হয়ে যায়। যদি অ্যাসিডের সবটা হাইড্রোজেন-অণু বিমুক্ত না হয়ে কিছুটা ওই সল্টে থেকে যায়, তবে তাকে বলা হয় অ্যাসিড-সল্ট ; যেমন, $NaHCO_3$ সোডিয়াম বাই-কার্বনেট।

অ্যাসে—কোন খনিজ প্রস্তর বা ধাতু-সংকরে কত শতাংশ ধাতু (বিশেষতঃ স্বর্ণ বা রৌপ্য) আছে তার বিশ্লেষণ। 'অ্যাসে' বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া দু'রকম—শুষ্ক বিশ্লেষণ ও তরল বিশ্লেষণ। স্বর্ণ বা রৌপ্যের শুষ্ক বিশ্লেষণে চূর্ণিত খনিজের বা ধাতুসংকরের সঙ্গে লেড্ অক্সাইড ↑ মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়, সঙ্গে দেওয়া হয় চারকোল ↑ ও জিঙ্ক

ক্লোরাইড ↑ জাতীয় একটা ফ্লাস্ক ↑। উত্তাপের ফলে গলিত লেড (সিসা) স্বর্ণ বা রৌপ্যের কণিকা-সহ পাত্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। তরল 'অ্যাসে' বিশ্লেষণে নাইট্রিক অ্যাসিড ↑ প্রভৃতির সাহায্যে খনিজটিকে দ্রবীভূত করা হয়, আর সেই দ্রবণ থেকে ধাতুকে উপযুক্ত উপায়ে অধঃপাতিত করা হয়।

অ্যাস্টার, অ্যাস্ট্রো — নক্ষত্র ; নক্ষত্র সম্বন্ধীয় বা নক্ষত্রের অনুরূপ ; যেমন, অ্যাস্টারয়েডস — গ্রহ-কণিকাপুঞ্জ। অ্যাস্ট্রোনেভিগেসন— আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান দৃষ্টে দিঙ্‌নির্ণয় করে জাহাজ বা বিমানপোত চালনা।

অ্যাস্ট্রোফিজিক্স — গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন, উপাদান, ঔজ্জ্বল্য, গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণা বিজ্ঞান।

অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইউনিট—পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বকে একক ধরে নিয়ে অনেক সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাধারণ গণনাদি করা হয়। এই একককে বলে অ্যা. ই. ; মোটামুটি 92,900,000 মাইল। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ে কখন কখন এই একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অ্যাস্ট্রোলজি — জ্যোতিষশাস্ত্র, মানব জীবনের শুভাশুভ বিভিন্ন গ্রহের প্রকোপ ও প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসম্মত ও যুক্তিসহ নয় বলে আধুনিক বিজ্ঞানে অস্বীকৃত।

অ্যাস্ট্রোনমি — জ্যোতির্বিদ্যা : গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি-প্রকৃতি, অবস্থান ও অবস্থাদি সম্পর্কীয় পর্যবেক্ষণ-লব্ধ বিবিধ তথ্যাদি বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়।

অ্যাস্টারয়েডস — গ্রহপুঞ্জ ; মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের কক্ষ-পথের মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট কক্ষে প্রায় দেড় হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ এক সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ; এদের বলে অ্যাস্টারয়েড্‌স বা গ্রহপুঞ্জ। এগুলোর কোনটারই ব্যাস 300 মাইলের বেশী নয়।

অ্যাস্টিগ্‌মেটিজ্‌ম — চোখের বা কোন লেন্সের উপরিভাগের বক্রতা প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ার জন্যে যে দৃষ্টিদোষ ঘটে। এরূপ লেন্সে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বিভিন্ন ফোকাসে ↑ সংহত হয় ; এ-জন্যে দৃষ্ট বস্তু এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো দেখায়। এই ত্রুটিকে বলে অ্যাষ্টিগ্‌মেটিজ্‌ম। চোখের এরূপ দোষ সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে দূর করা যায়।

অ্যাস্পিরিন — সাদা কঠিন পদার্থ ; এর রাসায়নিক নাম অ্যাসিটাইল-সেলিসাইলিক অ্যাসিড। প্রায় 133° সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়। বেদনা-নাশক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ; এর অ্যানাল্‌জেসিক ↑ এবং অ্যান্টি-পাইরেটিক ↑ উভয় গুণই বিশেষভাবে বর্তমান। মাথা-ধরা ও ব্যথা-বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ।

অ্যাস্টেটিক কয়েলস — বৈদ্যুতিক তার-কুণ্ডলীর এক রকম ব্যবস্থা ; সূক্ষ্ম তড়িৎ-যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। এর জন্যে একটা ধাতব তার-কুণ্ডলী এমন-ভাবে স্থাপিত হয় যাতে ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে যে চৌম্বক-শক্তি উৎপন্ন হয়, তা আবার নিকটস্থ কোন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীত শক্তির প্রভাবে পরস্পর শক্তিশূন্য হয়ে পড়ে।

আ

...আইট—সাল্‌ফিউরাস (H_2SO_3), নাইট্রাস (HNO_2) প্রভৃতি অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ধাতব '...আইট' সল্ট উৎপন্ন হয়, যেমন — সোডিয়াম সাল্‌-ফাইট (Na_2SO_3), পটাসিয়াম নাইট্রাইট (KNO_2) প্রভৃতি। আর সাল্‌ফিউরিক (H_2SO_4), নাইট্রিক (HNO_3) প্রভৃতি অ্যাসিডের বিক্রি-য়ায় উৎপন্ন হয় ধাতব '...**য়েট**' সল্ট ; যেমন — সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$), পটাসিয়াম সাল্‌ফেট (K_2SO_4) ইত্যাদি। এই দুই শ্রেণীর সল্টের প্রভেদ মাত্র তাদের সংগঠক অক্সিজেন-পরমাণুর সংখ্যায়।

...আইটিস — কোন অঙ্গের প্রদাহ বুঝাতে বিশেষ বিশেষ শব্দের পরে এই উপসর্গ যুক্ত হয় ; যেমন—**গ্যাস্ট্রাই-টিস** মানে পাকস্থলীর প্রদাহজনিত রোগবিশেষ; এ-রকম **ল্যারেঞ্জাইটিস** ল্যারিংস-এর ↑ প্রদাহ ; **ডার্মাইটিস** চর্মের (ডার্মিস ↑) প্রদাহ।

আইডোফর্ম — বীজঘ্ন রাসায়নিক পদার্থ ; হলদে, স্ফটিকাকার কঠিন বস্তু। জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথার ↑, অ্যালকোহল ↑ প্রভৃতিতে গলে যায়। একটা বিশেষ তীব্র গন্ধের জন্য পরিচিত। বীজাণু-প্রতিরোধক হিসেবে ক্ষতস্থানে লাগানো হয়।

আই-পিস — অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রে দর্শকের চোখের কাছে যে লেন্স ↑ সংলগ্ন থাকে। অব্‌জেক্টিভ্‌ ↑ লেন্সের ভিতর দিয়ে দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব এসে এই 'আই-পিস' লেন্সের মধ্য দিয়ে বর্ধিতাকারে দর্শকের চোখে প্রতিফলিত হয়।

আইডিয়াল গ্যাস—আদর্শ গ্যাস। বায়বীয় পদার্থের আয়তন, চাপ ও তাপের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী (চার্লস-ল ↑, বয়েল্‌স-ল ↑) মোটামুটি নির্ধারিত হয় ; কিন্তু অতি সতর্ক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সূত্রগুলি সর্বত্র সম্পূর্ণ খাটে না, বিভিন্ন গ্যাসে কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়ে থাকে। তথাপি নানা রকম রাসায়নিক তথ্য প্রকাশের সুবিধার জন্য ঐ সব সূত্র নির্ভুল ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীগণ শেষে আদর্শ গ্যাসের কল্পনা করেছেন, যাতে ঐ সব সূত্র যেন সম্পূর্ণরূপে খাটে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন আদর্শ বা আইডিয়াল গ্যাস দুর্লভ ; হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন

গ্যাস কতকটা এর কাছাকাছি। এই কাল্পনিক 'আইডিয়াল গ্যাস'কে কখন কখন **পারফেক্ট গ্যাস**ও বলা হয়।

আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট — ইহুদী বংশীয় জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ; জন্ম জার্মানীর উলম সহরে 1879 খৃঃ, মৃত্যু 1955 খৃঃ। বাল্যকাল কাটে মিউনিকে — শিক্ষাসমাপ্তি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে। গণিতে অপূর্ব প্রতিভা ; পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ। গতিবিদ্যা, তাপবিজ্ঞান, মহাকর্ষ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা। 1905 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানে যুগান্তকারী তথ্য 'আপেক্ষিকতা বাদ' প্রকাশ এবং পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদনেই সমধিক প্রসিদ্ধি। সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি ও সম্মান। 1921 খৃঃ ফটো-ইলেক্ট্রিসিটি ↑ সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। বার্লিনে কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিউটে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর। অবশেষে 1933 খৃঃ নাৎসী অত্যাচারে গোপনে জার্মানী ত্যাগ, বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষে আমেরিকার প্রিন্সটনে বসতি স্থাপন এবং তত্রত্য ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনা। প্রিন্সটনের হাসপাতালে লোকান্তর।

আইয়োডিন — গাঢ় ধূসর বর্ণের কঠিন মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 126·92, পারমাণবিক সংখ্যা 53 ; উদ্বায়ী পদার্থ, হাওয়ায় উন্মুক্ত রাখলে বেগুনী রংয়ের ধূমে পরিণত হয়ে উবে যায়। জলে প্রায় গলে না ; কিন্তু অ্যালকোহলে ↑ সঙ্গে সঙ্গে গলে যায় — এই দ্রবকে বলে টিংচার-আইয়োডিন, যা কাঁটা-ছেড়ায় জীবাণু-প্রতিরোধক হিসেবে লাগানো হয়। বিভিন্ন সামুদ্রিক গুল্মে ও চিলি সল্ট-পিটার ↑ নামক একটি খনিজে যৌগিক আকারে পাওয়া যায়, এবং তা থেকে বিশুদ্ধ আইয়োডিন পৃথক করা হয়। বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে এর যৌগিক মিলনে বিভিন্ন আইয়োডাইড সল্ট সৃষ্টি হয়। অনেক খাদ্যবস্তুতে সামান্য আইয়োডিন থাকে, খাদ্যে এর অভাবে গলগণ্ড রোগ জন্মে। বিভিন্ন আইয়োডাইড সল্ট ঔষধ হিসেবে ও আলোকচিত্র শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আইস—বরফ ; জলের কঠিন অবস্থা। তাপ হ্রাস পেয়ে 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ↑ নেমে এলে জল জমে বরফ হয়ে যায়। জল জমলে আয়তনে বাড়ে — কাজেই হাল্কা হয়ে বরফ জলের উপর ভেসে থাকে ; নীচের জলে জলচর জীব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে বেঁচে থাকতে পারে। শীতপ্রধান অঞ্চলের স্বাভাবিক তাপেই বরফ সৃষ্টি হয়, আবার রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও বরফ তৈরী করা যেতে পারে।

আইস্ল্যাণ্ড স্পার — এক রকম প্রস্তর বিশেষ ; স্বচ্ছ স্ফটিকাকার ক্যাল্সিয়াম কার্বনেট ↑। পদার্থটির

একটা বিশেষ গুণ এই যে, এর মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হলে আলোকরশ্মি পোলারাইজ্ড ↑ হয়, অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গ-স্পন্দন সব একমুখী হয়ে পড়ে। আলোক-তরঙ্গের এই গতি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে বলে পোলা-রাইজিং এফেক্ট। আইস্ল্যাণ্ড স্পারের মধ্যে আবার আলোকরশ্মির একাধিক প্রতিসরণও কখন কখন হয়ে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে যন্ত্রাদিতে এর কৃষ্টাল ↑ ব্যবহৃত হয়।

আইস্ল্যাণ্ড স্পার

আইস্-পয়েন্ট — বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে ঠিক যে-তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হতে সুরু করে ; অন্য কথায় বলা যায়, যে তাপমাত্রায় (টেম্পারেচার ↑) বরফ গলতে সুরু করে। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (ব্যারোমিটার ↑) এই তাপমাত্রা হলো 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑।

আইসোগোনিক লাইন — পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও চুম্বকীয় উত্তরের (ম্যাগ্নেটিক নর্থ ↑) মধ্যের ব্যবধান (ম্যাগ্নেটিক ডিভিয়েশন ↑) যে সব স্থানে সমান মানচিত্রে তাদের সংযোজক রেখা। সম-চৌম্বক রেখা।

আঙ্গিউলেটা—খুর সমন্বিত পদবিশিষ্ট প্রাণিকুল, যেমন—গরু, ঘোড়া, হরিণ, ছাগল প্রভৃতি।

আইসোটোপ — বিশেষ অবস্থায় কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতক-গুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায়, অথচ পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকে। এরূপ পরমাণুকে ওই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে ওই মৌলিক পদার্থের মতই থাকে। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন আইসোটোপ হতে পারে। পরমাণুর কেন্দ্রীনের নিউট্রন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয়। যে-সব পরমাণুর কেন্দ্রীনে সমসংখ্যক নিউট্রন থাকে তারা একই শ্রেণীর আইসোটোপ। অনেক স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের মধ্যে তার বিভিন্ন আইসোটোপ মিশ্রিত থাকতে পারে ; বিভিন্ন কৌশলে আইসোটোপ তৈরীও করা যেতে পারে।

আইসোটোপিক ওয়েট—অক্সিজেন গ্যাসের আইসোটোপের ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন তুলনা করা হয়। কোন আইসোটোপের এই তুলনা-মূলক পারমাণবিক ওজনকে বলে আইসোটোপিক ওয়েট। এই ওজন প্রায়ই পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ; একে আইসোটোপের মাস্ ↑ (mass) বা ভর-সংখ্যাও বলে।

আইসোক্রোনাস — সমকালব্যাপী, যেমন — পেণ্ডুলামের ↑ দোলন-কাল। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ব্যাপ্তিকালও সর্বদা সমান, অর্থাৎ আইসোক্রোনাস।

আইসোটোনিক —সম অস্মস্-শক্তি বিশিষ্ট (অস্মোসিস ↑); যেমন— 'আইসোটোনিক লিকুইড্‌স' হলো যে-সব দ্রবে দ্রাবক ও দ্রাব্যের আণবিক অনুপাত সমান থাকে, অর্থাৎ সমান আণবিক ঘনত্ব বিশিষ্ট হয়। অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রব অল্প ঘনত্বের দ্রব থেকে তরল দ্রাবক ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে ক্রমে উভয়ের ঘনত্বের সাম্য বিধান করতে চায় এবং দ্রব দু'টি ধীরে ধীরে আইসোটোনিক হ'য়ে যায়।

আইসোট্রন — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে কোন পদার্থ থেকে তার হাল্‌কা ও ভারী বিভিন্ন প্রকার আইসোটোপ ↑ সব একে একে পৃথক করা সম্ভব হয়ে থাকে।

আইসোট্রপিক — যে-সব পদার্থের শক্তি বা ধর্ম (যেমন, তাপের তারতম্যে আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা প্রভৃতি) সর্বত্র সব দিকেই সমান ; যেমন — কাঁচকে বলা হয় আইসোট্রপিক পদার্থ ; কিন্তু কাঠ আইসোট্রপিক নয়।

আইসোথার্ম — আবহাওয়া-নির্দেশক মানচিত্র বা নক্সায় সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় একই তাপবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান যে সকল রেখা টেনে দেখানো হয়। আঞ্চলিক সম-তাপ রেখা। এদের **আইসোথার্মাল** লাইন্‌স-ও বলে।

আইসোথার্মাল লাইন — আইসোথার্ম ↑

আইসোথার্মাল চেঞ্জ — সমতাপাঙ্ক পরিবর্তন ; যে পরিবর্তনে পদার্থের তাপ বা উষ্ণতার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না ; যেমন—অতি মন্থর গতিতে কোন গ্যাসের আয়তন সম্প্রসারিত করলে তার উষ্ণতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না (যেমন হয় দ্রুত সম্প্রসারণ বা সংকোচনে)। কোন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও এরূপ আইসোথার্মাল বা সমতাপ পরিবর্তন হ'য়ে থাকে।

আইসোপোডা — সামুদ্রিক জীবের এক বিশেষ শ্রেণী ; ক্ষুদ্র থলথলে দেহ, বাইরে কোন কঠিন খোলা বা আবরণ এদের থাকে না।

আইসোপ্রিন — জৈব রাসায়নিক পদার্থ, C_5H_8 ; উদ্ভিজ্জ রাবারের ↑ গুণ ও ধর্ম এর উপরে নির্ভরশীল। আইসোপ্রিনের অণুগুলি পরস্পর শৃঙ্খলিত অবস্থায় সংবদ্ধ হ'য়ে প্রাকৃতিক পলিমারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ রাবার উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক উপায়ে আইসোপ্রিনের পলিমারিজেসন ঘটিয়ে কৃত্রিম রাবারও তৈরি করা যেতে পারে।

আইসোবার — আবহাওয়া-নির্দেশক মানচিত্রে যে সকল রেখা টেনে অনুরূপ বায়বীয় (বায়ুমণ্ডলের) চাপ-

বিশিষ্ট স্থানসমূহ যোগ করে দেখানো হয়। আঞ্চলিক সম-চাপরেখা।

আইসোবার্‌স — সমান পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন পদার্থের আইসোটোপ ↑; অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমগোত্রীয় ও সমান ওজনের আইসোটোপ। এদের পারমাণবিক সংখ্যা (অ্যাটমিক নাম্বার ↑) বিভিন্ন, কিন্তু আইসোটোপিক ওয়েট ↑ সমান; যেমন, টিন ধাতুর একটা আইসোটোপ হলো $_{50}Sn^{115}$; আর, ইণ্ডিয়াম ↑ ধাতুর একটা আইসোটোপ $_{49}In^{115}$; কাজেই এদের বলা হয় আইসোবার্‌স। এখানে 115 হলো পারমাণবিক ওজন, আর 50 ও 49 হলো পারমাণবিক সংখ্যা।

আ ই সো ম র্ফি জ্‌ ম — একই রূপ রাসায়নিক গঠন ও একই কেলাসন (দানাবাধা) আকারে থাকার অবস্থা। গঠনে ও ক্রৃষ্টালিজেসনে ↑ এই সাম্যভাব যে পদার্থের সর্বত্র একই রূপ থাকে তাকে বলে **আইসোমর্ফাস** পদার্থ; যেমন, বিভিন্ন শ্রেণীর ফিট্‌কারি, বা অ্যালাম ↑ হোল আইসোমর্ফাস।

আইসোমার — যে সব রাসায়নিক পদার্থের অণুগুলো সমান সংখ্যক ও সমপর্যায়ের বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হয়েও সেই পরমাণুগুলোর সংস্থান বা পারস্পরিক সংযোগের বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট হয়, তাদের বলে পরস্পরের আইসোমার। যেমন, অ্যামোনিয়াম সায়েনেটের ↑ আণবিক সূত্র হলো NH_4CNO, আবার ইউরিয়া ↑ হলো $CO(NH_2)_2$; এরা একই প্রকার মৌলিক পদার্থের সমান সংখ্যক পরমাণু-বিশিষ্ট হয়েও পারমাণবিক সংস্থানের বিভিন্নতার জন্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ হয়েছে। এরা হলো পরস্পর পরস্পরের আইসোমার। অণুর গঠনে পরমাণুর এরূপ সংস্থান-বৈচিত্র্যকে বলে **আইসোমেরিজ্‌ম**।

আইসোসেলিস ট্র্যাঙ্গেল — সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ; জ্যামিতিতে যে ত্রিভূজের দু'টি বাহু পরস্পর সমান। চিত্রে ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের AB ও AC বাহুদ্বয় সমান।

আইসোসেলিস ট্র্যাঙ্গেল

আইসোহিল—পৃথিবীর যে সব স্থানে সম পরিমাণ সূর্যকিরণ (রৌদ্র) পড়ে, অর্থাৎ সৌর তাপ পায়। 'আইসো' মানে সমান; 'হেলাস' সূর্যকিরণ।

আইসোহেলাইট — সমুদ্রের যে সকল স্থানের জল সমান লবণাক্ত।

আইসোহেইট — ভূ-পৃষ্ঠের যে সকল স্থানে সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়।

আউন্স — ওজন ও আয়তন পরিমাপের বৃটিশ একক বিশেষ। কঠিন বস্তুর ওজন নির্ধারণে অ্যাভড়ুপয়েজ ↑ আউন্স = 437·5 গ্রেণ ↑, বা 28·3

গ্র্যাম ↑; ট্রয় আউন্স = 480 গ্রেণ বা 31·1 গ্র্যাম। আবার তরল বস্তুর আয়তন পরিমাপে ফ্লুইড আউন্স = 8 ড্রাক্‌ম = 28·43 সি. সি. ↑।

আফ্‌টার-ড্যাম্প — মিথেন (CH_4) গ্যাসকে বলে ফায়ার-ড্যাম্প ↑; কয়লার খনিতে আবদ্ধ এই মিথেন গ্যাস জ্বলে উঠে যে বিস্ফোরণ ঘটায় তাতে কার্বন-মনক্সাইড ও অন্যান্য কোন কোন বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব হয়। বিস্ফোরণের ফলে খনির গহ্বরে উৎপন্ন এইরূপ সব বিষাক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণকে বলে আফ্‌টার-ড্যাম্প।

আম্ব্রা — আলোকরশ্মি কোন অস্বচ্ছ পদার্থে বাধা পেলে ওই বাধার পশ্চাদ্ভাগে একটা গাঢ় ছায়া পড়ে। এই ছায়ার চার-ধারে আঁধা অন্ধকার সৃষ্টি হয়। তার মাঝ-খানের ঐ গাঢ় অন্ধকার ছায়াকে বলে আম্ব্রা; আর চার-ধারের স্বল্প আলোকিত ছায়াকে বলে **পেনাম্ব্রা**।
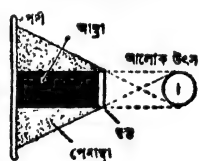
আয়ন — তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বা পরমাণু-সমষ্টি। কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলি ইলেক্‌ট্রন ↑ (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑) থাকলে তা বৈদ্যুতিক-সমতা লাভ করে তার চেয়ে কম-সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন থাকলে ওই পরমাণু হয় ধন-তড়িৎ সম্পন্ন আয়ন। ওই ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যা আবার বেশী হলে সৃষ্টি হয় ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন আয়ন কণিকা। নানাভাবে ইলেক্‌ট্রন কণিকার সংখ্যার এরূপ হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বা পরমাণু-সমষ্টি এরূপ আয়নায়িত হয়ে পড়ে। হাইড্রোজেন ↑ পরমাণুর সংগঠক ইলেকট্রন-কণিকাটি সরিয়ে দিলে তার নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন ↑ কণিকা থেকে যায় তাই হলো হাইড্রো-জেন-আয়ন। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ করলে, অথবা রঞ্জন-রশ্মি ↑, গামা-রশ্মি ↑ প্রভৃতি চালালে ওই গ্যাসীয় পরমাণুগুলো ধীরে ধীরে আয়নায়িত হয়ে ওঠে।

আয়নোস্ফিয়ার — ভূ-পৃষ্ঠের মোটা-মুটি 30 থেকে 250 মাইল উচ্চে অবস্থিত আয়নায়িত বায়বীয় স্তর। সূর্যকিরণের তীব্র আলট্রা-ভায়োলেট ↑ রশ্মির প্রভাবে এই স্তরের বায়ুকণিকা-গুলো তড়িতাবিষ্ট (আয়নায়িত) অবস্থায় থাকে। বেতার-তরঙ্গ সোজা মহাশূন্যে চলে না গিয়ে এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ক্রমাগত ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই পৃথিবীর বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। পৃথিবীর অ্যাট্‌মস্ফিয়ারের ↑ এই বায়ু-স্তরকে কখন কখন **হেভিসাইড লেয়ার**-ও ↑ বলা হয়।

আয়রন — লৌহ; কঠিন মৌলিক ধাতব পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 55·85, পারমাণবিক সংখ্যা 26।

চুম্বকে আকৃষ্ট হয়; বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষাকৃত নরম; বিভিন্ন কৌশলে একে সুকঠিন ও কার্যক্ষম করা হয়। কার্বন বা কোন ধাতব পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করলে লোহার এই বৈশিষ্ট্য জন্মায় (স্টিল ↑)। কাঁচা লোহায় তৈরী জিনিসকে টেম্পার ↑, অর্থাৎ 'পান' দিয়েও তার কাঠিন্য কিছুটা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পরিমাণ মত কার্বন ↑ মিশিয়ে লোহাকে কঠিন ইস্পাতে পরিণত করা হয়। ম্যাগ্নে-টাইট্ ↑, হেমাটাইট্ ↑, পাইরাইটস্ ↑ প্রভৃতি লৌহ-মিশ্রিত বিভিন্ন খনিজ-পাথর ব্ল্যাষ্ট-ফার্নেসে ↑ গলিয়ে নানা কৌশলে কাঁচা লোহা নিষ্কাশিত হয়। লোহার ল্যাটিন নাম **ফেরাম**; সাংকেতিক চিহ্ন তাই Fe. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিভিন্ন রকম লোহা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন, পিগ্-আয়রন, রট-আয়রন, কাষ্ট-আয়রন ↑ ইত্যাদি।

আয়রন এজ — লৌহ যুগ। প্রাগৈতিহাসিক কালকে মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশের তিনটি স্তর বা যুগ দ্বারা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; —প্রস্তর-যুগ, তাম্র-যুগ ও লৌহ যুগ। কিছুটা শিল্পসমুন্নত যে-যুগে মানুষ ক্রমে লৌহের ব্যবহার আয়ত্ব করে। অবশ্য যুগের এই কাল বিভাগ সুনির্দিষ্ট নয়; কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। ইউরোপে খৃঃ পূর্ব প্রায় 1500 বছর থেকে এই যুগের আরম্ভ বলে ধরা হ'য়েছে।

আয়রন-লাংস—ফুস্ফুস্ অকেজো হয়ে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে যে-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটা হলো, বাইরের বায়ু-সম্পর্ক শূন্য একটা সুদৃঢ় বাক্সের মত, যার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসঘটিত রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়, মাথাটি অবশ্য বাইরে থাকে। ওই বাক্সের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ যান্ত্রিক কৌশলে (পাম্পের সাহায্যে) পর্য্যায়ক্রমে বাড়ানো-কমানো হয়; ফলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ায় যেমন হয়, তেমনভাবেই রোগীর ফুস্ফুস্টাও পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে, আর বাইরের বাতাস নাসিকাপথে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ও বেরিয়ে আসে। এভাবে সহজেই রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে। এ-যন্ত্রটাকে আবার আবিষ্কারকের নামানুসারে '**ড্রিঙ্কার অ্যাপারেটাস**-ও বলে।
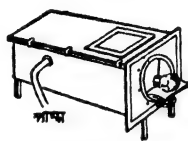
আয়রণ লাংস

আর্ক (জ্যামিতিক) — বৃত্তের পরিধির যে-কোন অংশ।

আর্ক (বৈদ্যুতিক) — সামান্য ব্যবধানে রক্ষিত দুটি তড়িৎ-দ্বারের (ইলেক্ট্রোড ↑) মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে

যে সুতীব্র বৈদ্যুতিক আলো পাওয়া যায়। এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এর তড়িৎ-দ্বার দুটি সাধারণতঃ হয় কার্বনের তৈরী। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বাষ্পীভূত কার্বন কণিকার ধারা উভয় তড়িৎ-দ্বারের মধ্যস্থ ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। এই কার্বন-বাষ্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চলাচল করবার ফলে কার্বনের কণিকাগুলো তড়িতাবিষ্ট হয়ে ওই তীব্র আলোক ও উত্তাপের সৃষ্টি করে। এভাবে কোন কোন ধাতু-নির্মিত তড়িৎ-দ্বারের মধ্যেও আর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আর্ক ল্যাম্প — তীব্র আলোক সৃষ্টির জন্যে বৈদ্যুতিক আর্কের ব্যবহারিক প্রয়োগে যে এক রকম বাতি তৈরী করা হয়। সাধারণতঃ কার্বন আর্কেরই বাতি হয়ে থাকে। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ বাড়িয়ে কমিয়ে আলোর তীব্রতারও হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পারদের সাহায্যেও এক রকম আর্ক-ল্যাম্প তৈরী হয়, এতে পারদই তড়িৎ-দ্বারের কাজ করে।
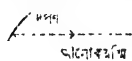
আর্ক-ল্যাম্প

আর্কটিক রিজিয়ন — সুমেরু-অঞ্চল; পৃথিবীর উত্তর মেরুকে বেষ্টন করে $66\frac{1}{2}°$ উত্তর-অক্ষাংশ (ল্যাটিচিউড ↑) পর্যন্ত বিস্তৃত চির তুষারাবৃত ভূখণ্ড। গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিটস্‌বার্জেন, অ্যালেস্‌মার দ্বীপগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত আর্কটিক বা সুমেরু-সাগরে অবস্থিত। দক্ষিণমেরু অঞ্চলকে বলে **অ্যান্টার্কটিক রিজিয়ন** বা 'অ্যান্টার্টিকা'।

আর্ক সাইন— ত্রিকোণমিতিতে কোন সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ও অতিভুজের অনুপাতকে বলে ভূমিসংলগ্ন কোণের **সাইন**; প্রদত্ত চিত্রে CAB (30°
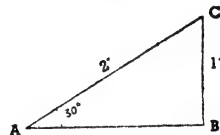
ডিগ্রি) কোণের সাইন = BC : AC, সংক্ষেপে সাইন 30° = $\frac{1}{2}$; এই উক্তিকে আবার ঘুরিয়ে বলা যায়, যে-কোণের 'সাইন $\frac{1}{2}$' তার পরিমাণ 30° ডিগ্রি। একে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়: 30° = আর্ক সাইন $\frac{1}{2}$, অথবা সাইন $^{-1}$ $\frac{1}{2}$ ($\sin^{-1}\frac{1}{2}$); সুতরাং 'আর্ক সাইন A' হলো সেই কোণ যার সাইন হলো A. মোটামুটি বলা যায়, সাইনের বিপরীত 'আর্ক সাইন', যাকে অন্য কথায় বলে 'সাইন ইন্‌ভার্স'।

আর্কি (archæ) — অতি পুরাতন, প্রাচীন; যেমন — **আর্কিয়ান রক** হলো লক্ষ লক্ষ বছরের অতি প্রাচীন সুকঠিন প্রস্তর।

আর্কি (arche) — প্রারম্ভ, প্রথম। **আর্কিটাইপ** মানে প্রথম নমুনা বা

মডেল ; যেমন — 'আর্কিটাইপ এরো-প্লেন' হলো কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর যে বিমানপোতটি প্রথম তৈরি হয়েছে এবং পরে যার অনুকরণে অসংখ্য বিমান-পোত তৈরি হবে।

আর্কিঅপ্টারিক্স— শিলীভূত জীবাশ্ম (ফোসিল ↑) দেখে প্রাচীন যুগের যে অধুনালুপ্ত বৃহদাকার পক্ষীর অস্তিত্ব জানা গেছে। পৃথিবীর প্রথম পক্ষিকুল।

আর্কিপেলেগো — দ্বীপপুঞ্জ ; বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের এক সঙ্গে একত্র সমাবেশ ; যেমন — হাওয়াই আর্কিপেলেগো।

আর্কিমিডিস — গ্রীক গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানী; জন্মস্থান গ্রীসের সিরাকিউস। জন্ম খৃঃ পূঃ 287, মৃত্যু খৃঃ পূঃ 212 অব্দ। জ্যামিতি, যন্ত্র-বিদ্যা, জল-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অসামান্য দান — সে যুগের বিস্ময়। তরল পদার্থের প্লবতা বিষয়ক 'আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল্' ↑ নামক তথ্যাবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। উচ্চে জলোত্তলনের জন্যে 'আর্কিমিডিস স্ক্রু' নামক যন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবক।

আর্কিমিডিস প্রিন্সিপ্ল্ — তরল পদার্থের প্লবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কৃত তথ্য। তথ্যটা হলো এই যে, কোন তরল পদার্থের মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কোন বস্তু নিমজ্জিত করলে যতটা তরল পদার্থ স্থানচ্যুত হয়, তার ওজনের সমান ওজন সেই বস্তু দৃশ্যতঃ হারায়, নিমজ্জিত বস্তুটা হাল্‌কা মনে হয়। নিমজ্জিত বস্তুর আয়তনের সমান তরল পদার্থের ওজন ওই বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে দৃশ্যতঃ কমে যায়। নিমজ্জিত বস্তুর উপরে তরল পদার্থের ঊর্দ্ধ চাপের ফলেই এরূপ ঘটে। একেই বলে তরল পদার্থের প্লবতা বা বয়েন্‌সি ↑। কোন বস্তুর আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি এই তথ্যের সাহায্যে সহজেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

আর্কিয়োলজি — প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বিজ্ঞান। প্রাগৈতিহাসিক মানব-সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন (প্রাচীন অলঙ্কার, তৈজসপত্র, কারুশিল্প, বাস-গৃহ প্রভৃতি) পর্যবেক্ষণ করে মানব-জাতির ক্রমবিকাশের ধারা নিরূপণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

আর্গ — বল-বিদ্যায় শক্তি পরিমাপের একক বিশেষ ; শক্তি প্রয়োগে জড় পদার্থে যে কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায় তার পরিমাপ। 'সি. জি. এস.' মাপে এক ডাইন ↑ শক্তির প্রভাবে এক সেন্টি-মিটার ↑ দূর অবধি (এক গ্র্যাম বস্তুতে) যে পরিমাণ গতীয় শক্তির কাজ নিষ্পন্ন হয় তাই হলো এক আর্গ।

আর্গন — একটি মৌলিক গ্যাস ; বায়ু-মণ্ডলে সামান্য (·93%) পরিমাণে আছে। গ্যাসটি নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ কোন পদার্থের সঙ্গেই এর রাসায়নিক মিলন

ঘটে না (ইনার্ট গ্যাস ↑)। বিজলী বাতির বাল্‌ব কখন কখন এই গ্যাসে ভর্তি করা হয়।

আর্গল — ঈষৎ লালাভ স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ; এর প্রধান উপাদান হলো প টা সি য়া ম-হাইড্রোজেন-টার্টারেট। একে সাধারণ ভাবে **টার্টার**-ও বলা হয়। ফার্মেণ্টেসন ↑ প্রক্রিয়ায় মদ্য প্রস্তুতের সময় মদ্য-ভাণ্ডের মধ্যে এই পদার্থ আপনা থেকে জমে।

আর্জেণ্টাইন — খনিজ সিল্‌ভার-সাল্‌ফাইড, Ag_2S ; রৌপ্য ও গন্ধকের একটি যৌগিক পদার্থ। সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই রৌপ্য নিষ্কাশিত হয়। একে **সিল্‌ভার-গ্ল্যান্স** ও বলে। কোন ধাতুর সঙ্গে রৌপ্য মিশ্রিত থাকলে তাকে বলে 'আর্জেন্টিফেরাস মেটাল।'

আর্টারি — ধমনী ; রক্তবহা নালী। হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠ থেকে যে নালীপথে বিশুদ্ধ রক্ত সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়। ঐ রক্ত দেহের সর্বত্র জীব-কোষগুলিকে অক্সিজেন ↑ যুগিয়ে সঞ্জীবিত করে এবং তাদের নিঃসৃত দূষিত পদার্থ নিয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত শিরা (ভেন ↑) পথে ফুসফুস পরিভ্রমণ করে বিশুদ্ধ হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তের বহির্গমন-পথ হলো 'আর্টারি', আর প্রত্যাগমন-পথকে বলে শিরা বা 'ভেন'।

আর্টিকুলেটেড স্কেলিটন — দেহের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল অস্থি যথাস্থানে যথাযথভাবে সংলগ্ন-করা নর-কঙ্কাল। শারীরবৃত্ত শিক্ষায় যেরূপ কঙ্কাল প্রয়োজন হয়।

আর্টিসান ওয়েল—আর্তেজীয় কূপ ; এক রকম কৃত্রিম প্রস্রবণ বিশেষ। ভূ-গর্ভের কোথাও কোথাও দু'টি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে একটি প্রবেশ্য শিলাস্তর অর্ধচন্দ্রাকারে বিন্যস্ত থাকে। এর প্রান্তদ্বয় ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছালে জল গিয়ে ঐ প্রবেশ্য স্তরটি
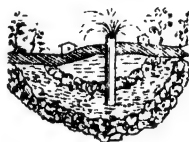
আর্টিসান ওয়েল

জলে পরিপৃক্ত হয়। এরূপ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশ্য স্তর পর্যন্ত কূপ খনন করলে প্রস্রবণের ন্যায় জল সবেগে উঠতে থাকে। এরূপ কূপ প্রথমে ফ্রান্সের আর্তোয়া নামক স্থানে খনিত হয় বলে একে 'আর্তেজীয় কূপ' বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় এরূপ কূপ অনেক খনিত হয়েছে। এর জল উঠে অযথা নষ্ট না হয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার উপায় করাও সম্ভব হয়েছে

আর্থ — পৃথিবী ; সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে সৌর পরিবারের তৃতীয় গ্রহ। মঙ্গল (মার্স ↑) ও শুক্র (ভেনাস ↑) গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট উপবৃত্তীয় কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রায় গোলাকার ; নিরক্ষীয় ব্যাস 7,926·7 মাইল, মেরু-প্রসারী ব্যাস 7,900 মাইল। ভূপৃষ্ঠের

আয়তন মোটামুটি 19,68,00,000 বর্গ মাইল; নিরক্ষীয় পরিধি 24,902 মাইল; ওজন প্রায় 6×10^{21} টন।

আর্থ বা পৃথিবীর গতি দ্বি-বিধ—আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। উপ-বৃত্তীয় কক্ষপথে ঘণ্টায় 66,000 মাইল বেগে বছরে, অর্থাৎ 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিটে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর এই উপবৃত্তীয় কক্ষ-পথ প্রায় 580 লক্ষ মাইল। পৃথিবী স্বীয় অক্ষের চারদিকে 23 ঘণ্টা 56 মিনিটে (সিডিরিয়্যাল-ডে) পূর্ণ এক পাক ঘোরে, যার ফলে দিন-রাত্রি হয়। সূর্য থেকে দূরত্ব গড়ে 9,25,00,000 মাইল। পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণনের অক্ষ বার্ষিক গতির কক্ষপথের সঙ্গে নিয়ত 23·5° ডিগ্রি কোণে সর্বদা একই দিকে হেলে থাকে, এর ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন সময়ে সূর্য থেকে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী হয় এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

আর্থ — মৃত্তিকা, মাটি। চূর্ণিত প্রস্তর, বালুকা, উদ্ভিজ্জ পদার্থাদির সংমিশ্রণে গঠিত; যাতে কৃষিকার্য হয়, উদ্ভিদাদি জন্মায়, বিভিন্ন জীবাণু বেঁচে থাকে। ক্রমাগত রোদ ও বৃষ্টিজনিত শিলাক্ষয়ে ও বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে নানা অজৈব পদার্থের বিবর্তনে মৃত্তিকার উৎপত্তি। নানারকম জৈব ও অজৈব পদার্থও সূক্ষ্ম কণিকায় এর সঙ্গে সংমিশ্রিত রয়েছে।

আর্থ-ওয়ার্ম—কেঁচো; সরু দীর্ঘাকার মৃত্তিকাভোজী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। দেশে দেশে শ্রেণী ও গোষ্ঠির বিভিন্নতা আছে—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঊর্ধে 2—3 ফুট এবং শীতপ্রধান দেশে কোথাও কোথাও 10 ফুট দীর্ঘ দেখা যায়। এদের দীর্ঘ দেহ পর-পর সংলগ্ন কতকগুলি নরম আংটির মত পদার্থে গঠিত। এজন্য এদের 'অঙ্গুরীমাল' পর্বের জীব বলা হয়। লম্বা দেহের এক প্রান্তে মুখ ও অপর প্রান্তে এদের পায়ু। মৃত্তিকাভ্যন্তরে থেকে মৃত্তিকাই খায়; আর তার মধ্যস্থ উদ্ভিজ্জ পদার্থাদি জীর্ণ করে বিশুদ্ধ ও অতিমসৃণ মৃত্তিকা নিঃসরিত করে উপরে তোলে। এভাবে নীচের মাটি উপরে তুলে হিউমাস ↑ গঠনে সাহায্য করে' এরা মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি একরে ↑ পঞ্চাশ হাজার কেঁচো থাকলে বছরে তারা 10 টন মাটি নিচে থেকে উপরে তুলে আনে। কৃষিকার্যে পরম হিতকারী।

আর্থ ওয়ার্ম

আর্থ-কোয়েক—ভূমিকম্প। ভূ-গর্ভের উত্তপ্ত ও তরল পদার্থাদির সংকোচন-আলোড়নের ফলে বা আগ্নেয়োৎপাতের দরুণ ভূপৃষ্ঠের কঠিন শিলাস্তরের প্রকম্পন ও আন্দোলন। মৃদু স্থানীয় কম্পন বা সুদূর-প্রসারী প্রবল ও ধ্বংস-

কারী প্রকম্পন পৃথিবীর নানা স্থানে ঘটে। ভূ-স্তরের অগভীর দুর্বল অঞ্চল বরাবর আঞ্চলিক ধারায়ই প্রায়শঃ ভূমিকম্প ঘটে থাকে। প্রশান্ত মহা-সাগর, দক্ষিণ এশিয়া ও ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলেই ভূমিকম্পের প্রাবল্য বেশি — এসব অঞ্চল ভূকম্পন-বলয়ের অন্তর্গত। অতি মৃদু কম্পনও সিস্মো-গ্রাফ ↑ যন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। ভূমি-কম্পের কারণ, অবস্থা ও বিবরণাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে বলে **সিস্মোলজি**।

আন্ডিন — তরল পদার্থ নির্গমণের বক্র নলমুখ-যুক্ত ছোট শিশি; যা দিয়ে সাধারণতঃ চোখে ফোঁটা কেটে ঔষধ দেওয়া হয়।

আন্ডিন

আর্থ্রাইটিস — দেহের অস্থি-সংযোগের স্ফীতি-জনিত যন্ত্রণাদায়ক বাত রোগ বিশেষ। অস্থি-সংযোগে উপাস্থির (কার্টিলেজ ↑) আবরক পর্দায় একপ্রকার জীবাণু সংক্রমণের ফলে এ-রোগের সৃষ্টি হয়। এক প্রকার 'গেঁটে বাত'।

আর্থ্রোপোডা — কঠিন ও পরস্পর সংযুক্ত খোলসে আবৃত-দেহ জীবশ্রেণী: যেমন,—কাঁকড়া, বোলতা, বিছা প্রভৃতি।

আর্মেচার — বৈদ্যুতিক মোটর, অথবা ডায়নামো ↑ যন্ত্রে ধাতব তার-জড়ানো যে যন্ত্রাংশ থাকে। একটা ধাতব দণ্ডের গায়ে বিশেষ ব্যবস্থায় সরু তারের (নির্দিষ্ট কাজের জন্য) নির্দিষ্ট সংখ্যক পাক জড়ানো থাকে। বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতিতে ওই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সাধারণতঃ সমগ্র আর্মেচার-টাই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে ঘুরতে থাকে।

আর্সেনিক — একটি মৌলিক পদার্থ, পারমাণবিক ওজন 74·91, পারমাণবিক সংখ্যা 33; সাংকেতিক চিহ্ন As; বিষাক্ত পদার্থ, — ধূসর বর্ণ, স্ফটিকাকার ও ভঙ্গুর। এক রকম সাদা আর্সেনিকও আছে, যাকে বলে 'সেঁকো'; তীব্র বিষাক্ত। গন্ধকের সঙ্গে মিশে রিয়েলগার ↑, As_2S_2, অর্পিমেণ্ট, As_2S_3, প্রভৃতি নানা খনিজ পদার্থে এবং কখন কখন বিশুদ্ধভাবেও পাওয়া যায়। ঔষধ হিসেবে ও কীটনাশক পদার্থ তৈরীর কাজে ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক সংযোগে বিভিন্ন **আর্সেনাইট** সল্ট তৈরী হয়।

আল্পাকা — দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতীয় লোমশ জন্তুবিশেষ; দেখতে অনেকটা ভেড়ার মত; কিন্তু এদের গলা লম্বা, দেহ অতি সুচিক্কণ ঘন

আলপাকা

পশমে আবৃত। এদের ওই লোমে তৈরী সূক্ষ্ম সূত্রে বোনা বস্ত্রাদিকেও 'আল্‌পাকা' বলা হয়। এ কাপড় সুদৃশ্য, মূল্যবান ও বেশ গরম।

আল্‌ট্রাভায়োলেট-রে—অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি। সূর্য-রশ্মির বর্ণালিতে দেখা যায় পর-পর সাজানো সাতটা বর্ণরেখা, যার একপ্রান্তে 'ভায়োলেট' বা বেগুনী ও অন্য প্রান্তে লাল। সাদা আলোকের সংগঠক বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই সাতটা বর্ণরশ্মির বর্ণালি আমরা দেখতে পাই (স্পেক্ট্রাম ↑)। বেগুনী-রশ্মির পরে যে অতিবেগুনী বা আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি সৃষ্টি হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এত কম (4×10^{-5} সেন্টিমিটার থেকে 5×10^{-7} সেন্টি-মিটার) যে, তা আর মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে (অ্যাক্টি-নিক-রে ↑)। সূর্যালোকের এই অদৃশ্য আলট্রাভায়োলেট রশ্মি মানুষের দেহে ভিটামিন-ডি সৃষ্টি করে, নানা রকম চর্মরোগ সারায়। এর আবার বিভিন্ন জীবাণু-নাশক শক্তিও আছে।

আল্‌ট্রা-মাইক্রোস্কোপ—এক রকম বিশেষ ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর সাহায্যে সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ↑ অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম পদার্থকণিকাও বেশ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার দেখায়। এ দিয়ে বিশেষতঃ তরল পদার্থ পরীক্ষা করা হয়। ওই তরল পদার্থের মধ্যে একটা তীব্র আলোক-রশ্মি সংহত করা হয়, যার ফলে তার মধ্যস্থ অতিক্ষুদ্র অদৃশ্য পদার্থ-কণিকাগুলো বিচ্ছুরিত আলো-কের প্রভাবে সাধারণ মাইক্রো-

আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ
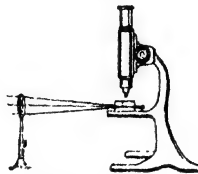
স্কোপেই স্পষ্ট দেখা যায়। সাধারণতঃ এরূপ ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই বলে আল্‌ট্রা-মাইক্রোস্কোপ। তরল পদার্থের মধ্যে আলোক বিচ্ছুরণের এই প্রভাবকে বলে টিণ্ড্যাল-এফেক্ট ↑।

আল্‌ট্রা-ম্যারাইন — এক রকম নীল বর্ণের রঞ্জক পদার্থ বিশেষ। চীনামাটি, গন্ধক, সোডিয়াম সাল্‌ফেট ইত্যাদি মিশিয়ে এ জিনিসটা প্রস্তুত করা হয়। রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচা কাপড়ের হল্‌দে ছোপ ও চিনির স্বাভাবিক রং দূর করতে এই নীল রং অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

আল্‌ট্রাসোনিক ওয়েভ — যে শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে 30,000-এরও বেশী। এরূপ স্পন্দনের শব্দ-তরঙ্গ মানুষের কানে ধরা পড়ে না, কাজেই শ্রুতিগোচর হয় না (অডি-বিলিটি লিমিট ↑)। একে **সুপার-সোনিক** ↑ ওয়েভও বলে।

ইউক্লিড — গ্রীক গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। সুনির্দিষ্ট জন্মকাল অজ্ঞাত, খৃঃ পূর্ব 300 অব্দে আলেকজেন্দ্রিয়ায় অধ্যাপনা করতেন বলে জানা যায়। জ্যামিতি বিদ্যার আবিষ্কারক না হলেও এর প্রভূত উন্নতি সাধন করে সুসংবদ্ধ আকারে 13 খণ্ডে বিভক্ত বিরাট জ্যামিতি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এজন্য জ্যামিতি বা রেখা-গণিতের প্রবর্তক বলে আখ্যাত। আলোক-বিজ্ঞানেও প্রভূত দান।

ইউগ্লেনা — প্রোটোজোয়া ↑ শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীবাণু ; এদের দৈহিক গঠন অতীব সরল। দেখতে সবুজ বর্ণের একটু পত্রাংশের মত, পাতলা এবং চেপ্টা। পশ্চাদ্ভাগ লেজের মত নেড়ে নেড়েই এরা জলে ভেসে বেড়ায়। আবদ্ধ জলে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সান্নিধ্যে জন্মায়।

ইউগ্লেনা

ইউজেনিক্স — সর্বাংশে উন্নত শ্রেণীর সন্তানোৎপাদন, অর্থাৎ কোন জীবের সুপ্রজনন সম্পর্কীয় তথ্যাদির গবেষণা-বিদ্যা। যোগ্যতাসম্পন্ন সুনির্বাচিত স্ত্রী-পুরুষের মিলনে প্রজনিত সন্তানই সাধারণতঃ সর্বগুণান্বিত হয়ে থাকে। পশুপালন-বিদ্যায় এরূপ বিচার বিশ্লেষণের, অর্থাৎ 'ইউজেনিক্স' বিদ্যার ব্যবহার ও প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে।

ইউফোরিয়া — প্রকৃত অবস্থাতিরিক্ত শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনায় ভাব বা অনুভূতি। অনেক সময় মানসিক বিকৃতির ফলে এরূপ অবাস্তব অনুভূতি অনেকের প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন কোন ঔষধের প্রভাবেও অনেক সময় এরূপ মানসিক রোগ দেখা দেয়।

ইউথেনেসিয়া — যন্ত্রণাহীন আকস্মিক মৃত্যু ; যেমন, কোন কোন কষ্টদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সকলের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে' সকল যন্ত্রণার অবসান হয় ; একেই বলে ইউথেনেসিয়া।

ইউরেকা ওয়্যার — নিকেল ↑ ও তামার এক প্রকার বিশেষ সংকর-ধাতুর (অ্যালয় ↑) সরু তারের ব্যবহারিক নাম। ইহা উৎকৃষ্ট তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইউরিয়া — সাদা স্ফটিকাকার জৈব পদার্থ, $CO(NH_2)_2$, জীবজন্তুর মূত্রে পাওয়া যায়। এর অন্য নাম **কার্বা-মাইড**। জীবের দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের প্রোটিন উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্রমে এই নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেহাভ্যন্তরস্থ অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত নাইট্রোজেন এই ইউরিয়ার আকারে বেরিয়ে যায়। পদার্থটা জলে দ্রবণীয়। জীবের মূত্রে ইউরিয়ার সঙ্গে কিছু ইউরিক অ্যাসিডও থাকে। শারীরিক নানা কারণে এই ইউরিক অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সল্ট উৎপন্ন

হয়ে হাত-পায়ের গাঁটে সঞ্চিত হওয়ার ফলে বাত রোগ জন্মে।

ইউরেনিয়াম — সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থ থেকে স্বভাবতঃই তেজ বিকিরীত হয় বলে একে 'রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ এলিমেণ্ট' বলে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াস ↑ বা কেন্দ্রীয় বস্তুকণাকে নিউট্রন ↑ কণিকার প্রতিঘাতে ভেঙে শক্তির রূপান্তরে বিশ্লিষ্ট করা সর্ব প্রথম সম্ভব হয়েছে। এরূপ কেন্দ্রীন বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিউ-ক্লিয়ার ফিসন' ↑।

ইউরেনাস — সূর্যের একটি গ্রহ ; শনি ও নেপচুন ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দুরত্ব প্রায় 178 কোটি মাইল ; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 14·6 গুণ বড়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর আমাদের হিসাবে লাগে 84 বছর, অর্থাৎ আমাদের 84 বছরে ইউরেনা-সের হয় এক বছর।

ইক্লিপ্‌স (লুনার) — চন্দ্রগ্রহণ ; বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যখন সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে একই সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্যের আলোক পৃথিবীতে আট্‌কে যায়, কাজেই পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে চন্দ্রকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। পূর্ণিমা রাতেই এরূপ অবস্থা হতে পারে এবং চন্দ্রের উপর এই ছায়া দেখা যায় ; একেই বলে চন্দ্র-গ্রহণ। ব্যাপারটা নিছক আলো-ছায়ার খেলা মাত্র।

ইক্লিপ্‌স (সোলার) — সূর্যগ্রহণ ; বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে একই সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্য-

ইক্লিপস
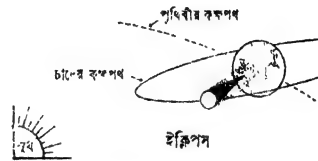
গ্রহণের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের ছায়ায় পৃথিবীর কোন স্থান থেকে সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে অদৃশ্য হয়। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সূর্য-গ্রহণ বা আলো-ছায়ার এই ব্যাপার একই সময়ে একই রকম দেখা যায় না।

ইক্লিপ্টিক — মহাশূন্যে নক্ষত্রাদির অবস্থানের আপেক্ষিকে সূর্যের যে গতিপথ আপাতদৃষ্টিতে লক্ষিত হয়। সম্বৎসরে 'সেলেশ্চিয়্যাল স্ফিয়ার'-এর ↑ গায়ে সূর্যের যে বৃত্তাকার গতিপথ রচিত হয়। (ইকুইনক্স ↑)

ইকোলজি — জন্মস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। হিমালয়ের সানুদেশে পাইন, ওক প্রভৃতি সরল বর্গীয় বৃক্ষ জন্মে কেন ? আফ্রিকার অধিবাসী কৃষ্ণকায়, আর চীনের লোক সাধারণতঃ খর্বকায় হয় কেন ? এরূপ

স্থানীয় সব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগত তথ্যাদির অনুশীলন ও পর্যালোচনা এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। **ইকো** মানে গৃহ বা বাসস্থান।

ইকোয়েটর (টেরেস্ট্রিয়াল) — ভূ-বিষুবরেখা। ভূ-পৃষ্ঠের কাল্পনিক নিরক্ষ রেখা ; পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের সমদূরবর্তী-ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে বৃত্ত-রেখার কল্পনা করা হয়েছে। একে বলে 0° অক্ষাংশ (ল্যাটিচিউড ↑) রেখা। ভৌগোলিক আলোচনার সুবিধার জন্যে এই রেখার কল্পনা করা হয়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় বিভিন্ন রকম ইকোয়েটরের কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে ; যেমন—

ইকোয়েটর (ম্যাগ্নেটিক)— পৃথিবীর প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে দুইটি বিপরীতধর্মী চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব বিভিন্ন চৌম্বকীয় পরীক্ষায় লক্ষিত হয়ে থাকে — এদের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে ওই স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তির কোন প্রভাব নেই। এই রকম পার্থিব চৌম্বক শক্তিশূন্য সব স্থানের উপর দিয়ে যে বৃত্ত রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাকে বলে **ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর**। এটা ভৌগোলিক নিরক্ষ-বৃত্ত বা 'টেরেস্ট্রিয়াল' ইকোয়েটরের প্রায় কাছাকাছি; উত্তর-দক্ষিণে কিছু সরে আছে মাত্র।

ইকোয়েটর (সেলেশ্চিয়াল)—পৃথিবী থেকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগুলোকে আকাশের এক অর্ধ-গোলাকার চাঁদোয়ার গায়ে সংলগ্ন দেখতে পাই, পৃথিবী যেন ওর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যায় একে বলে 'সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ার'। পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর বা নিরক্ষ-রেখা যে সমতলে আছে তাকে চারদিকে বাড়িয়ে দিলে যে কাল্পনিক বৃত্তরেখায় উহা সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারকে ছেদ করবে তাকে বলা হয় 'সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েটর'। (গ্রেট সার্কেল ↑)।

ইকোয়েশন (ম্যাথ্‌মেটিক্যাল) — গাণিতিক সমীকরণ; বিভিন্ন রাশি বা রাশি-সমষ্টির সমতা প্রদর্শনের সূত্র। এর মধ্যে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট মূল্যমানের রাশি থাকবে, যাতে অনির্দিষ্ট রাশির একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানে সমীকরণটি সার্থক হবে ; যেমন, $5a = 10$ একটি গণিতিক সমীকরণ; এর অনির্দিষ্ট রাশি a-এর মূল্য 2 হলেই সমীকরণটি সার্থক হয়।

ইকোয়েশন (কেমিক্যাল) — রাসায়নিক সমীকরণ ; যে-সব পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে এবং তার ফলে যে-সব পদার্থ উৎপন্ন হবে, তাদের সমতা প্রদর্শনের বর্ণনামূলক সূত্র। এর মধ্যে উৎপাদক ও উৎপাদিত পদার্থগুলোর মৌলিক উপাদানের সব অণু-পরমাণুর সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়। যেমন, $H_2 + Cl_2 =$

2HCl, একটি রাসায়নিক সমীকরণ; এতে বুঝাচ্ছে — হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে। একটি হাইড্রোজেন-অণু ও একটি ক্লোরিন-অণু মিলে দু'টি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু সৃষ্টি হয়েছে; আর সেই হাইড্রোজেন ↑ ও ক্লোরিনের ↑ প্রত্যেকটির অণুতে দু'টি করে পরমাণু রয়েছে; এবং তার এক-একটি পরমাণু মিলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক-একটি অণু গঠিত হয়েছে। এভাবে সমীকরণটির সমতা রক্ষিত হলো।

ইকুইভ্যালেণ্ট ওয়েট — রাসায়নিক মিলনে কোন মৌলিক পদার্থের ব কোন রেডিক্যালের ↑ যত গ্র্যাম কোন অ্যাসিডের (অণু থেকে) মাত্র এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন বিমুক্ত করে' তার স্থান অধিকার করতে পারে, অথবা 8 (আট) গ্র্যাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেই গ্র্যাম-সংখ্যাকে বলে ঐ মৌলিক পদার্থ বা র‍্যাডিক্যালের ই. ও.। যেমন—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে দস্তার (জিঙ্ক ↑) রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হয় এবং জিঙ্ক-ক্লোরাইড সল্ট উৎপন্ন হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, 35·5 গ্র্যাম দস্তা এই বিক্রিয়ায় (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের থেকে) মাত্র এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন অপসারিত করে এবং তার স্থান অধিকার করে ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় জিঙ্ক-ক্লোরাইড। সুতরাং 35·5 হলো দস্তার ই. ও.। আবার 35·5 গ্র্যাম দস্তা আট গ্র্যাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এভাবে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের 'ইকুইভ্যালেণ্ট ওয়েট' বা 'সমভর' পরিমাণ স্থির করা হয়। ভরের এরূপ তুলনা যে-কোন এককে চলতে পারে—গ্র্যামে হলে তাকে তখন **গ্র্যাম ইকুইভ্যালেণ্ট** বলা হয়।

ইকুইনক্স — পৃথিবীর তুলনায় সূর্য একস্থানে স্থির আছে সত্য; কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রাদির তুলনায় পৃথিবী থেকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সারা বছরে সূর্যের যে গতিপথ দেখতে পাই তাকে জ্যোতির্বিদ্যায় বলা হয় ইক্লিপ্টিক ↑। এই ইক্লিপ্টিক বা সূর্যের কক্ষপথ সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েটরকে ↑ যেখানে ছেদ করে তাকে বলে ইকুইনক্স। সূর্য যখন ইকুইনক্সে থাকে তখন পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়; এ রকম হয় বছরে দু'দিন — 21 মার্চ এবং 23 সেপ্টেম্বর। 21 মার্চ সূর্য 'ভারন্যাল ইকুইনক্সে' এবং 23 সেপ্টেম্বর 'অটাম্ন্যাল ইকুইনক্সে' থাকে।

ইকুইলিব্রিয়াম — স্থিরাবস্থা; বিপরীত শক্তির প্রভাবে পদার্থ যে স্থিরতা লাভ করে। টেবিলের উপর একখানা বই রয়েছে, এখানে বইখানা

'ইকুইলিব্রিয়াম' অবস্থায় আছে। বই-খানার নিম্নমুখী ভার-শক্তি টেবিলের ঊর্ধ্বমুখী ভার-সহন শক্তির সমান, বা কম; তাই ওখানা স্থিরাবস্থায় রয়েছে।

ইগ্‌নিস-ফেটুয়াস — আলেয়া; ইংরেজীতে একে বলে 'উইলও-দি-উইস্প'। পতিত বা পরিত্যক্ত ভূমিতে মাঝে মাঝে যে অস্থায়ী অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতে দেখা যায়। বিভিন্ন জৈব পদার্থ পচে ভূগর্ভ থেকে ফস্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন ↑ অথবা অন্য কোন দাহ্য গ্যাস বেরিয়ে বায়ুর সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে; ফলে এরূপ অস্থায়ী অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইগ্নিসন-পয়েণ্ট — জ্বলনাংক; কোন পদার্থ যে উত্তাপে জ্বলে ওঠে। যে তাপমাত্রায় পৌছুলে কোন পদার্থ জ্বলতে সুরু করে, তাই হলো ওই পদার্থের ইগ্নিসন-পয়েণ্ট। এই তাপমাত্রা বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

ইটিয়োলজি — কোন রোগোৎপত্তির মূল কারণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বীয় বিজ্ঞান। কোন রোগের 'ইটিয়োলজি' বললে কি কি কারণে সেই রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছে তার তথ্যাদি বুঝায়।
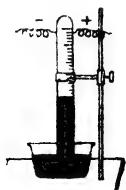
ইডিয়োমিটার

ইডিয়োমিটার — রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন সব গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন (সংকোচন বা প্রসারণ) যে যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা যায়।

ইথার — বর্ণহীন ও দাহ্য একটি তরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $(C_2H_5)_2O$; বিশেষ এক রকম মিষ্ট গন্ধযুক্ত। জীবদেহের উপর এর অ্যানেস্থেটিক ↑ ক্ষমতা আছে। ইথাইল অ্যাল্‌কোহলকে ↑ তেজী সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে নির্জলিকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইথার তৈরী করা হয়। রাসায়নিক গঠনের হিসাবে একে তাই সাল্‌ফিউরিক 'ইথার' বা **ডাই-ইথাইল ইথার**ও বলা হয়।

ইথার—বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একটা কাল্পনিক পদার্থ; যার মাধ্যমে আলোক, বেতার প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় বলে এক সময় মনে করা হোত।

ইথাইল অ্যাল্‌কোহল — সুরাসার; সাধারণ অ্যাল্‌কোহল। বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, তীব্র কটু স্বাদযুক্ত। শর্করা জাতীয় পদার্থকে এক রকম জীবাণুর প্রভাবে বিশেষ ধরণের গাঁজন-ক্রিয়ার (ফার্মেণ্টেসন ↑) সাহায্যে প্রস্তুত হয়। ঔষধ হিসেবে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। (অ্যাল্‌কোহল ↑)

ইথেন — এক রকম বর্ণহীন, গন্ধহীন দাহ্য গ্যাস; প্যারাফিন ↑ জাতীয় বিশেষ একটা হাইড্রোকার্বন। রাসায়নিক সূত্র C_2H_6।

ইথিলিন — বর্ণহীন, মিষ্ট গন্ধযুক্ত, দাহ্য, গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ। প্যারাফিন শ্রেণীর গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন। রাসায়নিক সূত্র C_2H_4।

ইন্‌কিউবেসন পিরিয়ড — দেহে কোন জীবাণু সংক্রমণের সময় থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময় পর্যন্ত কাল-ব্যবধান। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে একই জীবাণুর শক্তি বিস্তারের এই কাল বিভিন্ন হতে পারে — এটা নির্ভর করে মানুষের রক্তের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতার উপরে।

ইন্ ভিট্রো — গবেষণাগারের সীমিত পরীক্ষা; যা কাচের আধারে (টেস্ট টিউব) পরিচালিত হয়। **ভিট্রো** মানে 'কাচ'। কোন রাসায়নিক পদার্থের জীবাণুনাশক বা অপর কোন শক্তি নির্ধারণের জন্য প্রথমতঃ গবেষণাগারে কাচের পাত্রে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

ইন্ ভিভো — 'ইন্‌ভিট্রো' পরীক্ষালব্ধ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব মানুষ বা জীবজন্তুর দেহে-সংক্রামিত জীবাণুদের উপরে যাচাই করবার জন্যে যে বাস্তব ও ব্যবহারিক পরীক্ষা করা হয়।

ইন্‌ভার্স রেসিও — বিপরীত বা ব্যস্ত অনুপাত। কোন রাশি 'ক' যে অনুপাতে বাড়ে তদনুপাতে অপর কোন রাশি 'খ' যদি কমে, তাহলে ঐ রাশিদ্বয়কে পরস্পর পরস্পরের 'বিপরীত অনুপাতিক' (ইন ইন্‌ভার্স-রেসিও) বলা হয়।

ইন্‌ভার্টিব্রেট — অমেরুদণ্ডী জীব। যে সকল জীবের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী; যেমন, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, কেঁচো, শামুক প্রভৃতি। এদের সমষ্টিগতভাবে **ইন্‌ভার্টিব্রাটা** বলা হয়।

ইন্‌ভোলিউট — কোন চক্রের গায়ে দড়ি জড়াতে গেলে ঐ দড়ির প্রত্যেকটি বিন্দুর চক্রাকার গতিপথকে ঐ মূল চক্রের 'ইনভোলিউট' বলা হয়। প্রদত্ত চিত্রে 'ক-খ' দড়ি চক্রের ('বৃত্ত-1') গায়ে জড়ানো হচ্ছে. দড়ির 'ব' বিন্দু সঞ্চারিত হয়ে $ব_1$ অবস্থানে আসতে আর একটি বৃত্ত (বৃত্ত-2) সৃষ্টি হবে, যার বৃত্তাংশ ব-$ব_1$ দ্বারা সূচিত হবে।

ইন্‌ভোলিউট

এখন বৃত্ত-2 হলো 'বৃত্ত-1' এর **ইন্‌ভোলিউট**। আবার 'বৃত্ত-1'-কে বলে 'বৃত্ত-2'এর **ইভোলিউট**। যন্ত্র-বিদ্যায় এরূপ বিভিন্ন জটিল গাণিতিক আলোচনার প্রয়োজন হয়।

ইণ্টেন্সিটি—কোন শক্তির প্রাবল্য বা আতিশয্যের সূচক-পরিমাণ। শব্দের (সাউণ্ড ↑) ইণ্টেন্সিটি হলো ধ্বনির উচ্চতা; আলোকের ইণ্টেন্সিটি বললে তার ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ (ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার ↑) বুঝায়। তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তির ইণ্টেন্সিটি বললে তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির তীব্রতা বুঝায়।

বিভিন্ন শক্তির ইণ্টেন্সিটি বিভিন্ন নির্দিষ্ট এককে প্রকাশ করা হয়।

ইন্‌কুবেটর — বাক্সের মত একটা যন্ত্র, যার অভ্যন্তরভাগে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট তাপের সমতা রক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তাপের এই সমতা রক্ষার যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলে থার্মোষ্টাট্ ↑ —এতে এমন যন্ত্র-কৌশল থাকে যাতে প্রয়োজনীয় তাপ-মাত্রায় পৌছুলেই তাপ পরিবহনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তাপমাত্রা আর বাড়তে পারে না। এ-রকম যন্ত্রে সাধারণতঃ হাঁস, মুরগী প্রভৃতির ডিম ফোটানো হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় অপুষ্ট শিশুদেরও এর মধ্যে উপযুক্ত তাপে রেখে সজীব ও পরিপুষ্ট করে তোলা যায়। জীব-বিদ্যার পরীক্ষাদির জন্যে জীবাণুদের এর মধ্যে রেখে অনেক সময় বাঁচিয়ে ও বাড়িয়ে তোলা হয়ে থাকে।

ইন্‌ক্যাণ্ডেসেন্স—ভাস্বরতা, প্রদীপ্তি; অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় কোন কোন বস্তুর যে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত অবস্থা দৃষ্ট হয়; যেমন, বিজলী-বাতির তার।

ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট ল্যাম্প — কোন পদার্থ না জ্বালিয়ে কেবল অত্যধিক উত্তপ্ত করে যে বাতিতে ভাস্বরতা বা আলোক সৃষ্টি করা হয়। ইলেক্ট্রিক বাল্‌বের সরু তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ওটা জ্বলে না, কেবল প্রদীপ্ত হয়েই আলো ছড়ায়। গ্যাসের আলোতে প্রধানতঃ থোরিয়াম ↑ ও সিরিয়াম ↑ ধাতুর বিশেষ কোন সণ্ট-মাখানো ম্যাণ্টেল ↑ প্রদীপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে।

ইণ্টার-সেলুলার— উদ্ভিদ বা জীব-দেহের সংগঠক পাশাপাশি বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী ব্যবধান।

ইণ্টারনোড — উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখার যে সব স্থানে পাতা গজায় তাকে বলে **নোড**; আর দু'টা নোডের মধ্যবর্তী অংশকে বলে ইণ্টারনোড।

ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্-লাইন—যদি কোন লোক পূর্ব দিকে চলতে থাকে, তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির (পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে) জন্যে সে ক্রমে আগে সূর্যোদয় দেখবে, ঘড়ির সময় তার এগিয়ে যাবে। আবার পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে তার সময় পিছিয়ে যাবে। এজন্যে সময় বা তারিখের একটা স্থিরতা রক্ষার জন্যে গ্রিন্‌উইচ (0° দ্রাঘিমা) থেকে 180° দূরে, অর্থাৎ 180° দ্রাঘিমা-রেখায় উপস্থিত হলে পূর্বদিকে অগ্রসর-যাত্রীর সময় পূর্ণ 24 ঘণ্টা অগ্রবর্তী হয়। কাজেই সে একদিন বাদ দেয়, অর্থাৎ দু'দিনের একই তারিখ ধরা হয়। আর পশ্চিম দিকের যাত্রীর একদিন কমে যায় বলে সে তার তারিখের সঙ্গে এক দিন যোগ করে নেয়, অর্থাৎ পরের দিনের তারিখ

ধরে নেয়। এভাবে আন্তর্জাতিক হিসেবে তারিখ নির্ধারণের জন্যে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ওই 180° দ্রাঘিমা-রেখাকে এজন্যে আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা বা 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্ লাইন' বলা হয়।

ইণ্টারন্যাল-কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন — যে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে উপযুক্ত জ্বালানি কিছু জ্বেলে তার আবদ্ধ তাপশক্তিকে যান্ত্রিক কৌশলে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এর জ্বালানি সাধারণতঃ পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি হয়ে থাকে। পিষ্টন-লাগানো একটা আবদ্ধ সিলিণ্ডারের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জ্বলন-ক্রিয়া চলতে থাকে, গ্যাস সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাসের চাপে পিষ্টনটা দ্রুত চলাচল করে, আর ইঞ্জিন চলতে থাকে। মোটর গাড়ীতে পেট্রল↑ পুড়িয়ে এ-রকম ইঞ্জিন চালানো হয়।

ইণ্টিজার — পূর্ণ সংখ্যা বা রাশি; যেমন, 1, 5, 10, 300 ইত্যাদি; কিন্তু ½, 3¼, 2·5 ইত্যাদি নহে।

ইণ্টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কুলাস — গণিত বিজ্ঞানের একটি শাখা বিশেষ; বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশের সমষ্টি নির্ধারণের গাণিতিক প্রণালী। কোন প্রকার পরিবর্তনের (হ্রাস, বৃদ্ধি, গতি প্রভৃতির) হার এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঐ পরিবর্তনের নির্দিষ্ট পরিমাণ জানলে অপর যে কোন সময়ে তার সম্ভাব্য পরিমাণ এই প্রণালীর সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। কোন দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং কোন এক সময়ে মোট লোকসংখ্যা কত, তা জানলে দশ বছর পরে লোকসংখ্যা কত হবে, এরূপ সব তথ্য এই গাণিতিক প্রণালীতে সহজে নির্ণয় করা যেতে পারে। এরূপ গাণিতিক সমাধানে প্রতি ঘণ্টা বা প্রতি দিনের বৃদ্ধির সমষ্টি সূত্রানুসারে নির্ধারিত হয়।

ইণ্ডাক্সন—কোন পদার্থকে তড়িতাবিষ্ট করবার একটা বিশেষ কৌশল। পদার্থটা তড়িৎ-পরিবাহী হলে নিকটস্থ কোন তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে ওর মধ্যেও তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এরূপ তড়িৎ-সংক্রমণকে বলে ইণ্ডাক্সন।

ইণ্ডাক্সন কয়েল — নিম্ন-চাপের তড়িৎ-শক্তি থেকে উচ্চতর চাপের তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের একটা যন্ত্রিক কৌশল। নরম লোহার রডের গায়ে ধাতব তার জড়িয়ে, একটার উপর আর একটা এরূপভাবে, দু'টা কয়েল সামান্য ব্যবধানে স্থাপন করা হয়—

ইণ্ডাক্সন কয়েল

নীচেরটাকে বলে প্রাইমারি কয়েল, আর উপরেরটা হলো সেকেণ্ডারি কয়েল। প্রাইমারি কয়েলে অল্প কয়েকটি মাত্র পাক থাকে, আর সেকেণ্ডারি কয়েলে থাকে অপেক্ষাকৃত সরু তারের অনেকগুলো পাক। যান্ত্রিক কৌশলে প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে (ইলেক্‌ট্রিক

বেলের ↑ মত) এমনভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো হয়, যাতে সেই প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতকে অতি দ্রুত গতিতে একবার চালিয়ে, আবার বন্ধ করে, ক্রমাগত দ্রুত গতিশীল পরবর্তী তড়িৎ-স্রোত (অল্টার্নেটিং কারেণ্ট ↑) উৎপাদন করা হয়। এর ফলে ইণ্ডাক্‌সনের ↑ প্রভাবে সেকেণ্ডারি কয়েলের মধ্যেও উচ্চ চাপের তড়িৎ শক্তির উন্মেষ ঘটে।

ইণ্ডিগো —নীলবর্ণের জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; একটি গ্ল‌ুকোসাইড ↑ জাতীয় যৌগিক। সাধারণভাবে পদার্থটা 'ইণ্ডিক্যান' বলে পরিচিত। 'ইণ্ডিগোফেরা' নামে এক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এই ইণ্ডিগো বা নীলের জন্যে ওই উদ্ভিদের চাষ এখন আর হয় না ; কারণ, কৃত্রিম উপায়েই নীল তৈরীর সহজসাধ্য কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইণ্ডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; অত্যন্ত নরম ধাতু। সীসার চেয়েও নরম বলে মসৃণ চলাচলের জন্যে অনেক সময় যন্ত্রাদির বেয়ারিং-এর ↑ উপরে এর একটা পাত্‌লা আবরণ দেওয়া হয়।

ইন্‌ফিনিটি—অসীম বা অনন্ত রাশি বা সংখ্যা ; যে রাশি ধারণাযোগ্য যে-কোন বৃহত্তম রাশির চেয়েও বড়। এইরূপ রাশির কল্পনা করা যায় মাত্র ; '∞' এই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে গণিতে একে প্রকাশ করা হয়।

ইন্‌ফিনিটিসিম্যাল — ধারণাতীত ক্ষুদ্রতম রাশি ; কোন রাশি যদি ক্রমাগত ক্ষুদ্র হতে হতে যায়, অথচ কখন শূন্যও না হয়, তবে সেই অন্তিম ক্ষুদ্রতম রাশিকে 'ইন্‌ফিনিটিসিম্যাল' বলে বোঝানো হয়।

ইন্‌ফ্রা রেড-রে — অদৃশ্য অব-লোহিত রশ্মি। সূর্য-রশ্মির বর্ণালীর এক প্রান্তে যে লাল রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয় তার চেয়েও বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি আমরা আর চোখে দেখতে পাই না। লাল রশ্মির পরবর্তী এই অদৃশ্য রশ্মি হলো ইন্‌ফ্রা-রেড বা অবলোহিত রশ্মি। এটা আর আলোক বা বর্ণধর্মী নয়,—তাপধর্মী ; বিকিরিত তাপরশ্মি। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকরশ্মির চেয়ে বেশী, কিন্তু বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম।

ইন্‌ফ্রা সাউণ্ড — মোটামুটি 30-এর কম স্পন্দন-সংখ্যার শব্দ-তরঙ্গ। কখন কখন বহু দূরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে আগত এরূপ মৃদু স্পন্দনের শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর না হলেও 'ফিজ্যাণ্ট' প্রভৃতি কোন কোন পাখী এই শব্দ অনুভব করতে পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ইন্‌ভার — একটা সংকর ধাতু ; 63·8% লোহ, 36% নিকেল ও ·2% কার্বন মিশিয়ে তৈরী। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে এর আয়তনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এজন্যে দামী ঘড়ির ব্যালান্স-হুইল ও অন্যান্য সূক্ষ্ম

যন্ত্রাংশ নির্মাণে এই সংকর-ধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইন্‌ভার্ট সুগার — সমপরিমাণ গ্ল্‌কোজ ↑ ও ল্যাভুলোজ ↑ শর্করার সংমিশ্রণ; যা ইক্ষু চিনির (কেন্‌ সুগার) রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন হয়। ইক্ষুচিনির রাসায়নিক নাম হলো সুক্রোজ। এর জলীয় দ্রবকে এক রকম এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে, অথবা কোন মৃদু অ্যাসিড দিয়ে ফুটালে ওই সুক্রোজের গ্ল্‌কোজ ও ল্যাভুলোজ ↑ নামক দু'টি আইসোমার ↑ সমপরিমাণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলে 'ইন্‌ভার্সন অব কেন্‌-সুগার'।

ইন্‌ভার্টেজ—এক রকম বিশেষ জৈব পদার্থ বা এন্‌জাইম ↑; যা সাধারণতঃ ঈষ্টের ↑ মধ্যে জন্মায়। এই এন্‌জাইম ইক্ষুচিনির রূপান্তর ঘটিয়ে গ্ল্‌কোজ ও ল্যাভুলোজ ↑ নামক শর্করা বিশেষ উৎপন্ন করে। (ইন্‌ভার্ট সুগার ↑)

ইন্‌সুলেসন — তড়িৎ বা তাপশক্তির পরিবহন বন্ধ করবার ব্যবস্থা। কোন তড়িতাবিষ্ট বস্তু থেকে তড়িৎ, বা উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপের বিকিরণ রোধ করবার কৌশল। তড়িৎ বা তাপের পরিচলন রোধ করবার ক্ষমতা যে সব পদার্থের আছে তাদের বলা হয় ইন্‌সুলেটর ↑।

ইন্‌সুলিন — জীবদেহের প্যান্‌ক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ডে ↑ উৎপন্ন একটি হর্মোন ↑। এর অভাবে ডায়বিটিস, বা বহুমূত্র-রোগ জন্মে। কোন সুস্থ জীবদেহ থেকে ইন্‌সুলিন নিয়ে ডায়বিটিস রোগীকে ইঞ্জেকসন করে দেওয়া হয়; এতে রক্তের শর্করার ভাগ কমে যায়, রোগের উপশম ঘটে। জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইন্‌সুলিন ভুক্ত খাদ্যাদির শর্করা-উপাদানের সমতা রক্ষা করে।

ইন্‌সুলেটর — প্রতিরোধক বা প্রতিবন্ধক পদার্থ; 'ইন্‌সুলেট' মানে বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করা। যে সব পদার্থের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবাহিত হয় না, তাদের বলা হয় (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) ইন্‌সুলেটর; যেমন — রাবার ↑, পোর্সিলেন ↑ প্রভৃতি। ভাল তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের গায়ে এ-জন্য রাবারের আস্তরণ দিয়ে তড়িতের অযথা নির্গমন বা অপচয় রোধ করা হয়; আর টেলিগ্রাফের ↑ খুঁটির মাথায় পোর্সিলেনের নির্মিত এক রকম বাটির গায়ে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক তার টানা হয়। আবার, তাপের বিকিরণ রোধ করবার জন্যে উত্তপ্ত পদার্থের গায়ে অ্যাস্‌বেস্টস ↑, ফেল্ট ↑ প্রভৃতির আবরণ দেওয়া হয়, যে-হেতু তাপশক্তির পক্ষে এ-সব ইন্‌সুলেটর বা তাপ-প্রতিরোধক পদার্থ।

ইনার্ট —যে পদার্থের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নেই; কোন পদার্থের সঙ্গেই যার রাসায়নিক মিলন ঘটে না। হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটন, আর্গন ↑ প্রভৃতি গ্যাসকে 'ইনার্ট গ্যাস' বলে।

ইনার্সিয়া — জড় বস্তুর স্থিরাবস্থা; বাইরের কোন শক্তি প্রয়োগ না করলে জড় বস্তু, স্থির থাকলে বরাবর স্থিরই থাকবে; আর চলতে থাকলে বরাবর একই দিকে একই গতিতে চলতে থাকবে। জড় বস্তুর এই ধর্মকে বলে ইনার্সিয়া বা জাড্য। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত জড়ের গতি বা স্থিতির কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ইনোকুলেসন — রোগ-বীজাণুর টিকা; কোন রোগের জীবাণু সুস্থ জীবদেহে সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে সেই রোগের প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা। বিজ্ঞানী পাস্তুর ↑ এর আবিষ্কারক। বাইরে থেকে কোন রোগ-জীবাণু নিয়ে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে ওই রোগের একটা মৃদু আক্রমণ ঘটে; এর ফলে ওই রোগের তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করবার একটা শক্তি স্বভাবতঃই জীবদেহে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্বে সজীব জীবাণু নিয়ে এরূপ টিকা দেওয়া হোত, এখন মৃত জীবাণু, অথবা তাদের দেহ-নিঃসৃত রস, (টক্সিন ↑, অ্যান্টিটক্সিন) প্রভৃতির টিকা দিয়েও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে।

ইপ্‌সম সল্ট — ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্‌ফেট; সাধারণতঃ বলে **ম্যাগ-সাল্‌ফ**, $MgSO_4 . 7H_2O$। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, বিরেচক ও ক্ষারধর্মী। জোলাপ-জাতীয় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইপিকাক্‌ — ব্রেজিল দেশের এক রকম উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌কালয়েড ↑ পদার্থ; এর মধ্যে 'অ্যামিটিন' নামক ভেষজ পদার্থ রয়েছে। ঔষধটির প্রয়োগে রোগীর ঘাম হয়, বমির উদ্রেক করে। উপযুক্ত মাত্রায় আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ; শুষ্ক কাসির শ্লেষ্মা তরল করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

ইভাপোরেসন — বাষ্পীভবন; উত্তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া। কর্পূর, পেট্রল প্রভৃতি অনেক পদার্থ স্বাভাবিক তাপেই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়, এদের বলা হয় **ভোলাটাইল** বা উদ্বায়ী পদার্থ। উন্মুক্ত পাত্রে জল রাখলেও এই প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। তাপ বৃদ্ধি করলে এই বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়ে থাকে।

ইভোলিউসন — ক্রম-বিবর্তন; ক্ষুদ্র এককোষী জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) থেকে বহুকোষী জটিল অবয়ব-বিশিষ্ট জীবের ক্রমবিকাশ। কোটি কোটি বছরে এই 'ইভোলিউসন' বা ক্রম-বিবর্তনের ফলে প্রারম্ভিক সরল জীবদেহ থেকে বর্তমান জটিল গঠনের সুসম্পূর্ণ জীব-জন্তু ও মানব দেহের উৎপত্তি হয়েছে।

ইমাল্‌সন — মিশ্র তরল পদার্থ; যার মধ্যে অপর কোন তরল বা কঠিন পদার্থ এমনভাবে অতি সূক্ষ্ম কণিকায়

প্রায় একীভূত হয়ে মিশে থাকে যে, তারা স্বভাবতঃ আর পৃথক হ'তে পারে না। জলে আর তেলে বিশেষ-ভাবে ফেটালে এরূপ ইমাল্‌সন হয়, তেলের সূক্ষ্ম কণিকাগুলো জলের কণিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়। এভাবে জলের সঙ্গে প্রোটিন ↑ ও ল্যাক্টোজ ↑ সম্বলিত স্নেহ-পদার্থের স্বাভাবিক ইমাল্‌সন হলো দুধ।

ইমিউনিটি — জীবদেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা। এরূপ ক্ষমতা স্বাভাবিক বা জন্মগতও হতে পারে; আবার ভ্যাক্‌সিন ↑ ইত্যাদি প্রয়োগেও জন্মানো যায়। এই রোগ-প্রতিরোধ শক্তির তারতম্যের জন্যেই একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় থেকেও কেউ রোগাক্রান্ত হয়, কেউ বা সুস্থ থাকে।

ইম্মিসিব্‌ল — পরস্পর একীভূত হয়ে মিশে যায় না এমন; তরল পদার্থের বেলায়ই কথাটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, — যেমন, জল আর তেল পরস্পর ইম্মিসিব্‌ল।

ইমেজ — প্রতিচ্ছায়া; কোন বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত বা লেন্সে ↑ প্রতিসরিত হলে তার যে প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্ব সোজাসুজি দর্শকের চোখে পড়তে পারে, আবার কোন পর্দার উপরেও ফেলা যায়। একে বলে 'রিয়েল ইমেজ' বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব আবার ভার্চুয়াল ↑ বা অপ্রকৃতও হতে পারে। সাধারণ আয়নায় আমরা 'ভার্চুয়াল ইমেজ' দেখি। এখানে আলোকরশ্মির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয় না; কাজেই তাতে দৃষ্ট প্রতিচ্ছায়া পর্দার উপর ফেলা যায় না।

ইল্যাস্টিসিটি — স্থিতিস্থাপকতা; পদার্থের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্যে চাপ দিলে তার আকার-আয়তন বদলে যায়, চাপ ছেড়ে দিলে আবার পূর্ব আকার-আয়তনে ফিরে আসে। এরূপ পদার্থকে বলে **ইল্যাস্টিক** পদার্থ; রাবার এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ পদার্থেরই কিছু না কিছু ইল্যাস্টিসিটি আছে; সামান্য বলে হয়তো চোখে ধরা পড়ে না।

ইলিপ্‌স—জ্যামিতিক উপবৃত্ত; কোন আয়তনিক কোণকে (চিত্রানুযায়ী) বাঁকাভাবে কেটে দিলে যে প্রলম্বিত বৃত্ত-রেখা সৃষ্টি হয়। এরূপ উপবৃত্তের অভ্যন্তরে এমন দু'টি বিন্দু থাকে পরিধির যে-কোন বিন্দু থেকে যাদের

ইলিপ্‌স

দূরত্বের সমষ্টি সর্বদা স্থির (একই) থাকে। চিত্রে $P_1F_1+P_1F_2=P_2F_1+P_2F_2=$ স্থির রাশি। ঐ বিন্দুদ্বয়কে বলে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্র বা **ফোকাস**। সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি এরূপ উপবৃত্তীয়

পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য থাকে তার যে-কোন একটি ফোকাসে।

ইলিপ্সয়েড — কোন উপবৃত্তকে (ইলিপ্স ↑) তার অক্ষের চারদিকে ঘোরালে যে আয়তনিক ক্ষেত্র রচিত হয়। চিত্রের উপবৃত্তটির অক্ষ অ-অ, যার চারদিক ঘুরানো হ'চ্ছে।

ইলিপ্সয়েড

ইলেক্ট্রন — পদার্থের পরমাণুর সংগঠক ঋণ-তড়িৎ কণিকা। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউ-ক্লিয়াসের চারদিকে এরূপ ঋণতড়িৎ কণিকা পরিভ্রমণ করে (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)। হাইড্রোজেন-পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটি মাত্র ইলেক্ট্রন ঘুরছে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এরূপ ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ—সাধারণ মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি লেন্সের মাধ্যমে এসে আমাদের চোখে পড়ে; বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে বর্ধিতাকারে দৃশ্য বস্তুর সেই প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দ্রষ্টব্য বস্তুটা যদি আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়, তবে আর তা থেকে আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হতে পারে না; ফলে সেরূপ ক্ষুদ্র বস্তু সাধারণ মাইক্রোস্কোপে অদৃশ্য থেকে যায়। এখন, ক্যাথোড-রে-টিউবের ↑ ক্যাথোড প্রান্ত থেকে ইলেক্ট্রনের যে ধারা-প্রবাহ বেরোয় তার প্রকৃতি আলোক-রশ্মিরই অনুরূপ বটে; কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। কাজেই ইলেক্ট্রনের এই ধারা-রশ্মিতে অতি ক্ষুদ্র (যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ↑ অদৃশ্য) কণিকাও প্রতিফলিত হতে পারে। অতি জটিল যান্ত্রিক কৌশলে এরূপ প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রে। দ্রষ্টব্য বস্তুর উপরে ইলেক্ট্রনের সমান্তরাল ধারারশ্মি নিক্ষিপ্ত হয়, আর যন্ত্রের এক বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণে প্রতিফলিত-রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে বস্তুটার বর্ধিতাকার প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিচ্ছায়া এক রকম প্রতিপ্রভ (ফ্লোরেসেণ্ট ↑) পর্দার উপরে ফেলা হয় এবং ক্যামেরায় তার আলোক-চিত্রও তোলা যায়।

ইলেক্ট্রন লেন্স— ইলেক্ট্রন ↑ কণিকার ধারারশ্মি যে বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রের (ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড ↑) প্রভাবে এক বিন্দুতে এনে সংহত (ফোকাস ↑) করা যায়, যেমন কাচের লেন্সে ↑ প্রতি-সরিত আলোক-রশ্মি একস্থানে সংহত হয়। ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপে ↑ এরূপ চৌম্বকক্ষেত্রকে সাধারণ লেন্সের মত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রনিক্স — ইলেক্‌ট্রনের ধর্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যে শাখায় রেডিও-ভাল্‌ব ↑, ক্যাথোড-রে-টিউব ↑ প্রভৃতি যন্ত্রাদি (যার মধ্যে মুক্ত ইলেক্‌ট্রন-কণিকা সব চলাচল করে) বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি আলোচিত হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি — তড়িৎ বা বিদ্যুৎ শক্তি। পদার্থের পারমাণবিক গঠনে যে ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকা রয়েছে বিভিন্ন উপায়ে তাদের উত্তেজিত করলে যে শক্তির উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বছর পূর্বে **অ্যাম্বার** নামক পদার্থে এই শক্তির প্রথম পরিচয় পান থেল্‌স নামে এক বিজ্ঞানী। কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে প্রবাহিত করা যায়; একে আবার তাপশক্তি, আলোকশক্তি. বা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করাও যেতে পারে। এই তড়িৎ-শক্তিকে বিশেষ ব্যবস্থায় কোন পদার্থের মধ্যে স্থির-ভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, তখন একে বলে **স্ট্যাটিক** ইলেক্‌ট্রিসিটি বা স্থির-তড়িৎ। যখন একে কোন বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থের তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাকে বলে **কাইনেটিক** ইলেক্‌ট্রিসিটি, অর্থাৎ চল-বিদ্যুৎ। সাধারণতঃ ধাতব পদার্থ-মাত্রই উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী (কণ্ডাক্টর) হয়।

ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট—তড়িৎ-শক্তির ধারা-প্রবাহ; কোন তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের ভিতর দিয়ে ধারাকারে ইলেক্‌ট্রন-কণিকার গতিস্রোত। তড়িৎ-শক্তির উচ্চ চাপের ফলে ইলেক্‌ট্রন ↑ বা ঋণতড়িৎ-কণিকাগুলো প্রকৃতপক্ষে ধন-তড়িৎ ধারার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহের এই গতিপথ তারের মাধ্যমে সর্বদা অবিচ্ছিন্ন (সম্পূর্ণ চক্রাকারে) রাখতে হয়; একেই বলে **ইলেক্‌ট্রিক সার্কিট**। ওই তার কোথাও বিচ্ছিন্ন হলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট দু'-রকম—এ. সি(অল্টারনেটিং কারেণ্ট ↑) এবং ডি. সি. (ডাইরেক্ট কারেণ্ট)। এ-সি. প্রবাহে তড়িৎ-শক্তির চাপ ক্রমাগত বাড়ানো কমানো হয়; এক দিকে হঠাৎ চাপ বেড়ে যায়, মুহূর্ত্তে কমে গিয়ে বিপরীত দিকে বেড়ে যায়। প্রবাহের এই গতি পরিবর্তন সেকেণ্ডে 50 বার, বা তারও বেশী হয়ে থাকে। এজন্যে একে বাংলায় 'পরিবর্তী-প্রবাহ' বলা হয়। ডি. সি. প্রবাহে তড়িৎ-শক্তি ক্রমাগত একই দিকে সমানভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, গতি-পথের পরিবর্তন হয় না। তাই একে বলা হয় ডাইরেক্ট বা একমুখী প্রবাহ।

ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর—যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদিত হয়। এই যন্ত্র বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন শক্তির হতে পারে। তড়িৎ-শক্তি

উৎপাদন করবার যান্ত্রিক কেন্দ্রকে বলে **পাওয়ার ষ্টেশন** ; এ সব কেন্দ্র সাধারণতঃ দু-রকম হয়ে থাকে ; — **থার্মাল** ↑ ও **হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক** পাওয়ার ষ্টেশন। তেল, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানির সাহায্যে উত্তাপ সৃষ্টি করে যে-সব জেনারেটর যন্ত্র চলানো হয় তাদের বলে থার্মাল, বা তাপীয় ; আর জলস্রোতের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে যে জেনারেটর চালানো হয়, তাকে বলে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক ↑ জেনারেটর, অর্থাৎ জলশক্তিতে চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র। বিরাট শক্তিশালী এরূপ বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে বিদ্যুৎশক্তি তারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্যে দূর দূরান্তরে সরবরাহ করা হয়।

ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প—তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে আলোক উৎপাদনের বাতি। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বিশেষ ধরনের (সাধারণতঃ টাংষ্টেন ↑ ধাতুর) সরু তার উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। ওই তার বা ফিলামেণ্ট ↑ থাকে বায়ুশূন্য বা নিষ্ক্রিয় কোন গ্যাসে পূর্ণ কাচ-গোলকের মধ্যে, যাকে বলে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব। এই হলো সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প। ইদানিং নিয়ন ↑ গ্যাস-ল্যাম্পের প্রচলন হয়েছে। **নিয়ন-ল্যাম্প** কাঁচের বাল্‌ব বা টিউবের মধ্যে নিয়ন গ্যাস ভর্তি করে তার মধ্যে দু'টা ধাতব চাক্‌তি বা জড়ানো তার জুড়ে দেওয়া হয়। ওই দু'টা চাক্‌তি বা তারের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে সুদৃশ্য লাল রংএর আলোক বিকিরিত হয়। বাল্‌বের মধ্যে বিভিন্ন ফ্লোরেসেণ্ট ↑ পদার্থ দিয়ে এভাবে বিভিন্ন বর্ণের সুদৃশ্য আলোক সৃষ্টি করা যায়।

ইলেক্‌ট্রিক বেল — বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। বেল, ইলেক্‌ট্রিক ↑ ।

ইলেক্‌ট্রাম — স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিজ ধাতু-সংকরের বিশেষ নাম। এরূপ রৌপ্যমিশ্রিত খনিজ স্বর্ণ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কখন কখন অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রো-এন্সেফালোগ্রাম— ইলেক্‌ট্রো-এন্সেফালোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কিত মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র-গুলোর বিশেষ বৈদ্যুতিক স্পন্দনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশক রেখা-চিত্র। মস্তিষ্কের কোষগুলোর অতি মৃদু স্পন্দন বহু সহস্র গুণ বর্ধিত হয়ে তরঙ্গের আকারে কাগজে রেখাপাত করে। এই রেখা দেখে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুর কার্যকারিতা বুঝা যায়। যেমন, একজন সুস্থ লোকের মস্তিষ্ক থেকে সেকেণ্ডে 8 থেকে 13-টি তরঙ্গরেখা পাওয়া যায় ; কিন্তু মৃগী রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির বেলায় এই তরঙ্গরেখা সেকেণ্ডে মাত্র 6 বা 7-টার বেশী হয়

না। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির এরূপ তরঙ্গের আকৃতি ও প্রকৃতিরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রো কম্‌প্লেক্স — মনোবিকার বিশেষ; যার ফলে কোন কোন বালিকা পিতার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়; পরন্তু মাতার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। এ যেন কতকটা বিপরীত-ধর্মী বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মত।

ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাম— বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এক রকম যান্ত্রিক কৌশলে অঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের রেখা-চিত্র। এর যন্ত্রটাকে বলে ইলেক্ট্রো-**কার্ডিওগ্রাফ**। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত হলে এই যন্ত্রের সাহায্যে তার অবস্থা পরীক্ষা করা হয়; রেখাচিত্রের ধরন দেখে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই ধরা যায়।

কার্ডিয়োগ্রাম

ইলেক্‌ট্রো-কেমিস্ট্রি — ইলেক্ট্রো-লিসিস ↑ সম্পর্কীয় রসায়ন শাস্ত্র; তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের সংগঠনিক যে-সব রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

ইলেক্‌ট্রোথেরাপি — মানসিক রোগের বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-প্রণালী; মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে বিভিন্ন মাংসপেশীর বিক্ষোভ সৃষ্টি করে' বা কখন কখন রোগীর চেতনা বিলুপ্তি ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার মনোবিকার-জনিত বিকল স্নায়ুগুলিকে ক্রমে স্বাভাবিক করে তোলা হয়।

ইলেক্‌ট্রোড — তড়িৎ-দ্বার; তড়িৎ-পরিবাহী কোন পদার্থে তৈরী যে দণ্ড, চাকতি বা তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ কোন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, অথবা তা থেকে বেরিয়ে যায়। যে তড়িৎ-দ্বার দিয়ে কোন পদার্থে তড়িৎ প্রবেশ করে তাকে বলে **অ্যানোড** ↑, বা ধন-তড়িৎদ্বার; আর যেটা দিয়ে তড়িৎ বেরিয়ে যায় তাকে বলে **ক্যাথোড** ↑, বা ঋণ-তড়িৎদ্বার।

ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স — বৈদ্যুতিক চাপশক্তি; এই চাপশক্তির প্রভাবেই তড়িৎ-স্রোত ধাতব তারের পূর্ণ চক্রপথে দ্রুত প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎ-চাপ ভোল্ট ↑ এককে পরিমিত হ'য়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রোমিটার—যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-শক্তির চাপ বা ভোল্টেজ ↑ মাপা হয়। তড়িতের চাপ নিরূপণের জন্যে নানা রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থার ইলেক্ট্রোমিটার যন্ত্র আছে।

ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট — বৈদ্যুতিক তার-জড়ানো লোহদণ্ড; দণ্ডটা সোজা, বা ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকানোও হতে পারে। জড়ানো ওই তারের

মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে দণ্ডটা চৌম্বক শক্তি লাভ করে; একেই বলে ইলেক্ট্রোম্যাগ্‌নেট; বাংলায় একে বলে তড়িৎ-চুম্বক। তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ যতক্ষণ চলে ওই দণ্ডের চৌম্বক ধর্মও সাধারণতঃ ততক্ষণ মাত্র থাকে।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেট
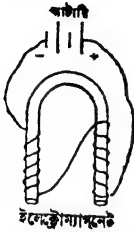
ইলেক্ট্রোলাইট — ইলেক্ট্রোলিসিস্‌ প্রক্রিয়ায় যে পদার্থের দ্রবের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল করে। এখানে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ওই পদার্থেরই আয়নায়িত পরমাণুগুলোর মাধ্যমে প রি চা লিত হয়ে থাকে। কপার-সাল্‌ফেট ↑ বা তুঁতের জলীয় দ্রবের মধ্যে দু'টি ইলেক্ট্রোড ↑ বসিয়ে ব্যাটারির তার জুড়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো হলো। ব্যাটারি ↑ থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অ্যানোডের মধ্য দিয়ে ওই দ্রবের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে আবার ব্যাটারিতে ফিরে যায়। এর ফলে ওই দ্রবের, বা ইলেক্ট্রোলাইটের ঋণ-তড়িতাবিষ্ট সাল্‌ফেট আয়নগুলো ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে চলে যায়; আর ধন-তড়িতাবিষ্ট কপার (তামা) আ য় ন গু লো অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে যায়। এভাবে তামার সূক্ষ্ম কণিকা ক্যাথোডের গায়ে জমে তার একটা পাত্‌লা আস্তরণের সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **ইলেক্ট্রোপ্লেটিং** ↑। আর কপার সাল্‌ফেটের ওই দ্রবটা, যা বিশ্লিষ্ট হয়, তাকে বলে ইলেক্ট্রোলাইট।

ইলেক্ট্রোলিসিস — বিশেষ বিশেষ পদার্থের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ওই সব পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলেক্ট্রোলিসিস্‌। প্রবাহের ক্যাথোড ও অ্যানোড তড়িৎদ্বার দু'টির মধ্যে ওই পদার্থের পরমাণুগুলো আয়নায়িত হয়ে পড়ে, আর সেই আয়ন-কণিকাগুলোর মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। দ্রবের রাসায়নিক উপাদানগুলির ধনাত্মক আয়ন কণিকা (ধাতব) সব গিয়ে ক্যাথোড ↑ দ্বারের গায়ে জমে এবং ঋণাত্মক আয়ন কণিকা সব অ্যানোড দ্বারে বিমুক্ত হয়ে যায়। পদার্থের এরূপ বিশ্লেষণ নির্ভর করে প্রধানতঃ দ্রাবক ও দ্রাব্য পদার্থ দু'টির এবং ইলেক্ট্রোডের রাসায়নিক গঠন ও প্রকৃতির উপর।
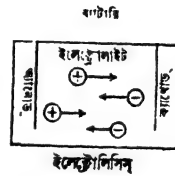
ইলেক্ট্রোলিসিস

ইলেক্ট্রোলিটিক কপার—তামার কোন রাসায়নিক লবণ (কপার সল্ট ↑) থেকে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় যে অতিবিশুদ্ধ তামা পাওয়া যায়।

ইলেক্ট্রোপ্লেটিং — কোন ধাতব বস্তুর উপরে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রি-

যার সাহায্যে অন্য কোন ধাতুর সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়ার রাসায়নিক কৌশল। সাধারণতঃ এ-প্রক্রিয়াকে বাংলায় 'গিল্‌টি করা' বলা হয়। এভাবে কপার-প্লেটিং, সিল্‌ভার-প্লেটিং, গোল্ড-প্লেটিং প্রভৃতি করবার ব্যবস্থা করা যায়। যে ধাতুর আস্তরণ দিতে হবে তার কোন সল্টকে করতে হবে ইলেক্ট্রোলাইট ↑, ঋণ-তড়িৎ-দ্বার বা ক্যাথোড ↑ প্রান্তে ঝুলানো থাকবে ধাতব জিনিসটা, যার গায়ে ইলেক্ট্রোলিসিস্ প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রোলাইট ↑ সল্টের ধাতব উপাদানের সূক্ষ্মকণিকাগুলো গিয়ে লেগে যাবে।

ইলেক্‌ট্রোস্কোপ — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এজন্যে সাধারণতঃ গোল্ড-লিফ্‌-ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটা হলো একটা বদ্ধ-মুখ কাঁচের জার; কোন বিদ্যুৎ-পরিবাহী

ইলেক্‌ট্রোস্কোপ

ধাতব দণ্ডের সঙ্গে লাগানো সোনার দু-খানা পাতলা পাত্ ওই জারের মধ্যে ঝোলানো থাকে। ওই ধাতব দণ্ডের সঙ্গে কোন জিনিসকে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সংযুক্ত করলে, যদি তাতে তড়িৎ শক্তি থাকে, তবে তা দণ্ডের ভিতর দিয়ে সোনার পাত দু'খানাকে তড়িতাবিষ্ট করবে; আর সম-তড়িতাবিষ্ট হওয়ার ফলে পাত্ দু'খানা পরস্পর থেকে সরে ফাঁক হয়ে যাবে। তারের সংযোগ কেটে দিলে পাত দু-খানা আবার জুড়ে যাবে। কোন পদার্থে অতি সামান্য তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্বও এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজেই নিরূপণ করা যায়।

ইলেক্‌ট্রোস্ট্যাটিক্স — স্থির-তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ফ্লানেল বা সিল্ক দিয়ে ঘসলে কাচের দণ্ডে তড়িৎ সঞ্চারিত হয়; এই তড়িৎশক্তি কাচে স্থির, অর্থাৎ প্রবাহবিহীন অবস্থায় থাকে। ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িতের যেরূপ চলতা বা প্রবাহ সৃষ্ট হয় কাচের স্থির-তড়িতে তেমন থাকে না। এরূপ স্থির স্থিতিশীল তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের আলোচনা বিজ্ঞানের এই শাখার অন্তর্গত।

ইলুট্রিয়েশন— পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া। চূর্ণিত অদ্রাব্য পদার্থে জল দিয়ে নেড়ে রেখে দিলে বৃহত্তর কণিকাগুলি থিতিয়ে তলায় জমে, অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলি উপরের জলে অদৃশ্যভাবে ভাসতে থাকে। উপরের এই জল সাবধানে ঢেলে নিয়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি-মসৃণ কণিকাসমূহ পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলুট্রিয়েশন।

ইয়েলো-ফিভার — পীতজ্বর; দক্ষিণ আমেরিকার এক রকম মারাত্মক ব্যাধি। এক জাতীয় মশার দংশনে সংক্রামিত হয়। এ-রোগে লিভার

পাকস্থলী প্রভৃতির প্রদাহ ও স্ফীতি ঘটে, গাত্রচর্ম হলদে হয়ে যায়, রোগী কালো বমি করে। আজকাল এর প্রতিষেধক ঔষধাদি বেরিয়েছে।

ইস্টম্যান, জর্জ — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম নিউ-ইয়র্কে 1854 খৃঃ, মৃত্যু 1932 খৃঃ। আলোকচিত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন — দ্রুত ফটোগ্রাফির ↑ জড়ানো ফিল্ম ↑ পদ্ধতির উদ্ভাবন 1884 খৃঃ। বিশ্ববিখ্যাত কোড্যাক ক্যামেরা ↑ তৈরী করেন 1888 খৃঃ। উপার্জ্জিত বিপুল ধনসম্পত্তি জনহিতে ও শিক্ষাবিস্তারে দান করে গেছেন।

ঈষ্ট — ছত্রাক জাতীয় এক রকম জৈব পদার্থ; এর সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থের গাঁজন-ক্রিয়া সংঘটিত হয়। পাউরুটি নরম ও ফাঁপা করবার জন্যে ময়দার সঙ্গে ঈষ্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়। চিনির রস ঈষ্ট দিয়ে গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ঈষ্ট থেকে এক রকম এন্‌জাইম ↑ বা জৈব পদার্থ জন্মে; যার প্রভাবে এরূপ বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হয়।

উ

উইলো — এক জাতীয় বৃক্ষের সাধারণ নাম; জলাভূমি অঞ্চলেই প্রধানতঃ জন্মে। 'হোয়াইট উইলো', 'উইপিং উইলো' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধারণতঃ সাদা ফুল ফোটে, পাতা ফলকাকৃতি; কাণ্ড দৃঢ়, অথচ নরম। বিভিন্ন শ্রেণীর উইলো কাঠ থেকে ক্রিকেটের ব্যাট, বাস্কেট, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

উইলো-দি-উইস্‌প — আলেয়া, ইগ্নিস ফেটুয়াস ↑। পতিত জলাভূমি অঞ্চলে জৈব পদার্থাদি পচে কখন কখন ফস্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন ↑ প্রভৃতি স্বভাব-দাহ্য গ্যাস জন্মে এবং তা বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলে উঠে যে অপসৃয়মান ক্ষণস্থায়ী আলোক শিখা রাত্রিকালে পরিদৃষ্ট হয়।

উইণ্ড পাইপ — শ্বাসনালী; নাসিকার পশ্চাদ্ভাগ থেকে গলদেশের যে নল-পথে শ্বাসবায়ু গিয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়। এই শ্বাসনালী 'ট্রেকিয়া' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। ল্যারিংস ↑ হলো এই নল-পথেরই ঊর্ধ্বাংশ।

উইণ্ড পাইপ

উইণ্ড মিল — বায়ু-প্রবাহের বেগ-শক্তির নিয়ন্ত্রণে চালিত যন্ত্র বিশেষ। নৌকার পালের মত ব্যবস্থায় বায়ু-প্রবাহের বেগশক্তি সংহত করে কৌশলে যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হয়। সাধারণতঃ শস্যাদি চূর্ণ করা ও জল উপরে তোলবার কাজে এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূর্বে ছিল এক দণ্ডী 'পোস্ট-মিল' — পরে 'টাওয়ার মিল' উদ্ভাবিত হয়, যার ঘূর্ণায়মান শীর্ষভাগের

চারদিকে সাধারণতঃ চারখানা পাল বা ধাতব রেড লাগানো থাকে। কোন জ্বালানি ব্যতিরেকে কেবল প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে এরূপ যন্ত্র চালনায় কাজ পাওয়া বেশ লাভজনক। আজ কাল পালের পরিবর্তে হাল্কা ধাতব রেড লাগিয়ে উন্নত ধরণের অধিকতর কার্যকরী 'উইণ্ড মিল' তৈরী হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এর সাহায্যে ইদানিং আবার সস্তায় তড়িৎশক্তি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

উইম্‌সহার্স্ট মেসিন — স্থির-তড়িৎ (স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি ↑) উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত এক প্রকার যন্ত্র। প্রধানতঃ এতে কাচ-নির্মিত কতকগুলি ঘূর্ণায়মান প্লেটের সঙ্গে ধাতব প্লেটের ঘর্ষণের ফলে তড়িৎ উৎপাদিত হয় এবং তা কৌশলে সঞ্চিত করে রাখবার ব্যবস্থা থাকে।

উড্ কক্ — দীর্ঘ সরল চঞ্চুবিশিষ্ট এক প্রকার পক্ষী; আরক্ত ধূসর বর্ণের পালকে আচ্ছাদিত, আর তার মাঝে মাঝে কালো রেখা-যুক্ত। সাধারণতঃ এরা মাটির গর্তে বা বড় গাছের কোটরে বাস করে। আমাদের দেশে এদের বলে 'কাঠঠোক্‌রা'।

উড্ কক্

উড্ মেটাল — একটা সংকর ধাতুর বিশেষ নাম। 50% বিস্‌মাথ, 26% সীসা, 12·5% টিন, 12·5% ক্যাড্‌মিয়াম ↑ মিশিয়ে এটা তৈরী। মাত্র 71° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গলে যায়। এরূপ নিম্ন-গলনাংকের জন্যে এ দিয়ে অনেক সময় বড় বড় বাড়ীর জলের পাইপের মুখ বন্ধ করা হয়। আগুন লাগলে ঐ জোড়া-মুখ সহজেই গলে খুলে যায়, আর জল বেরিয়ে আগুনের ব্যাপ্তি রোধ করে।

উড্ ন্যাপ্‌থা — একটা বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থ; বিশেষ কৌশলে কাঠ চোলাই (ডিস্টিলেসন ↑) করে পাওয়া যায়। এ-জন্যে একে উড্ স্পিরিট বা উড্-অ্যাল্‌কোহলও বলে। এর রাসায়নিক নাম মিথাইল অ্যাল-কোহল (CH_3OH)। উপযুক্ত দ্রাবক হিসেবে বিভিন্ন রসায়ন শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। অ্যাল্‌কোহলের (ইথাইল) ↑ সঙ্গে এই বিষাক্ত পদার্থটা মিশিয়ে জ্বালানি হিসেবে 'মেথিলেটেড স্পিরিট' ↑ তৈরী করা হয়।

উড্ স্পিরিট — মিথাইল অ্যাল-কোহল ↑, (CH_3OH)। সাধারণতঃ কাঠ চোলাই করে তৈরী হয় বলে এই নাম। এই তরল দাহ্য পদার্থটি উড্-**অ্যাল্‌কোহল**, অথবা **উড্‌ন্যাপ্‌থা** ↑ নামেও পরিচিত।

উডেন ট্যাংগ — গবাদি পশুর রোগ বিশেষ। এ রোগে পশুদের মুখ-গহ্বর ও খাদ্যনালী, বিশেষতঃ জিহ্বা এক

রকম ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) জাতীয় জীবাণুর আক্রমণে স্ফীত ও শক্ত হয়ে ওঠে। (অ্যাক্টিনোমাইকোসিস ↑)

উল্‌ফ্রাম — মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 183·92, পারমাণবিক সংখ্যা 74, সাংকেতিক চিহ্ন W. উলফ্রাম ধাতুকে **ট্যাংস্টেন**-ও ↑ বলে। ধাতুটা অত্যন্ত কঠিন, অথচ সহজেই এর সরু তার বা পাত্‌ করা যায়; এতে আবার মরচেও ধরে না। অত্যধিক তাপ সহন-ক্ষমতার জন্যে এ-দিয়ে বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট ↑ তৈরী হয়; এর গলনাংক 3370° সেন্টিগ্রেড।

উ ল্‌ ফ্রা মা ই ট — উল্‌ফ্রাম ↑, বা টাংস্টেন ↑ ধাতুর স্বভাবজাত লৌহ-মিশ্রিত অক্সাইড ($FeWO_4$) খনিজ; সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই উল্‌ফ্রাম ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

উল-সর্টার্স ডিজিজ — অ্যান্‌থ্রাক্স ↑ রোগ। ভেড়ার চামড়া ও পশম (উল) থেকেই সাধারণতঃ এই মারাত্মক রোগের 'অ্যান্‌থ্রাক্স' জীবাণু শ্রমিকদের দেহে সংক্রামিত হয় বলেই রোগটির এই নামকরণ হয়েছে।

উল্‌ফ বট্‌ল - বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষাদিতে ব্যবহৃত দুই মুখবিশিষ্ট বিশেষ এক প্রকার কাচপাত্র।

উল্‌ফ বট্‌ল

উয়োজেনেসিস—প্রসূতির গর্ভাধারে (ওভারি ↑) ডিম্বকোষের পরিপুষ্ট ও সুসম্পূর্ণ অবস্থা। 'উয়ো' মানে ডিম্বক।

উয়োলাইট — এক শ্রেণীর চুনা পাথর (লাইম স্টোন ↑), যা ডিম্বাকৃতি বড় বড় দানায় গঠিত।

উয়োমাইসিট্‌স —একজাতীয় ডিম্বাকৃতি ছত্রাক, বা ফাঙ্গাস ↑। এদের আক্রমণে আলু পচে যায়, এবং তরমুজ, কুমড়া প্রভৃতির গাছ রোগাক্রান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পচে শুকিয়ে যায়।

এ

এক্‌জস্ট পাইপ — ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত জ্বালানির ধূম ও গ্যাস যে নলপথে বেরিয়ে যায়, যেমন—মোটর গাড়ীর পেছনে থাকে ধোঁয়া বেরবার নল। 'এক্‌জস্ট' মানে বহির্গমন বা খালি হওয়া।

এক্‌জস্ট পাম্প — বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র; যে যন্ত্রের (পাম্প ↑) সাহায্যে আবদ্ধ বায়ু বার করে দিয়ে কোন আধার বায়ুশূন্য করা হয়ে থাকে।

এক্‌জস্ট ফ্যান — গৃহের দূষিত বায়ু নির্গমনের জন্যে দেয়ালের উপর দিকের ক্ষুদ্র গবাক্ষে যে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা (ফ্যান) বসানো হয়। এর ব্লেডগুলি এমনভাবে বাঁকানো থাকে যে গৃহাভ্যন্তরস্থ দূষিত হাল্‌কা বায়ু উপর থেকে টেনে বার করে দেয়; আর বিশুদ্ধ বায়ু নিচের দরজা-জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

এক্‌ডাইসিস— জীবের বহিরাবরণ বা খোলস ত্যাগের প্রক্রিয়া; সরীসৃপরা

যেমন তাদের পাতলা গাত্রচর্ম এবং কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি তাদের বাইরের শক্ত খোলাটা মাঝেমাঝে ছেড়ে ফেলে।

একর — ভূমির আয়তন পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক ; =4840 বর্গগজ ; এ-দেশের প্রায় তিন বিঘা।

একা-অ্যালুমিনিয়াম — সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত যে মৌলিক ধাতব পদার্থকে **গ্যালিয়াম** নাম দেওয়া হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতুর সমগোত্রীয় এ-রকম একটা মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবল ↑ থেকে অনুমান করা হয়েছিল। আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ধাতুটা এই বিশেষ নামে পরিচিত ছিল।

এক্ল্যাম্প্‌সিয়া — সন্তানসম্ভবা নারীর এক প্রকার কঠিন রোগ বিশেষ। রক্তদুষ্টির ফলে এ-রোগে প্রসূতি অসাড় অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে এবং সন্তানপ্রসব অসম্ভব হয়ে প্রায়ই মারা যায়। আভ্যন্তরীণ কোন ত্রুটিপূর্ণ জৈবিক বিষ-ক্রিয়ার ফলে সহসা রক্তে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এ-রোগর নির্ভরযোগ্য মূল কারণ অদ্যাপি অজ্ঞাত।

এক্সটেন্সোমিটার — কোন ধাতব তার, বা পাটির সম্প্রসারণ পরিমাপক যন্ত্র। কতটা শক্তি প্রয়োগে টানলে কোন্ ধাতু কতটা সম্প্রসারিত হতে পারে (ইল্যাস্টিসিটি ↑ অথবা ডাক্টিলিটি ↑) তার পরিমাণ এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমিত হয়ে থাকে।

এক্সপ্‌থ্যাল্‌মিক গইটার — থাই-রয়েড ↑ গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতিজনিত রোগ ; যাতে গলদেশ ফোলে এবং অক্ষিগোলক যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে। 'এক্স' মানে বাহির, 'অপ্‌থ্যাল্‌মস' মানে চক্ষু বা অক্ষি-গোলক।

এক্সপোজার মিটার — ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার ↑ একটা যন্ত্রাংশ বিশেষ। ফিল্মের ↑ (বা প্লেটের) উপরে কতক্ষণ কোন্ নির্দিষ্ট ঔজ্জ্বল্যের আলোকপাত করলে (অর্থাৎ এক্সপোজার দিলে) ভাল ছবি পাওয়া যাবে, তা এই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে নিরূপণ করা যায়।

এক্সপ্যান্সন কোইফিসিয়েন্ট — এক ডিগ্রি ↑ তাপবৃদ্ধির ফলে কোন পদার্থের (ধাতব, গ্যাসীয় বা তরল) একক আয়তনের (দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল বা ঘনফলের) বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ যে ভগ্নাংশের দ্বারা সূচিত হয়। সতর্ক পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের এই তাপানুপাতিক বৃদ্ধি নির্ণীত হয়ে থাকে। স্টিলের ↑ এ. কো. হলো ·000011, অর্থাৎ এক ফুট একটা স্টিলের বার বা দণ্ড প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ বৃদ্ধিতে ·000011 ফুট বাড়ে। সুতরাং 40 ফুট একটা 'রেলের পাটি' 0' ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ (ফ্রিজিং পয়েন্ট ↑) অপেক্ষা 25° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার দিনে দৈর্ঘ্যে বর্ধিত হবে $40 \times 25 \times \cdot000011$ ফুট, অর্থাৎ প্রায় $^1/_8$ ইঞ্চি।

এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স—আমাদের এই পৃথিবীসহ সমগ্র সৌরমণ্ডল ও পরিদৃষ্ট সাধারণ নক্ষত্ররাজি অনন্ত মহা-শূন্যে চলমান এক বিরাট নীহারিকা পুঞ্জের (গ্যা লা ক্সি ↑) অন্তর্গত; মহাশূন্যে যে সুদীর্ঘ ছায়াপথ (মিল্‌কি-ওয়ে ↑) পরিদৃষ্ট হয় তারই অংশ। বিশাল সাহারার বুকে এক কণা বালুকার মতো আমাদের পৃথিবী এরই একটু নগণ্য অংশ মাত্র। অনন্ত মহাশূন্যে এরূপ বহু নীহারিকাপুঞ্জ রয়েছে। শক্তিশালী টেলিস্কোপ ↑ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত বিভিন্ন নীহারিকা-পুঞ্জের আ লো ক-রশ্মির বর্ণালি-বিশ্লেষণে (ডপ্‌লার এফেক্ট ↑) মনে হয়, ঐসব নীহারিকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি যেন আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এই হিসাবে বলা যায়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে — নিখিল বিশ্ব আয়তনে যেন ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আলোচ্য এ, ই. কথাটা দিয়ে এই ভাবটি প্রকাশিত হয়।

এ ক্স পো ন্যা ণ্ট — গণিতশাস্ত্রে যে সংখ্যার দ্বারা কোন রাশির মূল্য-মানের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়; যেমন— x^3 রাশির মূল রাশি x-এর এক্সপোন্যাণ্ট হলো 3; একে মূল রাশির 'ঘাত,' বা সূচক সংখ্যাও বলা হয়।

এক্সপোনেন্সিয়াল ডিকে — কোন রাশি যদি প্রতি একক সময়ে (প্রতি সেকেণ্ড, মিনিট ইত্যাদিতে) একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশিক অনুপাতে হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে এরূপ হ্রাসকে এ. ডি. বলে। কোন পাত্রের জল যদি চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা 25° ডিগ্রি অধিক উত্তপ্ত থাকে এবং এক মিনিট পরে যদি তার উত্তাপ হয় 20° ডিগ্রি, তাহলে তার তাপ হ্রাস হলো 5° ডিগ্রি; অর্থাৎ প্রাথমিক তাপ 25° ডিগ্রির $^1/_5$ (এক পঞ্চমাংশ) হ্রাস হলো। আবার পরবর্তী মিনিটে যদি তার তাপ হয় 16° ডিগ্রি (20° ডিগ্রি থেকে) তাহলে তাপের হ্রাস হলো 4° ডিগ্রি, অর্থাৎ 20° ডিগ্রির $^1/_5$ (এক পঞ্চমাংশ)। এরূপ সম-ভগ্নাংশিক অনুপাতের হ্রাসকেই বলা হয় এ. ডি.। 'ডিকে' মানে ক্ষয় বা হ্রাস। (নিউটন্‌স ল অব কুলিং ↑)।

এক্সপোনেন্সিয়াল ফা ং স ন — গণিতশাস্ত্রে 'ফাংসন' মানে সম্বন্ধ; যেমন, $y = 2x$ রাশির দ্বারা x এবং y'এর মূল্যমানের সম্বন্ধ নিরূপিত হচ্ছে। এখানে x যদি হয় 3, তাহলে y হবে 6; এটা হলো সাধারণ ফাংসন। কিন্তু $y = 2^x$ রাশিতে x এবং y'এর সম্বন্ধকে বলা হয় এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংসন। এখানে x হলো একটা স্থির বা ধ্রুব রাশির (এখানে 2-এর) একটা অধ্রুব বা পরিবর্তনশীল সূচক (এক্সপো-ন্যাণ্ট ↑)। অতএব x যদি হয় 3,

তাহলে $y=2^3$, অর্থাৎ 8 ; x যদি হয় 1 তাহলে $y=2^1$, অর্থাৎ 2 ; এভাবে x এবং y'এর ফাংসন বা সম্বন্ধ এতে হয় পরিবর্তনশীল।

এক্সপ্লোসিভ — বিস্ফোরক পদার্থ ; যে-সব মিশ্র পদার্থে অতি দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, আর তার ফলে প্রচুর গ্যাস ও তাপের উদ্ভব হয়। গান-পাউডার ↑, নাইট্রো-গ্লিসারিন ↑, অ্যামাটল ↑ প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থে সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিলে, বা সামান্য আঘাত জনিত উত্তাপে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ-জাতীয় পদার্থের উপাদানগুলোর মধ্যে অতি দ্রুত রাসায়নিক সংযোগ বা ক্রিয়া ঘটে এবং বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলেই কামান, বন্দুক প্রভৃতির আবদ্ধ খোলের মধ্যে সহসা প্রচুর গ্যাস, ধূম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং তারই প্রচণ্ড চাপে মুহূর্ত মধ্যে গোলো-গোলি মহাবেগে ছুটে বেরোয়।

এক্স-রে — রঞ্জেন বা রন্টগেন রশ্মি ; জার্মাণ বিজ্ঞানী রন্টগেন 1895 খৃষ্টাব্দে যে এক প্রকার অদৃশ্য, অথচ ভেদকারী রশ্মি আবিষ্কার করেন। এটা আলোক ও বেতার তরঙ্গের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (এক সেণ্টিমিটারের লক্ষাধিক ভগ্নাংশ) এক বিশেষ তরঙ্গ-স্পন্দনের ফলে এই রশ্মির সৃষ্টি হয়। 'এক্স-রে-টিউব' হলো বিশেষ আকারের বায়ু-শূন্য একটা কাঁচ-গোলক। বিশেষ ব্যবস্থায় ওই টিউবের ভিতরে ইলেক্ট্রন কণিকার ধারা অতি দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে একটা ধাতব চাকৃতির উপরে পড়ে এবং সেখান থেকে এই অদৃশ্য

এক্স-রে টিউব
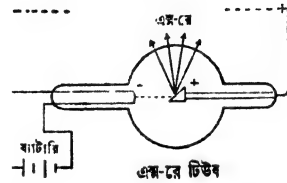
রশ্মির বা এক্স-রে'র উদ্ভব ঘটে থাকে। সাধারণ আলোক-রশ্মি যে-সব পদার্থ ভেদ করতে পারে না, এক্স-রশ্মি তাদের ভেদ করে চলে যায়। এই এক্স-রশ্মির সাহায্যে দেহের মাংসপেশী ভেদ করে ভিতরের হাড় ও যন্ত্রাদির ছায়া ফটোগ্রাফিক ↑ প্লেটে মুদ্রিত করা যেতে পারে ; এভাবে দেহাভ্যন্তরের অস্থি-পঞ্জরের অবস্থা সহজে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। আবার বিভিন্ন স্ফটিকাকার পদার্থের পারমাণবিক গঠনও এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'এক্স-রে-অ্যানালিসিস'।

এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে রঞ্জেন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পারে। এই যন্ত্রে ফটোগ্রাফিক প্লেট লাগিয়ে বিভিন্ন কৌশলে এক্স-রশ্মির এক রকম আলোক-চিত্র তোলবারও ব্যবস্থা

করা যায়, তখন যন্ত্রটাকে বলা হয় 'এক্স-রে স্পেকট্রোগ্রাফ'।

এক্সিপিয়েণ্ট — ব্যবহারের সুবিধার জন্যে বিভিন্ন ঔষধাদিতে যে-সব নিষ্ক্রিয় পদার্থ মিশ্রিত করা হয়, যেমন— বিভিন্ন মলমে ভেসেলিন ↑, চর্বি ইত্যাদি; তরল মিক্‌শ্চারে জল; গুঁড়া মিক্‌শ্চারে স্টার্চ ↑ বা কেয়োলিন ↑।

এক্সোগ্যামি — গোত্রান্তরে বিবাহ, স্বকীয় বংশের বা আত্মজনের বাহিরে বিবাহ করবার রীতি; যেমন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। **এণ্ডোগ্যামি** হলো সগোত্র বিবাহ; যেমন—মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।

এক্সোজেনাস — বহির্জাত; দেহের বাইরে থেকে উৎপন্ন জীব; যেমন— হাইড্রা ↑। মূল দেহ থেকে ক্ষুদ্র গুটিকাকারে দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নূতন হাইড্রা জন্মায়। এরূপ জীবশ্রেণীকে বলে এক্সোজেনাস।

এক্সোডার্ম— বহিস্ত্বক; জীব-দেহের উপরের পাতলা চামড়া।

এক্সোথার্মিক—কোন কোন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপশক্তি উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। এরূপ সব এক্সোথার্মিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বলে 'এক্সোথার্মিক কম্পাউণ্ড'। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ↑, এটা হলো একটা এক্সোথার্মিক কম্পাউণ্ড; $H_2 + Cl_2 = 2\,HCl + 43{,}600$ ক্যালোরি ↑।

এডিংটন, স্যার আর্থার—বৃটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ; জন্ম 1882 খৃঃ, মৃত্যু 1944 খৃঃ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক। আইনস্টাইনের ↑ আপেক্ষিকতাবাদের সার্থকতা ও ব্যাপকতা প্রতিপাদন, এবং বিশ্বের ক্রমবৃদ্ধি (এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স ↑) সম্পর্কীয় মতবাদের প্রবর্তক। নক্ষত্রের গঠন ও পদার্থের সাম্য বা স্থিতি বিষয়ক মূল্যবান গবেষণার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহু বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।

এডিসন, টমাস আলভা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তড়িৎ-বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিশারদ; মিলানে জন্ম 1847 খৃঃ, মৃত্যু 1931 খৃঃ। বাল্যে শিক্ষাবিমুখ, ট্রেনে সংবাদপত্র বিক্রেতা হিসাবে জীবিকার্জন; পরে ট্রেনেই ক্ষুদ্র সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ। এক সময়ে তারবার্তা (টেলিগ্রাফ ↑) সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ লাভ। কৈশোরে মাইকেল ফ্যারাডে ↑ রচিত তড়িৎ-বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ হন, নিজের ক্ষুদ্র গবেষণাগারে তড়িৎসম্বন্ধীয় কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমেই বৈদ্যুতিক ভোট-গ্রহণ ব্যবস্থার যন্ত্র উদ্ভাবন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলি-

ফোনের ↑ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। 1879 খৃঃ বৈদ্যুতিক বাতির কার্বন ফিলামেন্ট ↑ আবিষ্কার, যার ফলে সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের সবিশেষ প্রচলন সম্ভবপর হয়েছে। সুলভে তড়িৎ সরবরাহের উপযোগী করে ডায়নামো ↑ যন্ত্রের উন্নতি-বিধান। আধুনিক গ্রামোফোনের ভিত্তিস্বরূপ ফোনোগ্রাফ ↑ যন্ত্র, ছায়াচিত্রের প্রাথমিক যন্ত্র কাইনেটোস্কোপ ↑, নিকেল-আসরণ সেল ↑ প্রভৃতি অসংখ্য যন্ত্র উদ্ভাবন। জীবনে মোটামুটি সহস্রাধিক নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন ও পেটেন্ট গ্রহণ। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে 'বিজ্ঞানের যাদুকর' বলে খ্যাতি অর্জন।

এন্‌কোণ্ড্রোমা — দেহাভ্যন্তরস্থ অনাবশ্যক তরুণাস্থি-পিণ্ড (কার্টিলেজ ↑); দূষিত অস্থির স্থানবিশেষে যে কোমল তরুণাস্থি-পিণ্ডের সৃষ্টি হয়, কিন্তু যার কোন স্ফীতি বাইরে থেকে লক্ষিত হয় না। অস্থি-সংযোগের তরুণাস্থির বহির্দৃষ্ট স্ফীতিকে (যেমন—আর্থারাইটিস ↑ বা গেঁটেবাত রোগে সাধারণতঃ হয়ে থাকে) বলে **একোণ্ড্রোমা**।

এন্‌জাইম—বিভিন্ন জীবধর্মী ছত্রাকের দেহকোস থেকে নিঃসৃত বিশেষ জৈব পদার্থ। বিভিন্ন শ্রেণীর এন্‌জাইমের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষমতা থাকে। ক্যাটালিটিক ↑ পদার্থের মত এ-গুলো বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এক-এক রকম এন্‌জাইমের আবার এক-এক রকম নির্দিষ্ট রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। ঈষ্টের ↑ ছত্রাক-কোস বা জীবাণু থেকে যে এন্‌জাইম সৃষ্টি হয়, তা শর্করাকে অ্যাল্‌কোহলে ↑ পরিবর্তিত করে। মুখের লালাতে টায়ালিন ↑ নামক এক রকম এন্‌জাইম উৎপন্ন হয়, যার প্রভাবে সংঘটিত রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়। পেপ্‌সিন ↑ নামক এন্‌জাইম আমিস জাতীয় খাদ্য হজম করায়।

এন্‌ডেমিক ডিজিজ — আঞ্চলিক রোগ। পৃথিবীর বিশেষ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাধারণতঃ যে রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বৎসর দেখা যায়; যেমন আমাশয় ভারতের একটা এন্‌ডেমিক রোগ, কিন্তু ইংলণ্ডের নয়। (যদিও ইংলণ্ডেও যে মাঝে মাঝে এ রোগ হয় না, এমন নয়।)

এণ্ডোকার্ডাইটিস — হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রদাহ রোগ বিশেষ; হৃৎপিণ্ডের আবরক প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ পর্দার স্ফীতি ও প্রদাহ। 'এণ্ডো' মানে অভ্যন্তর বা ভিতর।

এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড — অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি; দেহাভ্যন্তরস্থ যে-সব বহির্মুখ-শূন্য গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড ↑ থেকে বিভিন্ন হর্মোন ↑ নিঃসৃত হয়ে অন্তর্নালি দিয়ে রক্তে মিশ্রিত হয়; যেমন—

হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে অ্যাড্রিনেলিন ↑ নামক হর্মোন-রস নিঃসৃত হয়ে রক্তে মিশে যায়; এর ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়, গাত্রচর্ম ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে এ-রকম পিটুইটারি ↑, থাইমাস ↑, থাইরয়েড ↑ প্রভৃতি আরও নানা রকম অন্তঃস্রাবী নালীশূন্য গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড আছে। এ-গুলো থেকে বিভিন্ন হর্মোন নিঃসৃত হয়ে ভিতরে ভিতরে রক্তে মিশে দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

এণ্ডোটক্সিন — যে সব টক্সিন ↑ পদার্থ বা বিষরস জীবাণু-বিশেষের দেহের অংশ স্বরূপ; যা ছেঁকে বা ধুয়ে জীবাণু থেকে পৃথক করা যায় না; যেমন—টাইফয়েড টক্সিন, যা টাইফয়েড-জীবাণুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত থাকে। টিটেনাস্ জীবাণুর টক্সিন পৃথক করা যায় বলে তাকে বলা হয় 'এক্সোটক্সিন'।

এণ্ডোথার্মিক — যে সব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ হ্রাস পায়, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপ কমে যায়। এ-রকম রাসায়নিক ক্রিয়াকে বলে 'এণ্ডো-থার্মিক রিঅ্যাকসন,' এবং এর ফলে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বলে 'এণ্ডোথার্মিক কম্পাউণ্ড'। হাইড্রোজেন ↑ ও আইওডিনের ↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন হাইড্রায়োডিক অ্যাসিড হলো একটা এণ্ডোথার্মিক কম্পাউণ্ড; $H_2 + I_2 = 2HI - 12,200$ ক্যালোরি ↑ তাপ। (এক্সোথার্মিক ↑)।

এণ্ডোস্পার্ম—উদ্ভিদের বীজকোষের অভ্যন্তরভাগে সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার; ভাবী উদ্ভিদ-শিশুর জন্যে সঞ্চিত এই বীজ-শাঁসই মানুষ ও অপরাপর জীবজন্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে; যেমন —ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি।

এন্‌সেফালিটিস – মস্তিষ্কের প্রদাহ-জনিত রোগ বিশেষ; মগজের যে কোন রকম স্নায়বিক বিকলতা। **এন্‌সেফালিটিস লেথারজিকা** হলো কোন ভাইরাস ↑ জনিত এক রকম মস্তিষ্করোগ, যাতে স্নায়ুতন্ত্রী অবসাদগ্রস্ত হয়ে রোগী শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারায় এবং সর্বদা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

এনামেল — কাচ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে টিন-ডাইঅক্সাইড (SnO_2) প্রভৃতি বিভিন্ন সব পদার্থ উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে-মিশিয়ে যে মসৃণ ও চক্‌চকে পদার্থ তৈরী হয়। বিভিন্ন ধাতব বাসনপত্রের উপর এর একটা পাতলা আবরণ দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়। মাটি বা পোর্সিলেনে ↑ তৈরী পাত্রাদির উপরেও অনেক সময় এরূপ 'এনামেল' করা হয়ে থাকে।

এনার্জি — শক্তি; কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা। এনার্জি—পোটেন্‌সিয়্যাল ↑ ও কাইনেটিক ↑, এই দু-রকম অবস্থায়

থাকতে পারে। পাহাড়ের উপরে যে জল সঞ্চিত হয়ে আছে তার পোটেন্সিয়াল এনার্জি ↑ (স্থৈতিক শক্তি) রয়েছে। উচ্চে অবস্থিতির জন্যে ওই জল একটা শক্তি বা কর্ম-ক্ষমতা লাভ করেছে। যখন প্রবাহিত হয়ে নীচে নামবে তখন জলের বেগে মাটি কেটে পাথর ভেঙ্গে ওই শক্তি প্রকাশ পাবে; পোটেনসিয়াল এনার্জি এ-ভাবে কাইনেটিক এনার্জিতে (গতীয় শক্তিতে) পরিবর্তিত হবে। শক্তির বিনাশ নেই; বিশেষ ব্যবস্থায় এক শক্তিকে অপর শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় মাত্র। এরূপ তাপ-শক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি, রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের শক্তির বিকাশ দেখা যায়।

এপিগাইনস—সপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণী বিশেষ; যাদের ফুলের দলপত্র ও রেণুস্থলীবাহী পরাগ-দণ্ডগুলি (স্ট্যামেন ↑) গর্ভাশয়কে (ওভারি ↑) চক্রাকারে পরিবেষ্টিত করে রাখে। অভ্যন্তরীণ পথে (চিত্রে ফুলের অভ্যন্তর ↑) রেণুনিষেকের ফলে এদের গর্ভাশয়ে বীজ জন্মায়।

এপিগাইনস

এপিডার্মিস — বহিস্ত্বক; বৃক্ষপত্র বা গাত্রচর্মের উপরের পাতলা পর্দা বা ত্বক। সাধারণ কথায় আমরা যাকে 'মৃগছাল' বলি।
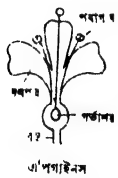
এপিডায়াস্কোপ—ছায়াচিত্রের এক রকম যন্ত্র বিশেষ। একে এপিস্কোপ ও ডায়াস্কোপ উভয় প্রক্রিয়াতে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ ব্যবস্থায় এতে চিত্রিত স্বচ্ছ স্লাইড বা ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর আলোক-রশ্মি ফেলে দেয়াল বা পর্দার উপরে সোজাসুজি
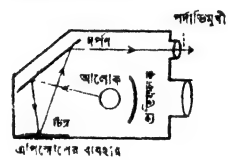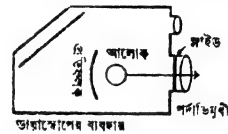
এপিডায়াস্কোপ

তার ছবির প্রতিচ্ছায়া ফেলা যায়। প্রতিফলক লেন্সের সাহায্যে তীব্র আলোক-রশ্মি সংহত হয়ে স্লাইড বা ফিল্মের ভিতর দিয়ে পর্দার উপর গিয়ে ছায়াছবি পড়ে। এই ব্যবস্থায় এ-যন্ত্রকে বলে **ডায়াস্কোপ**। এপিস্কোপের কৌশলও প্রায় অনুরূপ; কেবল এর মধ্যে আলোক-রশ্মি একটা দর্পণে প্রতিফলিত করে প্রত্যক্ষভাবে কোন বস্তু বা ছবির উপর ফেলা হয়, তা থেকে প্রতিফলিত রশ্মি আবার ওই দর্পণেই পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে পর্দায় ছায়া ফেলে। চিত্র থেকে উভয় ব্যবস্থার পার্থক্য সহজেই মোটামুটি বুঝা যাবে।

এপিজিল — হাইপোজিল ↑ ।

এপিফাইট — ফার্ন ↑ জাতীয় এক শ্রেণীর পরগাছা, যা অপর কোন উদ্ভিদের গায়ে জন্মে বেড়ে ওঠে, কিন্তু সেই অবলম্বন-বৃক্ষের রস এরা সাধারণতঃ শোষণ করে না। এই শ্রেণীর সাধারণ একটা 'অর্কিড' ↑ প্রদত্ত চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এপিফাইট

এপিফিসিস্ — কঠিন অস্থির অগ্রভাগের পরিবর্ধিত কোমল ও অপরিপুষ্ট তরুণাস্থি (কার্টিলেজ ↑), যার গঠন অনেকটা স্পঞ্জের মত। বাল্য ও কৈশোর বয়সের এই তরুণাস্থিই পরিণত বয়সে ক্রমে শক্ত হয়ে প্রকৃত অস্থিতে পরিণত হয়।

এফারভেসেন্ট লিক্যুইড — প্রচুর গ্যাস উৎপাদক তরল পদার্থ। গ্যাসীয় পরিপৃক্ততার বা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে তরল পদার্থ থেকে বুদ্‌বুদের আকারে প্রভূত গ্যাস উত্থিত হতে থাকে; সোডা-ওয়াটারে ↑ যেমন দেখা যায়। সিড্‌লিট্‌জ ↑ পাউডারে জল দিলেও এরূপ **এফারভেসেন্স** ঘটে।

এফিমেরিস—গ্রহাদির দৈনিক গতিপঞ্জী; গগনমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির আপাত গতিজনিত পরিদৃষ্ট তুলনামূলক অবস্থানগুলোর নির্দেশক পর্যবেক্ষণ-লিপি।

এফিমেরপ্টেরা — দিনজীবী পতঙ্গ বিশেষ; যেমন, 'মে-ফ্লাই' নামক পতঙ্গ, যারা মাত্র একদিন জীবিত থাকে, দিনের শেষে মরে যায়। আবার **এফিমেরাল** মানে স্বল্পজীবী প্রাণী, যারা অল্প সময় মাত্র বেঁচে থাকে এবং স্বভাবতঃই মরে যায়। এই শ্রেণীর ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতঙ্গও অনেক আছে।

এফিমেরপ্টেরা

এফেড্রিন — চীনদেশীয় এক প্রকার উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌কালয়েড ↑ ভেষজ পদার্থ। মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লেগে বা হাঁপানি রোগে অনেক সময় রোগীর নাসিকা ও গলদেশে যে অত্যধিক রক্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চার হয় তা হ্রাস করবার জন্যে এবং হৃৎপিণ্ড সতেজ রাখতে ঔষধ হিসেবে এটা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

এবোনাইট — খুব শক্ত কালো এক রকম পদার্থ, রাবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তৈরী। এতে গন্ধকের পরিমাণ সাধারণতঃ থাকে 30%; একে 'ভাল্কেনাইট' ↑, অথবা 'ভাল্কেনাইজ্‌ড রাবার' ও ↑ বলা হয়। জিনিসটার তড়িৎ বা তাপ পরিবহনের ক্ষমতা নেই বলে বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়।

এমব্রায়ো — ভ্রূণ ; মাতৃগর্ভস্থ জীব-শিশু (ফিটাস ↑)। উদ্ভিদের বীজে, অথবা জীবমাতার গর্ভাধারে অবস্থিত ক্রমবর্ধমান পূর্ণাঙ্গ জৈবকোষ।

এমব্রায়ো

এমব্রায়োলজি — ভ্রূণবিদ্যা, গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। পরিপুষ্ট ও স্বয়ংক্রিয় হয়ে জন্মাবার পূর্বে কোন জীবের জীবনেতিহাসের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা।

এমারি — কোরাণ্ডাম ↑ নামক খনিজ অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড ও আয়রন-অক্সাইড গুঁড়া করে মিশিয়ে এমারি তৈরী হয়। অত্যন্ত কঠিন বলে এ দিয়ে ঘসে ধাতব পদার্থ পরিষ্কার করা হয়। মোটা কাগজে এমারি-চূর্ণ শিরিষের আঠার সাহায্যে লাগিয়ে তৈরী করা হয় 'এমারি-পেপার'।

এলিমেণ্ট—মৌলিক পদার্থ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম — এই পাঁচটিকে মৌলিক পদার্থ হিসেবে 'পঞ্চভূত' আখ্যা দিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ-গুলোকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না। এমন কি, এদের সবগুলো পদার্থের সংজ্ঞার মধ্যেও পড়ে না ; যেমন—তেজ হলো শক্তি, পদার্থ নয়। যে সব পদার্থ একই প্রকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, কোন রকম বিশ্লেষণেই যে পদার্থে অন্য কোন গুণ বা ধর্মের অণু-পরমাণু মেলে না, তাদের বলে এলিমেণ্ট বা মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীতে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে ; অপরাপর যাবতীয় পদার্থই ওই সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন যৌগিক রূপ। ইদানিং আরও ছয়টি দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—কাজেই এখন মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 98-টি বলা যায়। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থায়ই থাকতে পারে। (পরিশিষ্টে মৌলিক পদার্থগুলোর তালিকা ↑)।

এস্টার — বিশেষ এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ ; যা বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যালকোহলের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় ; যেমন—ইথাইল অ্যাল্-কোহল ↑ ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিলনে হয় 'ইথাইল অ্যাসিটেট ; যাকে ইথাইল বা অ্যাসিটিক-এস্টারও বলে। প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ তৈল ও চর্বিতে বিভিন্ন রকম এস্টার যুক্ত রয়েছে। কোন কোন শ্রেণীর এস্টার সুগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ ; তাই সেগুলো সুগন্ধী প্রসাধন দ্রব্য, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

এসেন্সিয়্যাল অয়েল—স্বভাবজাত

সুগন্ধী তৈল জাতীয় জৈব পদার্থ; বিভিন্ন ফুলে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মায়। রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে এগুলো 'এস্টার' ↑ শ্রেণীর জৈব যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আজকাল অনুরূপ সুগন্ধী কৃত্রিম তৈল তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে।

ও

ওঅ্যারলেস — বেতার; কোনরূপ তারের যোগাযোগ ব্যতীতই সঙ্কেত, অথবা শব্দ দূরে প্রেরণের কৌশল। ইলেকট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গপ্রবাহের সাহায্যে এরূপ শব্দ-সঙ্কেত প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ওঅ্যারলেস বা বেতার-যন্ত্রে এরূপ তড়িৎ-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের কৌশল ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কোনি 1895 খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন।

ওকার — মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি-মিশ্রিত অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ফেরিক-অক্সাইড (Fe_2O_3); লৌহ ও অক্সিজেনের যৌগিক খনিজ পদার্থ বিশেষ। হলদে আভাযুক্ত লাল বর্ণের জন্য জিনিসটা সাধারণতঃ রং বা পেইন্ট হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ওজোন — অক্সিজেন গ্যাসের প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত (O_2); কোন প্রকারে তিনটি অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হলে সৃষ্টি হয় ওজোন গ্যাস (O_3)। এজন্যে ওজোন হলো অক্সিজেনের একটি অ্যালোট্রোপ ↑। গ্যাসটা সামান্য নীলাভ, বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন, বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান। সমুদ্র-তীরের বায়ুতে ওজোনের ভাগ বেশী বলে সমুদ্রবায়ু স্বাস্থ্যকর। বায়ু বা অক্সিজেনের মধ্যে নিঃশব্দ মৃদু তড়িৎ-স্ফুরণের ফলে ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ওজোনাইড — ওজোন ↑ ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম। কোন জৈব যৌগিকের দুইটি কার্বন পরমাণুর অনাবদ্ধ ভ্যালেন্সি ↑ বণ্ডের মধ্যে ওজোন-পরমাণু সংবদ্ধ হয়ে যে যৌগিকের সৃষ্টি হয়; যেমন— ইথিলিন ওজোনাইড।

ওপ্যাল — মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, সাধারণতঃ এটা 'গোদন্ত-মণি' নামে পরিচিত। জিনিসটা দুধের মত সাদা, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল; ভিতরে বিভিন্ন বর্ণের চাকচিক্য দেখা যায়।

ওপেক — অস্বচ্ছ; যার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না; যাতে আলোকরশ্মি প্রতিহত হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। যেমন, কাঁচ হলো স্বচ্ছ বা 'ট্রান্সপ্যারেণ্ট' পদার্থ; কিন্তু কাঠ অস্বচ্ছ বা ওপেক পদার্থ।

ওপেন হার্থ প্রোসেস — কাঁচা লোহাকে স্টিলে ↑ রূপান্তরিত করবার

একটা প্রণালী। চিত্রে প্রদর্শিত বিশেষ ধরণের চুল্লী বা ফার্নেসে কাঁচা লোহাকে (কাস্ট আয়রন ↑) মরিচা-ধরা পুরাতন টুকরা লোহা

ওপেন হার্থ
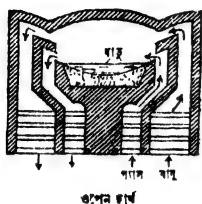
প্রভৃতি সহ একসঙ্গে দ্রবীভূত করা হয়। লোহার মরিচার (আয়রন অক্সাইডের) অক্সিজেনে ঐ গলিত লোহের সঙ্গে সংমিশ্রিত পদার্থাদি ও ফার্নেসের তলদেশস্থ আস্তরণের চুন ও বালুকা অক্সিডাইজ্ড ↑ হয়ে যায়। বিশেষ ব্যবস্থায় অত্যুত্তপ্ত প্রোডিউসার ↑ গ্যাস তখন ঐ তরল লোহের উপরে প্রবাহিত করা হয়। মোটামুটি এই রকম প্রক্রিয়ায় তরল লোহের সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ কার্বনের সংমিশ্রণে স্টিল ↑ বা ইস্পাত তৈরী হয়ে থাকে।

ওভাম—ডিম্বাণু; স্ত্রী-প্রজনন কোষ (প্রায় ·01 ইঞ্চি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ডিম্বাকার জৈব পদার্থ)। একটা সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আবরণে আবৃত এই জীবন-কণার সঙ্গে গর্ভাশয়ের ভিতরে পুং-প্রজনন কোষের মিলন ঘটলে উভয়ের কেন্দ্রীনস্থ ক্রোমোসোমের ↑ পারস্পরিক মিলনে ভ্রূণের (এম্ব্রায়ো ↑) সৃষ্টি হয়। বহুবচনে **ওভা**, ডিম্বাণুগুলি।

ওভারি — গর্ভাশয় বা গর্ভাধার; জননী-জঠরস্থ যে জৈবাধারে ডিম্বাণুর (ওভাম ↑) উৎপত্তি ঘটে। উদ্ভিদের বীজাধারকেও ওভারি বলে—ফুলের নিম্নাঙ্গের যে আধারে ডিম্বকোষের সঙ্গে পরাগ-রেণুর মিলনে বীজ সৃষ্টি হয় (পিষ্টিল ↑)।

ওম্ — পদার্থমাত্রই তড়িৎ-প্রবাহে কিছু-না-কিছু বাধা দেয়; যে পদার্থে এই বাধা যত কম পদার্থটা তত ভাল তড়িৎ-পরিবাহী হবে। তড়িৎশক্তি পরিবহনে পদার্থের এই স্বাভাবিক বাধা পরিমাপের একক হলো ওম্। কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের এই বাধা এক 'ওম্' হবে, যদি এক ভোল্ট ↑ তড়িৎ-চাপের ফলে ওর মধ্যে মাত্র এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয়। সাধারণ ইলেক্ট্রিক লাইটের ফিলামেণ্টের ↑ মধ্যে তড়িৎ-পরিবহনের এই বাধার পরিমাণ সচরাচর প্রায় 400 থেকে 700 ওম্ হয়ে থাকে।

ওম্স-ল — কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের তারের মধ্যে প্রবাহিত তড়িৎশক্তি ওর প্রান্তদ্বয়ের তড়িৎ-চাপের (ভোল্টেজ ↑) পার্থক্যের সঙ্গে আনুপাতিক হয়ে থাকে। যেমন — দুই ভোল্ট ↑ তড়িৎ-চাপ থাকলে যদি এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তাহলে চার ভোল্ট

তড়িৎ-চাপে দুই অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হবে। এভাবে দেখা যায়, কোন পদার্থের তড়িৎ-চাপ (ভোল্ট) ÷ তড়িৎপ্রবাহ (অ্যাম্পিয়ার ↑) = তড়িৎপ্রবাহের বাধা (ওম্‌স)।

ও বে লি য়া — উদ্ভিদাকৃতি জলজ জীবাণু বিশেষ। এক রকম জীব-কোষের গায়ে গুটিকার উদ্ভব হয়ে ক্রমে বৃক্ষশাখার ন্যায় বর্ধিত হতে থাকে এবং আবার তাতে নূতন গুটিকা গজায়। এভাবে গুটিকা ও বৃন্তের নব নব উদ্গমে সবটা উদ্ভিদের মত শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট দেখায়। ঐ গুটিকাগুলির এক-একটা মুখ-গহ্বর থাকে, যার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে তারা সংবর্ধিত হয়। এগুলি আবার ক্রমে মূল দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে জলে ভেসে বেড়ায় এবং নূতন ওবেলিয়া সৃষ্টি হয়। (চিত্রে × 500 বর্ধিত)

ওবেলিয়া

ওয়াট্ — শক্তি পরিমাপের একক ; প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত বা ব্যয়িত হয়। এক ওয়াট হলো প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল ↑ শক্তির সমান। সাধারণতঃ তড়িৎ-শক্তির পরিমাপ করতেই ওয়াট কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় ; ইলেকট্রিক ল্যাম্পের তড়িৎ পরি-বহনের ক্ষমতা ওয়াটে বুঝানো হয়। ডি.সি. তড়িৎ-প্রবাহের অ্যাম্পিয়ার সংখ্যাকে তড়িৎ-চাপের ভোল্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে তড়িৎশক্তির পরিমাপক এই ওয়াট সংখ্যা। 1000 ওয়াট = 1 কিলো-ওয়াট = $1\frac{1}{3}$ হর্স-পাওয়ার ↑ (অশ্ব-শক্তি)।

ওয়াটার অব ক্রিষ্ট্যালিজেসন — স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের সঙ্গে যে-জলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিক (ক্রিস্ট্যাল ↑) গঠনে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক জলীয় অণু সংযুক্ত হয়। আবার কোনরূপে এই জল বিশুষ্ক বা বিদূরিত করলে স্ফটিকের আকার ও গঠন নষ্ট হয়ে যায়। কপার সাল্‌ফেট, অর্থাৎ তুঁতের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে জলের পাঁচটি অণু মিলে কপার-সাল্‌ফেটের স্ফটিক গঠিত হয় ($CuSO_4 . 5H_2O$); ফিট্‌কিরি বা অ্যালামের ↑ স্ফটিকে থাকে 24টি জলীয় অণু।

ওয়াটার গ্যাস—এক রকম জালানি গ্যাস ; কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। উত্তপ্ত কয়-লার উপর জলীয় বাষ্পের প্রভাবে উৎপন্ন হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে ওয়াটার (জলীয়) গ্যাস। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে কয়লার স্তর উত্তপ্ত করে তার মধ্যে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। জলীয় বাষ্পে কয়লা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আবার

উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ চালান হয়। বার বার এরূপ করবার ফলে কয়লা আংশিকভাবে পুড়ে ওই সংমিশ্রিত জ্বালানি গ্যাসের উদ্ভব হয়।

ওয়াটার গ্লাস — সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেটের ↑ ঘন জলীয় দ্রব। পদার্থটা কাঁচের মত স্বচ্ছ। কোন জিনিসের উপর এর একটা পাতলা আবরণ দিলে হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না। এভাবে অনেক সময় ডিম সংরক্ষণ করা হয়। এ দিয়ে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করাও চলে। সাবান ও পেষ্টবোর্ড শিল্পে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েথাকে।

ওয়াটার ইকুইভ্যালেন্ট — কোন বস্তুর উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপশক্তি (ক্যালোরি ↑) শোষিত হয় তাতে যতটা জলের (অনুরূপ) এক ডিগ্রি উষ্ণতা-বৃদ্ধি ঘটে, সেই ওজন-পরিমাণই হলো ঐ বস্তুর ও ই.। অন্য কথায় বলা যায়, কোন বস্তুর তাপ-ধারণের শক্তি (থার্মাল ক্যাপাসিটি ↑) যে পরিমাণ জলের তাপধারণ-শক্তির সমান তাই হলো বস্তুটার ও. ই.। যেমন—কোন একটা লোহখণ্ডের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ বৃদ্ধি করতে যদি 200 ক্যালোরি তাপশক্তি (হিট্ ↑) ব্যয়িত হয় তাহলে ঐ 200 ক্যালোরিতে যতটা জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে;—আমরা জানি, 200 ক্যালোরি তাপে 200 গ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ জল এক ডিগ্রি উষ্ণ হয়; কাজেই ঐ লোহখণ্ডের ও. ই. হলো 200 গ্র্যাম।

ওয়াটার পাওয়ার — জলপ্রবাহের বেগ-শক্তিতে চালিত টারবাইন ↑ প্রভৃতির যান্ত্রিক কৌশলে উৎপাদিত তড়িৎশক্তি। (হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার ↑)

ওয়াটার মার্ক—জলছাপ (কাগজে), কাগজের ভিতরে কোন লেখা বা ছবির যে স্বচ্ছ ছাপ থাকে; কাগজটা আলোর দিকে ধরলে যা দেখা যায়। কলে কাগজের মণ্ড একটা পাটাতনের উপরে রোলারের সাহায্যে পিশে মসৃণ ও সমতল পাতে পরিণত করা হয়। এই রোলারের গায়ে প্রয়োজনীয় লেখা বা ছবির সামান্য উঁচু ছাচ বসানো থাকে, বিশেষ ব্যবস্থায় তারই ছাপ কাগজে অঙ্কিত হয়ে যায়।

ওয়াটার লাইন — খালি অবস্থায় জাহাজের খোলের নিমজ্জন-সীমা, অর্থাৎ কেবলমাত্র স্বকীয় ওজনে কোন জাহাজের খোল যে দাগ পর্যন্ত জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে ভেসে থাকে। সর্বাধিক বোঝাই হয়ে খোলের যে দাগ পর্যন্ত জলে ডুবলে জাহাজ নিরাপদ থাকবে তাকে বলে **লোড্ ওয়াটার লাইন**।

ওয়াটার্ড সিল্ক—বিভিন্ন ডিজাইনে কুঞ্চিত এক রকম রেশম বস্ত্র; এর

ব্যবহারিক নাম 'মস্বরে' সিল্ক। জলসিক্ত রেশম-বস্ত্র কৌশলে নানাভাবে ছোট ছোট ভাঁজে রেখে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড চাপ দিয়ে এরূপ কোঁচকানো সিল্ক তৈরি করা হয়। আবার নানারকম দাগ-কাটা রোলারে চেপেও এরূপ রেশম-বস্ত্র তৈরী করা যেতে পারে।

ওয়ার্ক — (বৈজ্ঞানিক অর্থে) শক্তি প্রয়োগে কোন বস্তুকে যদি কোন বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব প্রতিহত করে স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে ঐ প্রযুক্ত শক্তির ফলে ওয়ার্ক বা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, বলা হয়। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভিটেসন ↑) বিরুদ্ধে দৈহিক শক্তির প্রয়োগে কোন বস্তু উত্তোলিত হলে দৈহিক-শক্তি ঐ বস্তুর উপরে একটা ওয়ার্ক সম্পন্ন করলো। ওয়ার্কের পরিমাণ = প্রযুক্ত শক্তি × স্থানান্তরের পরিমাণ (উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য)। ওয়ার্কের সাধারণ একক হলো ফুট পাউণ্ড বা আর্গ ↑ ।

ওয়াশ লেদার — রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক রকম অতি কোমল মেষ-চর্ম, যা দিয়ে কাচ ও ধাতব পদার্থাদি ঘসে পরিষ্কার বা পালিশ করা হয় (স্যাময় লেদার ↑)।

ওয়াশিং সোডা — সাধারণ কাপড়-কাঁচা সোডা ; সাদা, ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। অবিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট ($Na_2CO_3 . 10H_2O$)।

ওয়াশার — বল্টু বা স্ক্রু শক্ত করে আঁটবার জন্যে তাতে চামড়া বা কোন ধাতু-নির্মিত ছিদ্র-যুক্ত যে চাকতি পরানো হয়।

ওয়েল্ডিং — ধাতব পদার্থ জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া ; অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম ↑ ।

ওয়েভ লেংথ — তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ; আলোক, শব্দ, বেতার প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নরূপ তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। স্থির জলে একটা ঢিল ফেললে যেমন জলের তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এদেরও তেমনি হয়। একে বলে শক্তির তরঙ্গ-গতি (ওয়েভ-মোশন)। বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের আকার ও দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এরূপ

ওয়েভ লেংথ

কোন একটি তরঙ্গের এক শীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গের অনুরূপ শীর্ষের ব্যবধান বা দূরত্বের মাপকে বলে ওয়েভ-লেংথ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। দৃশ্য আলোক-রশ্মির ওয়েভ-লেংথ মোটামুটি 4×10^{-5} থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার ↑ ; এক্স-রশ্মির ↑ ওয়েভ লেংথ প্রায় 10^{-6} থেকে 10^{-9} সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। 10^{-5} সেন্টিমিটার = ·00001, অর্থাৎ এক

সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

ওয়েভ ব্যাণ্ড — বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের (ওয়েভ লেংথ ↑) তরঙ্গ সমাবেশে গঠিত মিশ্র তরঙ্গ-শ্রেণী; যেমন লং ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ ও সর্ট ওয়েভ (পরিশিষ্টে রেডিও-তরঙ্গ ↑)। রেডিও যন্ত্রে 'মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ড' বলতে 100 থেকে 1000 মিটার ↑ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-শ্রেণী বুঝায়।

ওয়েট অ্যাণ্ড ড্রাই বাল্‌ব থার্মোমিটার — হাইগ্রোমিটার ↑ ।

ওয়েদার সিপ — আবহাওয়ার (বায়ুর চাপ, গতি, আর্দ্রতা প্রভৃতি) অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে বিশেষতঃ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে যে সকল জাহাজ নিয়মিত চলাচল করে। আন্তর্জাতিক বিমান পোত ও জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে এগুলি থেকে আবহাওয়ার বিবরণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির অনেকগুলি জাহাজ এই কাজে নিযুক্ত আছে (মিটিরিওলজি ↑)।

ওয়েষ্টন সেল—নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির ভোল্টেজ ↑ বিশিষ্ট তড়িৎ-উৎপাদক এক রকম যন্ত্র বা সেল ↑ । মার্কারি, ক্যাড্‌মিয়াম ↑ ও এদের সাল্‌ফেট ↑ সল্টের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এজাতীয় সেলে ↑ নির্দিষ্ট ভোল্টেজের তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এতে 20° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় স্থিরভাবে 1·0183 ভোল্ট ↑ তড়িৎ উৎপাদিত হয় বলে ইহা প্রামাণ্য সেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক

কক্‌, রবার্ট—জার্মান জীবাণুবিজ্ঞানী, জন্ম 1843 খৃঃ, মৃত্যু 1910 খৃঃ। জীবাণুবিদ্যার গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব, প্রায় পাস্তুরের ↑ সমকক্ষ। যক্ষ্মা ও কলেরা রোগোৎপাদক জীবাণু আবিষ্কার; অ্যান্থাক্স ↑ রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবন। 1905 খৃঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। কলেরার জীবাণু ও তাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি আবিষ্কার করেন কক্‌, স্পেনীয় বিজ্ঞানী ফেনার তার প্রতিষেধক টিকা বার করেন, যার পদ্ধতি আবার সংশোধন করেন ফরাসী বিজ্ঞানী ডাঃ হপ্‌কিন ↑ । বর্তমানে বিজ্ঞানী কোলে প্রবর্তিত কলেরার প্রতিষেধক টিকা প্রচলিত আছে।

কন্‌জার্ভেসান অব এনার্জি—শক্তির অবিনশ্বরতা। জগতে কোন রকম শক্তিই মূলতঃ সৃষ্টি করা যায় না, শক্তির বিনাশও নেই; এক রকম শক্তিকে অন্য রকম শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় মাত্র। ইলেক্‌ট্রিক হিটার, স্টোভ প্রভৃতিতে

তড়িৎ-শক্তিকে তাপ শক্তিতে পরিণত করা হয়। ইঞ্জিনে কয়লার তাপ-শক্তিকে কৌশলে গতীয় শক্তিতে (কাইনেটিক এনার্জি ↑) রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু মূলতঃ আমরা কোন শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না, বা কোন শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করাও যায় না। এই ব্যাপারটাকেই বলে 'প্রিন্সিপ্‌ল অব কন্‌জার্ভেশান অব এনার্জি'। এ কথা পদার্থের বেলায়ও সত্য; পদার্থেরও সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, বিভিন্ন ব্যাপারে পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র। একে বলে 'কন্‌জার্ভেশান অব ম্যাটার,' বা পদার্থের অবিনশ্বরতা।

কঞ্জাংটিভা — চক্ষুগোলকের উপরিভাগে বিস্তৃত স্বচ্ছ আচ্ছাদন-পর্দা; যার মধ্যভাগ মোটা হয়ে চোখের কৃষ্ণ-তারকা অংশের সৃষ্টি হয়েছে।

কঞ্জাংটিভার ওই মধ্যভাগকেই বলা হয় কর্ণিয়া ↑ ।

কণ্ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স — প্রত্যক্ষ সংযোগশূন্যভাবে কোন উত্তেজকের প্রভাবে জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া স্বতঃই প্রকাশ পায় তাকে বলে **রিফ্লেক্স**, অর্থাৎ স্বাভাবিক জৈব প্রতিক্রিয়া; যেমন— সামনে খাদ্য দেখলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জিবে স্বভাবতঃই জল আসে। এখানে খাদ্য হলো বাহিরের উত্তেজক, আর তার রিফ্লেক্স হলো লালা-নিঃসরণ। বিশেষ শিক্ষা বা অভ্যাসের ফলে এরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কার্য-কারণ বদলে গেলেও জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় তাকে বলে কণ্ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স, বা নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া। যেমন — একটা ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাদ্য পরিবেশনের সময়ে প্রতিবারেই যদি ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তাহলে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দেখল, আর কুকুরের জিবে জল এল। এভাবে কিছুদিন অভ্যস্ত হলে ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরটার জিবে জল আসবে, তার জন্যে আর খাদ্যের আবশ্যক হবে না। একেই বলে ক.রি.। খাদ্যের গন্ধে বা দর্শনে লালা আসে, এই স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের পরিবর্তে কণ্ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স হলো ঘণ্টাধ্বনির প্রভাবে লালা সৃষ্টি। শারীর বিজ্ঞানের এই তথ্য ও তাৎপর্যাদি সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন রাশিয়ার স্বনামধন্য বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভ ↑ ।

কণ্টুর লাইন —মানচিত্রে যে-সকল রেখা টেনে কোন দেশের সমান উচ্চতা-বিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান সমূহ দেখানো হয়।

কন্‌ভেক্স লেন্স—উত্তল কাচখণ্ড, বা

লেন্স ↑ ; যে বক্রতল কাচখণ্ডের মধ্যভাগ মোটা, অর্থাৎ যার বক্রতা বাইরের দিকে। আবার মধ্যভাগ ভিতরের দিকে বক্র হলে তাকে বলে অবতল বা **কন্‌কেভ লেন্স**। (লেন্স ↑)

কন্‌ভেক্স লেন্স

কন্‌কেভ্‌ লেন্স

কনিফেরা — মুক্তবীজী উদ্ভিদ ; ফার, পাইন প্রভৃতি জাতীয় যে-সব উদ্ভিদের বীজ কোন বীজাধারে (ওভারি) আবদ্ধ থাকে না। এরূপ উন্মুক্ত বীজোৎপাদক উদ্ভিদকে জাইমোস্পার্ম ↑ ও বলা হয়। বায়ু - প্রবাহের সাহায্যে এদের ফুলে রেণু-নিষেক ঘটার ফলে ওইরূপ বীজ উৎপন্ন হয়। চিত্রে 'প' পাইন, 'ফ' ফার গাছ এবং 'ব' এ-জাতীয় বীজ দেখানো হয়েছে।

কক্রফ্‌ট, স্যার জন ডগ্‌লাস — বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম ইয়র্কশায়ারে 1897 খৃঃ, অদ্যাপি (1954 খৃঃ) জীবিত। পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা। পরমাণু বিজ্ঞানের জটিল তথ্যাদি আবিষ্কারের জন্য 1951 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ। বৃটিশ পরমাণুশক্তি কমিশনের অধিকর্তা হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন।

কম্পাল্‌সন নিউরোসিস—মানসিক রোগ বা মনোবিকার বিশেষ, যাতে রোগী অহেতুক কোন অর্থহীন কাজ নিয়মিতভাবে করতে উৎসুক হয় ; যেমন—পথ চলতে চলতে রাস্তার ধারে প্রত্যেকটা ল্যাম্প পোষ্ট ছুঁয়ে যাবে ; এ-রোগে অকারণ এরূপ একটা মানসিক বাধ্যবাধকতা জন্মায়।

কম্পেন্‌সেসন ব্যালান্স — ঘড়ির এক রকম বিশেষ ধরণের 'ব্যালান্স হুইল', যা এমনভাবে তৈরী যে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতার পরিবর্তনে তার আয়তনের পরিবর্তন ঘটলেও তার ঘূর্ণন বা আবর্তনকালের পরিমাণ ঠিক থাকে, সঠিক সময় নির্দেশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এরূপ তাপ প্রতিষেধক ব্যালান্স হুইলে (চিত্রানুযায়ী) দুদিকের বক্র অংশদ্বয় বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ধাতুদ্বয় বিভিন্ন হারে (কোয়িফিসিয়েন্ট অব এক্সপ্যান্সন ↑) বর্ধিত হওয়ায় অধিকতর বেঁকে যায় এবং উভয় অংশের ভারসাম্য কেন্দ্রাভিমুখী হয়। এর ফলে ঐ হুইল বা চক্রের আবর্তন বা দোলনকাল (পেণ্ডুলাম ↑) সর্বদা সঠিক ও সুনির্দিষ্ট থাকে।
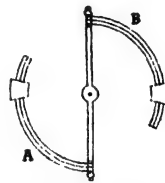
কম্পেনসেসন ব্যালান্স

কম্পোজিটা—সপুষ্পক উদ্ভিদের এক শ্রেণী বিশেষ ; ডেইজি প্রভৃতি যে-সব সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ফুল বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ ফুলের একত্র সমাবেশে গঠিত হয়।

কম্পোস্ট - এক রকম উদ্ভিজ্জ সার ; লতা-পাতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে এরূপ সার প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এর মধ্যে উদ্ভিদের পরিপোষক নাইট্রোজেন-বহুল উৎকৃষ্ট সার জন্মায়।

কমিউটেটর—এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র ; যার সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহের গতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রিক সার্কিটের ↑ তড়িৎ-প্রবাহকে পর পর সংগ্রহ করা, বা কোন তড়িৎ-প্রবাহকে বিভিন্ন সার্কিটে প্রেরণ করবার জন্যেও এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ডায়নামো ↑ যন্ত্রে প্রয়োজনানুসারে অল্টারনেটিং (এ. সি.) ↑ কারেন্টকে ডাইরেক্ট (ডি. সি.) ↑ কারেন্টে পরিবর্তিত করবার জন্যেই এই কমিউটেটর যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়।
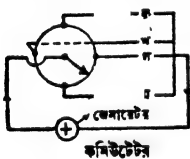
কমিউটেটর

কমেট — ধূমকেতু ; উজ্জ্বল গ্যাসীয় জ্যোতিষ্ক বিশেষ। মহাশূন্যে সুদীর্ঘ অধিবৃত্ত কক্ষপথে এরূপ জ্যোতিষ্ক মহাবেগে ছুটে চলে। সূর্যের আকর্ষণে কদাচিৎ সৌর মণ্ডলে প্রবেশ করায় পৃথিবী থেকে অল্প কালের জন্যে দেখা যায়। এর একটা অত্যুজ্জ্বল কেন্দ্র ও অনুজ্জ্বল দীর্ঘ পুচ্ছ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

করোনা — গ্রহণের (ইক্লিপ্স, সোলার ↑) সময়ে সূর্যের চারদিকে যে সাদা পরিমণ্ডল দেখা যায়। এটা সূর্যের ক্রোমোস্ফিয়ারের ↑ বহির্বলয় অংশ। কুয়াশার দিনে বা ঘসা-কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে সূর্যের চারদিকে এরূপ শ্বেতাভ বলয় দৃষ্ট হয়।

করোনারি আর্টারি—হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলের জন্যে তার দুদিকে যে-দুটি রক্তবহা নল থাকে। **করোনারি থ্রম্বোসিস**, রোগ বিশেষ ; যাতে হৃৎপিণ্ডের এই নলপথের কোথাও রক্ত জমে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে সহসা রোগীর মৃত্যু ঘটে বস্তুতঃ একে করোনারি অক্লুসান ↑ বলাই সঙ্গত।
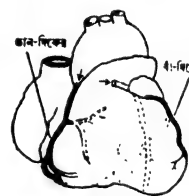
করোনারি আর্টারি

করোনারি সার্কুলেসন—হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল ও সরবরাহের ব্যবস্থা ; যার সাহায্যে শিরা ও ধমনীর পথে সারা দেহে রক্ত চলাচল করে।

করোলা — ফুলের বীজ-কোষের চারদিকে চক্রাকারে সজ্জিত বর্ণ-বৈচিত্র্যময় দলপত্র সমূহ বা স্তবক; এদের প্রধান কাজ হলো ফুলের বীজকোষে রেণু-নিষেকের সাহায্যের জন্যে বর্ণশোভায় প্রলুব্ধ করে কীট-পতঙ্গদের আকৃষ্ট করা।

করোলা

করোসিভ সাব্লিমেট—মার্কিউরিক ক্লোরাইডের ($HgCl_2$) এক বিশেষ নাম। বিষাক্ত পদার্থ বলে জীবাণু-নাশক ঔষধাদিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়; ফটোগ্রাফিতেও ↑ এর কিছু ব্যবহার আছে। **করোসন** মানে ক্ষয় বা জারণ, **করোসিভ** মানে যার সংস্পর্শে পদার্থাদি ক্ষয়ে যায়; যেমন অ্যাসিডের সংস্পর্শে ধাতব পদার্থ ক্ষয়ে যায়, বা জারিত হয়।

কস্টিক অ্যাল্‌কালি — কস্টিক পটাস (পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, KOH) এবং কস্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, NaOH)। এগুলো অত্যন্ত ক্ষারধর্মী, হাতে লাগলে হাত জ্বলে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এই দু'রকম কস্টিক অ্যাল-কালির ↑ যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

কস্‌মিক-রে — মহাজাগতিক রশ্মি। মহাশূন্য থেকে অতি সূক্ষ্ম বিভিন্ন মৌলিক কণিকা, বিশেষ করে তড়িতাবিষ্ট (আয়ন ↑) কণিকা সমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এসে পৃথিবীপৃষ্ঠে অহরহঃ বর্ষিত হচ্ছে। এই তড়িৎ-কণিকার অজস্র ধারা আসছে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে, আর তা অদৃশ্য আলোক-রশ্মির মত মহাশূন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় এদের সংগঠক নিউট্রন, প্রোটন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন কণিকার পরস্পর সংঘাতে মেসন ↑ নামে এক রকম নূতন কণিকার সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠে যে কস্‌মিক রশ্মি পৌঁছায় তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এই মেসন-কণিকা। জগতের সৃষ্টি-রহস্যের মূলে এই অদৃশ্য রশ্মির প্রভাব কতখানি তা বিশেষ গবেষণার বিষয়।

কসমোগনি — বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের আলোচনা-বিজ্ঞান; গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি বা উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা।

কস্‌মোলজি — জ্যোতির্বিজ্ঞানের শাখা; বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আকার, আয়তন, গতিপ্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্কাদি বিষয়ক তত্ত্বীয় বিজ্ঞান।

কাইনেম্যাটিক্স — গতিবিজ্ঞান; কোন চলমান বস্তুর গতিবেগ, ত্বরণ (অ্যাক্সিলারেসন ↑), শক্তি, ভর প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত।

কাইনেটিক এনার্জি—গতীয় শক্তি; গতির প্রভাবে চলমান বস্তুতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়; যেমন, জল-

স্রোত বা বায়ুপ্রবাহের বেগশক্তি, যার প্রভাবে টার্বাইন↑, উইণ্ড মিল↑ প্রভৃতি চলে। এই শক্তি আর্গ↑ বা ফুট-পাউণ্ড্যাল↑ এককে পরিমিত হয়ে থাকে। এর পরিমাণ নির্ধারণের সূত্র হলো $E = \frac{1}{2}mv^2$ (এখানে E হলো এনার্জি বা শক্তি, m হলো বস্তুর মাস্↑ বা ভর, আর v হলো বস্তুটার গতিবেগ।)

কাইমোগ্রাফ — শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎ-স্পন্দন প্রভৃতির গতি-নির্দেশক এক রকম যন্ত্র বিশেষ। এ-যন্ত্রে ভূষাকালি মাখানো একটা গোলাকার পাত্রের গায়ে এক রকম কলমের অগ্রভাগ লাগানো থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় দেহের সংস্পর্শে ওই কলম বিভিন্ন স্পন্দনের গতি অনুযায়ী কম্পিত হয় এবং তড়িৎ-প্রভাবে ঘূর্ণায়মান পাত্রটার গায়ে রেখাপাত করে।
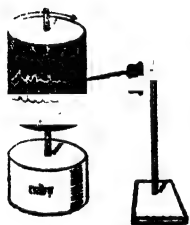
কাইমোগ্রাফ

কার্টিলেজ — তরুণাস্থি; প্রাণীদেহের নরম হাড়; উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়ামের↑ অভাবে অপরিপুষ্ট এরূপ অস্থি নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। শিশুদের দেহে যথেষ্ট কার্টিলেজ থাকে, যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম পেয়ে পরিপুষ্ট ও কঠিন হাড়ে পরিণত হয়।

কার্ডিনাল — প্রধান, সবিশেষ প্রয়োজনীয়; যেমন— কম্পাস↑ যন্ত্রের 'কার্ডিনাল পয়েণ্টস' হলো পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি দিক-নির্দেশক বিন্দু চতুষ্টয়।

কার্ডিয়াজল — কর্পূর (ক্যাম্ফর↑) থেকে প্রস্তুত এক প্রকার রাসায়নিক ভেষজ পদার্থের ব্যবহারিক নাম। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের উপরে এর ভেষজ-উত্তেজক প্রভাবের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন নার্কোটিক↑ পদার্থাদির বিষক্রিয়া প্রশমনে এবং কোন কোন মানসিক রোগেও পদার্থটা ব্যবহৃত হয়।

কার্নালাইট — পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নিসিয়াম-ঘটিত আকরিক লবণ বিশেষ; কোন কোন লবণ-হ্রদের বিশুষ্ক তলদেশে খনিজ আকারে পাওয়া যায়। এটা কখন কখন জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক পটাসের↑ প্রধান খনিজ উৎস।

কার্নিভোরা — মাংসভুক প্রাণিগোষ্ঠি; যেমন— সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি। গরু, ছাগল হলো হার্বিভোরা↑, মানে তৃণভুক প্রাণী।

কার্বন — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন C, পারমাণবিক ওজন 12·01 পারমাণবিক সংখ্যা 6; এটা খনিজ

কয়লা, কাঠ-কয়লা, ভূ ষা কা লি, গ্র্যাফাইট ↑, হীরক প্রভৃতি পদার্থের প্রধান মৌলিক উপাদান। খাদ্যের কার্বন-অংশের দহনক্রিয়ার ফলেই জীবদেহে তাপ ও শক্তির সঞ্চার হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন কার্বাইড ↑ সল্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাতাসে কিছু কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে, এজন্যে চূণের জল খোলা বাতাসে রাখলে সাদা হয়ে যায়, ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী হয়। জীবের দেহাভ্যন্তরে শ্বাসবায়ুর অক্সিজেন খাদ্যের কার্বন-উপাদানকে

কার্বনের চক্রগতি
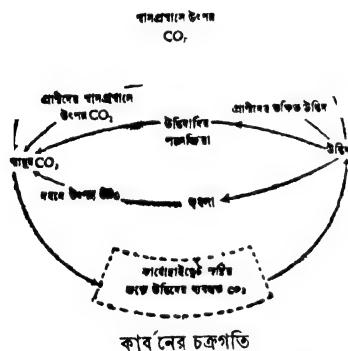
পুড়িয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ↑ গ্যাস সৃষ্টি করে, আর তা প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে বায়ুতে মিশে যায়। এদিকে উদ্ভিদ আবার সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে তার কার্বন অংশ আত্মস্থ করে দেহের পুষ্টি সাধন করে, আর অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। আবার এভাবে উৎপন্ন কার্বন-বহুল উদ্ভিজ্জ খাদ্যাদি খেয়ে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। এসব প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় কার্বন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছে; এই ব্যাপারটাকে বলে **কার্বন সাইকৃল** বা কার্বনের চক্র-গতি। এভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক থাকছে, জীব-জগৎ রক্ষা পাচ্ছে।

কার্বনিফেরাস রক — ভূ-স্তরের অঙ্গারীভূত কঠিন শিলা; ভূগর্ভের যে স্তরে কয়লা সঞ্চিত আছে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর এই অঙ্গারশিলা-স্তর প্রায় 25 কোটি বছর পূর্বে গঠিত হয়েছে।

কার্বনিক অ্যাসিড — কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের জলীয় দ্রব, H_2CO_3, অত্যন্ত মৃদু একটা অ্যাসিড। উন্মুক্ত রাখলে এর প্রায় সম্পূর্ণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সল্টই হলো বিভিন্ন **কার্বনেট**। অনেক সময় এ থেকে (অ্যাসিড সল্ট ↑) বাইকার্বনেটও সৃষ্টি হয়ে থাকে। চাপ প্রয়োগ করে কৌশলে প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত ও সম্পৃক্ত করে সোডা ওয়াটার ↑ তৈরী করা হয়; মূলতঃ জিনিসটা 'কার্বনিক অ্যাসিড'।

কার্বলিক অ্যাসিড — এর অপর নাম ফিনল ↑ ; রাসায়নিক সূত্র C_6H_5OH ; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়, বিষাক্ত পদার্থ, তীব্র অ্যাসিড-ধর্মী, যাতে লাগে তা পুড়ে ক্ষয়ে যায়। একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বীজাণুরোধক (ডিস্‌ইন্‌ফ্যাক্টাণ্ট ↑) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; রং ও প্লাস্টিক ↑ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

কার্বাইড — কার্বাইড নানা রকমের হতে পারে, বিশেষভাবে 'ক্যালসিয়াম কাবাইড' বুঝায়; ক্যালসিয়াম ও কার্বনের যৌগিক পদার্থ, CaC_2 ; বিশুদ্ধ অবস্থায় সাদা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ এক রকম ধূসর বর্ণের কঠিন পদার্থরূপেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে জল দিলে এসিটিলিন ↑ গ্যাস (C_2H_2) জন্মায়, যা বার্ণারে জ্বালালে আলো দেয়। একেই বলে 'কার্বাইড লাইট'। ক্যালসিয়াম অক্সাইড ↑ বা চূণের সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীতে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে ক্যালসিয়াম কাবাইড তৈরী করা হয়।

কার্বোহাইড্রেট — এক শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ; সাধারণ রাসায়নিক সূত্র HCOH. শ্বেতসার, শর্করা, গ্লুকোস, ↑ সেলুলোজ ↑ (কাঠের আঁস) প্রভৃতি হলো বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট পদার্থ। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট উপাদানই জীবের দেহাভ্যন্তরে জলে-পুড়ে হজম হয়ে দেহের তাপ ও শক্তি জোগায়।

কার্বোর‍্যাণ্ডাম — গাঢ় ধূসর বর্ণের এক রকম সুকঠিন ও ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থের বিশেষ নাম; রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা 'সিলিকন কার্বাইড' (SiC)। এর কাঠিন্য প্রায় হীরকের মত। ধাতব অস্ত্র-শস্ত্রের ধার ঘষে তীক্ষ্ণ করবার জন্যে এর চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। সিলিকা ↑ (SiO_2) অর্থাৎ বালি ও কয়লা মিশিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেসে ↑ প্রায় 2000° সেণ্টিগ্রেড তাপে গলিয়ে পদার্থটা উৎপন্ন হয়।

কার্বুরেটর — পেট্রল-চালিত ইঞ্জিনের একটা যন্ত্রাংশ বিশেষ; এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় জ্বালানি তেলের সূক্ষ্ম ধারার সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ বায়ু মিশ্রিত হয়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে যায়; সেখানে বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের (ইলেক্‌ট্রিক স্পার্ক) সংস্পর্শে ওই মিশ্রিত পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটে দহনক্রিয়া চলে। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন' ↑. বা আভ্যন্তরীন দহনক্রিয়া। এর তাপে উৎপন্ন গ্যাসের চাপে ইঞ্জিন চলে।
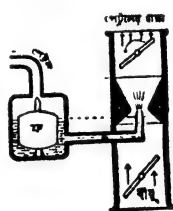
কার্বুরেটর

কার্মিনেটিভ — অম্লনাশক ঔষধ ; যে ঔষধের ক্রিয়ায় পাকস্থলীর অম্ল-জনিত অস্বস্তি ও বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয়, যেমন — 'বাইকার্বনেট অব সোডা' ↑ ।

কালার ইণ্ডেক্স — দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (লাল) রশ্মি আমাদের চোখে উজ্জ্বলতর দেখায় সত্য, কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটের ↑ উপর তার প্রভাব ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি অপেক্ষা কম। সুতরাং রক্তবর্ণের কোন নক্ষত্র চোখে উজ্জ্বল দেখাবে, কিন্তু তার ফটোগ্রাফে অনুজ্জ্বল প্রতিভাত হবে। এই দুই অবস্থায় কোন নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য নিরূপক পরিমাপকে ঐ নক্ষত্রের কা ই. বলা হয়। এ থেকে দূরাগত আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্যের বিভিন্নতার সাহায্যে বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। তা থেকে আবার উৎসের (নক্ষত্রের) উষ্ণতাও (টেম্পারেচার ↑) সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। জীবদেহের রক্তের 'কালার ইণ্ডেক্স' হলো প্রত্যেকটি রক্তকোষে যতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন ↑ রয়েছে। এই পরিমাণের, বা কালার ইণ্ডেক্সের উপরেই রক্তের অক্সিজেন ↑ গ্রহণ করবার ক্ষমতা নির্ভর করে।

কাষ্ট আয়রন — ঢালাই লোহা ; বস্তুতঃ অবিশুদ্ধ ভঙ্গুর লৌহ, যাকে পিগ-আয়রন ↑ বলা হয়। খনিজ লৌহ-প্রস্তর থেকে ব্লাষ্ট ফার্নেস-এর সাহায্যে এই অবিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 2% থেকে 4·5% কার্বন, সামান্য কিছু ম্যাঙ্গানিজ ↑, গন্ধক, সিলিকন প্রভৃতি থাকে। গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে এ দিয়ে রেলিং, কড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী হয়। ভঙ্গুর বলে এ-রকম লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে কোন জিনিস তৈরী করা যায় না ; আগে একে স্টিল ↑ বা 'রট্ আয়রন' করে নিতে হয়।

কিউমুলাস্ — ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ ; যে মেঘরাশি উপরের বায়ুস্তরের ঠাণ্ডায় জমে ঘণীভূত হওয়ার ফলে তার প্রান্তদেশ আকাশের গায়ে সুস্পষ্ট রেখায় পরিদৃষ্ট হয়।

কিউমুলাস মেঘ

কিড্‌নি — মূত্রাধার, বক্ষ-পঞ্জরের নিম্নভাগে অবস্থিত ফুস্‌ফুস্ (লাংস ↑) ও প্লীহার (স্পি্‌ন ↑) নীচের দিকে সংলগ্ন একটি খলের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ। এর মধ্যে রক্তের দূষিত জলীয় অংশ (মূত্র) ছেঁকে এসে জমে। আমাদের দেহের দু'পাশে দু'টা কিড্‌নি বা মূত্রাশয় রয়েছে।

কিড্‌নি (মূত্রাশয়)

কিপ্‌স অ্যাপারেটাস — রসায়না-গারে বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে

ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। উত্তাপ ব্যতিরেকে কঠিন পদার্থের উপর তরল পদার্থের (অ্যাসিডের) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হলে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যতক্ষণ এর থেকে গ্যাস ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে গ্যাসটা উৎপন্ন হতে থাকে। নির্গমন-নল বন্ধ করলে ভিতরের গ্যাসের চাপে অ্যাসিড উপরের পাত্রে উঠে যায়, আর গ্যাসের উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

কিপ্সে অ্যাপারেটাস

কিলো — মেট্রিক এককে হাজার অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়; যেমন, কিলোগ্র্যাম হলো এক হাজার গ্র্যাম ↑; কিলোমিটার—এক হাজার মিটার ↑; কিলোসাইক্‌ল ↑ ইত্যাদি।

কিলোসাইক্‌ল — প্রতি সেকেণ্ডে কোন পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের (অল্টানেটিং কারেণ্ট ↑) এক হাজার বার পূর্ণ আবর্তন, বা দিকপরিবর্তন। তড়িৎ-বিজ্ঞানে পরিবর্তী প্রবাহের গতি-পরিবর্তনকে, (অর্থাৎ '+' ধন তড়িৎ-দ্বার থেকে '—' ঋণ-তড়িৎদ্বারে পৌঁছে পুনরায় ধন-তড়িৎদ্বারে প্রত্যাবর্তনকে) বলে সাইক্‌ল। আবার প্রেরক-কেন্দ্র থেকে রেডিও ↑ তরঙ্গের বিচ্ছুরণ সেকেণ্ডে এক হাজার বার হলেও কিলোসাইক্‌ল বলা হয়।

কেজিন — দুধের প্রোটিন অংশ; শুষ্ক ছানা। সামান্য হল্‌দে পদার্থ। গরম দুধে অ্যাসিড বা কোন অম্ল পদার্থ মেশালে কেজিনের ভাগ পৃথক হয়ে যায়। কৃত্রিম সুতা, প্ল্যাস্টিক ↑, রং, পেইণ্ট প্রভৃতি নানা শিল্পে এর ব্যবহার আছে। কেজিন দিয়ে যে প্ল্যাস্টিক তৈরী হয় তাতে সহজেই সুদৃশ্য রং ধরে, দামেও সস্তা পড়ে। এ-দিয়ে বোতাম, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি বিভিন্ন মসৃণ ও সদৃশ্য জিনিস তৈরী করা হয়ে থাকে।

কেপ্‌লার, জোহান — জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জন্ম 1571 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1630 খৃঃ। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহির ↑ সুযোগ্য ছাত্র ও সহকারী। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ; জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য দান। সৌর মণ্ডলীয় গ্রহরাজির গতি-বিষয়ক তিনটি সূত্র আবিষ্কারে সমধিক প্রসিদ্ধি; এই '**কেপ্‌লারস্‌ ল**' বা সূত্র তিনটি: (1) প্রত্যেক গ্রহই সূর্যকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে রেখে উপবৃত্তীয় কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে, (2) কোন গ্রহের সৌর-পরিক্রমা-কালের বর্গফল সূর্য থেকে তার দূরত্বের ঘনফলের সঙ্গে আনু-পাতিক হবে (3) পরিক্রমাকালে সূর্য

থেকে কোন গ্রহের উপবৃত্ত-পথের সংযোজক ব্যাসার্ধরেখা সময়ের সম-ব্যবধানে সর্বদা সম-পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে।

কেফিন — সাদা স্ফটিকাকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ; গলনাংক 235° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কফি ও চায়ের পাতা থেকে নিষ্কাশিত একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑ পদার্থ। ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; হৃৎপিণ্ডের উপর এর বিশেষ ভেষজ-শক্তি আছে।

কেমোথিরাপি — চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ; যাতে কোনরূপ রাসায়নিক পদার্থ ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করে রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা হয়; কিন্তু রোগীর শরীরের উপর তার কোন প্রভাব বিস্তার করে না; যেমন— নিউমোনিয়া রোগে সাল্‌ফোনে-মাইড দেওয়া হয়, সিফিলিসে স্যাল্‌ভার্সন ↑। সাধারণ ঔষধে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গগুলো কমায়, এবং রোগের প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়; কিন্তু কেমোথিরাপির ঔষধে কেবল জীবাণুনাশের কাজ করে মাত্র।

কেল্‌ভিন, উইলিয়াম টমসন, লর্ড — বৃটিশ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক; বেল-ফাস্টে জন্ম 1824 খৃঃ, মৃত্যু 1907 খৃঃ। মাত্র 22 বছর বয়সে গ্লাসগো বিশ্ব বি দ্যা ল য়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক — একাদিক্রমে 53 বছর অধ্যাপনা ও গবেষণা। বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার ও যন্ত্র উদ্ভাবন— পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ, আলোকের তরঙ্গগতি, গ্যাসীয় মিশ্রণের সূত্র, অ্যাব্‌সোলিউট ↑ টেম্পারেচার স্কেল (কেল্‌ভিন স্কেল, $0^0K = -273^0C$), তড়িৎশক্তি পরিমাপক বিভিন্ন যন্ত্র, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (নৌ-বিভাগের চুম্বকীয় কম্পাস) প্রভৃতি বহু মূল্যবান অবদান। তড়িৎ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি বিধান; লিডেন জার ↑ নিয়ে এঁর অভিনব পরীক্ষার ফলাফলের উপরে হার্জের ↑ বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্ব নির্ভরশীল। আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের টেলিগ্রাফ সংযোগ সাধনে অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক তার সন্নিবেশের সফল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব।

কুইক লাইম — চুন, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO; ভাটিতে পাথর পুড়িয়ে তৈরী হয়। বাড়ীঘর তৈরী করতে ইটের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত হয়। এতে জল দিলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে (এক্সোথার্মিক ↑) এবং জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরী হয় কলি-চুন, (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) $Ca(OH)_2$, স্লেকড লাইম ↑।

কুইক সিল্‌ভার — পারদ বা মার্কারির ↑ বিশেষ নাম।

কুরি, পিরি — ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী, প্যারিসে জন্ম 1859 খৃঃ, মৃত্যু 1906 খৃঃ। পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (রেডিও

অ্যাক্‌টিভিটি ↑) সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধি — স্ত্রী মেরি কুরির সাহায্য ও সহযোগিতায় পিচ্‌-ব্লেণ্ড ↑ থেকে 1898 খৃঃ তেজস্ক্রিয় ধাতু পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম ↑ আবিষ্কার। 1903 খৃস্টাব্দে হেন্‌রি বেকারেলের ↑ সঙ্গে কুরি-দম্পতীও যুগ্মভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কেলাসিত পদার্থের তড়িৎ-ধর্ম সম্বন্ধেও মূল্যবান গবেষণা। অকালে প্যারিসের রাজ-পথে দুর্ঘটনায় জীবনাবসান।

কুরি, ম্যাডাম মেরি — পোল্যাণ্ডের ওয়ারস নগরে জন্ম 1867 খৃঃ, মৃত্যু 1934 খৃঃ। অধ্যাপক পিরি কুরির ছাত্রী, 1895 খৃঃ তাঁকে বিবাহ। তেজস্ক্রিয় ধাতু পোলোনিয়াম ↑ ও রেডিয়াম ↑ আবিষ্কারের জন্য স্বামী পিরি কুরির সঙ্গে কৃতিত্বের সমভাগী, 1903 খৃঃ যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ। স্বামী পিরি কুরির মৃত্যুর পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপিকা; তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে উন্নততর গবেষণা। 1911 খৃঃ রসায়ন-বিজ্ঞানে পুনরায় নোবেল পুরস্কার লাভ। ওয়ারস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রেডিওলজি বিষয়ে অধ্যাপিকা নিযুক্ত 1919 খৃঃ।

কন্যা **ইরিন কুরি** ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ছিলেন; ইনিও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক **জোলিও কুরির** সঙ্গে যুগ্মভাবে 1935 খৃঃ রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কুলম্ব, চার্লস অগাস্টাইন ডি. — ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1736 খৃঃ, মৃত্যু 1806 খৃঃ। তড়িৎ ও চুম্বক বিজ্ঞানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার ও সূত্র নির্ধারণ। নামানু-সারে তড়িৎশক্তির পরিমাণ-সূচক 'কুলম্ব' ↑ একক প্রচলিত।

কুলম্ব — তড়িৎ-শক্তির একক পরিমাণ: প্রতি সেকেণ্ডে এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে যতটা তড়িৎশক্তি ব্যয়িত হয়। ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় এক কুলম্ব তড়িতে ·001118 গ্র্যাম ↑ রৌপ্য-কণিকা বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে।

কুশ, ডাঃ পলিকার্প — মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী, জন্ম জার্মানীতে 1911 খৃষ্টাব্দে, অদ্যাপি (1960 খৃঃ) জীবিত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে পরমাণুর উপাদানিক গঠন-বিন্যাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। 1933 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃটিশ বিজ্ঞানী মরিস ডির‍্যাক কর্তৃক প্রবর্তিত 'পদার্থের পারমাণবিক গঠন' সম্পর্কীয় মতবাদের সংশোধন ও উন্নততর ব্যাখ্যা। 1955 খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডব্লু. ই. ল্যাম্বের ↑ সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ।

কোএঞ্জাইম — জীবদেহে বিভিন্ন এঞ্জাইমের ↑ জৈব রাসায়নিক

ক্রিয়ার সহায়ক বিভিন্ন জৈব পদার্থকে বলে কোএঞ্জাইম; এগুলি সব ভিটামিন ↑, অথবা ভিটামিন-ঘটিত পদার্থ। দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জৈব ক্রিয়ায় এঞ্জাইমের উপযোগিতা অসাধারণ; কিন্তু এগুলি পরিমাণে থাকে অতি সামান্য। আবার বিভিন্ন কোএঞ্জাইম বা ভিটামিনের পরিমাণ আরও কম, কিন্তু তার অভাবে এঞ্জাইমের কার্যকারিতা সার্থক হয় না। কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণে হলেও কোএঞ্জাইম বা ভিটামিন অপরিহার্য।

কোকেন—অ্যাল্‌ক্যালয়েড ↑ শ্রেণীর এক রকম সাদা ও কঠিন উদ্ভিজ্জ পদার্থ; কোকা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত। পদার্থটা বিশেষ অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু এর উগ্র মাদকতা দোষ আছে, দুরন্ত নেশার জিনিস। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারেই কোকেন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

কোচিনিল—'কক্কাস-ককৃটি' নামক এক প্রকার পোকার বিশুষ্ক দেহাবশেষ থেকে যে স্বাভাবিক উজ্জ্বল লাল রং নিষ্কাশিত হয়।

কোপারনিকাস সিস্‌টেম—ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী কোপারনিকাস প্রচার করেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সব আপন আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে; জ্যোতির্বিদ্যায় সৌর পরিবারের গতিসম্পর্কীয় এই মতবাদ পরীক্ষিত ও সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তার আগে টলেমি নামক এক পণ্ডিতের এরূপ এক ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য ও গ্রহগুলি ঘুরে চলেছে; যেমন আমরা সহজ বুদ্ধিতে সাদা চোখে দেখতে পাই।

কোমা—সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কঠিন রোগীর এরূপ অচৈতন্য অবস্থাকে 'কোমা স্টেজ' বলা হয়।

কোরাণ্ডাম্‌—অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের স্ফটিকাকার কঠিন দানা। এর কাঠিন্যও কার্বোর্যাণ্ডামের ↑ মত, প্রায় হীরকের তুল্য। এর চূর্ণ দিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অস্ত্রাদিতে শান্‌ দেওয়ার ও পালিশ করবার চক্রাকার পাথর তৈরী হয়।

কোলন—বৃহদন্ত্রের বিশেষ নাম; ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নাংশ থেকে যে অপেক্ষাকৃত মোটা নল ডান দিক থেকে সোজা উপরে উঠে গিয়ে ঘুরে আবার বাঁ-দিক থেকে নীচে নেমে গেছে। এর এই ডান দিকের অংশকে বলে ঊর্ধ্বগামী কোলন, পরবর্তী অংশ সমান্তরাল কোলন, আর বাঁ-দিকের অংশকে বলে নিম্নগামী কোলন।

কোলন

কোলাইটিস —আন্ত্রিক প্রদাহ-রোগ বিশেষ ; যাতে বৃহদন্ত্রের কোলন ↑ অংশের স্ফীতিজনিত যন্ত্রণা অনুভূত হয়ে থাকে।

কোলয়েড — কর্দমাক্ত জলে কাদা-মাটির কণিকাগুলো অপেক্ষাকৃত বড় বড়, জলে মিশে যায়, কিন্তু সময়ে থিতিয়ে তলায় জমে। লবণ-গোলা জলে লবণের অণুগুলো জলের অণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে যায় ; দ্রাব ও দ্রাবক নিজে থেকে আর আলাদা হতে পারে না। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি হলে সেই দ্রাব্য পদার্থকে বলে কোলয়েড। কোন পদার্থ কোলয়েড অবস্থায় এমন অতি সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হয় যে, দ্রাবক পদার্থের মধ্যে সেগুলো সমানভাবে সর্বক্ষণ ভেসে থাকে। প্রকৃত দ্রবের ন্যায় একেবারে দ্রাবকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে যায় না সত্য, কিন্তু ফিল্‌ট্রেসন ↑ প্রক্রিয়ায়ও তাকে পৃথক করা যায় না। পদার্থের এরূপ অবস্থাকে বলে 'কোলয়েড্যাল স্টেট'। কোন তরল দ্রবের মধ্যে কোন কঠিন দ্রাব্য বস্তু কোলয়েড্যাল অবস্থায় থাকলে ওই দ্রবকে **কোলয়েড্যাল সল্যুসন** ↑ বলা হয়। দুধকে এরূপ একটা কোলয়েড্যাল সল্যুসন বলা যেতে পারে।

কোলোস্ট্রেল—সদ্যপ্রসূতির প্রথম স্তন্যদুগ্ধ ; সন্তান প্রসবের পরে কোন জীবমাতার স্তনে প্রথম কয়েকদিন যে ঘন দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

কোসাইন — সংক্ষেপে বলে কস্'. ত্রিকোণমিতি গণিতে কৌণিক পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত —ভূমি : অতিভুজ। চিত্রে ABC কোণের কোসাইন, বা 'কস্' হলো BC/AB ; এভাবে অন্যান্য অনুপাত **কোট্যাঞ্জেণ্ট** বা 'কট' হলো ভূমি : লম্ব, অর্থাৎ BC / AC ; আর **কোসিক্যাণ্ট** বা 'কোসেক' হলো অতিভূজ : লম্ব, অর্থাৎ AB/AC.

A C কোসাইন

কোয়াণ্টাম থিয়োরি — বিকিরিত শক্তির ভর-তত্ত্ব। কোন উত্তপ্ত বস্তু বা আলোক-শিখা থেকে যে তাপ-শক্তি বিকিরিত হয় তা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না, হয় শক্তির সূক্ষ্ম কণিকার তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণে। এই শক্তি-কণিকাগুলোকে বলা হয় 'কোয়াণ্টা'; এগুলো সর্বক্ষেত্রে সমান আকারের নয়, বিকিরণের তীব্রতা (ফ্রিকোয়েন্সি ↑) অনুসারে এদের আকার বাড়ে-কমে। যেমন - লাল আলোর কোয়াণ্টামগুলো নীল আলো থেকে বিচ্ছুরিত কোয়াণ্টাম অপেক্ষা আকারে ও ভরে ক্ষুদ্রতর। বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন কোয়াণ্টামের পরিমাণ, অর্থাৎ ভর নির্ধারণের

গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী **ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক** ↑। কোন শক্তির একটি কোয়াণ্টামের আকার ও পরিমাণ নির্ভর করে তার বিকিরণের 'ফ্রিকোয়েন্সি' অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে বিকিরণের তরঙ্গ-সংখ্যার উপরে। কোয়াণ্টাম = ফ্রিকোয়েন্সি × একটি ধ্রুবক রাশি, যাকে বলে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ($6{\cdot}547 \times 10^{-27}$ আর্গ/সেকেণ্ড)।

কোয়াণ্টাম মেকানিক্স — ইলেক্‌ট্রন ↑, প্রোটন ↑ প্রভৃতি পরমাণু-কণিকার তড়িৎ-শক্তির বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে যে বিশেষ শক্তিতত্ত্ব (মেকানিক্স ↑) প্রযুক্ত হয়। বিশেষ বিচারে শক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা (কোয়াণ্টাম ↑) তরঙ্গাকারে চলে, যেমন—আলোক-তরঙ্গ অনেক সময় 'ফোটন' ↑ কণিকার প্রবাহ বলে প্রতিপন্ন হয়। পারমাণু-কণিকার এরূপ তরঙ্গ-ধর্মের তথ্যাদি এই 'কোয়াণ্টাম মেকানিক্স' তত্ত্বের সাহায্যে নির্ধারিত হয়। জটিল সব গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে জানা যায়, শক্তির বিচ্ছুরণ-ক্ষেত্রে কোথায়, কখন, কোন কণিকাগুলো অধিক সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হবে; আবার তা থেকে কোন বিশেষ কণিকার সম্ভাব্য অবস্থানও জানা যেতে পারে।

কোয়াড্রিল্যাটারাল ফিগার — জ্যামিতিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্র; চারিটি সরল রেখায় আবদ্ধ যে-কোন সামতলিক ক্ষেত্র। চতুর্ভুজ অনেক রকমের হতে পারে: (ক) **স্কোয়ার** বা বর্গক্ষেত্র, সমবাহু ও সমকোণী চতুর্ভুজ; (খ) **রম্বাস,** সমবাহু
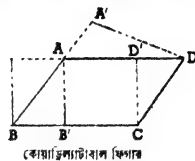
কোয়াড্রিল্যাটারাল ফিগার

কিন্তু অসমকোণী চতুর্ভুজ; (গ) **প্যারালালোগ্রাম,** যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল; (ঘ) **রেক্ট্যাঙ্গেল,** যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল এবং কোণগুলি সমকোণ; (ঙ) **ট্রাপিজিয়াম,** যে চতুর্ভুজের চারিটি বাহুই অসমান ও অসমান্তরাল; (চ) **ট্রাপিজয়েড,** যে চতুর্ভুজের বাহু চতুষ্টয় অসমান, কিন্তু দুটি বিপরীত বাহু সমান্তরাল।

ক্যাকোডিল — আর্সেনিক-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ; বিশেষ এক রকম দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত। পদার্থটা মিশিয়ে তরলায়িত রাবার তাড়াতাড়ি ঘণীভূত করে সহজেই প্রয়োজনানুরূপ ভাবে কঠিন করা যেতে পারে।

ক্যাট্‌আয়ন—ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন কণিকা। ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ধাতব পদার্থের এই ক্যাট্‌-আয়নগুলোই ঋণ-তড়িৎদ্বার, বা ক্যাথোড ↑ প্লেটের আকর্ষণে তার গায়ে গিয়ে লেগে যায়।

ক্যাটালিস্‌ট — **অনুঘটক** ; যে সব পদার্থ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে, অথচ নিজে ওই রাসায়নিক ক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না, অপরিবর্তিত থাকে। এরূপ পদার্থকে **ক্যাটালাইট**-ও বলা হয়। রসায়ন-শিল্পে নানারকম ধাতব ক্যাটালিস্ট ব্যবহৃত হয়। সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর সামান্য পরিমাণ চূর্ণ, বা কোন ধাতব অক্সাইড মেশালে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **ক্যাটালিসিস**। আবার অনেক সময় কোন কোন জৈব পদার্থও ক্যাটালিস্টের কাজ করে থাকে (এন্‌জাইম ↑) ; যেমন ঈস্টের ↑ সাহায্যে চিনি অতি সহজেই অ্যাল-কোহলে ↑ পরিণত হয়।

ক্যাড্‌মিয়াম—মৌলিক ধাতু ; সাদা ও নরম পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Cd ; পারমাণবিক ওজন 112·41, পারমাণবিক সংখ্যা 48. জিঙ্ক ↑ বা দস্তার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজ-রূপে পাওয়া যায়। অতি নিম্ন-গলনাংকের বিভিন্ন ধাতু-সংকর (ফিউজিব্‌ল অ্যালয় ↑) তৈরী করবার কাজে এটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রোপ্লেটিং ↑ প্রক্রিয়াতেও এর ব্যবহার আছে।

ক্যাথোড—ঋণ-তড়িৎদ্বার (নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রোড ↑); ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑, আর্ক ল্যাম্প ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় তড়িৎ প্রবাহের
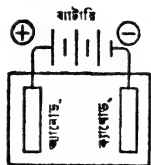
ক্যাথোড

ঋণ তড়িৎ প্রান্ত। আর ধন-তড়িৎ প্রান্তকে বলা হয় **অ্যানোড** ↑। এই ক্যাথোড এবং অ্যানোড উভয় তড়িৎ-দ্বারই বিশেষ বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থে তৈরী হয়। ক্যাথোড থেকে ঋণ-তড়িতাবিষ্ট ইলেক্‌ট্রন কণিকারা (অ্যানায়ন ↑) ধারাকারে ছুটে গিয়ে অ্যানোডে পৌছায়। বস্তুতঃ এভাবে এক্স-রে টিউব ↑, রেডিও ভাল্‌ব ↑ প্রভৃতিতে ইলেকট্রনগুলো ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে আধারের অভ্যন্তরস্থ অল্প পরিমাণ গ্যাসে পূর্ণ, বা প্রায় বায়ুশূন্য ব্যবধান অতিক্রম করে ধারাকারে ছুটে অতি দ্রুত অ্যানোডে (ধন-তড়িৎদ্বারে) চলে যায়।

ক্যাথোড-রে-টিউব — সামান্য পরিমাণ গ্যাসে ভর্তি বা মোটামুটি
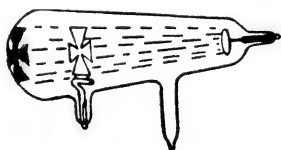
ক্যাথোড-রে-টিউব

বায়ুশূন্য যে টিউবের অভ্যন্তরস্থ ঋণ-তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড ↑) থেকে ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকার ধারা-প্রবাহের

ব্যবস্থা করা হয়। এই ধারা প্রবাহের ধর্ম অদৃশ্য আলোক-রশ্মির অনুরূপ ; এজন্যে একে ক্যাথোড-রশ্মি বলা হয়। এই 'ক্যাথোড-রে টিউব' নামক যন্ত্রে ওই ক্যাথোড-রশ্মিগুলোকে বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত ও নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ-মাখানো পর্দার উপরে ফেলা হয়। এর ফলে পর্দার যে-যে জায়গায় ওই রশ্মি পতিত হয় সেই-সেই জায়গাগুলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক স্পন্দনের পরিমাপ ও তথ্যাদি নিরূপণ করা চলে। এজন্যে এরূপ যন্ত্রকে ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপও বলা হয়।

ক্যানাডা ব্যাল্‌সাম — রজন জাতীয় এক রকম উদ্ভিজ্জ আঠালো পদার্থ। ব্যাল্‌সাম মাত্রেরই একটা সুগন্ধ আছে। উদ্বায়ী পদার্থ, নানা রকম ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এ-দিয়ে কাঁচের উপর কাঁচ এঁটে লাগানো যায়।

ক্যাণ্ডেল পাওয়ার — আলোকের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের একক। আলো-কের কোন উৎস থেকে কতটা আলোক-রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তা আজকাল **'ক্যাণ্ডেলা'** এককে প্রকাশ করা হয়; পূর্বে হোত একটা নির্দিষ্ট মাপের মোমবাতির বিকিরিত আলোকের হিসেবে, অর্থাৎ এর এককে, বা 'ক্যাণ্ডেল পাওয়ারে'। ক্যাণ্ডেলা হলো এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনের কোন কৃষ্ণবর্ণ ধাতব পদার্থ 1773·5° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (প্ল্যাটিনাম ধাতুর গলনাংক উষ্ণতা) তাপে যতটা আলো বিকিরণ করে তার 60 ভাগের এক ভাগ। এই ঔজ্জ্বল্যকে **নিউ-ক্যাণ্ডেল পাওয়ার**-ও বলা হয়। কোন একটা 40 ওয়াটের সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক বাতির ঔজ্জ্বল্য প্রায় 36 'নিউ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার' বা ক্যাণ্ডেলা; আর 100 ওয়াটের বাতির ঔজ্জ্বল্য সাধারণতঃ প্রায় 120 'ক্যাণ্ডেল পাওয়ার' হয়ে থাকে।

ক্যাপ্‌ষ্ট্যান —জাহাজে লৌহ নির্মিত ড্রামের-আকারবিশিষ্ট যে যন্ত্রটা ঘুরিয়ে তার গায়ে দড়ি বা শিকল জড়ানো হয়। জাহাজ টেনে তীরে সংলগ্ন করতে বা ভারী নঙ্গর তুলতে ও ফেলতে সচরাচর এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ক্যাপষ্ট্যান
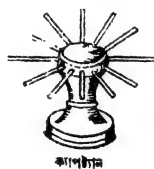
ক্যাপিলারি — কৈশিক, চুলের মত সূক্ষ্ম জিনিস ('কেপিল' মানে চুল)।

ক্যাপিলারি টিউব — কাচের অতি সূক্ষ্ম বা কৈশিক নল। **ক্যাপিলারি অ্যাট্রাক্সন** — যে আকর্ষণের ফলে সূক্ষ্ম নলপথে তরল পদার্থ অগ্রসর হয়, বা উপরে ওঠে। তরল পদার্থের অণুগুলি কৈশিক নলের প্রাচীর-গাত্র বেয়ে একটা গতিশীলতা লাভ করে। ব্লটিং-কাগজে কালি শোষে, প্রদীপের

পলিতা বেয়ে তেল উপরে উঠে যায় বস্তুতঃ এই আকর্ষণেরই ফলে।

ক্যামেরা-লুসিডা — দর্পণের মত একটা যন্ত্রাংশ বিশেষ। এর সাহায্যে মাইক্রোস্কোপে ↑ পরিদৃষ্ট বস্তুর হুবহু প্রতিচ্ছবি পার্শ্বস্থিত কাগজের উপরে ফেলা যায়। মাইক্রোস্কোপে কোন ক্ষুদ্র জিনিসের বর্ধিতাকার প্রতিচ্ছবি দেখে তার ভিতরকার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করা যায় সত্য, কিন্তু তার কোন স্থায়ী প্রতিচ্ছবি রাখা যায় না। এজন্যে মাইক্রোস্কোপের আইপিসের ↑ কাছে বিশেষ ধরণের এরূপ একখানা শয়ান দর্পণ সংলগ্ন করে তার সাহায্যে সেই বর্ধিতাকারের ছবি পার্শ্বস্থ কাগজের উপরে প্রতিফলিত করা যায়। এর উপরে পেন্সিল টেনে সহজেই সেই ছবি হুবহু এঁকে রাখা যেতে পারে।

ক্যারেট— (1) সোনা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি ওজন করবার এক রকম সূক্ষ্ম মাপ ; প্রায় $\frac{1}{5}$ গ্র্যাম ↑, বা 3·17 গ্রেণ। (2) সোনার বিশুদ্ধতা পরিমাপের একক হিসেবেই ক্যারেট কথাটা সবিশেষ প্রচলিত। সোনায় কতটা খাদ আছে তা এ-দিয়ে প্রকাশ করা হয়। খাদ-মেশানো সোনার 24 ভাগের মধ্যে কত ভাগ খাটি সোনা আছে তা এই ক্যারেটের হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ; যেমন — '24-ক্যারেট' সোনা হলো খাটি সোনা ; '18-ক্যারেট' সোনা বললে 24 ভাগের মধ্যে 18 ভাগ খাটি সোনা, আর 6 ভাগ খাদ আছে, বুঝতে হবে।

ক্যাল্‌কুলাস — গণিত-শাস্ত্রের শাখা বিশেষ। কোন ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রাশি সম্পর্কে বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানের কৌশল এতে আলোচিত হয়। 'ক্যাল্‌কুলাস' গণিত দু-রকম — ডিফারেন্সিয়্যাল ও ইন্টিগ্র্যাল। এদের সাহায্যে নানা রকম উচ্চতর গাণিতিক জটিল তথ্যের সমাধান করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ক্যাল্‌সাইট — প্রাকৃতিক ক্যালসিয়াম কার্বনেট, কঠিন স্ফটিকাকার খনিজ পদার্থ। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রস্তর এই পদার্থে গঠিত।

ক্যাল্‌সিয়াম — সাদা ও নরম এক প্রকার মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Ca, পারমাণবিক ওজন 40·08, পারমাণবিক সংখ্যা 20 ; এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ প্রকৃতিতে নানাভাবে নানা আকারে ছড়িয়ে আছে। এর হাইড্রক্সাইড, হলো সাধারণ চূণ, $Ca(OH)_2$, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$, হলো খড়িমাটি (চক্ ↑) ও বিভিন্ন পাথর। শুষ্ক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড $CaCl_2$, অন্য পদার্থের জল শুষে নেয় ; রঞ্জন শিল্পেও এর যথেষ্ট দরকার হয়। ক্যালসিয়াম সাল্‌ফেট, $CaSO_4$, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে শক্ত হয় বলে এ-দিয়ে প্ল্যাষ্টার-অব-

প্যারিস' ↑ তৈরী হয়। প্রাণিদেহের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান হলো ক্যাল্‌সিয়াম। ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইডকে (CaO) কুইক-লাইম ↑ বলে; এর মধ্যে জল দিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং উৎপন্ন হয় ক্যাল-সিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$, যার রাসায়নিক নাম হলো শ্লেক্‌ড লাইম ↑, সাধারণ চুণ।

ক্যালিস্ — অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সোডিয়াম নাইট্রেট ↑ ($NaNO_3$); আমেরিকার চিলি অঞ্চলে খনিজরূপে প্রচুর পাওয়া যায়, তাই একে **চিলি সল্ট-পিটার**ও বলে। বাংলায় সোরা নামে পরিচিত। নাইট্রিক অ্যাসিড, বিভিন্ন বাজি ও বারুদ প্রভৃতি তৈরী করবার কাজে যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

ক্যালিপার্স—সামান্য দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য নিখুঁতভাবে মাপবার সহায়ক এক রকম যন্ত্র। কোন তার বা রডের ব্যাস এ-দিয়ে সহজে মাপা যায়। সরু পাইপের ভিতর ও বাহিরের ব্যাস মাপবার জন্যে ও এটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্যালিপার্স

ক্যালোমেল — পারদ ও ক্লোরিনের একটা যৌগিক পদার্থের বিশেষ নাম; যার রাসায়নিক নাম মার্কিউ-রিয়াস ক্লোরাইড (Hg_2Cl_2)। বিশেষ ভারী, সাদা, অদ্রাব্য বিষাক্ত পদার্থ; সামান্য পরিমাণে জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালোরি — কোন পদার্থে নিহিত মোট উত্তাপ বা তাপশক্তি পরি-মাপের একক বিশেষ। এক গ্র্যাম জল 1° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপ দরকার হয়, অন্য কথায় 1° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত 1 গ্র্যাম জল ঠাণ্ডা করলে যতটা তাপ-শক্তি বিমুক্ত হয়, তাই হলো এক ক্যালোরি। বিশেষতঃ এক গ্র্যাম জল 14·5° থেকে 15·5° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, সেই তাপকে এক 'স্মল ক্যালোরি' বা '**গ্র্যাম ক্যালোরি**' বলা হয়। আর 1000 গ্র্যাম-ক্যালোরি তাপকে বলে 'কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি' বা এক '**লার্জ ক্যালোরি**'। বিভিন্ন খাদ্যের তাপ উৎপাদনের শক্তি ক্যালোরির হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

ক্যালোরিফিক ভ্যালু — কোন জ্বালানি পদার্থের তাপ উৎপাদক শক্তির পরিমাপ। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি সম্পূর্ণরূপে জ্বলে ভস্মীভূত হলে যে পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাকেই বলে পদার্থটার 'ক্যালোরিফিক ভ্যালু'। যেমন— এক পাউণ্ড কয়লা জ্বলে যত পাউণ্ড-ক্যালোরি তাপ সৃষ্টি হয় ওই কয়লার ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা 'থার্মাল ইউনিট' ↑ হবে তত।

ক্যালোরিমিটার — কোন পদার্থে নিহিত বা পরিবাহিত তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার জন্যে ব্যবহৃত
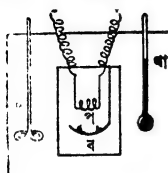
ক্যালোরিমিটার

যন্ত্র বিশেষ। এরূপ সাধারণ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে তামা বা অন্য কোন ধাতুতে নির্মিত একটা বিশেষ আকারের পাত্র। এই ধাতুটার 'স্পেসিফিক হিট্' ↑ জানা থাকলে ওই পাত্রে রেখে বিভিন্ন কৌশলে অন্যান্য পদার্থে নিহিত তাপ থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে সহজেই হিসাব করে বার করা যায়।

ক্যাল্‌সিফেরল — জৈব রাসায়নিক পদার্থ; কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত 'ভিটামিন-ডি', যার অভাবে শিশুদের হাড় শক্ত হয় না, রিকেট ↑ দেখা দেয়। এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেহের অস্থিতে প্রয়োজনীয় লাইম ↑ বা ক্যাল্‌সিয়াম সরবরাহ হয়। স্বভাবতঃ বিভিন্ন জান্তব চর্বি, ঈস্ট ↑, ছত্রাক প্রভৃতির মধ্যে আলট্রাভায়োলেট ↑ রশ্মির প্রভাবে এর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়ে থাকে। পদার্থটা **রেডিওষ্টল** নামেও পরিচিত।

ক্যালামাইন — আকরিক জিঙ্ক সিলিকেট (হাইড্রাস), H_2ZnSiO_5; এই খনিজ থেকেই প্রধানতঃ জিঙ্ক ↑, অর্থাৎ দস্তা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। কখন কখন জিঙ্ক কার্বনেটকেও ($ZnCO_3$) ক্যালামাইন বলে এবং এই নামে জিনিসটা কোন কোন ঔষধের মলমে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাটাপ্লেক্সি — যে রোগে জীবদেহ সহসা অসাড় ও নিশ্চল হয়ে পড়ে, বাক্‌শক্তি লোপ পায়, কিন্তু চেতনা হারায় না। প্রধানতঃ ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্রের (মোটর নার্ভ ↑) সাময়িক বিকলতাই হলো এ-রোগের কারণ; স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (ভলাণ্টারি নার্ভ) কাযকরী থাকায় রোগী সব দেখে ও বোঝে, কিন্তু কোন অঙ্গ-সঞ্চালন বা কর্মোদ্যম থাকে না। আচমকা প্রচণ্ড ক্রোধ বা ভীতি উদ্রেকের ফলে ব্যক্তিবিশেষের এরূপ হতে পারে।

ক্যাটাফোরেসিস—কোলয়েড্যাল ↑ সল্যুসনের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ক্যাথোড ↑ প্লেট, অর্থাৎ ঋণতড়িৎ-দ্বারের দিকে ধন-তড়িতাবিষ্ট কোলয়েড কণিকাগুলোর (ক্যাট্‌ আয়ন ↑) যে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। কোলয়েড কণিকার এরূপ সঞ্চরণ-প্রবণতাকেই বলে ক্যা. স.। (ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑)

ক্যাটার‍্যাক্ট—চোখের 'ছানি', রোগ বিশেষ; সাধারণতঃ বার্ধক্য হেতু অক্ষি-তারকার উপরে যে অনচ্ছ পর্দা পড়ে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

ক্যাটালেপ্‌সি— স্নায়ু-রোগ বিশেষ, যাতে রোগীর মানসিক অনুভূতি ও চেতনা বিলুপ্ত হয় এবং দেহের মাংসপেশী শক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় অনেক সময় রোগীকে মৃত বলে ভুল

হয়। সহসা সাময়িকভাবে স্নায়বিক বিপর্যয়ই এ-রোগের কারণ; এটা প্রকৃতপক্ষে মৃগী (এপিলেপ্‌সি ↑) রোগেরই একটা বিশেষ অবস্থা।

ক্যাটাবোলিজ্‌ম্‌— আংশিক মেটা-বলিজ্‌ম্‌ ↑ ; জটিল গঠনের ভুক্ত-দ্রব্যাদি দেহাভ্যন্তরে যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে বিভিন্ন সরল গঠনের রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়ে দেহ-কোষগুলিকে পুষ্টি-রস সরবরাহ করে এবং দেহে তাপের উদ্ভব হয়।

ক্যান্থারাইডিস — এক প্রকার কীটের দেহ-নিঃসৃত ভেষজ গুণ-সম্পন্ন জৈব পদার্থবিশেষ। কেশতৈলে ব্যবহৃত হয়; গাত্রচর্ম রঙিন করতেও এর ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর কীট স্পেনদেশেই দেখা যায়; লম্বায় এরা সচরাচর প্রায় আধ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

ক্যাভেণ্ডিস, হেনরি—বৃটিশ বিজ্ঞানী, জন্ম 1731 খৃঃ, মৃত্যু 1810 খৃঃ। লর্ড বংশীয় ধনীর সন্তান, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কালাতিপাত। বায়ু ও জলের উপাদানগত আয়তনিক বিশ্লেষণ এবং হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের রাসায়নিক তথ্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। তড়িৎ ও তাপ সম্পর্কে বিবিধ তথ্য আবিষ্কার। পৃথিবীর ওজন নির্ধারণের জন্য ভূ-গোলকের গুরুত্ব (ডেন্সিটি ↑) আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এক সুবিখ্যাত পরীক্ষার জন্য সমধিক খ্যাতি— পৃথিবীর গড় গুরুত্ব 5·52 নির্ধারণ। বিপুল সম্পত্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির উদ্দেশ্যে দান — এই অর্থে পরে কেম্ব্রিজে সুপ্রসিদ্ধ 'ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরি' স্থাপিত।

ক্যাম্ফর — কর্পূর; উদ্ভিজ্জ উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ। রাসায়নিক গঠন $C_{10}H_{16}O$; বিশেষ একটা গন্ধ-যুক্ত সাদা স্ফটিকাকার যৌগিক। বিশেষ এক শ্রেণীর উদ্ভিদের কাঠ, ডালপালা ও শিকড় থেকে ঊর্ধপাতন (সাব্লিমেসন ↑) প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। কৃত্রিম সেলুলোজ ↑ তৈরী ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইদানিং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম কর্পূর তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে।

ক্যারোটিন — স্বভাবজাত জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ; 'ভিটা-মিন-এ' নামে পরিচিত। লাল্‌চে বর্ণের অতি ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। উদ্ভিদের সবুজ-কণা (পত্র-হরিৎ বা ক্লোরোফিল ↑) সংগঠনের সহায়ক উপাদান। টাট্‌কা শাক-সব্জি, ফলমূল ও মাখনে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে পাওয়া যায়।

কোপার্নিকাস — পোল্যাণ্ডে জন্ম 1473 খৃঃ, মৃত্যু 1543 খৃঃ। শিক্ষা ইটালিতে, পেশায় ছিলেন ধর্মযাজক; প্রখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ। 'সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ' মতবাদের প্রবর্তক। বাইবেলে উল্লিখিত পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন;

বাইবেলের ভুল প্রতিপাদনের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি বিষয়ক যুগান্তকারী তথ্য আবিষ্কার। ছয় খণ্ডে বিভক্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ রচনায় অমর কীর্তি।

ক্রষ্ট্যাল — কেলাস; স্ফটিক; কঠিন পদার্থের কোন সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের দানা। বিশুদ্ধ অবস্থায় তরলায়িত বা দ্রবিত প্রায় সব রাসায়নিক পদার্থই বিশেষ ব্যবস্থায় এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক তলবিশিষ্ট কেলাসের আকারে জমে। তলের সংখ্যা ও আকার-আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ক্রষ্ট্যাল নানা রকমের হয়; যেমন, কিউবিক (সমচতুষ্কোণ ষড়তল) পিরামিড্যাল (ত্রিকোণ গম্বুজাকার), প্রিজ্‌মেটিক (ত্রি-শিরা), মনোক্লিনিক (সূক্ষ্ম কাঠির মত), হেক্সাগন্যাল ↑, টেট্রাগন্যাল ইত্যাদি।

ক্রষ্ট্যালিজেসন — স্ফটিকীকরণ, বা কেলাসন পদ্ধতি; পদার্থের কেলাস গঠনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থকে তরলায়িত, বা পরিপৃক্ত দ্রবিত অবস্থায় উত্তপ্ত করে সহসা ঠাণ্ডা করলে বা তার মধ্যে সামান্য কিছু দানা ফেলে দিলে কেলাসন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে সবটা কেলাসিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পদার্থের কেলাস বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে (ক্রষ্ট্যাল ↑)। কোন-কোন পদার্থের কেলাস আবার দ্রাবক জলের নির্দিষ্ট সংখ্যক অণু নিয়ে গঠিত হয়। কেলাসের সংগঠক এই জলকে বলে **'ওয়াটার অব ক্রষ্ট্যালিজেসন'** ↑, বাংলায় কেলাস-জল; যেমন, ফিট্‌কারি বা অ্যালামে ↑ থাকে 24-টি জলীয় অণু; তুঁতে বা 'কপার সাল্‌ফেট' ক্রস্ট্যালে 5 টি; হিরাকস অর্থাৎ 'ফেরাস সাল্‌ফেট' (গ্রীন ভিট্রিয়ল ↑) ক্রস্ট্যালে 7-টি জলীয় অণু থাকে।

ক্রষ্ট্যালোগ্রাফি — কেলাসন বিদ্যা; বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন আকারের কেলাসের গঠন-বৈচিত্র্য জ্যামিতিক আকৃতি, রাসায়নিক ধর্ম ও গুণাগুণ প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। কেলাসের এরূপ সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক পরিচয় ও গুণাগুণ অনেকটা নির্ভুলভাবে জানা যায়।

কৃষ্ণান, ডাঃ কে. এস — খ্যাতনামা ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী, মাদ্রাজে জন্ম 1898 খৃঃ, অদ্যাপি (1960 খৃঃ) জীবিত। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি, এবং পরে ডি. এস-সি। কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্টিভেসন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানে গবেষণা—স্যার সি. ভি. রামনের ↑ একান্ত সহযোগী এবং 'রামন এফেক্ট' ↑ আবিষ্কারের কাজে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহায়ক। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস) 1940 খৃঃ; ভারতীয়

সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি 1948 খৃঃ। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানা মৌলিক গবেষণার জন্যে বিপুল খ্যাতি ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

ক্রাউন গ্লাস — অধিকতর তাপসহ এক জাতীয় উৎকৃষ্ট কাচ (গ্লাস ↑), সাধারণ সোডা গ্লাসের ↑ মত সহজে ভাঙ্গে না, বা অধিক তাপেও গলে না। ইলেকট্রিক বাল্‌ব ও রসায়নাগারের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে এই শ্রেণীর কাচ ব্যবহৃত হয়।

ক্রায়োলাইট — সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড, Na_3AlF_6 ; খনিজ পদার্থ। অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতু সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

ক্রিম অব টার্টার — পোটাসিয়াম হাইড্রোজেন টার্টারেট, COOK.(CHOH)$_2$. COOH, নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। প্রায় অদ্রাব্য সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ; মদ্য প্রস্তুতকালে (আর্গল ↑) পাত্রের গায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই জমে। বেকিং পাউডারের ↑ একটা প্রয়োজনীয় উপাদান।

ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল — কোন ঘন পদার্থের (যেমন, কাঁচ) মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা পদার্থের (যেমন, বায়ু) মধ্যে প্রবেশ করবার সময়ে ওই আলোকরশ্মি দুই মাধ্যমের সাধারণ-তলে যে আপতন-কোণ (অ্যাঙ্গেল অব ইন্সিডেন্স, রিফ্লেকশন ↑) সৃষ্টি করবে তা যদি একটা নির্দিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণের বেশী হয়, তাহলে ওই আলোক-রশ্মি হাল্‌কা পদার্থে (বায়ুতে) আর প্রতিসরিত (রিফ্রাক্সন ↑) হয় না, সাধারণ-তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ঘন পদার্থেই ফিরে আসে। আলোক-রশ্মির এরূপ প্রতিফলনকে বলে **ইণ্টারন্যাল রিফ্লেকসন্** বা আভ্যন্তরীন প্রতিফলন। আর ওই নির্দিষ্ট ডিগ্রি-পরিমাপের আপতন-কোণকে বলা হয় ওই পদার্থের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল। সাধারণ কাঁচের এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল হলো 42° ডিগ্রি।

ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল

ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার — যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পৌছালে কোন গ্যাসকে একটা নির্দিষ্ট চাপ (ক্রিটিক্যাল প্রেসার ↑) প্রয়োগ করেই তরল করা সম্ভব হয়। ওই তাপমাত্রার উর্দ্ধে কেবলমাত্র চাপের পরিমাণ বাড়িয়েই কোন গ্যাস কখন তরল করা সম্ভব হয় না।

ক্রিটিক্যাল প্রেসার— কোন গ্যাসীয় পদার্থ তার নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের ↑ উষ্ণতা বা তাপমাত্রায় উপনীত হলে যে-পরিমাণ চাপ প্রয়োগের ফলে তাকে তরল

করা সম্ভব হয়। কোন গ্যাসকে তার এই ক্রি. টে, বা তার কম উত্তপ্ত অবস্থায় কেবলমাত্র চাপ বৃদ্ধি করেই তরল করা যেতে পারে; ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করেও কোন গ্যাসকে তরল করা সম্ভব হয় না।

ক্রিটিক্যাল ভেলসিটি — প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃপক্ষে সাত মাইল (ঘণ্টায় প্রায় 25,000 মাইল) গতিবেগ দিতে পারলে কোন বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান প্রতিহত করে মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। এই গতিবেগকে পার্থিব বস্তুর ক্রিটিক্যাল ভেলসিটি বলে। (স্পুট্‌নিক ↑, রকেট ↑)।

ক্রিপ্‌টন— মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় পদার্থ (রেয়ার গ্যাস ↑); পারমাণবিক ওজন 83·7, পারমাণবিক সংখ্যা 36; বায়ুমণ্ডলের প্রায় 10 লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র এই গ্যাস পাওয়া যায়। এর কোন রকম রাসায়নিক ক্রিয়াই নেই।

ক্রিপ্‌টল— কাদা মাটি, গ্রাফাইট ↑ ও কোরাণ্ডামের ↑ একটা সংমিশ্রণের বিশেষ নাম। তড়িৎ-রোধক পদার্থ হিসেবে জিনিসটা ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেসে (তড়িৎ চুল্লী) ব্যবহার করা হয়।

ক্রিয়োজোট — এক রকম পাংশু-বর্ণের তৈলাক্ত পদার্থ; আলকাতরা থেকে বাষ্পীকরণ (ডিস্টিলেসন ↑) প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ফিনল ↑ ও ক্রিসল ↑ নামক তরল রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কাঠ থেকেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পদার্থটা কিছু বেরোয়। কাঠ সংরক্ষণের জন্যে এই ক্রিয়োজোট তেল মাখানো হয়। এর বীজাণু প্রতিরোধক (ডিস্‌ইন্‌ফেক্টিং ↑) গুণও আছে। সাধারণ ফিনাইল ↑ তৈরী করতে ক্রিয়োজোট তেল ব্যবহৃত হয়।

ক্রিসল—আলকাতরা (কোলটার ↑) থেকে আংশিক-বাষ্পীকরণ (ফ্রাক্সন্যাল ডিস্টিলেসন ↑) প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বর্ণহীন তরল রাসায়নিক পদার্থ, $CH_3.C_6H_4.OH$, একটি জীবাণুরোধক পদার্থ। 'লাইসল' ↑ নামক এন্টিসেপ্টিক ↑ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন বিস্ফোরক পদার্থ, প্ল্যাষ্টিক ↑ এবং কোন কোন রং তৈরি করতেও পদার্থটার ব্যবহার আছে। (ক্রিয়োজোট ↑)।

ক্রুক্‌স, স্যার উইলিয়াম — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ও রাসায়নিক; জন্ম লণ্ডনে 1832 খৃঃ, মৃত্যু 1919 খৃঃ। পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (রেডিও অ্যাক্টিভিটি ↑) সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা। 'ক্রুক্‌স টিউব' ↑ নামক হাল্‌কা গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহের ফলে বর্ণোজ্জ্বল আলোক বিকিরণের যন্ত্র উদ্ভাবন। থলিয়াম ↑

নামক মৌলিক ধাতু আবিষ্কারে সমধিক প্রসিদ্ধি।

ক্রুক্‌স টিউব — অতি সামান্য বায়ু-চাপবিশিষ্ট (প্রায় বায়ুশূন্য) একটি বিশেষ আকারের কাচনলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে নলটি এক
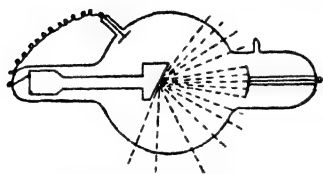
বিশেষ ধরণের ক্রুক্‌স টিউব

রকম হাল্‌কা সবুজ আলোকে উদ্ভাবিত হয়ে ওঠে। এ-থেকে তড়িৎ (ইলেক্‌ট্রন) সম্পর্কীয় বিশেষ তথ্যাদি জানা গেছে। বস্তুতঃ এটা এক ধরণের 'ক্যাথোড-রে টিউব' ↑ মাত্র। আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ক্রুক্‌সের নামানুসারে যন্ত্রটা পরিচিত হয়েছে। **ক্রুক্‌স গ্লাস** – এক রকম বিশেষ কাচ, যা আলোক-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ, কিন্তু তাপরশ্মির পক্ষে অনচ্ছ।

ক্রুসিফেরা — সপুষ্পক উদ্ভিদের বিশেষ এক শ্রেণীর নাম। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ফুলে মাত্র চারটি দল বা পাপড়ি থাকে।

ক্রুসিফেরা

ক্রোমিক অ্যাসিড — ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন হয় (H_2CrO_4) ; এর বিভিন্ন সল্টকে বলে **ক্রোমেট**। বিভিন্ন ক্রোমেট-সল্ট রং তৈরী করতে ও ফটোগ্রাফি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। লেড-ক্রোমেটকে বলে **ক্রোম-ইয়োলো** ; এটা এক রকম হলদে রং। আবার ক্রোম-অ্যালাম ↑ হলো ক্রোমিয়াম-পটাসিয়াম সালফেট সল্ট ; যা রঞ্জন-শিল্পে ও চামড়া ট্যান করবার কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রোমিয়াম — মৌলিক ধাতু, সাদা কঠিন পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Cr, পারমাণবিক ওজন 52·01, পারমাণবিক সংখ্যা 24 ; প্রাকৃতিক ক্রোম-আয়রন (ক্রোমাইট) থেকে নিষ্কাশিত হয়। মরিচা-হীন ইস্পাত তৈরী করতে এবং ক্রোমিয়াম প্লেটিং-এর (ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ↑) কাজে ধাতুটার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

ক্রোমোসোম—জীবের দেহ-কোষের কেন্দ্রীনে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ। কোন রং মেশালে জীব-কোষের একটা অংশে রং ধরে, বাকী অংশ বর্ণহীন থেকে যায়। এই রঙিন অংশকে বলা হয় **ক্রোম্যাটিন** ↑। কোন জীব-কোষ ভেঙ্গে ফেললে তার ওই ক্রোম্যাটিন অংশ কোষের কেন্দ্রীনস্থ সূক্ষ্ম কাঠির মত ক্রোমোসোমগুলোর গায়ে লেগে যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এ-সব ব্যাপার নানা-ভাবে পরিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর

দেহ-কোষে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের কোষে 48-টি মাত্র ক্রোমোসোম রয়েছে। এ-রকম বিভিন্ন প্রাণীর জৈবকোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে; অর্থাৎ একই জাতীয় জীবের প্রত্যেকটি কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের উপর জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রকৃতি, দোষ-গুণ প্রভৃতি নির্ভর করে (জিন্ ↑)।

ক্রোমোস্ফিয়ার—সূর্যের বহির্ভাগের প্রদীপ্ত গ্যাসীয় স্তর। এই স্তর সূর্যের ফোটোস্ফিয়ার ↑ অংশকে বেষ্টন করে আছে। সূর্য-গ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সৌর গোলকের এই স্তরের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ক্রোম্যাটিন — জীবকোষের সংগঠক উপাদানের যে অংশ কোন কোন রং শোষণ করে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, কিন্তু অবশিষ্ট অংশে কোন রং ধরে না। (ক্রোম মানে বর্ণ বা রং)

ক্রোম্যাটিক অ্যাবারসন—লেন্সের যে ত্রুটির ফলে আলোকরশ্মি তার মাধ্যমে প্রতিসরিত (রিফ্রাক্সন ↑) হয়ে একই বিন্দুতে (ফোকাস ↑) কেন্দ্রীভূত হয় না; বিভিন্ন বর্ণরশ্মি বিভিন্ন বিন্দুতে মিলিত বা কেন্দ্রীভূত হয়ে এক রকম মিশ্র বর্ণালীর (স্পেকট্রাম ↑) সৃষ্টি করে। এরূপ লেন্সের ↑ মাধ্যমে দৃষ্ট বস্তু পরিষ্কার দেখা যায় না, বিভিন্ন বর্ণে ঝাপ্সা প্রতিভাত হয়। (অ্যাবারসন ↑ ও অ্যাক্রোমেটিক ↑)।

ক্রোম্যাটোগ্রাফি — রাসায়নিক বিশ্লেষণের একটা পদ্ধতি বিশেষ; যাতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ 'ফুলার্স আর্থ' ↑, অ্যালুমিনা ↑ প্রভৃতি শোষণক্ষম পদার্থের দীর্ঘ স্তরের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণ ঐ শোষকস্তরের বিভিন্ন উচ্চতা বা দূরত্ব অবধি অগ্রসর হয়। এরূপ চলাচলের দ্রুততা ও গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন গুণানুযায়ী বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়।

ক্রোনোমিটার—সময়-নিরূপক এক রকম যন্ত্র, বা ঘড়ি। সঠিক সময় নিরূপণের জন্যে এই যন্ত্র আজকাল বিভিন্ন মান-মন্দিরে ও সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রোনোস্কোপ— সময়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (যেমন, সেকেণ্ডের সহস্রাংশ) পর্যন্ত পরিমাপের একটা যন্ত্রবিশেষ। প্রধানতঃ এর কৌশলটা হলো প্রতি সেকেণ্ডে (সময়ের ভগ্নাংশ অনুসারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্পন্দন-বিশিষ্ট একটা টিউনিং-ফর্ক ↑ এমনভাবে স্পন্দিত করা হয় যাতে তার প্রতি স্পন্দনে একটা চাকার এক-একটা দাঁত ঘুরে যায় এবং এর ফলে যান্ত্রিক

কৌশলে চলমান কাগজের উপরে সময়ের সূক্ষ্ম বিভাগের দাগ পড়ে।

ক্লিনিক — চিকিৎসাগার; যেখানে কোন রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তারী পরামর্শ ও চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া যায়।

ক্লিনিক্যাল থা র্মো মি টা র — 'ক্লিনিক্যাল' কথাটার অর্থ হলো শয্যাশায়ী রোগী সম্পর্কীয়। তাই, রোগীর দেহের তাপ নির্ধারণের জন্যে বিশেষ ধরণের যে থার্মোমিটার ↑ বা 'তাপমান যন্ত্র' ব্যবহৃত হয় তাকে বলে ক্লি থা.। এর তাপমাত্রা ফারেন্‌হাইট ↑ স্কেলে নিরূপিত হয়ে থাকে।

ক্লিনোমিটার — যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড়-পর্বতের ঢালের কোণ মাপা হয়, অর্থাৎ সমতল ভূমি থেকে কতটা কোণে ঢালু হয়ে পাহাড়ের শীর্ষ উঠেছে তার পরিমাণ জানা যায়।

ক্লোর‍্যাল — বর্ণহীন, কটুগন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার তৈলাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, $CCl_3.CHO$; অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে ক্লোরিনের ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঘুমের ঔষধ (নার্কোটিক ↑) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন পদার্থকে বলে 'ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট'।

ক্লোরিন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 35·457, পারমাণবিক সংখ্যা 17, সাংকেতিক চিহ্ন Cl; সবুজাভ হল্‌দে ভারী গ্যাস, শ্বাস-রোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট ও বিষাক্ত। এর বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ পৃথিবীতে নানা আকারে প্রচুর ছড়ানো রয়েছে। সাধারণ লবণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl; পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসেই কম-বেশী লবণ বিদ্যমান। সমুদ্রের জলে প্রচুর লবণ দ্রবীভূত আছে (সি-ওয়াটার ↑)। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl; যার বিভিন্ন সল্ট হলো **ক্লোরাইড**। সোডিয়াম ক্লোরাইড-মিশ্রিত সমুদ্র-জল থেকে ই লে ক্ট্রো লি সি স ↑ প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন সহজে প্রস্তুত করা যায়। এই গ্যাসের সাহায্যে পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করা হয়। বস্ত্রাদি সাদা (ব্লিচিং ↑) করতে ও জীবাণু-নাশক পদার্থ (ব্লিচিং পাউডার ↑) প্রভৃতি তৈরীর কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরেলা — এক জাতীয় গাঢ় সবুজ শ্যাওলা (অ্যালজি ↑)। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, এর মধ্যে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী প্রোটিন, শর্করা, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি সব উপাদানই যথোপযুক্ত পরিমাণে

বর্তমান — পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যার সমাধানে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। জল ও স্থল সর্বত্র এর উৎপাদন সহজ-সাধ্য ; এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড ↑ আত্মীকরণের শক্তিও এদের অতি প্রবল ; এজন্যে সাবমেরিন ↑ ও রকেট ↑ অভিযানের আবদ্ধ কক্ষের বায়ুতে অক্সিজেনের সমতা রক্ষায় সমর্থ বলে পরীক্ষিত।

ক্লোরোফর্ম — বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ ; সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত ; রাসায়নিক সূত্র $CHCl_3$, 'ট্রাইক্লোরো মিথেন'। অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তির জন্যে অস্ত্র-চিকিৎসার সময়ে এ-দিয়ে রোগীকে অনুভূতিশূন্য করে নেওয়া হয়।

ক্লো রো পি ক্রি ন — এক রকম তৈলাক্ত তরল রাসায়নিক পদার্থ, CCl_3NO_2 ; পিক্রিক ↑ অ্যাসিডের সঙ্গে ক্লোরিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন। মারাত্মক বিষাক্ত। উপযুক্ত পরিমাণে ও সাবধানে জীবাণুনাশক ও ছত্রাক-ধ্বংসী পদার্থ হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরোফিল—পত্র-হরিৎ ; উদ্ভিদের পত্রাদির কোষে সবুজবর্ণের যে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ-কণিকা রয়েছে। আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, উদ্ভিদের এই সবুজ-কণা, বা ক্লোরোফিল দু-রকম —'ক্লোরোফিল-এ' হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণ ; আর 'ক্লোরোফিল-বি' নীলাভ সবুজ। সূর্য-কিরণের মাধ্যমে উদ্ভিদ এই ক্লোরোফিলের সাহায্যে শক্তি আহরণ করে ; এবং বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে শর্করা উৎপন্ন করে, অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে পুনরায় বাতাসে মিশে যায়। উদ্ভিদের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, ক্লোরোফিল ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র (ফটো-সিন্থেসিস্ ↑)।

ক্লোরোমাইসিটিন—ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার জৈব পদার্থ থেকে নিঃসৃত জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ। টাইফয়েড রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাক আজ কাল উপযুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে রাসায়নাগারেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

গ

গথিক টাইপ — ছাপার কাজে ব্যবহৃত, অধুনা অপ্রচলিত এক ধরণের ইংরেজী অক্ষর। এরূপ অক্ষর বিভিন্ন রেখা-বিন্যাসে কারুকার্য করা থাকে। গথিক আর্চ — সূক্ষ্মাগ্র গম্বুজাকার ইমারতী গাঁথুনির খিলান।

গথিক আর্চ

গনোকক্কাই — যে রোগ-জীবাণুর (ব্যাক্টিরিয়া ↑) আক্রমণে গনোরিয়া নামক কুৎসিত ও কষ্টদায়ক যৌন-ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

গয়টার — গলগণ্ড রোগ; প্রধানতঃ থাইরয়েড ↑ গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতিজনিত রোগবিশেষ। ভুক্ত খাদ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে আয়োডিনের ↑ অভাবেই এ-রোগ হয়। (এক্সোথ্যালমিক গয়টার ↑)।

গল ব্লাডার — পিত্তাশয়। যকৃৎ (লিভার ↑) থেকে নিঃসৃত সবুজ বর্ণের পিত্তরস (বাইল ↑) খাদ্যের তৈলাক্ত অংশ পরিপাকে সাহায্য করে। এই পিত্তরস লিভারের কাছে সংলগ্ন যে-থলিতে সঞ্চিত হয় তাকে শারীরবৃত্তে বলা হয় গল-ব্লাডার।

গল ব্লাডার

গলষ্টোন—পিত্তকোষে(গল ব্লাডার ↑) সঞ্জাত প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থ-পিণ্ড; পিত্তরসের (বাইল ↑) স্বাভাবিক বিক্রিয়ার গোলযোগে এ-গুলি সৃষ্টি হয়। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগ।

গাইগার কাউণ্টার — যে যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত রশ্মি (আল্ফা, বিটা ও গামা রশ্মি ↑), অথবা কস্‌মিক ↑ রশ্মির অস্তিত্ব এবং তাদের সংগঠক ফোটন ↑ কণিকার সংখ্যা জানা যায়। মোটামুটি এ-যন্ত্রে থাকে ধন-তড়িৎ প্রান্ত (অ্যানোড ↑) হিসাবে একটা সূক্ষ্ম ধাতব তার, যাকে বেষ্টন করে থাকে ঋণ-তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড ↑) হিসাবে একটা সম-অক্ষবিশিষ্ট ধাতব সিলিণ্ডার; সবশুদ্ধ থাকে একটা গ্যাসীয় আধারে আবদ্ধ। ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে প্রায় 1000 ভোল্ট ↑ তড়িৎ-বিভবের ব্যবধান রক্ষা করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরিত রশ্মির 'ফোটন' কণিকাগুলি আয়নায়িত (আয়নিজেসন ↑, আয়ন ↑) হয়ে তড়িৎ-প্রান্তদ্বয়ের ভোল্টেজের ↑ পরিবর্তন ঘটায় এবং যান্ত্রিক কৌশলে তা ধরা পড়ে। এর সাহায্যে আয়নায়িত ফোটনের সংখ্যাও নির্ধারিত হতে পারে।

গাউট — এক জাতীয় বাত রোগ। রক্তে ইউরিক ↑ অ্যাসিড মিশে তার দুষ্ট বিক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অস্থি-সংযোগে ও মাংসপেশীতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কঠিন স্তর জমে যায়, যার ফলে স্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে এ-রোগ জন্মে। স্থানীয় ব্যথা-বেদনা সহ এ-রোগে দেহের অংশ বিশেষের স্ফীতি ঘটে ও সঞ্চালনে কষ্ট হয়।

গাটাপার্চা — অনেকটা রাবারের মত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। মালয়ে উৎপন্ন এক শ্রেণীর উদ্ভিদের রস (ল্যাটেক্স ↑) থেকে গাটাপার্চা তৈরী হয়ে থাকে। অত্যন্ত দাহ্য

পদার্থ ; তড়িৎ-রোধক পদার্থ হিসেবে অনেক সময় বৈদ্যুতিক তারে ও যন্ত্রাদিতে এর আবরণ দেওয়া হয়।

গান কটন — নাইট্রোসেলুলোজ↑, বা সেলুলোজ-নাইট্রেট। অতি উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ। তুলা, কাঠের আঁস প্রভৃতি সেলুলোজ↑ জাতীয় পদার্থের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়।

গান পাউডার—পটাসিয়াম নাইট্রেট (সল্ট পিটার↑), গন্ধক ও কয়লার গুড়ার সংমিশ্রণে তৈরী একটি বিস্ফোরক পদার্থ। এই বারুদে আগুন দিলে, বা আঘাত-জনিত উত্তাপে অতি দ্রুত বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, যার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে, এবং সহসা প্রচুর গ্যাস ও ধূম জন্মায়। কামান-বন্দুকের আবদ্ধ খোলের মধ্যে এরূপ বিস্ফোরণের ফলেই প্রচণ্ড শব্দ হয় ও উৎপন্ন গ্যাসের চাপে গোলা-গোলি দুরন্ত বেগে ছুটে বেরোয়।

গান মেটাল—তামা, দস্তা (জিঙ্ক↑) ও টিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটা সংকর ধাতু। সামান্য নীলাভ ধূসর বর্ণের এক প্রকার ব্রোঞ্জ↑, এর মধ্যে প্রায় 90% তামা, 6 থেকে 8 % টিন এবং 2 থেকে 4 % দস্তা সংমিশ্রিত থাকে।

গাম অ্যারাবিক — অ্যাকেসিয়া নামক এক রকম উদ্ভিদের বিশুষ্ক রস ; সাধারণ গঁদের আঠা। আঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ঔষধেও লাগে। প্রকৃতিতে আরও নানারকম গাম আছে ; সবই উদ্ভিজ্জ পদার্থ।

গামা-আয়রন — অত্যধিক তাপ-সহনশীল এক রকম (ইস্পাত) লোহা, যাকে **অস্টেনাইট**-ও বলা হয়। সামান্য কার্বন, নিকেল↑, ম্যাঙ্গানিজ↑ প্রভৃতি মিশিয়ে সাধারণ লোহাকে এরূপ বিশেষ স্টিল↑ বা ইস্পাতে পরিণত করা হয়। আবার বিশেষ কঠিন এক রকম ব্রাস↑, বা পিতলকে বলে **গামা-ব্রাস**।

গামা-রে — গামা রশ্মি ; বিভিন্ন স্বয়ম্প্রভ (রেডিও-অ্যাক্টিভ↑) পদার্থ থেকে যে বিশেষ এক শ্রেণীর অতি সূক্ষ্ম তেজ-রশ্মি তরঙ্গাকারে বিচ্ছুরিত হয়। এই রশ্মি এক্স-রশ্মির↑ অনুরূপ, কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও কম। এটা প্রকৃত পক্ষে তড়িৎ-চৌম্বকীয় এক বিশেষ তরঙ্গ মাত্র। রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থ থেকে ইলেকট্রনের তরঙ্গধারা (বিটারশ্মি↑) বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে এই গামা-তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয়। গামা-রশ্মি খুব মোটা ধাতব বাধাও ভেদ করে যেতে পারে, কিন্তু দু-মাইলের অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে যেতে পারে না। এই রশ্মি প্রাণিদেহের রক্ত-উৎপাদক কোষ

বিভিন্ন রশ্মির বিচ্ছুরণ

নষ্ট করে ফেলে ; কাজেই প্রাণীদের পক্ষে এটা বিশেষ মারাত্মক।

গিয়ার — যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত দাঁত-কাটা চাকাকে বলে **গিয়ার-হুইল**। এরূপ বিভিন্ন চাকার পরস্পর সন্নিবেশকে বলে গিয়ার। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক বেগশক্তি স্থির থাকলেও একটা গিয়ার-হুইল ঘুরিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চাকার সংযোগ কমিয়ে-বাড়িয়ে যন্ত্রের সামগ্রিক গতি-বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যায়। মোটরে থাকে গিয়ার-বক্স, যার মধ্যে বিভিন্ন মাপের গিয়ার সন্নিবিষ্ট থাকে।
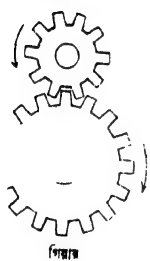
গিয়ার

গেইজার—(1) উষ্ণ-প্রস্রবণ ; ভূগর্ভ থেকে স্বভাবতঃ গরম জলের যে ধারা উৎসারিত হয়। (2) যে যন্ত্রে প্রবিষ্ট জল বিশেষ ব্যবস্থায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে নল-পথে বেরিয়ে আসে। শীতপ্রধান দেশে এরূপ যন্ত্র স্নানের ঘরে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রের উপর দিকের নলপথে জল প্রবেশ করে। সেই জল অভ্যন্তরস্থ অনেকগুলো উত্তপ্ত চাকতির উপর দিয়ে গড়িয়ে নামে। এভাবে জল গরম হয়ে নীচের নলপথে বেরিয়ে আসে। যন্ত্রটার নিম্নভাগে গ্যাসের উনান জ্বালানো থাকে, তার উত্তাপে ভিতরের ওই চাকতিগুলো উত্তপ্ত হয়ে থাকে।

গেইজার যন্ত্র

গেজ — পরিমাপক যন্ত্র ; যেমন—পেট্রল-গেজ, প্রেসার-গেজ ইত্যাদি। আবার সরু তারের ব্যাস নিখুঁত-ভাবে মাপবার জন্যে 'মাইক্রোমিটার গেজ' নামক যন্ত্র (প্রদত্ত চিত্র↑) ব্যবহৃত হয়। রেল-লাইনের দুটো রেলের মাঝে 7 ফুট ব্যবধান থাকলে বলে **ব্রড-গেজ** এবং 3 ফুট 6 ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে বলে **ন্যারো-গেজ** লাইন।

মাইক্রোমিটার গেজ

গে-লুসাক, লুই জোসেফ — ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী, জন্ম 1778 খৃঃ, মৃত্যু 1850 খৃষ্টাব্দ। বিভিন্ন রাসায়নিক গবেষণায়ই কিন্তু সমধিক প্রসিদ্ধি-আয়োডিনের↑ রাসায়নিক ধর্মাদি নির্ণয়, সালফিউরিক (H_2SO_4) ও অক্স্যালিক [$(COOH)_2.2H_2O$] অ্যাসিড তৈরীর নূতন প্রণালী উদ্ভাবন ; রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন গ্যাসীয় সংমিশ্রণের আয়তনের পরিবর্তন বিষয়ক সূত্র (গে-লুসাক্স-ল↑) প্রভৃতি আবিষ্কারে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন।

গে-লুসাক্স্-ল — বিভিন্ন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যৌগিক

পদার্থটাও যদি গ্যাসীয় হয়, তবে ওই উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন হবে উৎপাদক গ্যাস দুটির আয়তনের আনুপাতিক। এই নিয়ম অনুযায়ী এক ঘন ফুট অক্সিজেন ও দুই ঘন ফুট হাইড্রোজেনের মিলনে হবে দুই ঘন ফুট জলীয় বাষ্প। অবশ্য 100° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপে এই রাসায়নিক সংযোগ ঘটানো চাই; নতুবা উৎপন্ন পদার্থ গ্যাসীয় হবে না, হবে জল। আবার সর্বদা একই তাপ ও চাপে গ্যাসগুলোর আয়তন মাপতে হবে। ফরাসী বিজ্ঞানী গে-লুসাক্ ↑ গ্যাসীয় বিক্রিয়ার এই সূত্র নির্ধারণ করেন।

গেস্‌লার টিউব — বিভিন্ন গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের দীপ্তি এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা হয়। এটা একটা লম্বা কাচের-টিউব মাত্র। (অবশ্য এই কাচের টিউব বিভিন্ন আকৃতিরও হতে পারে) টিউবটা থাকে প্রায় বায়ুশূন্য, সামান্য পরিমাণ কোন গ্যাসে পূর্ণ। ওর ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে আবদ্ধ গ্যাসের পরমাণুগুলো তড়িৎ-প্রবাহের ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে এ-রকম দীপ্তি বিভিন্ন বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

গেস্‌লার টিউব

গোল্ড — সোনা; মৌলিক ধাতু, পারমাণবিক ওজন 197·2, পারমাণবিক সংখ্যা 79, সাংকেতিক চিহ্ন Au, উজ্জ্বল হলদে নমনীয় পদার্থ। সহজেই একে পাত ও তারে পরিণত করা যায়; মরিচা ধরে না, কোন অ্যাসিডেও গলে না। কেবল 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' ↑ নামক মিশ্র অ্যাসিডে সোনা দ্রবীভূত হয়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যায়। আবার কোথাও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ও প্রস্তরাদির সঙ্গে মিশ্রিত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। পূর্বে এরূপ অবিশুদ্ধ খনিজ প্রস্তর থেকে অ্যামালগাম ↑ প্রক্রিয়ায় সোনা নিষ্কাশিত হতো। তামা বা রূপা মিশিয়ে সোনার ধাতু-সংকর তৈরী করা হয়, (ক্যারেট ↑) এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে এ-দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়। সোনার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফির ↑ কাজে ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গোল্ড-লিফ ইলেক্‌ট্রোস্কোপ — ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ↑ ।

গোল্ডেন অয়েণ্টমেণ্ট —চক্ষু-রোগের মলম বিশেষ; চর্বি বা ভেসেলিন ↑ জাতীয় পদার্থে হলদে বর্ণের অতি বিশুদ্ধ 'পারদ ভস্ম' (মারকিউরিক অক্সাইড, Hg_2O) মিশিয়ে তৈরী করা হয়।

গ্যাংওয়ে—বড় বড় নৌকা বা জাহাজে আরোহণ বা, তা থেকে অবতরণের সুবিধার জন্যে সহজে স্থাপন ও অপসারণের যোগ্য যে সিড়ির সেতু ব্যবহার করা হয়।

গ্যাংগ্রিন — নালি ঘা, অন্তঃপ্রসারী ক্ষত। জীবাণুর প্রকোপে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে স্থানীয় মাংস-কোষগুলি (সেল ↑) মরে মরে ক্রমে ভিতরের দিকে এগিয়ে এরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। **গ্যাস গ্যাংগ্রিন**—যে নালিঘায়ে বিশেষ জীবাণুর (ব্যাচিলাস ↑) বিষ-ক্রিয়ায় দূষিত মাংসের অভ্যন্তরে গ্যাস জন্মে ও মাংসপেশী ঝাঁজরা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়ে যায়।

গ্যামাক্সেন — বিশেষ এক প্রকার আণবিক গঠন-বিশিষ্ট বেঞ্জিন-হেক্সাক্লোরাইড ($H_6C_6Cl_6$) নামক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। সাদা গুঁড়া আকারে পাওয়া যায় ; কীট-পতঙ্গ-নাশক বিশেষ শক্তিশালী বিষাক্ত পদার্থ।

গ্যামিট — প্রজনন-কোষ ; পুং বা স্ত্রী জৈবকোষ, যাদের পরস্পর মিলনে উদ্ভূত নূতন নূতন জীবকোষ ক্রমে ভ্রূণে (ফিটাস ↑) পরিণত হয়।

গ্যামিটোসাইট্স—যে সব জীবাণু-কোষ উপযুক্ত পরিবেশে কোন জীবের দেহে প্রজনন-কোষে রূপান্তরিত হয় ; যেমন—ম্যালেরিয়ার জীবাণু-কোষ মশকের দ্বারা সংক্রামিত হয়ে মানুষের রক্তে প্রজনন-কোষে রূপান্তরিত হয় এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায়।

গ্যাল্ভ্যানাইজ্ড আয়রন —জিঙ্ক অর্থাৎ, দস্তার একটা পাতলা আবরণ দেওয়া লোহার জিনিস। দস্তা গলিয়ে তার মধ্যে (অ্যাসিডের সাহায্যে সুপরিস্কৃত) লোহার জিনিস ডুবিয়ে নিলেই এরূপ গ্যাল্ভ্যানাইজ্ড হয়ে যায়, অর্থাৎ লোহার উপরে দস্তার একটা পাতলা আবরণ ধরে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **গ্যাল্ভ্যানাইজিং**। লোহায় মরিচা ধরা বন্ধ করবার জন্যে এরূপ প্রক্রিয়া করা হয়। ঘরের চালার ঢেউ-টিন এভাবে তৈরী হয়; প্রকৃতপক্ষে জিনিসটা টিন ↑ নয়, জিঙ্কের ↑ পাত্লা আস্তরণযুক্ত ঢেউ-তোলা লোহার পাত মাত্র।

গ্যাল্ভ্যানি, লুইগি — ইটালীয় জীববিজ্ঞানী, বোলোন সহরে জন্ম 1737 খৃঃ, মৃত্যু 1798 খৃঃ। ছিলেন শারীরবৃত্তের অধ্যাপক ; ব্যাং-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে গবেষণার কালে 1762 খৃঃ জীবদেহে তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কারে অবিস্মরণীয় কীর্তি। নামানুসারে জৈব তড়িৎপ্রবাহ 'গ্যালভ্যানি প্রবাহ' নামে খ্যাত।

গ্যালভ্যানোমিটার — সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশক

এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। সাধারণ গ্যালভ্যানোমিটারে একটা বৃত্তাকার স্কেলের উপর একটা কাঁটা ঘুরে তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশ করে; তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। বিশেষ ধরণের গ্যালভ্যানোমিটারের চৌম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে আবার ওই সূক্ষ্ম কাঁটার সঙ্গে

গ্যালভ্যানোমিটার

ক্ষুদ্র এক খানা দর্পণ ঝুলানো থাকে; অতি সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের ফলেও ওই দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি পরিবর্তিত কোণে ঘুরে অতি সামান্য তড়িতের অস্তিত্বও জ্ঞাপন করতে পারে। গ্যালভ্যানোমিটারে তড়িৎ-শক্তির সামান্য প্রবাহ নির্দেশ করে মাত্র, অ্যাম্-মিটারের ↑ মত এ-দিয়ে সাধারণতঃ তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ মাপা সম্ভব হয় না।

গ্যালাক্টোস — দুগ্ধ-শর্করার প্রধান উপাদান। প্রাণিদুগ্ধে বর্তমান মোট শর্করার (সুগার অব মিল্ক ↑) প্রায় অর্ধাংশ হলো এই গ্যালাক্টোস। মানুষের মস্তিষ্কে ও উদ্ভিদেও এই রাসায়নিক পদার্থটা পাওয়া যায়।

গ্যালাক্সি — ছায়াপথ; মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নিকট সমাবেশে গঠিত। এরূপ অগণিত গ্যালাক্সি মহাশূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। আমাদের সৌর পরিবার ও দৃষ্ট নক্ষত্ররাজি এরূপ বিভিন্ন ছায়াপথের অন্তর্গত। এরূপ জ্যোতিষ্ক সমাবেশকে কখন কখন আবার 'মিল্কি-ওয়ে'ও বলে।

গ্যালিলিও, গেলিলি — ইটালীয় বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ; অভূতপূর্ব প্রতিভাবান। ফ্লোরেন্সে জন্ম 1564 খৃঃ, মৃত্যু 1642 খৃঃ। পিসা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা-কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য কর্মচ্যুতি। পেডুয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ে অধ্যাপনাকালে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—গগন পর্যবেক্ষণের উপ-যোগী নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন, কোপার্নিকাসের ↑ প্রবর্তিত সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদ সমর্থন, বৃহ-স্পতি গ্রহের একাধিক উপগ্রহ, সৌর-কলঙ্ক, সূর্যের আবর্তন প্রভৃতি নূতন নূতন তথ্যাবিষ্কার। পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্ব সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তির বিরুদ্ধতার অভিযোগে বৃদ্ধ বয়সে রোমে পোপের আদেশে কারারুদ্ধ। প্রচলিত ধর্মভাবের অনুরোধে ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে অগত্যা সখেদে 'সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে' এই ভ্রান্ত মতে স্বীকৃতি দিয়ে নিষ্কৃতি ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। শেষ জীবনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।

পিসার গির্জায় দোলায়মান বাতি লক্ষ্য করে যৌবনেই দোলন-যন্ত্রের (পেণ্ডুলাম ↑) সূত্র আবিষ্কার। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কার্যকারিতা,

চৌম্বকশক্তির ব্যাখ্যা, তাপমান যন্ত্র সংস্কার প্রভৃতি বহু মূল্যবান অবদান। এক কথায় গ্যালিলিও ছিলেন সে-যুগের জ্ঞানধারার বহু অগ্রগামী প্রতিভা — বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিস্ময়।

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ — সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ↑ দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্যে গ্যালিলিও-র এই প্রাথমিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আইপিসে ↑ ব্যবহৃত হয়েছিল একখানা অবতল (কন্‌কেভ ↑) লেন্স। এরূপ বিশেষ ধরণের আইপিস-যুক্ত টেলিস্কোপকে ↑ বলা হয় গ্যালিলিও-টেলিস্কোপ।

গ্যালিক অ্যাসিড—ওক, চা প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটা জৈব অ্যাসিড, $C_6H_2(OH)_3COOH$; চামড়া ট্যান্ করতে ও কালি তৈরীর কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ওক, ওয়াট্‌ল, গরাণ প্রভৃতি গাছের ছালে ট্যানিক ↑ অ্যাসিডের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় গ্যালিক অ্যাসিডও কিছু পাওয়া যায়।

গ্যালিনা— খনিজ লেড-সালফাইড, PbS; বাংলায় বলে সীসাঞ্জন; ভারী স্ফটিকাকার চকচকে পদার্থ। বেশীর ভাগ সীসা এই খনিজ থেকেই নিষ্কাশিত হয়। এর মধ্যে কিছু রৌপ্যও মিশ্রিত থাকে।

গ্যালিয়াম — মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 69·72, পারমাণবিক সংখ্যা 31; প্রতীক চিহ্ন Ga; খনিজ দস্তার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাদা নরম ধাতব পদার্থ। এর গলনাংক মাত্র 30° সেন্টিগ্রেড; কাজেই একে সাধারণতঃ পারার (মার্কারি ↑) মত তরল অবস্থায়ই দেখা যায়। আবিষ্কৃত হয় 1875 খৃঃ; অ্যালুমিনিয়ামের সমপর্যায়ভুক্ত বলে ধাতুটা প্রথমে **একা-অ্যালুমিনিয়াম** ↑ নামে পরিচিত ছিল।

গ্যালেন, ক্লডিয়াস — গ্রীস দেশীয় চিকিৎসক। সুনির্দিষ্ট জীবনকাল অজ্ঞাত; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রোম সম্রাট মার্কাস অরিলিয়াসের রাজত্বকালে আবির্ভাব। দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও অস্থি-সংস্থান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথপ্রদর্শক। খ্যাতিতে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিপোক্রিটাসের ↑ সমকক্ষ। রোগ ও নিদান সম্পর্কে প্রায় 500 গ্রন্থ রচনা; কতকগুলি অদ্যাপি অভ্রান্ত বলে চিকিৎসা-জগতে স্বীকৃত।

গ্যাস — পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থার অন্যতম অবস্থা (কঠিন, তরল ও গ্যাস)। গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ প্রায় থাকে না, কাজেই গ্যাস আবদ্ধ পাত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উপযুক্ত নিম্ন-উষ্ণতায় গ্যাস জমে প্রথমে তরল এবং পরে কঠিন অবস্থায়

রূপান্তরিত হয়; আবার উপযুক্ত তাপবৃদ্ধিতে কঠিন পদার্থকে প্রথমে তরল ও পরে গ্যাসে পরিণত করা যেতে পারে। এটা সাধারণ নিয়ম, ব্যতিক্রমও আছে। অনেক সময় কেবল চাপবৃদ্ধি করেও গ্যাসকে তরল করা যেতে পারে (ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ↑)।

গ্যাসের উষ্ণতা, চাপ ও আয়তনের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতকগুলি নিয়ম বা সূত্রে বাঁধা। গ্যাসীয় সূত্র : (1) **বয়েলের সূত্র** (বয়েল্‌স-ল ↑) উষ্ণতা একই রাখলে গ্যাসের আয়তন (V) তার উপরে প্রযুক্ত চাপের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে বা কমে; যেমন, চাপ (P) দ্বিগুণ করলে আয়তন (V) অর্ধেক হয়ে যায়। সূত্র (2) **চার্লসের সূত্র** (চার্লস ল ↑): চাপ একই রাখলে যে কোন গ্যাসের 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যে আয়তন থাকে প্রতি 1° সে. উষ্ণতা-বৃদ্ধিতে তার 1/273 অংশ বর্ধিত হয়, অর্থাৎ (চাপ সমান রাখলে) নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন সর্বদা তার অ্যাবসোলিউট ↑ উষ্ণতার সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এ-সব নিয়ম অবশ্য কোন গ্যাসের পক্ষেই সর্বতোভাবে খাটে না; অনেকটা খাটে মাত্র অত্যধিক উষ্ণতায়। যে গ্যাসের বেলায় উক্ত গ্যাসীয় সূত্রগুলি সর্বাংশে খাটে বলে মনে করা হয় তাকে বলে **পারফেক্ট** বা **আইডিয়াল গ্যাস**; বস্তুতঃ প্রকৃত 'পারফেক্ট গ্যাস' দুর্লভ।

গ্যাসীয় সংযোগ সম্পর্কে **গে-লুসাকের সূত্র** (গে লুসাক্‌স-ল ↑): বিভিন্ন মৌলিক গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে কোন গ্যাসীয় যৌগিক উৎপন্ন হলে একই চাপ ও উষ্ণতায় সংযোজক ও সংযোজিত গ্যাসগুলির আয়তন সর্বদা সরল আনুপাতিক হবে। এ সত্য পরে **অ্যাভোগেড্রোর প্রকল্প** (অ্যাভোগেড্রোস হাইপথেসিস ↑) থেকে সমর্থিত হয়: একই চাপ ও উষ্ণতায় সব গ্যাসেরই সমান আয়তনে সমসংখ্যক গ্যাসীয় অণু থাকে।

মৌলিক গ্যাস হলো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন প্রভৃতি;— যৌগিক গ্যাস হলো কার্বন-ডাইঅক্সাইড, মিথেন, হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিড, কোল গ্যাস প্রভৃতি। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও উষ্ণতায় যে সব পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তাদেরই গ্যাস বলা হয়, গ্যাস হলো পদার্থের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। ক্লোরিন, ফ্লোরিন প্রভৃতি মৌলিক গ্যাসগুলি বিষাক্ত; কোল-গ্যাস ↑, ওয়াটার গ্যাস ↑ প্রভৃতি যৌগিক গ্যাসগুলি দাহ্য বলে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত আর্গন, হিলিয়াম,

নিয়ন, জেনন ও ক্রিপ্‌টন নামক গ্যাসগুলিকে বলা হয় **রেয়ার** ↑ (দুর্লভ) **গ্যাস**।

গ্যাস ইঞ্জিন — এক বিশেষ ধরণের 'ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন' ↑; আবদ্ধ আধারে (সিলিণ্ডারে) কোল-গ্যাস ↑ ও বায়ুর সংমিশ্রণে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাতে উদ্ভূত গ্যাসীয় চাপশক্তির নিয়ন্ত্রণে এ-ইঞ্জিন চলে। 1870 খৃঃ কোল-গ্যাসের ↑ সাহায্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে নানারূপ উন্নতি ঘটেছে —নিকোলাস অটো নামক এক যন্ত্রবিদ্ চার পর্যায়ের ((4-Stroke) (অর্থাৎ গ্যাসীয় মিশ্রণের প্রতি বিস্ফোরণে ইঞ্জিনের পিস্টন চার বার ওঠা-নামা করে) বিশেষ গ্যাস-ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। সর্বশেষে 1936 খৃঃ **গ্যাস টার্বাইন** ↑ চালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়।

গ্যাস কার্বন — কোল-গ্যাস ↑ উৎপাদনের জন্যে যে সুবৃহৎ বক-যন্ত্রে (রেটর্ট ↑) কয়লা চোলাই করা হয়, তার গায়ে এক রকম বিশুদ্ধ কার্বন (কয়লা) জমে যায়; একেই গ্যাস-কাবন বলে। এরূপ বিশুদ্ধ কার্বন একটা উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ; এদিয়ে সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির ইলেক্‌ট্রোড ↑ তৈরী হয়।

গ্যাস মাস্ক — গ্যাস-মুখোস; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাস ও ধূম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সৈনিকেরা যে মুখোস পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে এর ছিদ্র-পথে কার্বনের গুঁড়ার একটা স্তর ও তার গায়ে একটা ফিল্টার-প্যাড থাকে। এর ভিতর দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে, কিন্তু ভারী বিষাক্ত গ্যাস ও ধূম আটকে যায়। বায়ু, কার্বন-মনক্সাইড, কোল গ্যাস ↑ প্রভৃতি হাল্‌কা বলে এতে তেমন আটকায় না। কেবল রাসায়নিক যুদ্ধের ভারী বিষাক্ত গ্যাসগুলো থেকেই এরূপ মাস্কের ব্যবহারকারীরা রক্ষা পায়।

গ্যাস ম্যাণ্টেল — গ্যাস লাইটে যে জালি আবরণটা প্রদীপ্ত হয়ে আলো দেয়। সিল্ক জাতীয় সুতায় বোনা এই জালি প্রায় 99% থোরিয়াম অক্সাইড ও 1% সিরিয়াম অক্সাইডের সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায় অদাহ্য হয়ে পড়ে এবং ওই দুটি ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি প্রদীপ্ত হয়েই আলো ছড়ায়। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জালিটাকে এরূপ অদাহ্য ও দীপ্তিক্ষম করা হয়ে থাকে।

গ্যাসোমিটার — গ্যাস-সরবরাহ কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস সঞ্চয় ও সংরক্ষণের উপযোগী বিশেষ ধরণের এক রকম আধার। সাধারণ গ্যাসো-মিটার হলো, ইট ও সিমেণ্টের তৈরী প্রকাণ্ড পাতকুঁয়ার মত একটা জলপূর্ণ পাত্র, যার মধ্যে ধাতব পাতে-তৈরী একটা প্রকাণ্ড ড্রাম বসানো থাকে। উৎপাদিত

গ্যাসকে নলপথে ওই জলপূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করালে জল অপসারিত হয়ে ড্রামের ভিতরে গ্যাস জমতে থাকে। আবদ্ধ গ্যাসের চাপে ড্রামটা ক্রমে জলের উপরে ভেসে ওঠে। প্রয়োজন অনুসারে ওই সঞ্চিত গ্যাস পৃথক নলপথে নানা কাজে সরবরাহ করা হয়। আবদ্ধ গ্যাস বেরিয়ে যেতে ড্রামটা আবার ক্রমে ক্রমে জলে নিমজ্জিত হতে থাকে।
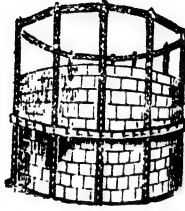
সাধারণ গ্যাসোমিটার

গ্যাসোলিন — খনিজ তৈল, পেট্রল ↑, মোটর-স্পিরিট প্রভৃতির বিশেষ নাম। পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ।

গ্যাস্ট্রাইটিস—রোগ বিশেষ; পাকস্থলীর প্রদাহ। সাধারণতঃ অত্যধিক মদ্যপান, বিশেষ গুরুপাক খাদ্যাদি ভোজনের অভ্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে অনেকের এ-রোগ জন্মায়।

গ্যাস্ট্রোপোডা -- শামুক জাতীয় যে সব জীব দেহভ্যন্তরস্থ নরম এক রকম মাংসপেশী খোলসের মুখে বিস্তার করে চলাফেরা করে, এবং ওই মাংসপেশীর সাহায্যেই অবলম্বন-স্থানে লেপ্‌টে থাকে।

গ্যাস্ট্রোপোডা (শামুক)

গ্র্যাম — সি. জি. এস. সিস্টেমে পদার্থের ওজন পরিমাপের মৌলিক একক বিশেষ; 4° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে এক ঘন সেন্টিমিটার ↑ বিশুদ্ধ জলের ওজনের প্রায় সমান। 1000 গ্র্যাম = 1 কিলোগ্র্যাম।

গ্র্যাম অ্যাটম -- গ্র্যাম এককে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন; যেমন, গন্ধকের (সালফার ↑) গ্র্যাম-অ্যাটমিক ওয়েট ↑ হলে 32·066 গ্র্যাম।

গ্র্যাম ইকুইভ্যালাণ্ট — কোন মৌলিক পদার্থের যত গ্র্যামের ↑ সঙ্গে এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন, বা আট গ্র্যাম অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটতে পারে, সেই গ্র্যাম-সংখ্যাকে ঐ মৌলিক পদার্থের গ্র্যা.ই. বলে। একে **ইকুইভ্যালাণ্ট ওয়েট**-ও বলা হয়।

গ্র্যাম-ক্যালোরি — এক গ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা 14·5° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ থেকে 15·5° সেন্টিগ্রেডে উন্নীত করতে যতটা তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়। এটা তাপ-শক্তির একটা একক বিশেষ।

গ্র্যাম মলিকিউল — গ্র্যাম এককে কোন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের আণবিক ওজন। একে **মোল**-ও বলা হয়। যেমন, জলের মোল বা গ্র্যাম-মলিকিউল হলো 18 গ্র্যাম।

গ্র্যামিনিভোরাস—তৃণভোজী; যে সব প্রাণী ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ

করে। 'গ্র্যামিনি' মানে ঘাস বা তৃণ।

গ্র্যানাইট — মোটা দানাযুক্ত কঠিন এক শ্রেণীর প্রস্তর বিশেষ। এই শ্রেণীর ফেলস্পার ↑, কোয়ার্জ ↑ প্রভৃতি পাথরে সাধারণতঃ কিছু অভ্র (মাইকা ↑) মিশ্রিত থাকে। গ্র্যানাইট পাথরের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে ওঠে; এ-জন্যে একে সাধারণ কথায় বলে 'চকমকি পাথর'।

গ্র্যাফাইট — কার্বন জাতীয় পদার্থ; কার্বনের একটা অ্যালোট্রোপ ↑। একে **ব্ল্যাক লেড** বা **প্লাম্বাগো**-ও বলে। আমরা যাকে লেড-পেন্সিল বলি তার শিষ্ গ্র্যাফাইটে তৈরী, লেড (সীসা) নয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

গ্রাউণ্ড স্পিড — প্রতিকূল বায়ু-প্রবাহের গতি প্রতিহত করে যে আপেক্ষিক গতিতে এরোপ্লেন ঊর্ধে সঞ্চরণ করে; যেমন — প্রতিকূল বায়ুর গতি ঘণ্টায় 30 মাইল এবং এরোপ্লেনের নিজস্ব প্রকৃত গতি ঘণ্টায় 200 মাইল হলে তার গ্রা. স্পি. হবে ঘণ্টায় 170 মাইল।

গ্রাউণ্ড রে — যে-সব রেডিও-তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে পৌছায়, প্রবাহের পথে উচ্চাকাশের বায়ুস্তরের কোথাও প্রতিফলিত হয়ে নিম্নদিকে দিক্-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না (হেভিসাইড কেনেলি লেয়ার ↑)। নিকটবর্তী স্থানেই এরূপ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করা সম্ভব। এরূপ বেতার-তরঙ্গকে **গ্রাউণ্ড ওয়েভ**-ও বলা হয়।

গ্র্যাভিটেসন — মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। সকল বস্তুকেই পৃথিবী অবিরত তার কেন্দ্রের দিকে টানছে; পৃথিবীর এই আকর্ষণ-শক্তির ফলেই গাছের ফল মাটিতে পড়ে। একেই বলে 'ফোর্স অব গ্র্যাভিটি'; বাংলায়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কোন বস্তুর ওজন হলো তার উপরে পৃথিবীর এই টান বা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ। কেবল পৃথিবী নয়, বস্তুতঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে টানছে, একে বলা হয় অভিকর্ষণ শক্তি, বা 'ফোর্স অব গ্র্যাভিটেসন'। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভিকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র (ল অব গ্র্যাভিটেসন) হলো এই যে, বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ তাদের বস্তুভর (মাস্ ↑) ও ব্যবধানের উপর নির্ভর করে; এবং তা তাদের পরস্পরের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক, আর দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত (ব্যস্ত) আনুপাতিক হয়ে থাকে।

গ্রাভিটেসন্যাল ইউনিট—গ্র্যাম ↑, পাউণ্ড ↑ প্রভৃতি হলো ওজন পরিমাপক একক; এগুলি বস্তুর ওজন (ওয়েট ↑), অর্থাৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের (ফোর্স অব গ্রাভিটি ↑) পরিমাণ বুঝায়। কাজেই এদের গ্রা.ই.

বলে। কিন্তু ডাইন ↑ এবং পাউণ্ড্যাল ↑ গ্রাভিটেসন্যাল ইউনিট নয়; এর কারণ, শেষোক্তগুলি বস্তুর ওজনের উপরে নির্ভরশীল নয়; ভূ-তলে বা আকাশে, পৃথিবীতে বা চাঁদে সর্বত্র এদের পরিমাণ সমান হবে।

গ্রাভিমেট্রিক অ্যানালিসিস — মাত্রিক বিশ্লেষণ। কোন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের যে পদ্ধতিতে সংগঠক উপাদানগুলির শতাংশিক ওজন-পরিমাণ নির্ধারিত হয়। (অ্যানালিসিস ↑)।

গ্রাহাম বেল — প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্; জন্ম স্কটল্যাণ্ডে 1847 খৃঃ, মৃত্যু 1922 খৃঃ। টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা, মাত্র 29 বছর বয়সে 1876 খৃঃ 10 মে তারিখে সর্ব প্রথম টেলিফোনের ↑ কৌশল জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন। বধিরদের জন্য অডিওমিটার যন্ত্র, ফোনোগ্রাফের ↑ রেকর্ড, ইণ্ডাকসন ব্যালান্স প্রভৃতি উদ্ভাবন; ব্যোমযান সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।

গ্রাহাম্স ল অব ডিফিউসন — ডিফিউসন মানে অনুপ্রবেশ; কোন গ্যাসীয় (বা তরল) পদার্থ অপর কোন গ্যাসীয় (বা তরল) পদার্থের মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট হয়ে পরস্পরের ঘনত্বের সমতা সাধন করতে চায়— গ্যাস ও তরল পদার্থের এই মিশ্রণ বা অনুপ্রবেশের প্রবণতাকে বলে 'ডিফিউসন'। হাল্কা গ্যাস বায়ুমধ্যে অধিকতর বেগে অণুপ্রবেশ করে, অর্থাৎ ছড়িয়ে যায়; কিন্তু ভারী গ্যাস ছড়ায় ধীরে ধীরে। এ সম্পর্কে গ্রাহামের সূত্র হলো: কোন গ্যাসের মধ্যে অপর কোন গ্যাসের অনুপ্রবেশের গতি হবে তার ঘনত্বের বর্গমূলের সঙ্গে বিপরীত আনুপাতিক (ইন্‌ভার্স প্রোপোরসন ↑) হারে; যেমন — অক্সিজেনের ঘনত্ব (ডেন্সিটি ↑) হাইড্রোজেনের 16 গুণ; সুতরাং অক্সিজেন হাইড্রোজেনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবে হাইড্রোজেনের ($1/\sqrt{16} = 1/4$) এক চতুর্থাংশ বেগে।

গ্রিক ফায়ার — জলের সংস্পর্শে অগ্নি-উৎপাদক এক মিশ্রণ বিশেষ। বিভিন্ন পদার্থের এক প্রকার সংমিশ্রণ, যা প্রাচীন গ্রীকগণ নৌ-যুদ্ধে ব্যবহার করতো। সংমিশ্রণটা জলের সংস্পর্শ পেলেই জ্বলে উঠতো। সম্ভবতঃ এটা গন্ধক, ন্যাপথা ↑, চুন (কুইক লাইম ↑) প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী করা হোত।

গ্রিন ভিট্রিয়ল—ফেরাস্ সাল্‌ফেট; লোহার সঙ্গে মৃদু সাল্‌ফিউরিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন সাল্‌ফেট সল্টের বিশেষ নাম। সজল স্ফটিকাকার, সবুজ বর্ণ; রাসায়নিক সূত্র $FeSO_4.7H_2O$; বাংলায় বলে 'হিরাকস'।

গ্রিনউইচ টাইম — আন্তর্জাতিক প্রমাণ-কাল। পৃথিবীর আবর্তন-হেতু

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় সময়ে সূর্যোদয় হয়। এর ফলে একই ঘড়িতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় নির্দেশ করে। এজন্য সারা পৃথিবীতে আনুপাতিক সময় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের গ্রিনউইচ সহরের স্থানীয় সময়কে প্রামাণ্য (মূল) সময় (স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) ধরা হয়। গ্রিন-উইচকে 0° লঙ্গিচিউডে ↑ অবস্থিত বলে ধরা হয়েছে (প্রাইম মেরিডিয়ান ↑)। এই 'গ্রিনউইচ সময়' পেলে পৃথিবীর যে কোন স্থানের প্রামাণ্য সময় দ্রাঘিমার (লঙ্গিচিউড ↑) ব্যবধান অনুযায়ী হিসাব করে বার করা যায়।

গ্রেন — ইংলণ্ডীয় ওজনের একক বিশেষ। এক পাউণ্ডের ↑ 7000 ভাগের এক ভাগ; = '0648 গ্র্যাম।

গ্রেট সার্কেল — কোন গোলকের কেন্দ্র ভেদ করে সমতলভাবে কেটে ফেললে যে বৃত্তের সৃষ্টি হয়। ভূ-গোলকের গ্রেট সার্কেল হলো বিষুব-রৈখিক বৃত্ত

(ইকোয়েটর ↑), বা যে-কোন দ্রাঘিমা বরাবর বৃত্তরেখা। ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোন গ্রেট সার্কেলের দুইটি বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা, অর্থাৎ তার আর্ক ↑-কে বলা হয় জিয়োডিসিক ↑ লাইন।
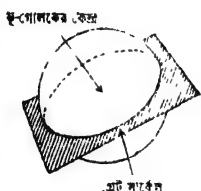
গ্রেপ সুগার — গ্লুকোজ ↑।

গ্লবার্স সল্ট — সোডিয়াম সাল্‌ফেট; যাকে সাধারণভাবে সোডা-সাল্‌ফ বলে। স্ফটিকাকার পদার্থ, রাসায়নিক সূত্র $Na_2SO_4\ 10H_2O$; (ওয়াটার অব ক্রিস্ট্যালিজেসন ↑) একটা বিরেচক পদার্থ; জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

গ্ল্যাণ্ড — গ্রন্থি; জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জৈব উপাঙ্গ, বা ক্ষুদ্র জৈবাধার। এগুলি থেকে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপযোগী জটিল
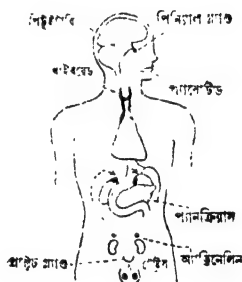
বিশেষ বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের পরিচয়

গঠনের বিভিন্ন জৈব রস (হর্মোন ↑) নিঃসৃত হয়। জীব-দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উত্তেজক ও নিয়ন্ত্রক এরূপ বিভিন্ন হর্মোন, বা উত্তেজক রস নিঃসরণের জন্যে দেহে দু'রকম গ্ল্যাণ্ড আছে—অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী। প্যান্‌ক্রিয়াস ↑, থাইরয়েড ↑,

অ্যাড্রিনেলিন ↑, পি টু ই টা রি ↑ প্রভৃতি হলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ; আর শুক্র, দুগ্ধ, ঘর্ম প্রভৃতি নিঃসরণের জন্যে আছে বিভিন্ন বহিঃস্রাবী গ্রন্থি। লিম্‌ফেটিক গ্রন্থিগুলির মাধ্যমে রক্ত-রস (লিম্‌ফ ↑) পরিস্রুত হয়ে গিয়ে রক্তস্রোতে মেশে। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি-গুলির অভ্যন্তরে বিভিন্ন হর্মোন উৎপন্ন হয়, যেগুলির বহির্নিঃসরণ নেই, ভিতরে ভিতরে রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেহের বিভিন্ন জৈব ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

গ্লাইকল—বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন ↑ উৎপন্ন হয়। অ্যালিফেটিক ↑, অথবা প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিশেষ হাইড্রোকার্বনগুলির সাধারণ রাসায়নিক গঠন হলো $CH_3...CH_3$; যেমন—ইথেন ↑ $(CH_3.\ CH_3)$। এরূপ হাইড্রো-কার্বনের অণু গঠনে দুটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে দুটা হাইড্রক্সিল (OH) গ্রুপ যুক্ত হলে তাদের রাসায়নিক নাম হয় গ্লাইকল ; যেমন—ইথিলিন গ্লাইকল $(CH_2OH.\ CH_2OH)$; বর্ণহীন সুমিষ্ট তরল পদার্থ। শীত-প্রধান দেশে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জল ঠাণ্ডায় জমে না যায় তার জন্য জলের সঙ্গে পদার্থটা অনেক সময় মেশানো হয়।

গ্লাইকোসুরিয়া — মূত্রে শর্করার (সুগার ↑) আধিক্য-জনিত জৈব বিক্রিয়া ; এটা বহুমূত্র (ডায়েবেটিস ↑) রোগের লক্ষণ বলে ধরা হয়।

গ্লাইসিমিয়া — রক্তে অস্বাভাবিক পরিমাণে শর্করা (সুগার ↑) সঞ্চারিত হয়ে যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায় ; এটা একপ্রকার রক্তদুষ্টির অবস্থা। **হাইপারগ্লাইসিমিয়া** — রক্তে অত্যধিক শর্করা উৎপত্তি-জনিত গুরুতর রক্তদুষ্টি-রোগ।

গ্লাইকোজেন — জান্তব শ্বেতসার, (কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট) ; বিভিন্ন শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সঙ্গে গ্লুকোজের ↑ রাসায়নিক মিলনে প্রাণী-দেহের যকৃৎ ও অন্যান্য স্থানে এরূপ পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা একপ্রকার জটিল গঠনের হাইড্রো-কার্বন ↑। প্রাণী-দেহের মাংসপেশীর মধ্যেও এ-পদার্থ যথেষ্ট থাকে।

গ্লাস — কাঁচ, কঠিন, ভঙ্গুর ও স্বচ্ছ পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে ক্যাল-সিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেট ↑ সল্ট। বালি (সিলিকা ↑), সোডিয়াম কার্বনেট ও চূণ (ক্যাল-সিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$) গলিয়ে সাধারণ সোডা গ্লাস ↑ তৈরী হয়। সোডিয়াম কার্বনেটের বদলে লেড, পটাসিয়াম, বেরিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুর কার্বনেট দিয়ে, আর সিলিকার বদলে বোরন-অক্সাইড গলিয়ে ক্রাউন গ্লাস ↑, ফ্লিন্ট গ্লাস ↑ প্রভৃতি নানা রকমের কাঁচ তৈরী হয়। উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যানিলিং ↑

করে কাঁচের সহজ-ভঙ্গুরতা দোষ দূর করা হয় (ওয়াটার গ্লাস ↑)।

গ্লাস উল—কাঁচের নরম পিণ্ড থেকে সূক্ষ্ম সুতা, বা পেঁজা তুলার মত যে পদার্থ তৈরী হয়। অদ্রাব্য বলে অ্যাসিড প্রভৃতি এর মধ্য দিয়ে ছেঁকে (ফিল্‌ট্রেসন ↑) পরিষ্কার করা হয়।

গ্লিসারিন — সিরাপের মত ঘন, মিষ্ট-স্বাদযুক্ত তরল পদার্থ; রাসায়নিক সূত্র $CH_2OH.\ CHOH.\ CH_2OH$; জলে বিশেষ দ্রবণীয়। একে **গ্লিসারল**-ও বলা হয়। বিভিন্ন চর্বি ও তেলের মধ্যে ফ্যাটি-অ্যাসিডের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সাবান তৈরীর সময়ে (স্যাফোনিফিকেসন ↑) এই গ্লিসারিন পৃথক হয়ে যায়। প্লাস্টিক ↑, বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ, ঔষধ প্রভৃতি নানা জিনিষ উৎপাদনের কাজে এর যথেষ্ট দরকার হয়।

গ্লিসারাইড — জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন পদার্থ। গ্লিসারাইড নানা রকম হতে পারে। এগুলো সব গ্লিসারিনের এস্টার ↑ জাতীয় যৌগিক। জান্তব চর্বিও হলো এক রকম গ্লিসারাইড।

গ্লু — জীবজন্তুর বিশুষ্ক চামড়া, হাড় প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করলে যে আঠালো কাথ (জিলেটিন ↑) পাওয়া যায়। সাধারণভাবে অবশ্য যে-কোন আঠালো পদার্থকেই (অ্যাডিসিভ ↑) গ্লু বলা হয়।

গ্লুকোজ — শর্করা বিশেষ, $C_6H_{12}O_6$; একে ডেক্‌স্ট্রোজ ↑ বা গ্রেপ-সুগারও বলা হয়। বর্ণহীন, স্ফটিকাকার, জলে দ্রবণীয়। ফুলের মধু ও সুমিষ্ট ফলে পাওয়া যায়। সাধারণ চিনি ও কার্বোহাইড্রেট ↑ জাতীয় পদার্থগুলো মানুষের দেহাভ্যন্তরে ক্রমে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়; আর তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় দেহের তাপ ও শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শ্বেতসার (স্টার্চ) ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে কৃত্রিম উপায়ে আজকাল প্রচুর গ্লুকোজ তৈরী করা হয়ে থাকে।

গ্লুকোসাইড — গ্লুকোজের বিভিন্ন অ্যালকালয়েড ↑। এগুলির গঠনে গ্লুকোজের ↑ একটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর জায়গায় কোন জৈব র‍্যাডিক্যাল ↑ জুড়ে যায়। পদার্থটা আর শর্করা থাকে না, মিষ্টত্ব হারায়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ স্বভাবতঃই তার দেহের মধ্যে এরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়, আর বিভিন্ন গ্লুকোসাইড শ্রেণীর অ্যাল্‌কালয়েড সৃষ্টি হয়। অ্যাস্পিরিন ↑, ডিজিটেলিন, ইণ্ডিক্যান ↑ প্রভৃতি এরূপ পদার্থ।

গ্লুটেন — জৈব রাসায়নিক পদার্থ; ময়দার প্রোটিন ↑ অংশ। কৌশলে ধুয়ে ধুয়ে ময়দার শ্বেতসার (স্টার্চ ↑) অংশ অপসারিত করলে যে আঠালো কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে।

গ্লেসিয়ার — হিমবাহ ; সঞ্চরণশীল বরফ-স্তূপ বা তুষার-স্তর। হিমপ্রধান অঞ্চলে বা উচ্চ পর্বতগাত্রে তুষারপাতের ফলে ক্রমে সঞ্চিত হয়ে যে স্তরীভূত বরফরাশির সৃষ্টি হয় এবং ভারী হলে যা সময় সময় ঢালু পথে চলতে থাকে। এই-ই অনেক সময় সমুদ্রে পড়ে স্রোতে ভেসে বেড়ায়, যাকে বলে **আইস বার্গ**।

গ্লেসিয়্যাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড— বিশুদ্ধ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ ; এর হিমাংক মাত্র 16·8° সেন্টিগ্রেড। এর কম উষ্ণতায় অ্যাসিডটা কঠিন অবস্থায় থাকে ; তখন এটা হয় বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ।

ঘ

ঘোষ, স্যার জ্ঞানচন্দ্র — খ্যাতনামা বাঙ্গালী রসায়নবিদ্, জন্ম 1894, 14 সেপ্টেম্বর, মৃত্যু 1959, 21 জানুয়ারি। শিক্ষা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ; লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডি. এস-সি। ঢাকা ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 1939 খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ইংরাজ সরকার কর্তৃক 1943 খৃঃ 'নাইট' উপাধিতে এবং ভারতীয় জাতীয় সরকার কর্তৃক 1954 খৃঃ 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। রসায়নের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও কারিগরী গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জন। শিক্ষা, শিল্প ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য দানের জন্য স্মরণীয়।

চ

চক্ — খনিজ ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$; প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক জীবের কঠিন খোল। জমে এর সৃষ্টি হয়েছে ; বাংলায় বলে খড়িমাটি। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা সাদা এক রকম নরম পাথর বিশেষ। স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে যে পেন্সিল-চক দিয়ে লেখা হয়, তা সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সালফেটে ($CaSO_4$) তৈরী, কার্বনেট নয়।

চন্দ্রশেখর, ডাঃ সুব্রাহ্মনান — বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ; জন্ম মাদ্রাজে 1910 খৃঃ। শিক্ষা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। হার্ভার্ড মানমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতায় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ গাণিতিক পাণ্ডিত্যের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির উচ্চ সম্মান লাভ। আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় 'রাসেল লেক্‌চারার' পদে নিযুক্ত ; চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কিন মান-

মন্দিরের গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু জটিল গাণিতিক তত্ত্বের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি।

চাইনিজ হোয়াইট —জিঙ্ক অক্সাইড, ZnO। পদার্থটা জলে গলে না, তেলে মিশিয়ে এ দিয়ে সাদা রং তৈরী হয়। বাংলায় বলে 'সবেদা'।

চারকোল — পোড়া কয়লা, অবিশুদ্ধ কার্বন ↑ বিশেষ। নানা রকমের চারকোল হয় — বায়ুহীন আবদ্ধ অবস্থায় কাঠ পুড়িয়ে হয় 'উড-চারকোল' (কাঠ-কয়লা); আর প্রাণীদেহের হাড়, মাংস ইত্যাদি এভাবে পুড়িয়ে হয় অ্যানিম্যাল চারকোল ↑। সব রকম চারকোলই হয় অত্যন্ত ছিদ্র বহুল; এ-জন্যে তরল ও বায়বীয় পদার্থ শুষে নেয়। বিভিন্ন পদার্থের রং বর্ণহীন করতে বিভিন্ন চারকোল উৎকৃষ্ট ফিল্টারের ↑ কাজ করে।

চার্লস-ল—গ্যাস মাত্রেরই 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে যে আয়তন থাকে তা প্রতি ডিগ্রি-সেন্টিগ্রেড তাপবৃদ্ধিতে 1/273 ভাগ বৃদ্ধি পায়; অবশ্য সেই গ্যাসের চাপ সর্বদা যদি সমান থাকে। এটাই হলো বিজ্ঞানী চার্লসের প্রবর্তিত গ্যাসীয় তাপ ও আয়তন সম্বন্ধীয় সূত্র (গ্যাস ↑)। অন্য কথায় বলা যায়, অপরিবর্তিত চাপে সব গ্যাসের আয়তনই তার অ্যাব্‌সোলিউট ↑ তাপের সমানানুপাতিক হয়ে থাকে।

চায়না ক্লে — প্রাকৃতিক অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$; উত্তপ্ত করলে এর জলীয় উপাদান (ওয়াটার অব ক্রিস্ট্যালিজেশন ↑) চলে গিয়ে এর রাসায়নিক গঠন বদলে যায়, শক্ত হয়ে পড়ে। এ-দিয়ে পোর্সিলিন ↑ তৈরী হয়। পদার্থটাকে **কেওলিন**-ও বলে।

চিকেন পক্স — 'জল-বসন্ত' রোগ; যাতে সামান্য জ্বরের সঙ্গে গায়ে জলপূর্ণ স্ফোটক উদ্ভূত হয়। সংক্রামক ব্যাধি, কিন্তু মারাত্মক নয়; সাধারণতঃ শিশুদেরই দ্রুত আক্রমণ করে। বুকে ও পিঠেই বেশি হয় ('স্মল-পক্স' বা গুটি-বসন্তের স্ফোটক বেশি হয় সাধারণতঃ হাতে, পায়ে ও মুখে)।

চিজ — জান্তব দুধের দই জীবাণুর প্রভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পচিয়ে ও পরে শুকিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য বিশেষ, পাশ্চাত্য দেশে উপাদেয় খাদ্য হিসেবে সমধিক প্রচলিত।

চিন্‌চিলা — ইঁদুরের মত দেখতে এক রকম রোমশ প্রাণী, অপেক্ষাকৃত লম্বা পা এবং মোটা লোমশ লেজ বিশিষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। এদের সুদৃশ্য নরম লোম উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এবং মহিলাদের সৌখিন জামায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিন্‌চিলা

চিনোপোডিয়াম অয়েল—উদ্ভিজ্জ ভেষজ তৈল বিশেষ; কৃমি রোগ নাশক। অন্ত্রের কৃমি-কীট বিনষ্ট করতে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিলি সল্টপিটার — প্রাকৃতিক অবিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট, $NaNO_3$; চিলিতে পদার্থটা খনিজ আকারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সল্টপিটার ↑, বা 'নাইটার' বলতে পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) বুঝায়।

চেইন — দৈর্ঘ্য পরিমাপের একটি ইংলণ্ডীয় একক বিশেষ; =100 লিংক, বা 22 গজ, মাইলের 80 ভাগের ভাগ।

চেইন (অ্যাটমিক) — রাসায়নিক পদার্থের গঠনে পরমাণুগুলো যে ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ থাকে, এটা যেন পরমাণুদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা। পরমাণুর এই সংযোগ-শৃঙ্খল দু' রকমের হতে পারে—সারিবদ্ধভাবে, যাকে বলে 'ওপেন চেইন'; আবার আংটির মত গোল হয়েও তারা জুড়তে পারে, এরূপ হলে বলা হয় 'ক্লোসড চেইন'। বেঞ্জিনের (C_6H_6) পারমাণবিক গঠনে কার্বন ও হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলো ক্লোসড চেইনে সংবদ্ধ থাকে; আর বুটেনের ↑ (C_4H_{10}) রাসায়নিক গঠন হলো ওপেন চেইনের একটা দৃষ্টান্ত।

```
    H   H   H   H
    |   |   |   |
H — C — C — C — C — H
    |   |   |   |
    H   H   H   H
```

অ্যালিফ্যাটিক কম্পাউণ্ড

'ওপেন চেইন' সংযোগ

চেইন রিঅ্যাকসন — পরমাণুর কেন্দ্রীন ভাঙ্গার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, নিউট্রন ↑ কণিকার ধারাবাহিক দ্রুত সংঘাতে কোন কোন পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রীন পর্যায়ক্রমে যেভাবে ভাঙ্গতে থাকে (ফিসন ↑)। অ্যাটম-বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তি এরূপ চেইন রিঅ্যাকসনের ফলেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। পরমাণুর কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস ↑) বিভাজনের কাজ অতি সামান্য সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব হয়। এরূপ ধারাবাহিক ক্রিয়াকে 'চেইন রিঅ্যাকসন' বলা হয়।

চেম্বার অ্যাসিড—'সীসক প্রকোষ্ঠ' পদ্ধতিতে প্রস্তুত অবিশুদ্ধ সালফিউরিক ↑ অ্যাসিড, যা সীসার পাতে তৈরী আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে উৎপন্ন হয়। এতে বিশুদ্ধ অ্যাসিড থাকে শতকরা 65 ভাগ মাত্র। একে বাংলায় বলা যায় 'প্রকোষ্ঠ অ্যাসিড'। সাধারণ কাজে এই অবিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিডই ব্যবহৃত হয়।

চেঞ্জ অব ষ্টেট — পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। উপযুক্ত তাপ ও চাপের প্রভাবে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটানো

যায় ; একেই বলে 'চেঞ্জ অব স্টেট'। তরল জল উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে জমে কঠিন বরফে পরিণত হয় ; তা আবার উত্তপ্ত করলে জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এই হলো জলের 'চেঞ্জ অব স্টেট'। এমন যে কঠিন লোহা, তা-ও অত্যধিক উত্তাপে গলে তরল হয় ; এমন কি, গ্যাসীয় অবস্থায়ও রূপান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে।

চেসিস — মোটর গাড়ী প্রভৃতির সংগঠক লৌহ-কাঠামো ; যার উপরে গাড়ীর যন্ত্রাদি ও প্রকোষ্ঠ সন্নিবিষ্ট হয়ে পূর্ণাঙ্গ গাড়ী তৈরী হয়।

চোক ড্যাম্প — কয়লার খনির আবদ্ধ বায়ুতে 'ফায়ার ড্যাম্প' ↑ (মিথেন ↑ গ্যাস, CH_4) জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে কার্বন মনক্সাইড (CO) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণকে বলে **আফটার ড্যাম্প** ↑, অথবা 'চোক ড্যাম্প' ; কারণ এই গ্যাসে মানুষের দম আটকে যায়।

জণ্ডিস — কামলা রোগ ; যকৃতের দোষে রক্তে পিত্তরস (বাইল ↑) সঞ্চারিত হয়ে ক্রমে দেহের চামড়া এ রোগে হলদে হয়ে যায়। আবার রক্তের লোহিত কণিকাগুলো ভেঙ্গে গিয়ে হিমোগ্লোবিনের ↑ অভাবেও এ-রোগ হতে পারে।

জলিবোট—মাল খালাস বা বোঝাই করবার জন্যে উপকূল ও দূরবর্তী জাহাজের মধ্যে যাতায়াতকারী মনুষ্য-চালিত ছোট জলযান।

জাইম্‌স—খমির বা ঈস্টের ↑ মধ্যে বর্তমান যে এঞ্জাইম ↑ শ্রেণীর জৈব পদার্থ শর্করাকে অ্যালকোহলে ↑ পরিণত করে। মূলতঃ এটা একটা প্রোটিন ↑ জাতীয় জৈব পদার্থ। বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই শ্রেণীর পদার্থ, বা জাইম্‌স ক্যাটালিষ্ট ↑ হিসেবে কাজ করে।

জাইমোজেন — যে-সব জৈব পদার্থ দেহাভ্যন্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এঞ্জাইমে ↑ রূপান্তরিত হয়।

জাইরেসন — কোন স্থির অক্ষদণ্ড বা কেন্দ্রের চারদিকে কোন বস্তুর ঘূর্ণন বা আবর্তনের গতি।

জাইরোস্কোপ— এক রকম যন্ত্র, প্রকৃতপক্ষে এটা কুম্ভকারের চাকা বা লাট্টুর মত, একটা অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘূর্ণায়মান একটা ভারী চক্র মাত্র। দণ্ডটাকে হেলিয়ে-বেঁকিয়ে যে-দিকে মুখ করে চক্রটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, অবস্থান-নিরপেক্ষভাবে দণ্ডটা সর্বদা সেই দিকেই মুখ করে থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় (সাধারণতঃ তড়িৎপ্রবাহের

জাইরেসন

সাহায্যে) চক্রটা সমভাবে আবর্তিত হতে থাকে ; আর ওই আবর্তিত চক্র-সমেত (যন্ত্রটার পাদ-পীঠ যে-দিকেই ঘুরে বা বেঁকে থাক না কেন) অক্ষদণ্ডটা সর্বদা সেই নির্দিষ্টমুখী হয়েই স্থির থাকে। অবশ্য চক্রটার ঘূর্ণন-বেগ হ্রাস পেলে দণ্ডটার এই স্থিরাবস্থান ধর্ম লোপ পায়।

জাইরোস্কোপ

ওই ঘূর্ণায়মান চক্রের অক্ষদণ্ডের দিক পরিবর্তনের এই নিষ্ক্রিয়তাকে বলে **জাইরোস্কোপিক ইনার্সিয়া,** 'ঘূর্ণন-জনিত জাড্য'। যন্ত্রটা অতি সাধারণ ; কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অপরিসীম। এর সাহায্যে চালকহীন এরোপ্লেন, রকেট ↑, টর্পেডো প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়-ভাবে অভিষ্ট লক্ষ্য-বস্তুর দিকে সোজা চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

জাইরো-কম্পাস — বিশেষ এক প্রকার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, যাতে জাইরোস্কোপের ↑ সাহায্যে ভৌগোলিক দিক সহজেই নির্ণীত হয়। সাধারণ কম্পাসের ↑ মত কোন চৌম্বক শলাকা না থাকায় এরূপ কম্পাসে 'ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম' ↑ প্রভৃতির জন্যে কখন দিক-নির্ণয়ের কোন অসুবিধা ঘটে না। সাধারণতঃ সমুদ্রগামী জাহাজে এরূপ 'জাইরো-কম্পাস' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফ্রেমে-আঁটা জাইরোস্কোপের ↑ অক্ষদণ্ডটা ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত করে তড়িৎ-প্রভাবে চক্রটাকে সমভাবে ঘূর্ণায়মান রাখা হয়। জাহাজ যে দিকেই ঘুরে যাক, অক্ষদণ্ডটা সর্বদা সেই উত্তর-দক্ষিণেই মুখ করে থাকে, ফলে সহজেই দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যন্ত্রটার ফ্রেমে সংলগ্ন পরস্পর-যুক্ত দুদিকে পারদ-ভর্তি দুটা পাত্র থাকে ; পৃথিবীর আবর্তনের ফলে জাইরোস্কোপের অক্ষ-তলের অবস্থানের যে ব্যতিক্রম ঘটে ওই পারদ এদিক-ওদিকে প্রয়োজনানুরূপ চলাচল করার ফলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বদা সংশোধিত হতে থাকে।
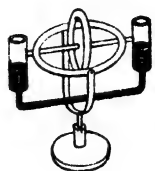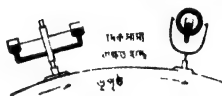
জাইরো-কম্পাস

জাইরো-কম্পাসের সংশোধন ব্যবস্থা

জাইরোষ্ট্যাট — জাইরোস্কোপের যেরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ স্থির রাখা হয়। এরূপ যন্ত্রকে আবার কখন কখন **জাইরোষ্ট্যাবিলাইজার**-ও বলা হয়। জাহাজের তলায় সাধারণতঃ খাড়া-ভাবে ঘূর্ণায়মান একটা প্রকাণ্ড জাইরোস্কোপ ↑ চক্র লাগানো হয়। এর ফলে তরঙ্গাঘাতে জাহাজ সহজে দোল খায় না, জাইরোস্কোপটার

খাড়া অক্ষদণ্ডের স্থিরাবস্থার জন্যে জাহাজটা স্থির থাকে। এ-ছাড়া 'মনোরেল সিষ্টেম' (একটা মাত্র লাইনের উপরে রেলগাড়ীর চলাচল) জাইরোস্ট্যাটের বিশেষ ব্যবহারের ফলেই সম্ভব হয়েছে।
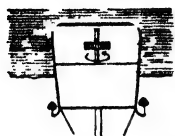
জাইরোস্ট্যাট

জাইলেম — উদ্ভিদের বিভিন্ন কলাতন্ত্রের (টিসু) সংগঠক কোষগুলির একটি বিশেষ উপাদান। ফ্লোয়েম ও জাইলেম নামক দুইটি উপাদানে উদ্ভিজ্জ কলার তন্তু-কোষগুলি গঠিত।

জার্মান সিল্‌ভার — সাদা এক রকম সংকর-ধাতু। তামা, দস্তা ও নিকেল ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত। বিভিন্ন অনুপাতে এদের মেশানো হয়। সাধারণতঃ 5 ভাগ তামা, 2 ভাগ দস্তা এবং 2 ভাগ নিকেল মিশিয়ে এটা তৈরী হয়ে থাকে।

জার্মিসাইড—জীবাণুনাশক পদার্থ, যে-সব রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন জার্ম বা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করবার শক্তি আছে।

জার্মেনিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ge, পারমাণবিক ওজন 72·6, পারমাণবিক সংখ্যা 32; সাদা ও ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। পদার্থটার বিভিন্নমুখী তড়িৎ-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী (পোলারিজেসন ↑) করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। এর এই বিশেষ ধর্মের জন্যেই এর সাহায্যে অধুনা-আবিষ্কৃত ট্র্যান্‌জিস্টর ↑ (রেডিও ↑) যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

জিওডেসি—ভূ-পৃষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চলের যে বিশেষ মানচিত্র পৃথিবীর গোলত্ব (অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতা) বিবেচনা করে তদনুযায়ী দৃষ্টিকোণে (পার্স্‌পেক্টিভ) অঙ্কন করা হয় তাকে বলে **জিওডেটিক ম্যাপ**। এরূপ মানচিত্র অঙ্কনের কৌশল বা বিদ্যাকে বলে জিওডেসি।

জিওডেটিক লাইন—কোন বক্রতল জিনিসের উপরিস্থিত যে-কোন দুটি বিন্দুর ক্ষুদ্রতম সংযোজক-রেখা।

জিওগ্রাফি — ভূগোল বিজ্ঞান, ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, অবস্থান, প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, জীবনধারা প্রভৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা-শাস্ত্র। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত: **ফিজিক্যাল জি.** ভূপৃষ্ঠের আঞ্চলিক উচ্চতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মরু অঞ্চল, অরণ্য প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা; গাণিতিক ভূগোল বা **ম্যাথ্‌মেটিক্যাল জি.** হলো পৃথিবীর আকার আয়তন, গতি, ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্যা; **ক্লাইমেটোলজি** বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান। পৃথিবীর জলভাগ এবং স্থলভাগের আকার-আয়তন, গঠন-বৈশিষ্ট্য ও তার কারণ প্রভৃতির

বিশেষ আলোচনা হয় **জিওমর্ফোলজি** শাখায়। 'মানবিক ভূগোল' বা **হিউম্যান জি.** শাখায় হয় ভূপৃষ্ঠের আঞ্চলিক অবস্থা ও গঠন-প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির দৈহিক ও চারিত্রিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা। এছাড়া আবার ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন তথ্যজ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ মানচিত্র অঙ্কনের বিদ্যাকে বলে **কার্টোগ্রাফি**।

জিওমর্ফোলজি—জিওগ্রাফি ↑।

জিওমেট্রি—জ্যামিতি বা রেখা-গণিত। সরল ও বক্র রেখায় গঠিত বিভিন্ন আকারের ত্রিভুজ, বৃত্ত, ক্ষেত্র, রেখা, কোণ প্রভৃতি বিষয়ক গাণিতিক তথ্যানুসন্ধান-বিদ্যা। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন মিশরে গৃহ নির্মাণ ও জমি জরিপ কার্যে এরূপ রেখা-গণিতের সূত্রপাত হয়েছিল; আবার হয়তো আর্য-যুগের ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র রচনার জন্যে ভারতেও এ বিদ্যার চর্চা সুরু করেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ 300 অব্দে গ্রীক পণ্ডিত ইউক্লিড-ই সর্বপ্রথম সুসম্বদ্ধভাবে জ্যামিতি-বিদ্যার চর্চা প্রবর্তন করেন। ক্রমে 'প্লেন জিও-মেট্রি' 'সলিড জিওমেট্রি', 'কনিক সেকসন', কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় এ-বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়।

জিওমেট্রিক প্রোগ্রেসন—গাণিতিক হিসাবের একটি পদ্ধতি; সংক্ষেপে বলা হয় জি. পি.। যে-সব রাশিমালার পরবর্তী রাশি পূর্ববর্তী রাশির একটি নির্দিষ্ট গুণিতক হয়, অর্থাৎ পূর্ববর্তীটিকে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পরবর্তী সংখ্যাটি পাওয়া যায়, যেমন — 3, 9, 27, 81 প্রভৃতি। এরূপ রাশিমালাকে বলে জ্যামিতিক ক্রমবর্ধমান রাশিমালা, বা 'জি. প্রো'। উল্লিখিত রাশিমালায় নির্দিষ্ট গুণিতক অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত হলো 3। যদি এরূপ রাশিমালায় n সংখ্যক রাশি থাকে, প্রথম রাশি হয় a, সাধারণ অনুপাত r, এবং শেষ রাশি L হয়; তাহলে এরূপ রাশিমালার সমষ্টির সূত্র হবে $S=a(r^n-L)/(r-L)$ এবং শেষ রাশি L হবে $a \times r^{n-1}$.

জিওলাইট—খনিজ 'ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট' (সোডিয়াম ও পটাসিয়াম মিশ্রিত)। পদার্থটার খর জল কোমলায়নের বিশেষ ক্ষমতা আছে। আজকাল খর জল (হার্ড ওয়াটার ↑) নরম করবার জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য পদার্থকেও সাধারণভাবে অনেক সময় জিওলাইট বলা হয়।

জিওলজি—ভূ-বিদ্যা; ভূ-স্তরের মাটি, পাথর, খনিজ প্রভৃতি সহ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা, প্রকৃতি,

গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়।

জিঙ্ক — দস্তা; মৌলিক ধাতু। পারমাণবিক ওজন 65·38, পারমাণবিক সংখ্যা 30, সাংকেতিক চিহ্ন Zn; নীলাভ সাদা কঠিন পদার্থ। সচরাচর এর খনিজ কার্বনেট (ক্যালামাইন, $ZnCO_3$) ও সাল্‌ফাইড (জিঙ্ক ব্লেণ্ড, ZnS) থেকেই ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। পিতল (ব্রাস ↑) প্রভৃতি সংকর-ধাতু তৈরী করতে ও লোহা গ্যাল্‌ভ্যানাইজ ↑ করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

জিঙ্ক ব্লেণ্ড—প্রাকৃতিক 'জিঙ্ক সালফাইড', ZnS; এই অবিশুদ্ধ খনিজ পদার্থ থেকেই বেশীর ভাগ জিঙ্ক নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

জিন—জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার। জীবকোষের (সেল ↑) কেন্দ্রীনের মধ্যে থাকে ক্রোমোসোম ↑. এই ক্রোমোসোমের সংগঠক কণিকাকে বলে জিন। বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহকোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠন-বিন্যাসের তারতম্যেই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। আবার অতি ক্ষুদ্র দানার মত কতকগুলো জিন-কণিকা মালার মত সূত্রাকারে গ্রথিত হয়ে এক-একটি ক্রোমোসোম গঠিত। এর প্রত্যেকটি জিনে দেহ ও মনের এক-একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এ-রকম বিভিন্ন জিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে এক-এক জীবের এক-এক রকম আকৃতি-প্রকৃতি গঠিত হয়ে থাকে। মানুষের প্রজনন-কোষের কেন্দ্রীনে 24-টি ক্রোমোসোম থাকে; স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত বা নিষিক্ত কোষে থাকে 24 জোড়া অর্থাৎ 48-টি। ইঁদুরের কোষে থাকে 4 জোড়া অর্থাৎ 8-টি ক্রোমোসোম। অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে যে গামা-রশ্মির ↑ উদ্ভব হয় তার প্রভাবে ক্রোমোসোমের সংগঠক বিভিন্ন জিন নষ্ট হয়ে গিয়ে জীবের আকৃতি-প্রকৃতি বদলে যায় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

জিন্‌স, স্যার জেমস—বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ; জন্ম 1877 খৃঃ, মৃত্যু 1946 খৃঃ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টিরহস্য (কস্‌মোলজি ↑) সম্পর্কীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবর্তক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা।

জিপ্‌সাম—হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সালফেট, $CaSO_4.2H_2O$; খনিজ পদার্থ, দেখতে সাদা। পদার্থটিকে সামান্য উত্তপ্ত করে 'প্লাস্টার অব প্যারিস' ↑ তৈরি করা হয়।

জিলাটিন — প্রাণী-দেহের হাড় ও কার্টিলেজ ↑ জলে ফুটালে জেলির ↑ মত যে ঘন পদার্থ পাওয়া যায়।

জিনিসটা এক রকম জটিল গঠনের প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ; স্বাদহীন, জলে দ্রবণীয়। বিশুদ্ধ জিলাটিন নানা রকম খাদ্যাদিতে মেশানো হয়। ফটোগ্রাফি ↑, বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতিতেও এর ব্যবহার আছে।

জিবারিলিক অ্যাসিড — উদ্ভিদের আকার ও শস্যোৎপাদক শক্তির বিশেষ উদ্দীপক একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ; দেখতে সাদা, সূক্ষ্ম কেলাসিত দানা, জলে দ্রবণীয়। ধানগাছের সহসা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অকাল মৃত্যুর জন্যে দায়ী 'জিবারেলা ফিউজিকুরয়' নামক ছত্রাক থেকে পদার্থটা সম্প্রতি রাসায়নিক উপায়ে নিষ্কাশিত হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং ফলন বাড়াতে এর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে। জীব-দেহের সঙ্গে তুলনায় পদার্থটি যেন উদ্ভিদের 'থাইরক্সিন হর্মোনের ↑' (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ↑) মত কাজ করে।

জুওলজি — প্রাণিবিদ্যা; বিভিন্ন সব জীব-জন্তুর গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

জুপিটার — বৃহস্পতি গ্রহ; সৌর-পরিবারের বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর প্রায় 318 গুণ বড়; সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 4,830 লক্ষ মাইল। সূর্যের গ্রহগুলোর দূরত্বের ক্রমপর্যায়ে এর স্থান হলো পঞ্চম; মঙ্গল ও শনি গ্রহের মাঝামাঝি এক নিদিষ্ট কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর প্রায় 12 বছরে বৃহস্পতির এক বছর হয়; অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর হিসেবে এর লাগে প্রায় 12 বছর। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে এর 12-টা উপগ্রহ বা চাঁদ দেখা গেছে। সম্ভবতঃ গ্রহটার কোন গ্যাসীয় আবরণ বা বায়ুমণ্ডল নেই, উপরিভাগ অত্যন্ত শীতল বলে মনে হয়, প্রায় —150° সেন্টিগ্রেড হবে।

জুল, জেম্স প্রেস্‌কট — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম ম্যাঞ্চেস্টারে 1818 খৃঃ, মৃত্যু 1889 খৃঃ। তাপ ও তড়িৎ সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন, তাপ ও তড়িৎ-শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়। তড়িৎ-শক্তির একক নির্ধারণ, যা তাঁর নামানুসারে জুল ↑ একক বলে পরিচিত; $=10^7$ আর্গ ↑।

জুল — সাধারণভাবে তড়িৎ-শক্তির একক বিশেষ, আবার যে কোন কর্মশক্তির একক হিসেবেও অনেক সময় জুল কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক জুল $=10^7$ আর্গ ↑ (ফুট-পাউণ্ড্যাল ↑)। এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎ-প্রবাহ এক ওম্ ↑ তড়িৎ-বাধা অতিক্রম করে এক সেকেণ্ড চলতে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তির প্রয়োজন হয়, তাই হলো এক জুল। বৃটিশ বিজ্ঞানী জুলের ↑ নামানুসারে।

জেট— (1) অত্যন্ত কঠিন চক্‌চকে

এক রকম খনিজ পদার্থ; রাসায়নিক হিসেবে এটা হলো 'অ্যানথ্রাসাইট' ↑ জাতীয় কার্বন। প্রাচীনকালে এ দিয়ে অলঙ্কারাদি তৈরী হোত; সে-যুগের অনেক পুরাতন কবরের মধ্যে অনেক জায়গায় এর তৈরী অলঙ্কার-পত্র পাওয়া গেছে। (2) গ্যাস বা তরল পদার্থ নির্গমণের সরু নলপথ।

জেট প্লেন — জেট-চালিত বিমান পোত। এক বিশেষ কৌশলে এর ইঞ্জিনে গতি সঞ্চারিত হয়, যাকে বলে জেট-প্রোপালসন। মোটামুটি
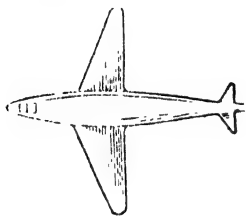
সাধারণ জেট প্লেন

এর কৌশলটা হলো: সামনে দিয়ে হাওয়া সবেগে ভিতরে ঢুকে ইঞ্জিনের জ্বালানি তেলের (পেট্রল ↑) সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আবদ্ধ আধারে উচ্চ চাপের বায়ুর মধ্যে ওই তেল প্রজ্বলিত হলে উৎপন্ন গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু সরু নল-পথে (জেট ↑) প্রচণ্ড বেগে পেছন দিক থেকে বেরুতে থাকে। গ্যাসীয় পদার্থের ওই পশ্চাৎগতির ফলে বিমানপোত সম্মুখগতি লাভ করে। বন্দুক ছুঁড়লে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল চাপে গুলিটা সবেগে সামনে বেরিয়ে যায়; আর, তার ফলে পেছন দিকে চালকের হাতে বন্দুকের একটা ধাক্কা লাগে। বন্দুকের এই পশ্চাৎ-গতির বৈজ্ঞানিক কারণ অনেকটা জেট-প্রোপালসনের অনুরূপ। শূন্যপথে হাউই যে কারণে সবেগে উপরে উঠে যায়, জেট-প্লেনের গতিও সেইরূপ।

জেট প্লেনের ভিতরের ব্যবস্থা

জেপ্‌লিন, কাউণ্ট ভন — জার্মাণ যন্ত্রবিদ্ ও উদ্ভাবক; জন্ম 1836 খৃঃ, মৃত্যু 1917 খৃঃ। 'জেপ্‌লিন' নামক সে-যুগের এক বিশেষ ধরণের বিমান-পোত আবিষ্কারে চিরস্মরণীয়।

জেম — অলঙ্কারাদিতে ব্যবহারের জন্য সুদৃশ্য আকারে কাটা ও পালিশ করা বিভিন্ন মূল্যবান প্রস্তর, বা রত্ন। ডায়মণ্ড ↑, রুবি ↑, স্যাফায়ার ↑ প্রভৃতি বর্ণোজ্জ্বল ও মূল্যবান প্রস্তর-গুলি কেটে ও পালিশ করে এরূপ রত্ন তৈরীর শিল্প বহু প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে।

জেম্‌স ওয়াট — স্কটল্যাণ্ডবাসী যন্ত্র-বিদ; জন্ম 1736 খৃঃ, মৃত্যু 1819 খৃঃ। ষ্টিম ইঞ্জিনের ↑ আবিষ্কর্তা; রেল, ষ্টীমার, কল-কারখানা প্রভৃতির প্রচলনের ফলে শিল্পজগতে নবযুগের প্রবর্তক। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের

মেকানিক, অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি বিষয়ক গবেষণায় জীবনপাত।

জেনার, এডওয়ার্ড — ইংলণ্ডের এক পল্লীবাসী ডাক্তার ; জন্ম 1749 খৃঃ, মৃত্যু 1823 খৃঃ। গো-বসন্তের মৃদু বীজ মনুষ্যদেহে সংক্রমিত করে দুরারোগ্য বসন্তরোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন। এরূপ টিকা অদ্যাপি প্রচলিত ; অবশ্য এই পদ্ধতির জীবাণুঘটিত মূল তথ্য নির্ধারণ করেন বিজ্ঞানী পাস্তুর ↑ ।

জেনারেটর — তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র। বিভিন্ন পাওয়ার-ষ্টেশনে বিভিন্ন পদ্ধতির জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত তড়িৎ-প্রবাহের হিসেবে জেনারেটর দু-রকম — এ. সি এবং ডি. সি। এ-যন্ত্র চলে মোটামুটি দু' রকম শক্তিতে — থার্ম্যাল ও হাইড্রলিক। কয়লা, জ্বালানি তেল প্রভৃতি পুড়িয়ে সেই তাপের সাহায্যে চালিত যন্ত্রে তড়িৎ উৎপাদিত হলে সেই যন্ত্রকে বলা হয় 'থার্ম্যাল জেনারেটর' ; আর, জলস্রোতের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে তার শক্তিতে যে জেনারেটর চালানো হয় তাকে বলে 'হাইড্রলিক জেনারেটর'।

জেনেটিক্স — বংশানুক্রম, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক তথ্যাদির বিজ্ঞান। স্ত্রী-পুরুষের প্রজননকোষের (পুং-কোষ ও ডিম্ব-কোষ) বিভিন্ন ক্রোমোসোম ↑ পরস্পর সম্মিলিত হয়ে তাদের জিনের ↑ পারস্পরিক সংযোগে গঠিত নূতন জীবকোষের প্রভাবে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানে পরিচালিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য কারণে অবশ্য এর কিছু কিছু স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ সব তথ্যাদি সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক মতবাদকে বলা হয় জেনেটিক্স। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি এই শাখায় পর্যালোচিত হয়ে থাকে।

জেনিথ — ভূ-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তির সোজা মাথার উপরে নভোমণ্ডলে অবস্থিত সর্বোচ্চ যে বিন্দু কল্পনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় 'সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে' ↑ এইরূপ সর্বোচ্চ (জেনিথ) বিন্দু কল্পনা করে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন গণনাদির সমাধান করা হয়।

জেল—জেলির মত ঘন কোলয়ড্যাল সলিউসন ↑ ; এর আঠালো-ঘনত্ব এত বেশি থাকে যে, তা প্রায় স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত হয়। অল্প জলে যথেষ্ট পরিমাণ জিলাটিন ↑ মেশালে এরূপ হয়ে থাকে।

জেলিগ্নাইট — এক রকম বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ। নাইট্রোগ্লিসারিন ↑, নাইট্রোসেলুলোজ ↑, সল্ট পিটার ↑ (পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3) ও

কাঠের গুঁড়া বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে পদার্থটা তৈরী হয়।

জো ডি য়া ক — সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারের ↑ যে অংশের উপর দিয়ে সূর্যের বার্ষিক গতি লক্ষিত হয়। সারা বছরে সূর্যকে আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ একটি নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায়। (প্রকৃতপক্ষে সূর্য স্থির রয়েছে, পৃথিবীর গতির জন্যেই এরূপ দেখায়।) সূর্যের এই আপাতদৃষ্ট ভ্রমণ পথকে বলা হয় জোডিয়াক। জ্যোতিবিদ্যায় এই জোডিয়াক বা রাশিচক্রকে 12-টি ভাগে ভাগ করে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি গণনা করা হয়ে থাকে।

জ্যাভেলি ওয়াটার — পটাসিয়াম হাইপোক্লোরাইটের (KOCl) জলীয় দ্রবণ; একে 'ইউ ডি জ্যাভেলি'ও বলে। পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের (KOH) ঠাণ্ডা জলীয় দ্রবণের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস চালালে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর উৎপত্তি ঘটে। বস্ত্রাদি বর্ণহীন (ব্লিচিং ↑) করতে ও বীজাণুনাশক পদার্থ হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টক্সিন—আণুবীক্ষণিক জীবাণুরা দেহ-তন্তুর মধ্যে যে-সব বিষ-রস ছড়ায়। দেহের কোন জীবাণুদুষ্ট অংশ থেকে এই টক্সিন রক্তপ্রবাহে মিশে গেলে রক্তের **টক্সিমিয়া** অবস্থা বলে। যে-সব প্রোটিন পদার্থ দেহে প্রবেশ করিয়ে কোন টক্সিনের বিষক্রিয়া নষ্ট করা যায় তাকে বলে **টক্সয়েড**, আর, কোন টক্সিনের বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করবার জন্যে দেহমধ্যে স্বভাবত:ই যে বিষঘ্ন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বলে **অ্যান্টিটক্সিন**।

টক্সিকোলজি — জীবদেহে বিভিন্ন বিষের ক্রিয়া ও তার ফলাফল বিষয়ক তথ্যাদির বিজ্ঞান।

টক্স্যামিন — যে-সব পদার্থ দেহমধ্যে ভিটামিনের কার্যকরী শক্তি নষ্ট করে ফেলে, যেমন, ভিটামিন-বি ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমন পদার্থের সৃষ্টি করে যাতে ওই ভিটামিন ↑ দেহের আর কোন কাজেই আসে না। এখানে ডিমের সাদা অংশকে টক্সামিন, বা 'ভিটামিন নাশক' পদার্থ বলা হয়।

টটোম্যারিজ্‌ম — কোন যৌগিক পদার্থে তার দু-রকম আইসোমার ↑ এক সঙ্গে মিশে থাকার অবস্থা। এরূপ দুই রকম আইসোমারের পারস্পরিক অনুপাত মোটামুটি স্থির থাকে। এর এক রকম আইসোমার যদি আলাদা করে ফেলা যায়, তাহলে অন্য আইসোমারটির কতক অংশের গঠন বদলে গিয়ে প্রথমটার মত হয়ে অনুপাতের স্থিরতা লাভ করে। এ রকম পদার্থকে 'টটোম্যারিক' পদার্থ

বলে। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় মনে হয়, এর মধ্যে এক রকম বিশেষ আইসোমার আছে, আবার কোন ক্ষেত্রে মনে হয়, যেন পদার্থটার মধ্যে অপর আর এক রকম আইসোমার রয়েছে।

টন — ইংলণ্ডীয় ওজনের একক বিশেষ; প্রায় 27 মণ। কয়লা প্রভৃতি ওজন করতে যুক্তরাষ্ট্রে একে বলে **লঙ্‌ টন**, =2240 পাউণ্ড; ধাতব পদার্থাদি ওজন করতে ব্যবহৃত হয় **শর্ট টন**, =2000 পাউণ্ড। 'মেট্রিক টন' হলো 1000 কিলোগ্রাম ↑, বা 2204·6 পাউণ্ড; একে আবার **টনি**-ও বলা হয়।

টন্‌সিল — মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জিহ্বামূলের দু'পাশের দুটি ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ড ↑ বা গ্রন্থি। এই গ্ল্যাণ্ড দুটি লিম্প ↑ উৎপাদন করে; আর এর বিশেষ জৈব-ক্রিয়ার সাহায্যে কণ্ঠনালীতে রোগ-সংক্রমণ নিবারণ করে দেহ সুস্থ ও নিরোগ রাখে।

টনিক — সাধারণ স্বাস্থ্যপ্রদ ঔষধ।

···**টনিক**, যেমন হাইপারটনিক ↑ সল্যুসন্‌স, গাঢ়তর দ্রবণ। আইসোটনিক ↑ সল্যুসন্‌স মানে যে-সব দ্রবণের গাঢ়ত্ব পরস্পরের সমান।

টম্‌সন, স্যার জোসেফ জন — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী, ম্যানচেষ্টারে জন্ম 1856 খৃঃ, মৃত্যু 1940 খৃঃ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞানের 'ক্যাভেণ্ডিস' অধ্যাপক। তড়িতের আয়ন ↑ মতবাদের সম্প্রসারণ এবং পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যে ইলেকট্রনের ↑ অস্তিত্ব আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। 1906 খৃঃ পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

পুত্র স্যার জর্জ প্যাগেট টমসনও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধীয় গবেষণায় স্মরণীয় কীর্তি; 1937 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ। প্রথম 'অ্যাটম বম্ব' ↑ উৎপাদনের গবেষকগোষ্ঠীর অন্যতম বিজ্ঞানী।

···**টমি** — ব্যবচ্ছেদ, কাটা, যেমন **লিথোটমি** মানে মূত্রাধার (ব্লাডার) কেটে তার ভিতরে উৎপন্ন পাথর (পাথুরি-রোগ) বার করে ফেলা (লিথো = প্রস্তর)। **অ্যা না ট মি** মানে শব-ব্যবচ্ছেদ, শারীরবৃত্তের শিক্ষায় মৃত দেহ কেটে আভ্যন্তরীন গঠন-বৈচিত্র্য ও অঙ্গ-সংস্থানের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

টর্টিকলিস — ঘাড়-মাথা একদিকে বেঁকে গিয়ে যে দৈহিক-বিকৃতি ঘটে, অত্যধিক শৈত্যে, বা অন্য কোন কারণে ঘাড়ের শিরা ও মাংসপেশীর সংকোচনে অনেক সময় এরূপ হয়।

টরিড জোন — ভূ-পৃষ্ঠের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুব-রৈখিক আঞ্চলিক ভূভাগ। ভৌগোলিক বিষুব

বৃত্তের (ইকোয়েটর ↑) 23°30′ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত।

টরিসেলি, ইভেঞ্জিলেটা — ইটালীয় বিজ্ঞানী, জন্ম 1608 খৃঃ, মৃত্যু 1647 খৃঃ। দীর্ঘদিন গ্যালেলিও-র ↑ ছাত্র ও সহকারী। 1643 খৃঃ বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ধারণের মৌলিক তথ্য আবিষ্কার এবং প্রথম চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার ↑) উদ্ভাবন। এই যন্ত্রে 'টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম' ↑ সৃষ্টির জন্য স্মরণীয়।

টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম — এক মুখ বন্ধ, অন্যূন 32 ইঞ্চি লম্বা, একটা কাঁচ-নলের মধ্যে পারা ভর্তি করে আর একটা পারা ভর্তি পাত্রের উপর উলটে ধরলে ওই কাঁচ নলের মধ্যস্থ পারা খানিকটা নেমে যায়। এভাবে কাঁচনলটার উপরের দিকে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়, সেখানে বায়ু থাকে না, সামান্য পারার বাষ্প থাকে মাত্র। এরূপ বায়ুশূন্য স্থানকে বলে 'টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম'। ইতালীয় বিজ্ঞানী টরিসেলি ↑ এরূপ কাঁচনলে পারা-স্তম্ভের উচ্চতা মেপে বায়ুর চাপ নির্ধারণের কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। কৌশলটা এক রকম সাধারণ ব্যারোমিটার ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম

টলেমি, ক্লডিয়াস টলেমিসাস — মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আবির্ভাব। পৃথিবী-কেন্দ্রিক সৌর জগতের মতবাদ (টলেমিয় বিশ্ব-সংজ্ঞা হলো : পৃথিবী স্থির, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র তাকে প্রদক্ষিণ করছে) প্রচার ; সহস্রাধিক বছর পরে যে মতবাদ কোপার্নিকাস ↑ কর্তৃক ভ্রান্ত প্রতিপন্ন। গণিতের ত্রিকোণমিতি শাখার প্রবর্তক। ভূ-মণ্ডলের প্রথম মানচিত্র অঙ্কন ; বহুলাংশে ভ্রান্তিপূর্ণ হলেও পৃথিবীর এই প্রথম মানচিত্র অনেকটা প্রামাণ্য ও সে-যুগের পক্ষে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

টলুইন — মিথাইল বেঞ্জিন, $C_6H_5CH_3$; বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ। কোল-টার ↑, অর্থাৎ আলকাতরা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। একে অনেক সময় **টলুঅল**-ও বলা হয়। এ থেকে নানারকম রং, ঔষধ, স্যাকারিন, প্রভৃতি পাওয়া যায়। টি-এন-টি ↑ (ট্রাই-নাইট্রোটলুইন) প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করতেও এর প্রয়োজন হয়।

টাইপ মেটাল — সীসা, অ্যান্টিমনি ও টিনের সংকর-ধাতু ; এর মধ্যে সাধারণতঃ 60% সীসা (লেড ↑),30% অ্যান্টিমনি এবং 10% টিন থাকে।

মুদ্রণকার্যের জন্যে এ-দিয়ে ছাপার টাইপ তৈরী হয়ে থাকে। অ্যান্টিমনি থাকায় তরলীকৃত সংকর ধাতুটা ঢালাই করে জমালে আয়তনে ছোট না হয়ে বরং একটু বেড়ে যায়; ফলে নিখুঁত পরিষ্কার অক্ষরগুলো ওঠে।

টাইটেনিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 47·9, পারমাণবিক সংখ্যা 22; অনেকটা লোহার অনুরূপ ধাতু। সহজেই এর তার ও পাত করা যেতে পারে। এর খনিজ যৌগিক পদার্থ অনেক পাওয়া যায়। এর অক্সাইড, TiO_2, সাদা 'ভার্নিস রং' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টাইটেনিয়াম মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর-ধাতুও তৈরী হয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী করতে টাংস্টেনের↑ সঙ্গে সামান্য কিছু টাইটেনিয়ামও লোহার সঙ্গে অনেক সময় মেশানো হয়ে থাকে। কাঁচ-শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

টাংস্টেন — মৌলিক ধাতু; এর অপর নাম উলফ্রাম↑। বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট↑ এ-দিয়ে তৈরী করা হয়। বিশেষ ধরণের ইস্পাত (টাংস্টেন-স্টিল) তৈরী করতেও এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

টার্টার — প্রধানতঃ অ্যাসিড-পটাসিয়াম টার্টারেটকে বলে **ক্রিম-অব-টার্টার,** যা মদ্য প্রস্তুতকালে মদ্য-ভাণ্ডের মধ্যে জমে (আর্গল↑)। জিনিসটা জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পটাসিয়াম ও অ্যান্টিমনির মিলিত টার্টারেট-কে বলে **টার্টার-এমিটিক**↑, যা সর্দি-কাশির একটা বিশিষ্ট ঔষধ; কিন্তু পরিমাণ বেশি হলে এর বিষক্রিয়া দেখা যায়। দাঁতের উপরে যে পদার্থের বাদামী আবরণ পড়ে তা প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট; সাধারণ কথায় বলা হয় টার্টার।

টার্টারিক অ্যাসিড — একটা জৈব অ্যাসিড; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। এর রাসায়নিক সূত্র COOH.(CH.OH.)$_2$ COOH; আঙ্গুর ফলের রস থেকে পাওয়া যায়। আর্গল↑ থেকেই বেশীর ভাগ টার্টারিক অ্যাসিড মেলে। এর বিভিন্ন সল্টকে বলে **টার্টারেট।** রঞ্জন-শিল্পে, কাপড় ছাপার কাজে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেকিং পাউডার↑, সিড্‌লিজ পাউডার↑ ইত্যাদিতেও প্রয়োজন হয়।

টার্টারেট — টার্টারিক অ্যাসিডের↑ রাসায়নিক লবণ বা সল্ট↑।

টার্টার এমিটিক — পটাসিয়াম ও এণ্টিমনির↑ মিলিত টার্টারেট↑ লবণের ব্যবহারিক নাম। টার্টার-এমিটিক ঔষধ হিসেবে সর্দি-কাশিতে ব্যবহৃত হয়; মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া।

টার্মালিন — বোরন ও অ্যালুমিনিয়ামের যুগ্ম সিলিকেটে↑ গঠিত স্বচ্ছ ও মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। সাধারণতঃ

বর্ণহীন থাকে, কখন কখন নীল বা লাল রঙেরও দেখা যায়।

টার্পেণ্টাইন — তারপিন তেল ; পাইন গাছ থেকে নিঃসৃত রজন-জাতীয় আঠালো রস চোলাই করে এই তেল পাওয়া যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা বিশেষ এক শ্রেণীর তরল হাইড্রোকার্বন ↑ মাত্র। উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ হিসেবে কখন কখন রং, ভার্নিস প্রভৃতি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেলটার কিছু ভেষজ গুণও আছে।

টারবাইন — এক রকম যন্ত্র বিশেষ ; যার সাহায্যে মোটর বা ইঞ্জিনের কার্যকরী-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর যান্ত্রিক কৌশলটা হলো : সরু নলপথে জলীয় বাষ্প, বায়ু বা জল-প্রবাহ এসে সবেগে একটা প্রকাণ্ড চাকার চওড়া ব্লেডগুলোর উপরে পর্যায়ক্রমে আঘাত করতে থাকে ;
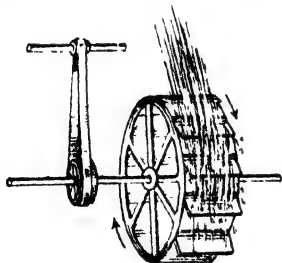
টারবাইন জল-চক্র

এর ফলে চাকাটা দ্রুত ঘুরতে আরম্ভ করে। ওই চাকার সঙ্গে সংযুক্ত ইঞ্জিন বা মোটরের চাকাও ঘুরে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। এভাবে চালিত গ্যাস-টারবাইন বা ওয়াটার-টার-বাইনের সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্র চালানো হয়। টারবাইনের কৌশলে চালিত যন্ত্রকে **টার্বো** বলে ; যেমন — টার্বো ইঞ্জিন, টার্বো জেনারেটর ↑ ইত্যাদি।

টি. এন. টি — ট্রাই-নাইট্রোটলুইন নামক বিস্ফোরক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম। ফিকে হলদে, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। বিশেষ নাইট্রেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে টলুইনের ↑ সঙ্গে নাইট্রো-জেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎ-পন্ন হয়ে থাকে। পদার্থটাকে আবার অনেক সময় **টোটাইল** ও বলা হয়।

টিউবারকূল — উদ্ভিদ বা জীবদেহের কোথাও স্থানীয় জৈব কোসগুলির স্ফীতির ফলে যে এক রকম গোলা-কার পদার্থ-পিণ্ডের উদ্ভব হয়। আবার জীবের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন তন্তুর (টিস্যু ↑) গায়ে যক্ষ্মারোগের (টিউবারকুলিসিস ↑) জীবাণুরা যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা সৃষ্টি করে সেগুলিকেও টি. ল. বলে।

টিউবারকুলিসিস — যক্ষ্মারোগ ; এ-রোগে সাধারণতঃ 'টিউবারকূল' নামক বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণুর (ব্যাচিলি ↑) দ্বারা প্রধানতঃ ফুসফুস্ আক্রান্ত হয়। (চিত্রে কাঠির মতগুলি জীবাণু, আর গোলাকার

টিউবার্কেল ব্যাচিলাস

গুলি রক্তকণিকার (সেল ↑) প্রায় হাজার গুণ বর্ধিত চিত্র)।

টিউবারকুলিন — টি. স ব্যাচিলি থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার জৈব পদার্থ, যা প্রয়োগ করে কেহ যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা, তার পরীক্ষা করা হয়।

টিউমার—দূষিত জৈবকোষের স্ফীতি। জীবাণু দুষ্ট কোষগুলি যদি বাড়তে থাকে এবং সংলগ্ন সব তন্তুকোষ-গুলিকে ক্রমাগত ভেঙ্গে ফেলে,তাহলে তা ক্যান্সার ↑ রোগে পরিণত হয়। যদি কোন টিউমারের কোষগুলি নিজেরা বাড়ে, কিন্তু চারদিকের তন্তুগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়,তাহলে তা তেমন মারাত্মক হয় না।

টিউনিং ফর্ক — ধাতুনির্মিত লম্বা সাঁড়াশি-আকৃতি যন্ত্র বিশেষ ; শব্দ-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। আঘাত করলে এর দুটি অংশ সম-ভাবে স্পন্দিত হয়ে একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বনি সৃষ্টি করে।

টিন — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; পারমাণবিক ওজন 118·7, পার-মাণবিক সংখ্যা 50, সাংকেতিক চিহ্ন Sn (ষ্ট্যানাম)। রূপোর মত সাদা ; সহজেই এর তার ও পাত করা যায়। এর খনিজ অক্সাইড, SnO_2 (টিন-স্টোন), এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় কার্বনের সঙ্গে উত্তপ্ত করে ধাতুটা সাধারণতঃ নিষ্কাশিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জল বা বায়ুর সংস্পর্শে এর কোন বিকৃতি ঘটে না ; কিন্তু 18° সেন্টিগ্রেডের কম তাপে ধূসর বর্ণ (অ্যালোট্রপিক টিন) হয়ে যায়, একে বলে **টিন প্লেগ**। নানারকম সংকর-ধাতু তৈরী ও টিন-প্লেটিং-এর কাজে প্রয়োজন হয়। লোহার চাদরে টিনের পাতলা আস্তরণ দিয়ে সাধারণ টিন-প্লেট তৈরী হয়ে থাকে।

টিণ্ড্যাল এফেক্ট — আলোক-রশ্মির পথে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকা পড়লে ওই আলোকের যে বিচ্ছুরণ ঘটে। কোন ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে রোদ ঢুকলে ঘরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা-গুলো এর ফলে পরিষ্কার দৃষ্টি-গোচর হয়ে থাকে, ধূলিকণার উপর আলোকের প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের ফলেই অদৃশ্য আলোক রশ্মি দৃশ্য হয়ে ওঠে। অতি সূক্ষ্ম কণিকার উপর নীল আলোক-তরঙ্গ বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত হয়। আকাশের রং মোটামুটি এ জন্যেই নীল দেখায়। আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ ↑ যন্ত্রে এই টিণ্ড্যাল এফেক্টের জন্যেই জলে ভাসমান অদৃশ্য কণিকাগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। বৃটিশ-বিজ্ঞানী টিণ্ড্যাল এই তথ্য উদ্ঘাটন করেন।

টিটেনাস — ধনুষ্টংকার রোগ ; জীবাণুঘটিত কঠিন ব্যাধি। প্রধানতঃ জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে 'টিটেনাস'

নামক এক প্রকার জীবাণু কোন ক্ষতের ভিতর দিয়ে দেহের রক্তে অনুপ্রবেশ করে এবং সোজা গিয়ে মেরুদণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে মেরু-শিরার সংকোচনে পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলিও সংকোচিত হয় এবং দেহ বেঁকে যায়। দুশ্চিকিৎস ব্যাধি।

টিনিটাস — কানে অকারণ শ্রুত ভোঁ-ভোঁ শব্দ। এটা বাইরের কোন শব্দ নয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতিজনিত শ্রুত আভ্যন্তরীণ শব্দ।

টিণ্টোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের বর্ণের তুলনামূলক প্রভেদ নিরূপণ করা যায়; এতে প্রধানতঃ প্রামাণ্য কোন নির্দিষ্ট বর্ণের কাচ বা দ্রবণের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের বর্ণের তুলনা করা হয়।

টেক্‌নোলজি — শিল্প-বিজ্ঞান; শিল্প-দ্রব্যাদি প্রস্তুতির কাজে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিদ্যা।

টেম্পারেচার — উষ্ণতা বা তাপ-মাত্রা; কোন পদার্থ কতটা উত্তপ্ত বা ঠাণ্ডা, অর্থাৎ তার উষ্ণতার পরিমাণ এর বিভিন্ন এককে প্রকাশিত হয়। পদার্থের মধ্যে উষ্ণতার, অর্থাৎ তার টেম্পারেচারের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন পদার্থে নিহিত মোট তাপ-শক্তিকে

থার্মো-মিটার

বলে হিট ↑। হিট ও টেম্পারেচার এক জিনিস নয়। টেম্পারেচার পদার্থের উষ্ণতার মাত্রা বা পরিমাণ সম্বন্ধীয় ধারণা জন্মায় মাত্র। আর পদার্থের হিট, বা মোট তাপ-শক্তির পরিমাণ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন থার্মোমিটারে ↑ বিভিন্ন স্কেলের এককে টেম্পারেচার মাপা হয়; যেমন—সেন্টিগ্রেড ↑, ফারেনহাইট ↑ ও রুমার ↑।

টেম্পারিং (অব ষ্টিল) — ইস্পাতে পান্ দেওয়া। সাধারণ ইস্পাতে তৈরী জিনিসে উপযুক্তরূপ কাঠিন্য দেওয়ার জন্যে প্রথমে তাকে বিশেষভাবে উত্তপ্ত করে সহসা তেল বা জলে ডুবিয়ে সাধারণতঃ টেম্পার করা হয়। যাকে বাংলায় বলে 'পান্ দেওয়া'। বিভিন্ন শ্রেণীর ষ্টিলে ↑ টেম্পারিং-এর কৌশল আবার বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

টেণ্টাকল — বিশেষ বিশেষ প্রাণীর সম্মুখভাগে প্রলম্বিত নমনীয় দেহাংশ; যা জড়িয়ে বা ঘুরিয়ে তারা শিকার ধরে, আবার এ গুলির স্পর্শেই

চলার পথের বাধাও অনুভব করে; যেমন — অক্টোপাসের ↑ বাহুগুলি, শামুক, আরশোলা প্রভৃতি জীবের মুখের পার্শ্ববর্তী সরু নলসমূহ।

টেণ্ড্রিল—লতানো উদ্ভিদের আকর্ষ
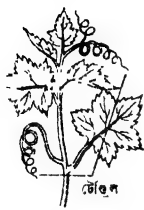
বা শুণ্ড ; অর্থাৎ লতার গাঁটে-গাঁটে যে-সব সূত্র বা লম্বা ও নরম অংশ বেরোয় এবং যে-গুলির সাহায্যে অবলম্বনস্বরূপ নিকটবর্তী ডাল-পালা আঁকড়ে ধরে লতা বেয়ে ওঠে।

উদ্ভিদের আকর্ষ

টেরাটোলজি — অস্বাভাবিক এবং অতিপ্রাকৃত আকৃতিবিশিষ্ট জীবের গঠন-বৈশিষ্ট্যাদি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিদ্যা; যেমন — মানুষের বেলায় দৈত্যাকৃতি লোক, বা অতি খর্বাকৃতি বামন, অথবা কোন যুক্তদেহ যমজ শিশুর অস্বাভাবিকতার জৈব কারণ নির্ধারণের বিদ্যা।

টেলিগনি — একই স্ত্রীলোকের (বা স্ত্রী-প্রাণীর) বিভিন্ন স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে পরবর্তী স্বামীর জাত সন্তানে পূর্বস্বামীর কোন কোন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য প্রভাব।

টেলিগ্রাফ — বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করবার যন্ত্র। এর ট্রান্সমিটার বা প্রেরক-যন্ত্রের একটা চাবি টিপলে তড়িৎ-স্রোত তারের মাধ্যমে দূরবর্তী গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় (ক্লোসড সার্কিট ↑); চাবিটা ছেড়ে দিলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রেরক-যন্ত্রের চাবিটা চেপে ধরা ও ছেড়ে দেওয়ার সময়ের কম-বেশির উপরে গ্রাহক যন্ত্রে দু-রকম শব্দ সৃষ্টি করে—হ্রস্ব শব্দ 'টরে' ও দীর্ঘ শব্দ 'টক্কা'। মোর্স নামে এক বিজ্ঞানী ইংরাজীর 26-টা অক্ষর এই 'টরে' ও 'টক্কা' শব্দ দুটা বিভিন্ন রকমে সাজিয়ে একটা সাংকেতিক ভাষার উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবস্থায় গ্রাহক-যন্ত্রের ওই শব্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে অক্ষরগুলো বুঝে নেওয়া যায়। পরে অক্ষরগুলো সাজিয়ে সমস্ত সংবাদটা এর থেকে বুঝা যেতে পারে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্রে আগত মৃদু তড়িৎপ্রবাহকে অবশ্য রিলে ↑ করে বাড়িয়ে নেওয়া হয়।

টেলিপ্রিণ্টার — টেলিগ্রাফের সাহায্যে দূরাগত সংবাদের স্বয়ংক্রিয় লিখন-যন্ত্র। বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শব্দ আপনা থেকে যন্ত্রস্থ কাগজের উপর বিন্দু ও রেখায় অঙ্কিত হয়ে এক রকম সাংকেতিক লেখার সৃষ্টি করে। আজকাল আবার এর এমন উন্নত যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যার সাহায্যে টেলিগ্রাফে আগত সংবাদ একেবারে টাইপ-রাইটারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। এরূপ যন্ত্রকে বলে টেলিপ্রিণ্টার বা **টেলিটাইপ**।

টেলিফোন — বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সঙ্গে কথা বলার যন্ত্র। শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্যে এর প্রধান অংশ

হলো ট্রান্সমিটার ও রিসিভার যন্ত্র। ট্রান্সমিটারে থাকে একটা কার্বন-মাইক্রোফোন ↑; ওর মুখে কথা বললে শব্দ-তরঙ্গের সংঘাতে ওই মাইক্রোফোনের পর্দা শব্দানুযায়ী কম্পিত হয়। এর ফলে মাইক্রোফোনের তড়িৎ-প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক স্পন্দন দূরবর্তী রিসিভার-যন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়। রিসিভার-যন্ত্রে থাকে একটা বাঁকানো চুম্বকের দুই প্রান্তে সংলগ্ন লোহার দু'টি টুকরোর (পোল-পিস্) গায়ে জড়ানো তার-কুণ্ডলী (কয়েল)। লোহার একখানা পাতলা পর্দা (ডায়াফ্রাম) ওই কয়েল দুটার সামনে আল্‌তোভাবে সংলগ্ন থাকে। ট্রান্সমিটার ↑ থেকে আগত বৈদ্যুতিক স্পন্দন রিসিভারের ওই কয়েলে সঞ্চারিত হয়, আর ওই লোহার পর্দাখানা তদনুযায়ী স্পন্দিত হতে থাকে। ওই পর্দা বা ডায়াফ্রামের এরূপ নিয়ন্ত্রিত স্পন্দনে রিসিভার বা গ্রাহক-যন্ত্রে পুনরায় তদনুযায়ী শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে শ্রুতিগোচর হয়।

টেলিফটো লেন্স — দূরের জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখবার উপযোগী টেলিস্কোপের ↑ মধ্যে যে বিশেষ ধরণের লেন্সের ↑ সঙ্গে ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা লাগিয়ে দূরবর্তী বস্তুর সুস্পষ্ট ছবি তোলা যায়। এরূপ লেন্স ব্যবহারের ফলে দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছবি টেলিস্কোপের ব্যবস্থায় ক্যামেরার ফোকাসের ↑ মধ্যে এসে যায় এবং ফটোগ্রাফির ↑ সাধারণ নিয়মে তার ফটো ওঠে। এতে ক্যামেরার সাধারণ লেন্সের জায়গায় বিশেষ ধরণের একখানা কন্‌কেভ ↑ এবং একখানা কনভেক্স ↑ লেন্স একসঙ্গে লাগানো থাকে।

টেলিভিসন — যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু বা দৃশ্যের ছায়াচিত্র কৌশলে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা যায়। যে বস্তুর প্রতিকৃতি দূরে পাঠাতে হবে তার উপর আলোকপাত করলে প্রেরক-যন্ত্রের মধ্যে আলো-ছায়ার তীব্রতার তারতম্যানুযায়ী যান্ত্রিক কৌশলে সূক্ষ্ম (ফটো ইলেক্‌ট্রিক ↑) তড়িত্তরঙ্গ উৎপাদিত হয় এবং তা আবার
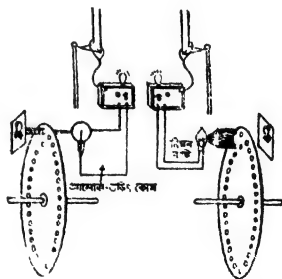
টেলিভিসন যন্ত্রের মোটামুটি নক্সা

বেতার-তরঙ্গের (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তড়িত্তরঙ্গ দূরবর্তী গ্রাহকযন্ত্রে উপস্থিত হয়ে বিশেষ

ব্যবস্থায় তার উৎপাদক আলোক-রশ্মির তীব্রতার তারতম্যানুযায়ী পুনরায় আলোকরশ্মির সৃষ্টি করে। এভাবে প্রেরক-যন্ত্রস্থ আলোকরশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী গ্রাহক-যন্ত্রের আলোকরশ্মিরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে এবং তদনুযায়ী আলো-ছায়ার সৃষ্টি করে। এভাবে দূরবর্তী প্রেরক-যন্ত্রের সম্মুখস্থ চিত্র বা দৃশ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি গ্রাহক-যন্ত্রের সম্মুখস্থ পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। শত শত মাইল দূরবর্তী লোকের অঙ্গভঙ্গি-সহ সম্যক চিত্র এভাবে গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায় ফুটে ওঠে। আর একই সঙ্গে রেডিও ↑ যন্ত্রের ব্যবস্থায় তার মুখের কথাও শোনা যায়।

টেলিস্কোপ — দূরবীক্ষণ যন্ত্র; বহু দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছবি বর্ধিতাকারে দেখবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র। 1603 খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও ↑ প্রথম আবিষ্কার করেন, ক্রমে অবশ্য এ-যন্ত্রের নানারূপ উন্নতি সাধিত হয়েছে। সম্প্রতি মাউণ্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারের 200″ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক-লেন্সযুক্ত টেলিস্কোপে লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ (লাইট-ইয়ার ↑) দূরের জ্যোতিষ্কও দেখা যাচ্ছে। টেলিস্কোপ দু'রকম হতে পারে: **রিফ্র্যাকটিং টেলিস্কোপ** যন্ত্রের **অব্জেকটিভে ↑ থাকে একখানা অপেক্ষাকৃত বড় উত্তল (কনভেক্স ↑) লেন্স, যার ভিতর দিয়ে** প্রতিসরিত হয়ে দৃশ্য বস্তুর ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার প্রতিচ্ছায়া যন্ত্রের ভিতরে পড়ে। ওই প্রতিচ্ছায়া আবার আইপিসের ↑ অবতল (কন্‌কেভ ↑) লেন্সের ভিতর দিয়ে বর্ধিতাকারে দৃষ্টিগোচর হয়।
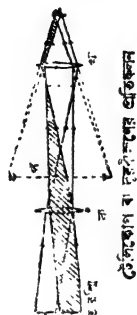
আর **রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপের** অব্জেকটিভে থাকে লেন্সের বদলে একখানা অবতল (কন্‌কেভ) দর্পণ, যাতে প্রতিফলিত হয়ে দৃশ্য বস্তুর ছায়া যন্ত্রের ভিতরে পড়ে, যা আবার আইপিসের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে বর্ধিতাকারে দেখা যায়। এ-সব দূরবীক্ষণ যন্ত্র গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের জন্যেই ব্যবহৃত হয়। এতে দৃশ্য বস্তুর উল্‌টো ছায়া পড়ে বলে ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী জিনিস দেখা অসুবিধাজনক। এজন্যে আবার একখানা প্রিজম ↑ বিশেষ ব্যবস্থায় এরূপ টেলিস্কোপে লাগানো হয়, যার ফলে উল্টো ছায়া সোজা হয়ে এসে দর্শকের চোখে পড়ে। (বাইনোকুলার ↑)

ট্যাকোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ইঞ্জিনের চাকার ঘূর্ণন-সংখ্যা জানা যায়; গতি-নির্ধারক যন্ত্র। 'ট্যাক্...' মানে গতি। 'ট্যাকি...' মানে দ্রুত, যেমন—**ট্যাকিকার্ডিয়া**, দ্রুত হৃৎস্পন্দন।

ট্যান্‌টালাম — মৌলিক ধাতু; অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। হাইড্রোফ্লোরিক ↑ অ্যাসিড ছাড়া অন্য কোন অ্যাসিডেই গলে না। উত্তাপ ও অ্যাসিডের ক্রিয়া প্রতিরোধক কোন কোন ধাতু-সংকর (অ্যালয় ↑) প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। ধাতুটার গ্যাস শোষণের ক্ষমতাও প্রবল; এজন্য ভ্যাকুয়াম ↑ নল তৈরী করতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

ট্যানিং — জীবজন্তুর কাঁচা চামড়াকে যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরী পাকা চামড়ায় (লেদার) পরিণত করা হয়। এজন্যে ট্যানিক ↑ অ্যাসিড, বিভিন্ন ট্যানিন ↑, অ্যালাম ↑ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া করা হয়ে থাকে। ক্রোমিয়াম ↑ ঘটিত বিভিন্ন সল্টও ট্যানিং-এর কাজে দরকার হয়।

ট্যানিক অ্যাসিড — এক প্রকার উদ্ভিদের 'গল্‌-নাট' নামক ফল থেকে নিষ্কাশিত রাসায়নিক পদার্থ; সাদা গুঁড়া, জলে দ্রবণীয়। হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি দেশীয় নানা রকম উদ্ভিদের ফল থেকেও এ-জাতীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়; এগুলো সব **ট্যানিন** নামে পরিচিত। এদের মধ্যেও ট্যানিক অ্যাসিড বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। চর্ম-শিল্পে (ট্যানিং ↑) ও কালি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়।

ট্যাল্‌ক — নরম এক রকম পাথরের মসৃণ চূর্ণ। পদার্থটা দিয়ে সাধারণতঃ গায়ে মাখার (ট্যালকাম্‌) পাউডার তৈরী হয়। রাসায়নিক হিসেবে পাথরটার গঠনে প্রধানতঃ থাকে ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ↑।

ট্যালো — বিশোধিত জান্তব চর্বি। বিশেষতঃ গরু, ভেড়া প্রভৃতির চর্বি থেকেই বিভিন্ন বিশোধন-প্রক্রিয়ায় ট্যালো তৈরী হয়ে থাকে। রাসায়নিক হিসেবে এটা নানা রকম গ্লিসারাইড ↑ পদার্থে গঠিত। বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন এবং নির্দোষ বলে পদার্থটা বিভিন্ন খাদ্য-বস্তুতে মিশ্রিত করা হয়। উৎকৃষ্ট সাবান-শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

ট্রয়-ওয়েট — মণিমুক্তা, সোনা-রূপা মাপবার ইংলণ্ডীয় ওজন পরিমাণ:

1 গ্রেণ = ·0648 গ্র্যাম
20 গ্রেণ = 1 স্ক্রুপল
24 গ্রেণ = 1 পেনিওয়েট
3 স্ক্রুপল = 1 ড্রাম
8 ড্রাম = 1 আউন্স ট্রয় = 1·1 আউন্স (অ্যাভয়ড্রু-পয়েজ ↑)

ট্রাইটিয়াম — হাইড্রোজেনের তৃতীয় আইসোটোপ ↑। স্বাভাবিক হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীনে থাকে একটি প্রোটন ↑ কণিকা; ডয়েটেরিয়ামে ↑ থাকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন ↑ কণিকা; আর এই ট্রাইটিয়ামের কেন্দ্রীনে থাকে একটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন কণিকা।

ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ট্রাইটিয়ামের কেন্দ্রীনে (নিউক্লিয়াস ↑) অতিরিক্ত আর একটি প্রোটন যোগ করলে হিলিয়াম ↑ অণুর সৃষ্টি হয়।

ট্রাইহাইড্রল — যে পদার্থের অণুর গঠনে তিনটি জলীয় অণুর (H_2O) সমাবেশ ঘটে ; যেমন, H_6O_3।

ট্রাইসেপ্‌স — মানুষের বাহুর পেছন-দিকের মাংসপেশী ; যার সংকোচন-প্রসারণের ফলে হাত সহজেই ওঠা নামা করে এবং কাজকর্ম করা সম্ভব হয়।

ট্রাইসেপ্‌স

ট্রাইপ্লেক্স তিনটি স্তর বা অংশে গঠিত জিনিস ; যেমন, **ট্রাইপ্লেক্স গ্লাস** – পৃথক তিনখানা পাতলা কাচ জুড়ে যে-কাচ তৈরি হয় ; নিরাপত্তার জন্যে মোটর গাড়ীর জানালায় এরূপ কাচ ব্যবহৃত হয়। সহজে ভাঙ্গে না, ভাঙ্গলেও টুকরা ছিট্‌কে বিপদে ঘটায় না। এরূপ **ট্রাইপ্লেক্সস উড**, যাকে সচরাচর আমরা বলি প্লাইউড।

ট্রাইবেসিক অ্যাসিড — যে সব অ্যাসিডের আণবিক গঠনে ধাতুর দ্বারা অপসারণ-যোগ্য এমন তিনটা হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে যেগুলো একে-একে অপসারিত করে তিন রকম ধাতব সল্ট গঠিত হতে পারে। ফস্‌ফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) হলো এ-রকম একটা অ্যাসিড। এর সোডিয়াম সল্ট তিন রকমের হতে পারে : (i) Na_3PO_4, (ii) Na_2HPO_4, (iii) NaH_2PO_4 (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

ট্রাকোমা — এক রকম সংক্রামক ও কষ্টদায়ক চক্ষুরোগ ; এ-রোগে চোখের কঞ্জাংটিভা ↑ স্ফীত হয় এবং চোখের পাতার তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা জন্মায়। কঞ্জাংটিভার পর্দা ও কর্নিয়া ↑ এ-রোগে অনচ্ছ হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

ট্রান্‌জিস্টর — অতিসূক্ষ্ম তড়িৎ-তরঙ্গ গ্রহণোপযোগী ইলেকট্রনিক ↑ যন্ত্রাংশ বিশেষ, প্রধানতঃ জার্মেনিয়াম ↑ ধাতুর ক্রষ্টালে ↑ তৈরী হয়। ভ্যাকুয়াম ভাল্‌ব ↑ বা ডায়োডের ↑ অনুরূপ কাজ করে ; কিন্তু স্থায়িত্বে, ক্ষুদ্রতায় ও ক্ষমতায় অধিকতর সুবিধাজনক। অতি সামান্য তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে দূরাগত তড়িত্তরঙ্গের ইলেকট্রনের ↑ ধারা পরিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবনীয় ক্ষমতা। রেডিও, উড়ো জাহাজ প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গ গ্রহণের সর্বাধুনিক (1948খৃঃ, আমেরিকা) আশ্চর্য আবিষ্কার।

ট্রান্সফিউসন — সুস্থ লোকের দেহের রক্ত বা রক্তরস (লিম্‌ফ ↑) রক্তশূন্য রোগীর শিরায় প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সুস্থ রক্ত রোগীর রক্তের অনুরূপ পর্যায়ের

হওয়া দরকার; যে-কোন লোকের রক্ত যে-কোন রোগীর দেহে কার্যকরী হয় না। এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রক্ত সংরক্ষণের জন্যে আজকাল বড় বড় হাসপাতালে 'ব্লাড-ব্যাঙ্ক' নামক গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে।

ট্রান্সভার্স ওয়েভ — প্রবাহ-পথের লম্বভাবে স্পন্দিত বস্তু-কণিকার সঞ্চরণ বা গতির ফলে যে তরঙ্গ-স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এরূপ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো, স্পন্দিত পদার্থের কণিকাগুলোই উপরে নীচে ওঠা-নামা করবার ফলে তরঙ্গের সৃষ্টি
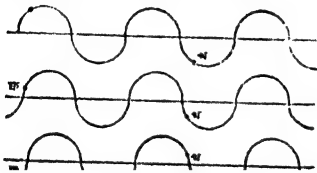
ট্রান্সভার্স ওয়েভ

হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু-কণিকার স্পন্দন না হলেও আলোক ও বেতার-তরঙ্গ এরূপ; কিন্তু শব্দ-তরঙ্গ এরূপ ট্রান্সভার্স নয়; তা হলো লঙ্গিচিউডিন্যাল ↑। জলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা ট্রান্সভার্স ওয়েভের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ট্রান্সমু্যটেসন অব এলিমেণ্ট — একটা মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠন বদলে ফেলে অন্য কোন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা। এক সময় অ্যাল্‌কেমিস্টরা ↑ এরই চেষ্টা করতেন, পরে এটা অসম্ভব বলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সম্প্রতি স্বয়ংপ্রভ (রেডিও-অ্যাকটিভ ↑) পদার্থের তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দেখা গিয়েছে যে, রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থে এরূপ পারমাণবিক মৌলিক পরিবর্তন অহরহঃই ঘটে থাকে। ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু তেজ-বিকিরণের ফলে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় পরিণত হয়ে যায়। তাছাড়া নিউক্লিয়ার পদার্থ-বিদ্যার পরীক্ষাদিতে সাইক্লোট্রোন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে নিউট্রন ↑ কণিকা, আল্‌ফ ↑ কণিকা প্রভৃতির দ্রুত সংঘাতে বেরিলিয়াম ↑ ধাতুকে কার্বনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থকে অন্য রকম মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এভাবে হয়তো একদিন সেই প্রাচীন অ্যাল্‌কেমিস্টদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী লোহাকে সোনা করাও সম্ভব হতে পারে।

ট্রান্সফর্মার — যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে অল্টারনেটিং ↑ (পরিবর্তী) তড়িৎ-প্রবাহের চাপের (ভোল্টেজ ↑) হ্রাস-

'ষ্টেপডাউন' ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা

বৃদ্ধির ফলে প্রবাহ-শক্তি (কারেন্ট) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। এর মূল ব্যবস্থা হলো : বৈদ্যুতিক তারের একটা ছোট কয়েলের চারদিক ঘিরে আর একটা বড় কয়েল (তার-কুণ্ডলী) এমনভাবে রাখা হয় যেন দু'টার মাঝে কিছু ফাঁক (ইনসুলেটেড) থাকে। ছোট কয়েলটাকে বলে **প্রাইমারি** কয়েল, আর বড়টাকে বলে **সেকেণ্ডারি** কয়েল। মধ্যবর্তী প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে একটা লোহার রড দিলে আরও ভাল কাজ হয়। এখন প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রবাহিত হলে ইণ্ডাকসনের ↑ ফলে সেকেণ্ডারি কয়েলেও ওই অল্টারনেটিং কারেন্টের তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু তার ভোল্টেজ বদলে যায়। তড়িৎ-প্রবাহের ভোল্টেজের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে ওই দুই কয়েলে জড়ানো তারের পাকের সংখ্যার উপর। সেকেণ্ডারি কয়েলে প্রাইমারি কয়েল অপেক্ষা তারের পাক বেশি থাকলে তার ভোল্টেজ তদনুযায়ী বেড়ে যায়। এরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'স্টেপ-আপ ট্রান্সফর্মার'। আর, সেকেণ্ডারি কয়েলে প্রাইমারির চেয়ে পাকের সংখ্যা কম হলে ভোল্টেজও কমে যায়। একে বলে 'স্টেপ - ডাউন ট্রান্সফর্মার'।

'স্টেপ-আপ' ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা

ট্রান্সইউরেনিক এলিমেণ্ট — যে সব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন ইউরেনিয়ামের ↑ চেয়ে বেশি। মেণ্ডেলিফের 'পিরিয়ডিক টেবল'-এ ↑ এরূপ কয়েকটা মৌলিক পদার্থের উল্লেখ ছিল। ক্রমে আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এদের নাম দেওয়া হয়েছে— নেপচুনিয়াম ↑ (93), প্লুটোনিয়াম ↑ (94), অ্যামিরিসিয়াম (95), কুরিয়াম (96) বার্কেলিয়াম (97), ক্যালিফোর্নিয়াম (98)। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ওজন 92, এগুলোর পা. ও. তার চেয়ে বেশি, তাই এদের ট্রান্সইউরেনিক মৌলিক পদার্থ বলা হয়। অদ্যাপি পৃথিবীতে এ রকম স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি ; তবে উপযুক্ত কৌশলে কেন্দ্রীন-বিক্রিয়ার (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ↑) সাহায্যে এগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে।

ট্রিগনোমেট্রি — ত্রিকোণমিতি, গণিতশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা। ত্রিভূজের বাহু ও কোণের বিভিন্ন অনুপাত (রেসিও, যেমন—সাইন ↑, কস্ ↑, ট্যান প্রভৃতি) নিয়ে এই শাখায় বিভিন্ন গাণিতিক তথ্যের সমাধান করা হয়।

ট্রোপোস্ফিয়ার — পৃথিবীর নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলীয় স্তর। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10 মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট এই

স্তরেই পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে এই স্তরের যত উপরে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও চলাচল ক্রমে তত হ্রাস পেতে থাকে। (অ্যাট্‌মস্ফিয়ার ↑)

ড

ড কু মে ণ্টা রি ফিল্ম — প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। কাল্পনিক আখ্যান নয়, এমন যে-সব বাস্তব চিত্র প্রচারের জন্যে, অথবা লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে তোলা হয়ে থাকে।

ডগ ষ্টার—'সিরিয়াস' নামক নক্ষত্রের বিশেষ নাম ; গগনমণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ডপলার, ক্রিশ্চিয়ান জো হা ন — অষ্ট্রিয়াবাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী, জন্ম 1803 খৃঃ, মৃত্যু 1853 খৃঃ। শব্দ-বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা : শ্রোতা ও উৎসের ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে শ্রুত শব্দের ধ্বনিগ্রামের উন্নতি-অবনতি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ। (ডপ্‌লার এফেক্ট ↑)। অনুরূপ তরঙ্গঘটিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাধানে 'ডপ্‌লার প্রিন্সি-প্‌ল' ↑ সবিশেষ খ্যাত। এই তথ্যের সাহায্যে নক্ষত্রের গতি, সূর্যের আবর্তন প্রভৃতি জ্যোতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তথ্যাদি নির্ণীত হয়।

ডপ্‌লার এফেক্ট—ডপ্‌লার ↑ কর্তৃক ব্যাখ্যাত শব্দ-বিজ্ঞানের তথ্যবিশেষ। শব্দের ধ্বনিগ্রাম (পিচ্‌ ↑, তীব্রতা) শব্দ-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির ↑ উপরে নির্ভরশীল ; 'ফ্রিকোয়েন্সি' ↑ হলো প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হলো, বস্তুতঃ কানে এল, সেই সংখ্যা। ধরা যাক্‌, একটা রেল ইঞ্জিন বাঁশি বাজিয়ে ছুটছে. বাঁশির শব্দের একটা বিশিষ্ট ধ্বনি আছে ; কারণ, তার নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে। ট্রেনটা যদি শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসে তাহলে তার গতির দ্রুততা অনুসারে শব্দ-তরঙ্গগুলি অধিকতর সংখ্যায় (প্রতি সেকেণ্ডে) শ্রোতার কানে আসবে, কাজেই ফিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে : ফলে, শব্দের ধ্বনিগ্রামও বাড়বে। ট্রেনটা শ্রোতার থেকে দূরে যেতে থাকলে বাঁশির শব্দ-তরঙ্গ ক্রমে কম সংখ্যায় কানে আসবে। কাজেই তার ফ্রিকোয়েন্সি কমবে, ধ্বনির তীব্রতাও তদনুযায়ী কমবে। উৎসের প্রকৃত ধ্বনি ও ফ্রিকোয়েন্সি একই থেকেও শ্রোতার কানে শব্দের এই বিভিন্নতা শব্দ-বিজ্ঞানে 'ডপ্‌-লার এফেক্ট' বলে খ্যাত।

ডপ্‌লার প্রিন্সিপল— কেবল শব্দ-তরঙ্গেরই নয়, যে-কোন তরঙ্গ মাত্রেরই অনুরূপ ধর্ম ডপ্‌লার ↑ প্রতি-পন্ন করেন এবং এই সাধারণ সূত্র 'ডপ্‌লার প্রিন্সিপ্‌ল' নামে খ্যাত। কোন নক্ষত্র যদি পৃথিবী থেকে ক্রমে দূরে সরে যায়, তাহলে তার

আলোক-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি ↑ ক্রমে কমে যাবে এবং অধিকতর লাল দেখাবে (লাল আলোকরশ্মির ফ্রিকোয়েন্সি কম বলে)। আলোক-রশ্মির বর্ণালি বিশ্লেষণ করে এই তথ্যের সাহায্যে সূর্যের আবর্তন, নক্ষত্রের আপেক্ষিক গতি প্রভৃতি বিশ্বরহস্যের বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ডর্ম্যাণ্ট — সুপ্ত অবস্থায় আছে, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল নয়, এমন।

ডলড্রাম — ভূ-বিষুবরেখার 4° উত্তর থেকে 4° দক্ষিণ পর্যন্ত নিরক্ষীয় অঞ্চল। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের পরস্পর বিপরীত-মুখী বায়ু-চাপের ফলে এই অঞ্চলের সমুদ্রে

ডলড্রাম

বায়ুপ্রবাহ প্রায় থাকে না, ঝড়ঝঞ্ঝা কম হয়, কিন্তু এ-অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

ডলোমাইট — ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর স্বাভাবিক যুগ্ম কার্বনেট ($MgCO_3.CaCO_3$); সাদাটে কঠিন প্রস্তর বিশেষ। পর্বতাদি প্রধানতঃ এ দিয়ে গড়া। একে **পার্ল স্পার**ও বলা হয়। ধাতু-নিষ্কাশনের চুল্লী তৈরী করতে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডলি — চাকার উপরে একটা প্লাটফর্ম-বিশিষ্ট এক রকম হাল্‌কা গাড়ী। চলচ্চিত্রের ছবি তোলবার সময় এই গাড়ীর উপরে ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফার থাকে এবং প্রয়োজনমত এরূপ গাড়ী সহজে চলাফেরা করতে পারে।

ডলি

ডয়েটেরিয়াম — হেভি হাইড্রোজেন ↑; হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ ↑ ; যার অ্যাটমিক ওয়েট 2 (সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যা. ওয়েট 1)। এর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন ↑ এবং একটি নিউট্রন ↑ (সাধারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন থাকে না)। এই হেভি হাইড্রোজেন, বা ডয়েটেরিয়ামের কেন্দ্রীনকে বলে **ডয়েটেরন**।

ডাইক্রোমেট—বাইক্রোমেট সল্টকে কখন কখন ডাইক্রোমেটও বলা হয়। ক্রোমেট ↑ সল্টের অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑ CrO_4, (যেমন, পটাসিয়াম ক্রোমেট, K_2CrO_4); আর ডাইক্রোমেটের র‍্যাডিক্যাল হলো Cr_2O_7, (যেমন, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট $K_2Cr_2O_7$); ডাইক্রোমেট সল্টগুলি বিশেষ জারক পদার্থ (অক্সিডাইজিং এজেন্ট ↑)।

ডাইলেক্‌ট্রিক—যে-সব পদার্থ তড়িৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে; যেমন—বাতাস, অভ্র (মাইকা ↑), কাগজ প্রভৃতি। এজন্য কণ্ডেন্সারের ↑ বিভিন্ন প্লেটের মাঝে মাঝে প্রতি-রোধক হিসাবে (ইন্‌সুলেটর ↑) এরূপ পদার্থ দেওয়া হয়।

ডাইবেসিক অ্যাসিড — যে অ্যাসিডে ↑ প্রতিস্থাপন-যোগ্য দুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, যেমন—H_2SO_4 ; কিন্তু HCl নয়। এরূপ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় দু' রকম ধাতব লবণ হতে পারে—শমিত লবণ, K_2SO_4, অশমিত লবণ $KHSO_4$, (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

ডাইরেক্ট ডাই — যে-সব রঞ্জক পদার্থ তুলা, রেয়ন ↑, বা বিভিন্ন সেলুলোজ ↑ জাতীয় পদার্থকে কোন 'মরড্যাণ্ট' ↑ ব্যতিরেকেই রঞ্জিত করতে পারে। সাধারণতঃ এ-সব রঞ্জক দ্রব্যের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে সাহায্য-কারী হিসেবে কিছু সোডিয়াম-ক্লোরাইড, বা সোডিয়াম-সালফেট মিশিয়ে নেওয়া হয় মাত্র।

ডাইরেক্ট কারেণ্ট — যে তড়িৎ-স্রোত সর্বদা স্থিরভাবে একই দিকে প্রবাহিত হয়, অল্টারনেটিং ↑ (পরিবর্তী) কারেণ্টের মত ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে না। সংক্ষেপে বলে ডি. সি. প্রবাহ।

ডাইমর্ফিজম—কোন কঠিন পদার্থে দু-রকম বিভিন্ন আকারের স্ফটিক বা ক্রিস্ট্যাল ↑ গঠিত হওয়ার অবস্থা। এ-রকম পদার্থকে বলে ডাইমর্ফাস।

ডাইভিং বেল — যে এক প্রকার ধাতব (ঘণ্টাকৃতি, অথবা বাক্সের মত) আধারে করে পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধানের জন্যে ডুবুরীরা জলের নীচে নামে। এই বিরাট আধারটার তলার দিকটা থাকে খোলা, কিন্তু একটা পাইপ দিয়ে উপর থেকে এমন
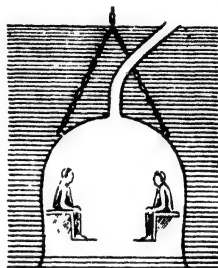
ডাইভিং বেল

ভাবে বাতাস পাম্প করে ঢোকান হয় যাতে প্রবিষ্ট বায়ুর চাপে নীচের জল আধারটার ভিতরে আর ঢুকতে পারে না; ডুবুরী স্বচ্ছন্দে ওর ভিতরে থাকতে পারে। প্রয়োজন শেষ হলে ডুবুরী ইঙ্গিতে জানায় আর উপর থেকে শিকলে-বাঁধা আধারটাকে সময়মত টেনে তোলা হয়।

ডাইনামিক্‌স - শক্তি ও গতি সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান। যেমন, **অ্যারো-ডাইনামিক্স** বায়ু-প্রবাহের গতিশক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ; **হাইড্রো-ডাইনা-মিক্‌স** জলশক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান।

ডাক্‌টলেস গ্ল্যাণ্ড — এণ্ডোক্রাইন ↑ গ্ল্যাণ্ড, বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি; দেহের অভ্যন্তরস্থ যে-সব গ্রন্থির জৈব রস (হর্মোন ↑) অন্তর্নিঃসৃত হয়ে রক্ত-স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়, হর্মোন-নিঃসরণের কোন বহির্মুখ থাকে না।

ডাক্টাইল — ধাতুর প্রসার্যতা, ঠাণ্ডা অবস্থায়ই আঘাতে বা টানে ধাতুর আয়তন-বৃদ্ধির ধর্ম; যেমন—সোনা একটা ডা. ল. ধাতু, কিন্তু ষ্টিল ↑ নয়।

ডাচ মেটাল — তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরী বিশেষ একটি সংকর-ধাতু। এই শ্রেণীর সংকর-ধাতুকে সাধারণতঃ বলা হয় পিতল বা ব্রাস ↑।

ডাচ লিকুইড — ইথিলিন ডাই-ক্লোরাইড, $C_2H_4Cl_2$; বর্ণহীন ও তৈলাক্ত তরল পদার্থ। একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক, ধূম-উৎপাদক পদার্থ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ডায়মণ্ড — হীরক; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা মূলতঃ কার্বন, বা কয়লা; কার্বনের একটা স্বাভাবিক অ্যালোট্রোপ ↑। সাধারণতঃ বর্ণহীন, উজ্জ্বল স্ফটিকাকার মূল্যবান পদার্থ। পরিচিত সকল পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে কঠিন। কৃত্রিম উপায়ে হীরকের প্রায় অনুরূপ পদার্থ তৈরী করা যেতে পারে; প্রায় 3500° সেন্টিগ্রেডে গলিত লোহার মধ্যে বিশুদ্ধ কার্বন গলিয়ে সহসা ঠাণ্ডা করে ফেললে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক-কণা পাওয়া যায়। ময়সাঁ নামে এক বিজ্ঞানী এভাবে এক রকম কৃত্রিম হীরক তৈরী করেছিলেন; কিন্তু প্রক্রিয়াটা ব্যয়-বহুল ও কষ্টসাধ্য বলে স্বভাবজাত হীরক অপেক্ষাও জিনিসটা অধিক মূল্যবান হয়ে পড়ে।

ডায়নামো — তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটা এক রকম জেনা-রেটর ↑, যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই যন্ত্রে সাধারণতঃ ডাইরেক্ট কারেণ্ট (ডি সি.) তড়িৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। মোটামুটি এর যান্ত্রিক কৌশলটা হলো: একটা শক্তিশালী ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটের ↑ দুই প্রান্তের মাঝে বৈদ্যুতিক তার-কুণ্ডলি (কয়েল ↑) স্থাপিত হয়। এই ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেট-টাকে বলে 'ফিল্ড ম্যাগ্‌নেট', আর ওই কয়েলকে বলে 'আর্মেচার' ↑। ফিল্ড ম্যাগ্‌নেট-টাকে সবেগে ঘোরানো হয়। এই ঘূর্ণনের ফলে ইণ্ডাক্‌সনের ↑ প্রভাবে আর্মেচারে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। আর্মেচার থেকে এই তড়িৎ-শক্তি তড়িৎ-পরিবাহী তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। বিভিন্ন পাওয়ার স্টেশনে বিভিন্ন রকম ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ডায়াথার্মানাস যে-সব পদার্থের ভিতর দিয়ে তাপ-রশ্মি অবাধে প্রবাহিত হয়, যেমন—কোয়ার্টজ ↑ ও ফ্লোরস্পার ↑ ; কিন্তু আলোক-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ হলেও কাচের ভিতর দিয়ে তাপ-রশ্মি যায় না, একে বলে **অ্যাডায়াথার্মানাস**।

ডায়াফোরেটিক—ঘর্ম-নিঃসরণকারী ঔষধ ; যে-সব ঔষধ ব্যবহারে রোগীর অত্যধিক ঘাম হয়।

ডায়েস্টেজ — গম, বালি প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত এক রকম এন্‌জাইম ↑ পদার্থ ; যা শ্বেতসারকে শর্করায় রূপান্তরিত করে। ওই সব খাদ্য-শস্যের মণ্ড করে বিশেষ ব্যবস্থায় গাঁজিয়ে (ফার্মেণ্টেসন ↑) নিয়ে পরে শুকিয়ে ফেললে **মল্ট** তৈরি হয়। এই মল্টের মধ্যে থাকে ডায়েস্টেজ। বিশেষ ব্যবস্থায় মল্টকে পুনরায় গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুতের সময়ে ওর ডায়েস্টেজ অংশ মল্টের প্রধান উপাদান স্টার্চ ↑, বা শ্বেতসার অংশকে **মল্টোজ** ↑ নামক শর্করায় পরিবর্তিত করে ফেলে।

ডাল্‌টন, জন — বৃটিশ রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্‌ ; জন্ম ক্যাম্বারল্যাণ্ডে 1766 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1844 খৃস্টাব্দ। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে গণিত ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বর্ণ-অন্ধত্ব (কালার ব্লাইণ্ড-নেস) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ। পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধীয় মতবাদের (ডাল্‌টন্‌স 'অ্যাটমিক থিয়োরি' ↑) জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন (অ্যাটমিক ওয়েট ↑) নির্ধারণে চিরস্মরণীয় কীর্তি।

ডাল্‌টনিজ্‌ম — লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য নির্ধারণের অক্ষমতা ; বিশেষ এক প্রকার বর্ণান্ধতা।

ডালটন্‌স অ্যাটমিক থিওরি — অ্যাটমিক থিওরি ↑ ।

ডালেন, নিল্‌স গুস্তভ — সুইডেন-বাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম স্টেন্‌স্টপে 1869 খৃঃ, মৃত্যু 1937 খৃঃ। বিভিন্ন যন্ত্র উদ্ভাবনে কৃতিত্ব। বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও 1930 খৃঃ 'লাইট হাউস' ও সামুদ্রিক বিপদ-সংকেতযানে ব্যবহারোপযোগী স্বয়ংক্রিয় বাতি আবিষ্কার। দুগ্ধ দোহন যন্ত্র ও বায়ু-সংকোচক (কম্প্রেসন পাম্প ↑) যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন। পদার্থ-বিজ্ঞানে 1912 খৃঃ 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন।

ডারুইন, চার্লস — বৃটিশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1809 খৃঃ, মৃত্যু 1882 খৃঃ। বাল্যে ছিলেন শিক্ষা-বিমুখ, কিন্তু চিন্তাশীল। ধর্মযাজকের পেশা অবলম্বনের জন্যে কৈশোরে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রেরণায় দীর্ঘকাল সমুদ্রভ্রমণ। জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ গবেষণা ও মতবাদ গঠন। জীবের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে ডারুইনের

মতবাদ হলো : জীবমাত্রেরই মূল উৎস এক ; কেবল পারিপার্শ্বিকতা, জৈব প্রয়োজন, জীবন যুদ্ধের প্রতিযোগিতা প্রভৃতির প্রভাবে কালক্রমে বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হয়েছে। মূলতঃ একেই সাধারণভাবে বলে ডারুইনের 'অভিব্যক্তিবাদ' (থি ও রি অব ইভোলিউসন ↑)।

ডিউ পয়েণ্ট — যে উষ্ণতা, বা তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমতে সুরু করে এবং জলে পরিণত হয়ে শিশির সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বাতাসে যে-পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে, তাপ কমে গেলে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্পেই ওই বাতাস অত্যধিক সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে, ফলে অতিরিক্ত বাষ্প জলে পরিণত হয়। শীতের রাত্রে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে মোটামুটি এ-জন্যেই শিশিরপাত হয়।

ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক — এক রকম কাঁচ পাত্র, যার মধ্যে রেখে কোন পদার্থের উষ্ণতা বহুক্ষণ বজায় রাখা যায়। এর মধ্যে ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে, গরম জিনিস গরম থাকে — বাইরের তাপে ভিতরের জিনিসের তাপ সহসা পরিবর্তিত হয় না। এ রকম পাত্রকে সাধারণ কথায় বলে **থার্মো-ফ্ল্যাস্ক** ↑ । এর কৌশলটা হলো : পাত্রটার গায়ে থাকে দুটা দেওয়াল, দুই দেয়ালের
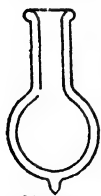
ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক

মাঝখানটা থাকে বায়ুশূন্য। এভাবে বাইরের বায়ুর সংস্রব-শূন্য হওয়ায় ভিতরের উত্তাপ পরিবাহিত বা বিকিরিত হয়ে জিনিসটার তাপ সহজে পরিবর্তিত হতে পারে না। আবার ভিতরের পাত্রটার বহির্গাত্রে পারদ-ঘটিত একটা আস্তরণ দেওয়া থাকায় তাপের বিকিরণ অনেকটা কম হয়। পাত্রটার মুখে মোটা কর্কের একটা ছিপি আঁটা থাকে। ব্যবহারের সুবিধার জন্যে সাধারণতঃ এরূপ কাঁচপাত্র একটা টিনের খোলের মধ্যে এঁটে বসানো থাকে।

ডিওডিনাম — পাকস্থলীর নিচের দিকে বৃহদন্ত্রের সংযোজক প্রায় এক ফুট অংশ, বৃহদন্ত্রের উর্ধাংশের যে নল-পথে ভুক্ত খাদ্য পাকস্থলী থেকে বৃহদন্ত্রে যায়।

ডিককৃসন — উদ্ভিজ্জ পদার্থের ক্বাথ। ভেষজ-গুণসম্পন্ন লতা-পাতা জলে সিদ্ধ করে তার যে ক্বাথ, বা নির্যাস তৈরী হয়। এরূপ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ক্বাথ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন কবিরাজী পাচনগুলো সব এরূপ পদার্থ।

ডি ক ম্পো জি স ন — যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলোর পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, বিভিন্ন কৌশল ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এরূপ করা সম্ভব হয়। যেমন, মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করলে যৌগিকটার 'ডিকম্পোজিসন' ঘটে, অর্থাৎ তার উপাদান মার্কারি (পারা) ও অক্সি-

জেন গ্যাস পৃথক (ডিকম্পোজড্) হয়ে যায়।

ড্রিকার অ্যাপারেটাস — আয়রন-লাংস ↑ ।

ডিকেড — দশ বছর, দশক ; যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হলো 1900 থেকে 1910 সাল পর্যন্ত।

ডিগ্রি — বিভিন্ন পরিমাপের আংশিক একক-পরিমাণ ; যেমন—থার্মো-মিটারের ↑ ডিগ্রি পরিমাপ ; বিভিন্ন স্কেলে (ফারেনহিট ↑, সেন্টিগ্রেড ↑ ও রুমার ↑) উষ্ণতার নির্দিষ্ট ভগ্নাংশিক মাপ ; 98·4°F, 100°C ইত্যাদি। আবার জ্যামিতিক কোণের পরিমাপ, এক সমকোণ= 90° ডিগ্রি ; এক সমকোণের 1/90 অংশ হলো এক ডিগ্রি কোণ।

ডিজেল, রুডল্‌ফ — প্রখ্যাত জার্মান যন্ত্র-বিজ্ঞানী ; প্যারিসে প্রবাসী জার্মান-পরিবারে জন্ম 1858 খৃঃ, মৃত্যু 1912 খৃঃ। অন্তর্দাহী (ইন্টার-ন্যাল কম্বাস্‌সন ↑) ইঞ্জিনের আবি-ষ্কারক, যা 'ডিজেল ইঞ্জিন' নামে খ্যাত। ইংলণ্ড যাত্রাপথে জাহাজে নিখোঁজ, মৃত্যু রহস্যাবৃত।

ডিজেল ইঞ্জিন — বিশেষ ধরণের ইন্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন ↑ ; যা ভারী তেল পুড়িয়ে চালানো হয়। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের মত এতে ইলেক্ট্রিক স্পার্কের ↑ সাহায্যে তেল জ্বালানো হয় না। এর ইঞ্জিনের আবদ্ধ কক্ষে প্রচণ্ড চাপে বাতাস উত্তপ্ত করে তোলা হয়, তারপরে কৌশলে তার মধ্যে সূক্ষ্ম ধারায় সজোরে তেল প্রবেশ করিয়ে তাকে বাষ্পায়িত করা হয়। আবদ্ধ কক্ষের ঐ চাপিত বায়ুর উত্তাপে এই বাষ্পায়িত তেল জ্বলে ওঠে, আর এর ফলে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল চাপে ইঞ্জিনে গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়।

ডিটোনেটিং গ্যাস — দু'ভাগ হাই-ড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। এর মধ্যে সামান্য অগ্নি সংযোগ বা তড়িৎ-স্ফুরণ করলে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গ্যাস দুটার রাসায়নিক মিলন ঘটে, উৎপন্ন হয় জল। রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থের মত এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণ 'ডিটোনেট' করে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

ডিটোনেটর — মার্কারি-ফুলমিনেট ↑ ও অন্যান্য যে-সব সহজ বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থে অতি দ্রুত বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হয়। রাইফেল, বন্দুক প্রভৃতির কার্তুজের মাথায় এ-রকম পদার্থ দেওয়া থাকে। প্রথমে এরূপ পদার্থের বিস্ফোরণের ফলেই পরে কার্তুজের বারুদও বিস্ফোরিত হয়ে থাকে।

ডিক্যান্টেসন — কঠিন ও তরল পদার্থের কোন সংমিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থটাকে পৃথক করে ফেলবার একটা সহজ প্রক্রিয়া। পরিস্রাবণ (ফিল্‌ট্রেসন ↑) প্রক্রিয়ার বদলে

সংমিশ্রণটা স্থিরভাবে রেখে দিলে মিশ্রিত অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ সব থিতিয়ে তলায় জমে, উপর থেকে তরল পদার্থটা সাবধানে ঢেলে নেওয়া যায়। এ-প্রক্রিয়া মিশ্রণের ক্ষেত্রেই খাটে। কঠিন পদার্থ টা তরল পদার্থের মধ্যে দ্রবীভূত থাকলে এভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় না।

ডিপোলারাইজার — বৈদ্যুতিক সেলের ↑ 'পজিটিভ প্লেট', বা ধন-তড়িদ্বারের উপর গ্যাস জমে গিয়ে তড়িৎ উৎপাদন অনেক সময় হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে বলে সেলের **পোলারিজেসন**, যেমন, জিঙ্ক-কপার সেলের মধ্যে কপার (তামা) প্লেটের উপর হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা আস্তরণ পড়ে গিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করে ফেলে। তড়িৎ উৎ-পাদনের এরূপ বাধা দূর করবার জন্যে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদের বলে ডিপোলারাইজার; যেমন, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) সাধারণ ড্রাই-সেলে ↑ ডিপোলারাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডিনামাইট — বিশেষ এক প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ। 'কিসেলগার' নামক ছিদ্রবহুল এক রকম বালি-মাটির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন ↑ নামক তরল বিস্ফোরক পদার্থ মিশিয়ে তৈরী হয়। সাধারণতঃ ডিনামাইটের বিস্ফোরণে পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে বিদীর্ণ করে সুরঙ্গ-পথ তৈরী করা হয়ে থাকে।

ডিফ্র্যাক্সন — আলোক-রশ্মির অপ-বর্তন। সাধারণ আলোকরশ্মির তরঙ্গ-প্রবাহ কোন অস্বচ্ছ পদার্থে বাধা পেলে সামান্য বেঁকে যায়। ওই বাধাপ্রাপ্ত রশ্মিকে কৌশলে কোন পর্দার উপর ফেললে বিভিন্ন বর্ণের এক রকম বর্ণালির (স্পেক্ট্রাম ↑) সৃষ্টি করে। কোন রঙীন (এক-বর্ণী) রশ্মি হলে এরূপ অবস্থায় পর্দার উপরে পর্যায়ক্রমে কালো রেখার সঙ্গে ওই বর্ণের রেখা ফুটে ওঠে। আলোক-তরঙ্গের এই গতি-প্রকৃতিকে ডিফ্র্যাক্সন বা অপবর্তন বলে। কেবল আলোক-তরঙ্গ নয়, অন্যান্য তরঙ্গের বেলায়ও এরূপ অপবর্তন দেখা যায়।

ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং — আলোকরশ্মি, বা অন্য কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহকে তার বিভিন্ন সংগঠক তরঙ্গমালায় বিশ্লিষ্ট করে ফেলবার
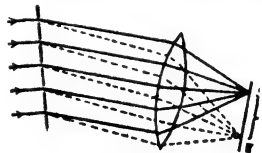
ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং

যন্ত্রবিশেষ। এর ফলে প্রাথমিক তরঙ্গ বিভিন্ন তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে বর্ণালির সৃষ্টি করে। এ-জন্যে সাধারণতঃ এক খণ্ড কাঁচের উপরে সমদূরবর্তী

ও সমান্তরালভাবে অসংখ্য দাগ কাটা হয় ; প্রতি ইঞ্চিতে 14,000 থেকে 20,000 পর্যন্ত এরূপ সূক্ষ্ম দাগ কাটা হয়ে থাকে। এর উপরে ফেললে প্রা থ মি ক রশ্মির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলো ওই অতি সূক্ষ্ম কাটা-দাগের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এর ফলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি করে, আর পর্দার উপরে বর্ণালি ফুটে ওঠে। কোন রশ্মি বা তরঙ্গ-প্রবাহ কিরূপ বিভিন্ন তরঙ্গের সমবায়ে গঠিত, তা এই কৌশলে ধরা যায়। কাঁচের বদলে অনুরূপ দাগ-কাটা ধাতব পাতও ব্যবহার করা যায় ; প্রতিসরণের বদলে এর উপরে তরঙ্গমালা প্রতিফলিত হয়ে বর্ণালির সৃষ্টি করে। একে তখন বলে **রিফ্লেকসন গ্রেটিং**। এরূপ দাগ-কাটা কাঁচ বা ধাতব পাত সমতল অথবা অবতল দু'রকমেরই ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিষ্টিলেসন — পাতন পদ্ধতি, যাকে বলে 'চোলাই করা'; যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থকে উপযুক্ত তাপ প্রয়োগে বাষ্পীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে পুনরায় তার তাপ কমিয়ে তরল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে বিশুদ্ধ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বলে 'ডিষ্টিলেট'। অবিশুদ্ধ তরল পদার্থ এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ বা বিশোধিত করা হয়। উদ্বায়ী পদার্থ মিশ্রিত থাকলে অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় কাজ হয় না। আবার বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল পদার্থ মিশ্রিত থাকলেও এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৌশলে তাদের আলাদা করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে 'ফ্রাক্সন্যাল ডিষ্টিলেসন' ↑ বলে।

ডিহাইড্রেসন — জলশূন্য করা, বা বিশুষ্কীকরণ; যেমন—ডিম বা দুধ থেকে যান্ত্রিক কৌশলে জলীয় অংশ সম্পূর্ণ দূর করে দিলে চূর্ণ পাওয়া যায় ; যেমন, মিল্ক পাউডার ও এগ্ পাউডার (সেন্ট্রিফ্যুগাল ↑ মে সি ন)। সাধারণতঃ স্বাভাবিক উষ্ণতায় কোন বায়ুশূন্য (ভ্যাকুয়াম ↑). পাত্রে রেখে খাদ্যাদির নির্জলীকরণই বুঝায়, যাতে খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক স্বাদ বজায় থাকে। (অ্যান্হাইড্রাস ↑)

ডি. ডি. টি.—কীটপতঙ্গ-নাশক এক রকম রাসায়নিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম ; এর পূর্ণ নাম হলো, 'ডাই-ক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রা ই ক্লো রো-ইথেন'। সাদা গুঁড়া, সামান্য সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ নাশক রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। একে আবার কখন কখন 'ডিকোফেন'ও বলা হয়।

ডেক্সট্রিন — সামান্য কিছু অ্যাসিড মিশিয়ে শ্বেতসার পদার্থ জলে ফুটালে যে আঠালো বস্তু পাওয়া যায়। একে **ষ্টার্চ গাম**-ও বলা হয়।

শ্বেতসার (স্টার্চ ↑) পদার্থের আংশিক হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন কার্বো-হাইড্রেট ↑ শ্রেণীর উপাদানের সংমিশ্রণে জিনিসটা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ডাকটিকেট, খাম প্রভৃতিতে এ-জাতীয় উৎকৃষ্ট গাম বা আঠা লাগানো হয়।

ডেক্স্ট্রোজ — পাকা ফলের সুমিষ্ট রস থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার শর্করা, বা চিনি, যেমন, গ্রেপ সুগার ↑ । রাসায়নিক হিসেবে এটা উদ্ভিজ্জ গ্লুকোজ ↑ বিশেষ।

ডেকাপোডা — দশটি পদবিশিষ্ট প্রাণী ('ডেকা' মানে দশ), যেমন — কাঁকড়া।

ডেকাপোডা

ডেট্ লাইন — ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্ লাইন ↑ ।

ডেন্সিটি — বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ। কোন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনে কি-পরিমাণ বস্তু বর্তমান আছে তা এর এককে প্রকাশ করা হয়। কোন পদার্থের এক ঘন সেণ্টিমিটার ↑ (সি. সি) আয়তনে যত গ্র্যাম ↑ বস্তু রয়েছে তাই হলো পদার্থটার ডেন্সিটি। এ-হিসাবে কোন পদার্থের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ ও ডেন্সিটি সংখ্যাগতভাবে একই হয়ে থাকে।

ডেভি, স্যার হাম্‌ফ্রে — বৃটিশ রাসায়নিক ; কর্নওয়ালে জন্ম 1778 খৃঃ, মৃত্যু 1829 খৃঃ। লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে সুদীর্ঘকাল রসায়নের অধ্যাপক। যৌবনেই 'নাইট্রাস অক্সাইড' (লাফিং গ্যাস ↑) আবিষ্কার। হীরক ও অঙ্গারের রাসায়নিক অভিন্নতা প্রতিপাদন। কয়লাখনির অভ্যন্তরে 'ফায়ার ড্যাম্প' ↑ গ্যাসের বিস্ফোরণে জাত দুর্ঘটনা নিবারণের উদ্দেশ্যে 'নিরাপদ বাতি' (ডেভিজ্ সেফ্‌টি ল্যাম্প ↑) উদ্ভাবনেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন।

ডেভি ল্যাম্প — বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রে ডেভি কয়লার খনির মধ্যে নিরাপদে ব্যবহারের উপযোগী যে বাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। একে 'ডেভিজ্ সেফ্‌টি ল্যাম্প'ও বলা হয়। কয়লার খনির মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন দাহ্য গ্যাস প্রচ্ছন্ন থাকে, অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এলেই এগুলো জ্বলে উঠে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিপদ নিবারণের জন্যে ডেভির উদ্ভাবিত এরূপ ল্যাম্পের বৈশিষ্ট্য হলো, এর আলোক-শিখা একটা লোহার জালের চিম্‌নির মধ্যে জ্বলে। দাহ্য গ্যাস ভিতরে ঢুকলে জ্বলে ওঠে সত্য, কিন্তু সে অগ্নিশিখা সহজে

ডেভি ল্যাম্প

জালের বাইরে ছড়াতে পারে না; কারণ ওই ধাতব জাল উত্তাপ টেনে নেয়, বাইরের গ্যাস সহসা জ্বলে ওঠার মত উত্তপ্ত হতে পায় না।

ডেল্‌টা রে—অপেক্ষাকৃত মন্দ গতির ইলেকট্রন কণিকার ধারা-প্রবাহ। অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থের উপর আলফা রশ্মি ↑ পড়লে এরূপ ডেল্‌টা রশ্মির অর্থাৎ বিশেষ এক কণিকা-ধারার উৎপত্তি হয়। এই ডেল্‌টা কণিকার ধারা (বা রশ্মি) আল্‌ফা কণিকার প্রবাহ-পথের লম্বভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। মূলতঃ আল্‌ফা কণিকা হলো হিলিয়াম ↑ গ্যাসের পরমাণু-কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস।

ডেল্‌টা মেটাল—একটি সংকর ধাতু; এটা সাধারণতঃ 55% তামা, 43% দস্তা, সামান্য কিছু লোহা ও অপরাপর ধাতু মিশিয়ে তৈরী হয়।

ডেলিকোয়েসেণ্ট — যে-সব পদার্থ বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই জলে দ্রবিত হয়। খোলা হাওয়ায় রাখলে ডেলিকোয়েসেণ্ট পদার্থ সব এভাবে ক্রমে দ্রবিত হয়ে পড়ে।

ডেসিকেটর — বিভিন্ন পদার্থ বিশুষ্ক রাখবার জন্যে রসায়নাগারে ব্যবহৃত এক রকম কাঁচপাত্র। বিশেষতঃ ডেলিকোয়েসেণ্ট ↑ পদার্থ বিশুষ্ক রাখবার জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচের পাত্রটার মুখে থাকে বায়ু-রোধক ঢাকনা; তলদেশে ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5,) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) প্রভৃতি হাইগ্রোস্কোপিক ↑ (জল শুষে নেয়, এমন) পদার্থ দেওয়া থাকে।

ডেসিকেটর

ডেসট্রাকটিভ ডিষ্টিলেসন—আবদ্ধ পাত্রে বায়ুশূন্য অবস্থায় কোন পদার্থ অত্যুত্তপ্ত করে তার রাসায়নিক বিয়োজন সাধন করবার প্রক্রিয়া; যার ফলে ওই পদার্থের বিভিন্ন উপাদান চোলাই (ডিষ্টিলেসন ↑) হয়ে পৃথক হয়ে যায়। কয়লা থেকে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোল-গ্যাস ↑, আলকাতরা (কোলটার ↑) প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এভাবে কাঠ চোলাই করে মিথাইল অ্যাল্‌কোহল ↑, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায়।

ড্রপ্‌সি — অস্বাভাবিক জলাধিক্য রোগ; সাধারণতঃ রক্তহীনতার ফলে দেহের কোন বিশেষ অঙ্গে চামড়ার তলায় বা মাংসপেশীর মধ্যে জল জমে যায়, যেমন—শোথ, উদরী, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগে হয়ে থাকে।

ড্রসোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের কতটা

জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জল-কণায় পরিণত হয় (শিশির, কুয়াশা) তার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ড্রসোফিলা — এক রকম ফলের পোকা বা পতঙ্গ বিশেষ; ফলের মধ্যেই এরা জন্মায়। বংশানুবৃত্তির (হেরিডিটি ↑) পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক সময় এরা ব্যবহৃত হয়।

ড্রাই ব্যাটারি — তড়িৎ উৎপাদনের জন্যে যে-সব ব্যাটারি ↑, বা সেলে ↑ বিক্রিয়ক রাসায়নিক পদার্থগুলি জল-শূন্য শুষ্ক অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, যেমন—সাধারণ টর্চের ব্যাটারি। অধিকাংশ ব্যাটারিতে রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণই ব্যবহৃত হয়; যাদের বলে 'ওয়েট ব্যাটারি'।

ড্রাই আইস — অত্যধিক চাপিত অবস্থায় উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তরল হয়ে যায়। সহসা সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই তরল পদার্থের তাপ আরও হ্রাস করলে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বলে 'ড্রাই-আইস'। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো এই যে, পদার্থটা কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তরল হয় না। রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি হিমায়ক যন্ত্রে অনেক সময় ড্রাই-আইস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ড্রাই সেল — তড়িৎ-শক্তির উৎপাদক এক প্রকার ব্যাটারি ↑ বিশেষ। এর মধ্যে কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না; এ-জন্যেই একে ড্রাই (শুষ্ক) সেল বলে। 'লেক্-

ল্যাক্ল্যান্স ড্রাই সেল
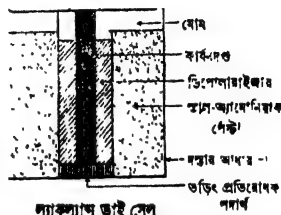
ল্যান্স সেল' ↑ এরূপ। জিঙ্কের তৈরী খোলের মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের এক রকম কাই ইলেকট্রোলাইট ↑ হিসেবে ভরতি থাকে; আর ভিতরে থাকে একটা কার্বন-দণ্ডের ইলেকট্রোড ↑। ডিপোলারাইজার ↑ হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, MnO_2, ব্যবহৃত হয়। টর্চের ব্যাটারি সাধারণতঃ এরূপ এক রকম ড্রাই-সেল মাত্র।

ড্রেজার — মাটি কাটা ও খনন করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। এরই বিশেষ এক রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থায় জলের তলা থেকে কাদা-মাটি তুলে ফেলে জলপথের গভীরতা বৃদ্ধি করা যায়।

জমি সমতলকারী ড্রেজার

থ

থাইমল — ফেনল ↑ জাতীয় একটি জৈবরাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{14}O$; সাদা, স্ফটিকাকার, সামান্য গন্ধযুক্ত। বিশেষ উদ্ভিজ্জ তেল থেকে পাওয়া যায়। পদার্থটার কিছু ভেষজ গুণ এবং বীজাণু-প্রতিরোধক শক্তিও সামান্য কিছু আছে।

থাইমাস গ্ল্যাণ্ড — শিশুদের বক্ষাস্থির ঠিক নিচে অবস্থিত একটি বিশেষ জৈব গ্রন্থি। নবজাত শিশুর এই গ্ল্যাণ্ডটি ↑ দু' বছর বয়সের পরে ক্রমে ছোট হতে থাকে, প্রায় 13 বছর বয়সে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয়, শৈশবে দেহের বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই এর কাজ শেষ হয়, পরবর্তী বয়সের শ্লথ বৃদ্ধির জন্যে আর এর দরকার হয় না।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড — গল-দেশের নিম্নভাগে সামনের দিকে থাকে এই জৈব গ্রন্থিটি। এর মধ্যে খাদ্যের আয়োডিন ↑ উপাদান এসে জমে এবং **থাইরক্সিন** নামক হর্মোন ↑ সৃষ্টি হয়, যা দেহের বৃদ্ধি ও শক্তি লাভের বিশেষ সহায়ক। এই গ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তার ফলে উপযুক্ত

পরিমাণ থাইরক্সিনের অভাবে দেহের বৃদ্ধি ও মনের বিকাশ শ্লথ হয়ে পড়ে। গলগণ্ড রোগে এই গ্ল্যাণ্ডটি দূষিত হ:য় অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।

থার্ম — উত্তাপ পরিমাপের একক বিশেষ; প্রায় 56 গ্যালন ↑ বরফ-জল যে পরিমাণ তাপের প্রয়োগে ফুটে ওঠে, তাকে বলে এক থার্ম, প্রায় 252 লক্ষ ক্যালোরির ↑ সমান। আবার এক থার্ম হলো এক লক্ষ 'বৃটিশ-থার্মাল-ইউনিট,' সংক্ষেপে বি. টি. ইউ (B. T. U)। আবার সাধারণভাবে তাপের পরিমাণ বা শক্তি বুঝাতেও 'থার্ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'থার্মাল' মানে, তাপ সম্বন্ধীয়। কোন পদার্থের থার্মাল ক্যাপাসিটি বললে বুঝতে হবে, যে পরিমাণ তাপ-শক্তির (যত বৃটিশ-থার্মাল ইউনিটের) প্রয়োগে সেই পদার্থের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাত্র বৃদ্ধি পায়।

থার্ম্যাল নিউট্রন — অতি ধীরগতি এবং তদনুযায়ী অত্যল্প শক্তিবিশিষ্ট নিউট্রন ↑ কণিকা। 'অ্যাটমিক পাইল' ↑ যন্ত্রে নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় ডয়েটেরন (হেভি হাইড্রোজেন ↑) ও গ্রাফাইট মডারেটরের প্রতিক্রিয়ায় অনেক সময় এই 'থার্ম্যাল নিউট্রন' কণিকার উদ্ভব হয়ে থাকে।

থার্মিট — অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ এবং আয়রন-অক্সাইডের সংমিশ্রণে গঠিত পদার্থ। একে **থার্মাইট**-ও বলা হয়।

এই সংমিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আয়রন-অক্সাইড থেকে মুক্ত অক্সিজেন অ্যালুমিনিয়ামের দহনকার্যে সহায়তা করে; আর, এর ফলে উৎপন্ন তাপে আয়রন (লোহা) গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে এভাবে গলিত লোহায় যন্ত্রাদির ভাঙ্গা অংশ জুড়ে (ওয়েল্ডিং ↑) মেরামত করা যায়।

থার্মোআয়নিক্স — উত্তাপের ফলে কোন-কোন পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রন ↑ কণিকার ধারা-প্রবাহ, বা রশ্মি নির্গত হয়। বস্তুতঃ এটা আয়ন ↑ কণিকার (ক্যাটায়ন ↑) ধারা। এর মধ্যে বিজ্ঞানের বহু জটিল তথ্য নিহিত রয়েছে। এতৎসম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির গবেষণাকে বলে থার্মোআয়নিক্স।

থার্মো-ইলেক্ট্রিসিটি — তাপশক্তি সরাসরি তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের মধ্যে তাপমাত্রার বৈষম্যের ফলে থার্মোকাপ্‌ল ↑, থার্মোপাইল ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে এই থার্মোইলেক্ট্রিসিটির উদ্ভব হয়ে থাকে।

থার্মোকাপ্‌ল — পদার্থের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের এক রকম যন্ত্র বিশেষ। দুটা বিভিন্ন ধাতব তারের (যেমন, তামা ও লোহা) দুই প্রান্ত জুড়ে নিয়ে দু-জায়গায় লাগানো হয়। ওর এক জায়গার উষ্ণতা যেন মাপতে হবে, অপর জায়গা তাহলে হতে হবে অপেক্ষা-

থার্মোকাপ্‌ল (তথ্যগত চিত্র)
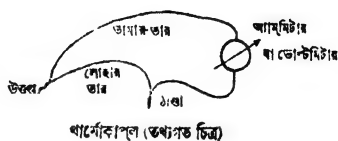
কৃত নিম্নতাপযুক্ত, অর্থাৎ ঠাণ্ডা, এবং এর উষ্ণতা জানা থাকা চাই। ওই দুই স্থানের তাপের বিভিন্নতার জন্যে ওই সংযোজক তারের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হবে। এরূপে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তিকে বলা হয় **থার্মোইলেক্ট্রিসিটি**, বা তাপ-বিদ্যুৎ। একটা তারের কোথাও কেটে তার দুই প্রান্ত গ্যালভ্যানোমিটারের ↑ সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই তড়িৎ-প্রবাহ মাপা যায়। এর ভোল্টেজ ↑ জেনে ওই দুই স্থানের তাপ-বৈষম্যও হিসাব করে জানা যেতে পারে। এভাবে এক স্থানের উষ্ণতা জানা থাকায় অপর স্থানের উষ্ণতা সহজেই নির্ধারিত হয়।

থার্মোকেমিষ্ট্রি — বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপের তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে কখন তাপ উদ্ভূত হয়, কখন বা আবার তাপ হ্রাস পায় (এক্সোথার্মিক ↑ এণ্ডোথার্মিক ↑)। এরূপ তাপ-

শক্তির পরিমাণ ও তথ্যাদি হলো থার্মোকেমিস্ট্রির আলোচ্য বিষয়।

থার্মোগ্রাফ — এক রকম তাপমান যন্ত্র; এর সাহায্যে কোন পদার্থের উষ্ণতার বিভিন্নতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদার্থের উষ্ণতার যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা এ-রকম যন্ত্রে চিত্ররেখায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং তা দেখে বিভিন্ন সময়ে তার উষ্ণতার পরিমাণ সহজেই জানা যেতে পারে।

থার্মো-ডাইনামিক্স — উত্তাপের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি, তড়িৎ-শক্তি প্রভৃতি যে-সব বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় তার নিয়ম ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় গাণিতিক বিজ্ঞান।

থার্মো-পাইল—কোন উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মি (রেডিয়েশন ↑) পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ। অ্যান্টিমনি ও বিস্‌মাথ ↑ ধাতুর কতকগুলো দণ্ড একটার পর একটার দুই প্রান্ত পরস্পর জুড়ে এ-যন্ত্র তৈরী হয়। এভাবে প্রকৃতপক্ষে কয়েকটা থার্মোকাপ্‌ল ↑ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। ওই ধাতব দণ্ডগুলো যাতে বিকিরিত তাপরশ্মি সম্যক শোষণ করে নিতে পারে সেজন্যে অনেক সময়ে ওইগুলোর গায়ে ভুষা-কালি মাখানো হয়। বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের এরূপ সংযোগ-প্রান্তগুলো তাপ-রশ্মির অভিমুখে রাখলে থার্মো-ইলেক্‌ট্রিক (থার্মোকাপ্‌ল ↑) প্রবাহের উদ্ভব হয়। এই তড়িৎ-প্রবাহ সূক্ষ্ম গ্যালভ্যানোমিটার ↑ যন্ত্রের সাহায্যে মেপে বিকিরিত তাপের পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

থার্মো-প্ল্যাষ্টিক — যে সকল প্ল্যাষ্টিক ↑ পদার্থ উত্তাপের প্রভাবে প্রয়োজনানুরূপ নমনীয় হয়ে যে-কোন আকার ধারণ করতে পারে এবং ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়। উত্তাপের সাহায্যে এই বিশেষ শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিক পদার্থ বার-বার গলিয়ে নরম করে ফেলা যায়, কিন্তু পদার্থটার স্বকীয় ধর্ম বা গুণের কোনরূপ পরিবর্তন সাধারণতঃ ঘটে না।

থার্মোফ্ল্যাস্ক — ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক ↑ ।

থার্মোমিটার — তাপমান যন্ত্র, যার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ বা উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতঃই বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্নরূপ পরিবর্তন ঘটে; এই পরিবর্তনের হার নির্ধারণ করেই পদার্থটার উষ্ণতারও পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এভাবে গ্যাস-থার্মোমিটার ↑ মার্কারি-থার্মোমিটার, থার্মো-কাপ্‌ল ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের তাপ-পরিমাপক যন্ত্র হতে পারে। সাধারণ থার্মোমিটারে মার্কারি বা পারদ ব্যবহৃত হয়। খানিকটা পারদ একটা ছোট কাঁচ-

গোলকে ভর্তি থাকে ; ওই গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত একটা দাগ-কাটা বন্ধমুখ সরু কাঁচনলের মধ্যে পারদ-সূত্র উষ্ণতা অনুযায়ী ওঠা-নামা করে। উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে ওই কাঁচ-গোলকের পারদ আয়তনে বেড়ে পারদ-সূত্র কাঁচ-নলের মধ্যে উঠে যায়। কাঁচনলের গায়ে দাগ-কাটা ডিগ্রি-স্কেল দেখে উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপণ করা হয়।

থার্মোমিটার

থার্মোমিটার (ক্লিনিক্যাল) — জ্বর হলে দেহের উষ্ণতা নিরূপণের জন্যে যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় ; (ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ↑)।

থার্মোমিটার (গ্যাস) — যে তাপ-মান যন্ত্রে কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে সংলগ্ন পদার্থের উষ্ণতা নির্ধারিত হয়। গ্যাস-থার্মোমিটার দু-রকমের হতে পারে। কোন গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে তাপের তারতম্যে ওর গ্যাসীয় চাপের যে পরিবর্তন ঘটে, অথবা, চাপ স্থির রেখে আয়তনের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা মেপে উষ্ণতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাপমান যন্ত্র হিসেবে এরূপ গ্যাস-থার্মোমিটার তেমন সুবিধাজনক নয় ; এজন্যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। কেবল 'অ্যাবসোলিউট টেম্পারেচার' ↑ স্থির করবার জন্যে এর ব্যবহার আছে।

থার্মোমিটার (ম্যাক্সিমাম্ অ্যাণ্ড মিনিয়াম্)—এক রকম বিশেষ ধরণের তাপমান যন্ত্র ; যাতে বিভিন্ন সময়ে কোন বস্তুর উচ্চতম ও নিম্নতম উষ্ণতা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এ-রকম তাপমান যন্ত্রে কাঁচ-গোলকের মধ্যে অ্যালকোহল ↑ ভরতি থাকে, তার উপরে (কাঁচ-নলের অভ্যন্তরে) সামান্য পারদ দেওয়া হয়। উত্তাপে অ্যালকোহল আয়তনে বাড়ে, আর তার চাপে পারদটুকু কাঁচের সরু নল-পথে উঠে যায়। কাঁচ-নলের ওই পারদ-সূত্রের দু'দিকে লোহার দুটা ছোট টুকরা দেওয়া থাকে, যাকে বলে 'ইণ্ডেক্স'। তাপ-বৃদ্ধির ফলে ওই পারদ-সূত্র ইণ্ডেক্সটাকে ঠেলে উপরে তোলে ; আর তাপ কমলে পারদ-সূত্র নেমে যায়, আর ইণ্ডেক্সটা সেখানে আটকে থাকে। নলের গায়ে ডিগ্রি-স্কেলের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে এর অবস্থান দেখে উচ্চতম (ম্যাক্সিমাম) তাপমাত্রা স্থির করা যায়। পারদ-সূত্রের নিম্নবর্তী অপর ইণ্ডেক্সটা যেখানে থেকে যায় সেখানকার স্কেল দেখে নিম্নতম (মিনিমাম্) তাপমাত্রা বুঝা যায়।

(পারদ নলের অংশমাত্র অঙ্কিত)
ম্যাক্সিমাম্ মিনিমাম্ থার্মোমিটার

থার্মোস্টাট — কোন আবদ্ধ স্থানের বা আধারের উষ্ণতা স্থির রাখবার জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম যন্ত্র।

ইনকুব্যেটর ↑, রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ তাপ এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণতায় স্থির রাখা হয়। উত্তপ্ত হলে ধাতব পদার্থ মাত্রই আয়তনে বাড়ে, কিন্তু সব ধাতু সমান বাড়ে না। একই উত্তাপে লোহা এবং পিতলের আয়তন-বৃদ্ধির পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে; পিতল বাড়ে বেশি। এখন লোহা ও পিতলের দুটা দণ্ডের দুই প্রান্ত জুড়ে একসঙ্গে বাঁকিয়ে চিত্রে প্রদর্শিত আকারে সংলগ্ন করা হয়। কোন আবদ্ধ স্থানের অধিক উষ্ণতায় এর পিতলের দণ্ডটা অপেক্ষাকৃত বেশি বেড়ে গিয়ে সোজা হতে চায়, ফলে নিচের অংশ একটু ফুলে উঠে 'ঠ' তড়িৎ-দ্বারে লেগে যায়; এর ফলে সংলগ্ন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ তাপ কমতে থাকে। আবার এভাবে যখন উষ্ণতা বেশি হ্রাস পায় তখন পিতলের দণ্ডটার আয়তন কমে গিয়ে যুগ্ম দণ্ডটা বেশী বেঁকে যায়, আর 'উ' তড়িৎদ্বারে লেগে 'ঠ' তড়িৎদ্বার বিযুক্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাপ আবার বাড়তে থাকে। এভাবে ওই আবদ্ধ স্থানের তাপ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী বা কম হতে পারে না, উষ্ণতা মোটামুটি স্থির থাকে। যন্ত্রটা যখন প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উষ্ণতায় থাকে তখন যুগ্ম দণ্ডটা 'উ' বা 'ঠ' কোন তড়িৎ-দ্বারেই লাগে না; ফলে উষ্ণতার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটাবার যান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিষ্ক্রিয় থাকে।

থার্মোস্টাট

থার্মোল — যে-সব যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় বস্তুর উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) মাপা যায়; যেমন—থার্মোকাপল ↑ প্রভৃতি।

থার্মোসাইফন—যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন আধারের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক নল দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢোকে, অন্য নল দিয়ে গরম জল বেরিয়ে আসে, কিন্তু আধারটি কখন বেশি উত্তপ্ত হয় না। মোটর গাড়ীর রেডিয়েটর ↑ ঠাণ্ডা রাখতে এই ব্যবস্থা থাকে। জলের এই চলাচল আপনা থেকে সাইফন ↑ ব্যবস্থায় ঘটে, কোন পাম্প লাগে না।

থায়ো-অ্যাসিড — সালফার (গন্ধক) সমন্বিত অ্যাসিডের বিশেষ নাম। এই শ্রেণীর অ্যাসিড সাধারণ অ্যাসিডের অক্সিজেনের স্থলে বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে সাল্‌ফার-পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়; যেমন—কার্বনিক অ্যাসিড, H_2CO_3; কিন্তু থায়োকার্বনিক অ্যাসিড হলো H_2CS_3.

থিওব্রোমিন — কেফিনের ↑ প্রায় অনুরূপ গুণবিশিষ্ট একটি রাসায়নিক পদার্থ; এর আরামদায়ক ও কিছু

উত্তেজক গুণের জন্যে চকোলেটে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

থিলিয়াম — জৈব কোষের স্তর, যেমন —**এপিথিলিয়াম** হলো কোন জৈব পদার্থের উপরিভাগে বিন্যস্ত কোষ-স্তর; আর **মেসোথিলিয়াম,** মধ্যবর্তী স্তর, এবং **হাইপো-থিলিয়াম,** নিম্নবর্তী স্তর।

থিয়োডোলাইট — দূরবর্তী কোন বস্তু বা স্থানের কৌণিক ব্যবধান পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ; জমি জরিপ করবার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান অংশ হলো ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী
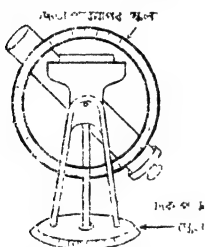
থিয়োডোলাইট (মোটামুটি গড়ন)

জিনিস দেখবার উপযোগী (টেরেস্ট্রি-য়াল) একটা টেলিস্কোপ ↑, যেটাকে ডিগ্রি-চিহ্নিত একটা গোলাকার স্কেলের উপর ঘুরিয়ে দূরের বস্তু লক্ষ্য করা হয়। ওই স্কেলের গায়ে টেলি-স্কোপটার অবস্থান লক্ষ্য করে দৃষ্ট বস্তুর অবস্থানের কৌণিক ব্যবধান নির্ধারিত হয়ে থাকে।

থেরাপিউটিক্স — রোগ নিরাময়ের জন্যে উপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা; রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি।

থোরিয়াম — মৌলিক ধাতু। সাংকেতিক চিহ্ন Th, পারমাণবিক ওজন 232·12, পারমাণবিক সংখ্যা 90; গাঢ় ধূসরবর্ণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। মোনাজাইট ↑ নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে সিরিয়াম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর অক্সাইড (ThO_2) গ্যাস-ম্যান্টেল ↑ তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়।

থোর‍্যাক্স — বক্ষদেশ; **থোর‍্যাক** মানে বক্ষ সম্বন্ধীয়। **থোর‍্যাকো-প্লাষ্টি** — এক অদ্ভুত চিকিৎসা-পদ্ধতি, এতে প্রয়োজনমত বক্ষ-পঞ্জরের এক ধারের অস্থিগুলি (পাঁজরার হাড) কেটে বাদ দেওয়া হয়, যাতে উপরের চাপে সে-দিকের ফুসফুসটা চেপে কুঁচকে যায়, শ্বাসবায়ু নিয়ে আর ফুলতে পারে না। এভাবে রোগগ্রস্ত ফুসফুসটা বিশ্রাম পায় এবং আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। কঠিন যক্ষ্মারোগে এ পদ্ধতি কখন কখন অবলম্বিত হয়ে থাকে।

থ্যালামাস - (উদ্ভিদ সম্পর্কে) বৃন্তের অপেক্ষাকৃত বর্ধিত শীর্ষদেশ, যাকে ঘিরে ফুলের পাঁপড়ি বা দলগুলি জন্মায়। একে ফুলের রিসেপ্টেক্‌ল-ও বলে। (মনুষ্য সম্পর্কে) মগজের (ব্রেন) নিম্নস্থ কাণ্ড-সংলগ্ন ডিম্বাকৃতি পদার্থপিণ্ড দু'টি; দেহের বিভিন্ন নার্ভ ↑, বা স্নায়ুর স্পন্দন এই থ্যালা-মাস পিণ্ডের মাধ্যমে গুরু মস্তিষ্কে (সেরিব্রাম ↑) গিয়ে পৌছায় এবং

অনুভূতি, চিন্তা, কর্ম প্রভৃতির সাড়া জাগায়। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে থ্যালামাসের কার্যকারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

থ্যালিয়াম—মৌলিক ধাতব পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন Tl, পারমাণবিক ওজন 204·39, পারমাণবিক সংখ্যা 81. অনেকটা সীসার মত সাদা ও অপেক্ষাকৃত নরম পদার্থ। সহজেই এর সূক্ষ্ম তার ও পাত করা যায়।

থ্যালাসোফাইট—সামুদ্রিক উদ্ভিদ; সমুদ্রের শৈবাল, লতা, গুল্ম প্রভৃতি। **থ্যালাস** মানে সমুদ্র।

থ্রম্বিন — দেহের কোন স্থান কেটে গেলে কর্তিত পেশী-কোষগুলি থেকে একটা সূক্ষ্ম জৈব-রস নির্গত হয়ে রক্তের **প্রোটোথ্রম্বিন** উপাদানকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। এই থ্রম্বিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় আবার রক্তের ফাইব্রিনোজেন ↑ (যা রক্তে মাত্র $\frac{1}{2}$% থাকে) উপাদান জমে গিয়ে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ হয়ে ওঠে, যার মধ্যে রক্তের জলীয় অংশ শুষে গিয়ে রক্ত জমাট বেধে যায়। দেহের কোন জায়গা কেটে গেলে এভাবে রক্ত জমাট বেঁধে সে-কাটা থেকে রক্ত পড়া স্বভাবতঃই বন্ধ হয়ে যায়।

থ্রম্বোসিস—রোগ বিশেষ। এ-রোগে দেহের কোন রক্তবহা নালি-পথের কোথাও সহসা রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এরূপ জমাট-বাঁধা রক্তে হৃৎপিণ্ডের 'করোনারি আর্টারি' ↑ রুদ্ধ হয়ে গেলে হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচল এভাবে বন্ধ হলে দেহের কর্মশক্তি লোপ পায়, অঙ্গ অসার হয়ে পড়ে। দেহের কোথাও রক্ত এভাবে জমাট বেঁধে যাওয়ার অবস্থাকে বলে **থ্রম্বাস**।

ন

নটিক্যাল মাইল—জাহাজ চলাচলে ব্যবহৃত জলপথের দূরত্বের মাপ বিশেষ, যার পরিমাণ এক ডিগ্রি ল্যাটিচিউডের ↑ ষাট ভাগের এক ভাগ। মোটামুটি 6080 ফুট, বা 1·515 মাইল (সাধারণ)। এই সামুদ্রিক দূরত্বকে আবার কখন কখন **নট**-ও বলা হয়।

নর্ম্যাল সল্ট — কোন বিক্রিয়ক অ্যাসিডের সব কয়টি হাইড্রোজেন-পরমাণু ধাতব পরমাণুর দ্বারা অপসারিত হয়ে যে রাসায়নিক লবণ গঠিত হয়, পূর্ণ-শমিত লবণ; যেমন, সোডিয়াম সাল্‌ফেট, Na_2SO_4; কিন্তু সোডিয়াম বাইসাল্‌ফেট, $NaHSO_4$ নর্ম্যাল সল্ট নয়। একে বলে অর্ধ-শমিত লবণ, অথবা অ্যাসিড সল্ট ↑।

নর্ম্যাল সল্যুসন — এক লিটার ↑ দ্রবণে কোন রাসায়নিক পদার্থের এক গ্র্যাম-ইকুইভ্যালেন্ট ↑ পরিমাণ দ্রবিত থাকলে সেই দ্রবণকে বলে

ন. স.; যেমন — সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ওজন (মলিকুলার ওয়েট ↑) 98, কিন্তু ইকুইভ্যালেণ্ট ওয়েট ↑ হলো 49; সুতরাং এক লিটার দ্রবণে যদি 49 গ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্রবিত থাকে তবে তা হবে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের নর্ম্যাল সলুসন।

নাইটার — সল্ট পিটার ↑. পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3.

নাইট্রাস অক্সাইড — বর্ণহীন, মিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থ, N_2O; গ্যাসটা নাকে গেলে হাসির উদ্রেক করে, এজন্যে একে **লাফিং গ্যাস** ↑ বলা হয়। অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তির জন্যে গ্যাসটা দন্ত-চিকিৎসায় আগে কখন কখন ব্যবহৃত হোত।

নাইট্রাস অ্যাসিড — নাইট্রোজেন-ঘটিত একটি মৃদু অ্যাসিড। নাইট্রোজেন-ট্রাইঅক্সাইড জলে দ্রবিত করলে পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন-পারক্সাইড, NO_2, জলে দ্রবিত করলে নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কিছু নাইট্রাস অ্যাসিডও (HNO_2) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

নাইট্রাইট — নাইট্রাস অ্যাসিডের (HNO_2) বিভিন্ন সল্টকে ↑ বলা হয় নাইট্রাইট, যেমন — সোডিয়াম নাইট্রাইট, $NaNO_2$; ইথাইল নাইট্রাইট প্রভৃতি। সোডিয়াম বা পটাসিয়াম-নাইট্রাইট সল্ট হৃদ্‌রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রাইড — নাইট্রোজেন-ঘটিত বাইনারি ↑ কম্পাউণ্ড। অত্যধিক উত্তাপে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম বোরন প্রভৃতি ধাতব পদার্থের সঙ্গে নাইট্রোজেন গ্যাসের সরাসরি রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন নাইট্রাইড যৌগিক উৎপন্ন হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড — বর্ণহীন তরল অ্যাসিড, HNO_3; একে **অ্যাকোয়া ফর্টিস**-ও বলা হয়। তীব্র অ্যাসিড-গুণসম্পন্ন, প্রায় সব পদার্থ ক্ষয় করে ফেলে। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম (নোবল মেটাল ↑) ব্যতীত সব ধাতু এতে দ্রবীভূত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ধাতব নাইট্রেট ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়; আর বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাস বেরোয়। পটাসিয়াম বা সোডিয়াম নাইট্রেটের (চিলি সল্টপিটার ↑) উপর সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রসায়নাগারে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করা হয়। আবার উত্তপ্ত প্লাটিনামের ↑ উপর অ্যামোনিয়া ↑
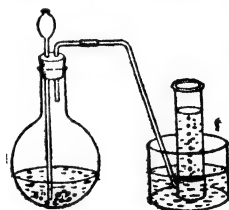
রসায়নাগারে HNO_3 প্রস্তুত প্রণালী

গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত করেও অ্যাসিডটা সহজে প্রচুর পরিমাণে

তৈরী করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় প্ল্যাটিনাম ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র; অ্যামোনিয়ার (NH_3) সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন ↑ গ্যাস মিলে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইট্রিক অক্সাইড — বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ, NO (নাইট্রোজেন মনঅক্সাইড)। অক্সিজেন গ্যাস বা বায়ুর সংস্পর্শে জারিত হয়ে গ্যাসটা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বা পারঅক্সাইড, NO_2, নামক বাদামী বর্ণের গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

নাইট্রেট — নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) বিভিন্ন সল্ট, জৈব বা অজৈব উভয় প্রকার বেসের ↑ সঙ্গেই নাইট্রেট আয়নের (NO_3) মিলনে গঠিত হয়; যেমন—পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3, (নাইটার ↑ বা সল্টপিটার ↑); সোডিয়াম নাইট্রেট, $NaNO_3$, সেলুলোজ ↑ নাইট্রেট, ইথাইল ↑ নাইট্রেট ইত্যাদি।

নাইট্রেসন — বিভিন্ন নাইট্রাইট ↑ সল্টের নাইট্রেট ↑ সল্টে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া; মূলতঃ এক প্রকার জারণ পদ্ধতি; যেমন, পটাসিয়াম নাইট্রাইট, KNO_2 নাইট্রেসনের ফলে পটাসিয়াম নাইট্রেটে, KNO_3, পরিবর্তিত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এই নাইট্রেসন প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই সংঘটিত হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মাটিতে পচে বিশেষ বিশেষ জীবাণুর (নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া ↑) সাহায্যে এরূপ জারণ প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট সল্ট উৎপন্ন হয়। জীবাণুদের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **নাইট্রিফিকেসন**।

নাইট্রোজেন – মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন N; পারমাণবিক ওজন 14·008, পারমাণবিক সংখ্যা 7; অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বায়ুমণ্ডলের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ অধিকার করে রয়েছে। গন্ধহীন, অদৃশ্য ও সাধারণ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর স্বাভাবিক যৌগিক পদার্থ হলো চিলি সল্টপিটার ↑, $NaNO_3$। জীবজগতের পক্ষে নাইট্রোজেন একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও নাইট্রোজেন ব্যতীত কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী বাঁচতে পারে না (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)। খাদ্যের প্রোটিন ↑ অংশে নাইট্রোজেনই প্রধান উপাদান। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ জমির উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় (ফার্টিলাইজার ↑)।

নাইট্রোজেন সাইক্‌ল — প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থায় নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ খাদ্যের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের প্রয়োজন মিটায়; আবার বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে তাদের দেহাবশেষ নানাভাবে

পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে মাটির বিভিন্ন অজৈব উপাদান বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন অজৈব নাইট্রেটে ↑ পরিণত হয়;
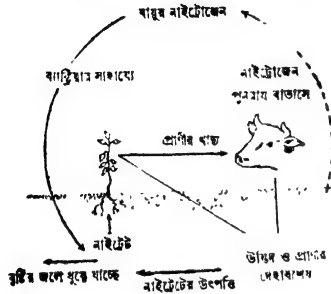
নাইট্রোজেন সাইক্‌ল

উদ্ভিদ তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ওই সব নাইট্রেট দ্রবিত অবস্থায় মাটি থেকে টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদ-দেহের নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন ↑ পদার্থ আবার প্রাণীরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। তারপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ মাটিতে পচে মিশে যায়, প্রাণীদের মল-মূত্রও মাটিতে মেশে। এভাবে নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগিক পুনরায় মাটিতে চলে যায়। বিশেষ জীবাণুর প্রভাবে এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, আর কতকাংশ নাইট্রেট আকারে পুনরায় উদ্ভিদ-দেহে চলে যায়। এভাবে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন স্বভাবতঃই বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে মাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে চক্রগতিতে চলাচল করছে। এই ব্যাপারটাকে বলে নাইট্রোজেন-সাইক্‌ল।

নাইট্রোজেন ফিক্সেসন— নাইট্রোজেন গ্যাস সংবদ্ধকরণ। জীবজগতের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে নাইট্রোজেনের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সে-প্রয়োজন সোজাসুজি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে সিদ্ধ হয় না। এজন্যে গ্যাসটাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৌশলে সংবদ্ধ করে ব্যবহারের উপযোগী যৌগিকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এভাবে তৈরী করা হয় অ্যামোনিয়া ↑ (NH_3), বিভিন্ন নাইট্রেট সল্ট এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত নানা রকম যৌগিক, যেগুলি জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। আবার মাটির মধ্যে নানারকম 'নাইট্রিফাইং' জীবাণুর প্রভাবে একাজ স্বভাবতঃও সিদ্ধ হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)।

নাইট্রো-গ্লিসারিন— গ্লিসারিন ↑ ও নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন তৈলাক্ত তরল পদার্থ, $C_3H_5(NO_3)_3$; একে আবার 'গ্লিসারাইল ট্রাই-নাইট্রেট'-ও বলে। ঈষৎ হল্‌দে বর্ণের ভারী পদার্থ। অতি সামান্য আঘাতেই জিনিসটা ভীষণ শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এটা এককভাবে বিস্ফোরক পদার্থ হিসেবে

ব্যবহৃত হয়ে থাকে; আবার এর সংমিশ্রণে ডিনামাইট ↑ তৈরী হয়।

নাইট্রো-চক — ক্যালসিয়াম কার্বনেট ↑ ($CaCO_3$) ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের (NH_4NO_3) সংমিশ্রিত পদার্থ। এই সংমিশ্রণ জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রো-বেঞ্জিন — হলদে বর্ণের তৈলাক্ত তরল পদার্থ, $C_6H_5NO_2$; বেঞ্জিনের ↑ সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই যৌগিক পদার্থটা থেকে পাওয়া যায় অ্যানিলিন ↑; এই অ্যানিলিন থেকে আবার বিভিন্ন রং ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি তৈরী হয়ে থাকে।

নাইট্রো-সেলুলোজ— তূলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ (সেলুলোজ ↑) পদার্থের উপর বিশেষ ব্যবস্থায় নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। একে সেলুলোজের 'নাইট্রিক অ্যাসিড এস্টার'-ও ↑ বলা যায়। অবশ্য একে 'সেলুলোজ নাইট্রেট' বলাই সঙ্গত; কিন্তু নাইট্রো-সেলুলোজ কথাটাই বিশেষভাবে প্রচলিত। অনেক সময় পদার্থটাকে **গান-কটন**-ও ↑ বলা হয়; কারণ, এটা উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ। বিভিন্ন শ্রেণীর নাইট্রোসেলুলোজ সেলুলয়েড ↑ ও কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তৈরীর জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড —অ্যাকোয়া-রিজিয়া ↑ ; এক ভাগ তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিড ও 4-ভাগ তীব্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ। এতে সোণা (নোবেল মেটাল ↑) দ্রবীভূত হয়। অগ্নিমান্দ্য ও লিভারের দোষে জলের সঙ্গে এর দু-এক ফোঁটা করে ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইলন — এক রকম প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থে তৈরী সূতার ব্যবহারিক নাম। এই সূতা দিয়ে মোজা, জামার কাপড়, সৌখিন শাড়ী প্রভৃতি তৈরী হয়; দেখতে অনেকটা সিল্কের মত বলে একে আর্টিফিসিয়াল সিল্ক-ও ↑ বলা যেতে পারে। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো অ্যাডিপিক ↑ অ্যাসিডের এক রকম পলিমার ↑ । এই অ্যাডিপিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ফিনল ↑ থেকে। অ্যাসিডটার বিশেষ পলিমারিজেসনের ↑ ফলেই এই নাইলন জাতীয় প্ল্যাস্টিকের সৃষ্টি হয়। এই পলিমার পদার্থটাকে উত্তাপে তরল করে যন্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে চেপে বার করা হয়, বাইরের ঠাণ্ডায় তা শক্ত হয়ে নরম ও মসৃণ সূতার আকার ধারণ করে।

নাদির—কোন লোকের ঠিক মাথার উপরে উর্ধে সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে ↑ অবস্থিত কল্পিত সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলে জেনিথ ↑। জেনিথের বিপরীত বিন্দু, অর্থাৎ কোন লোকের বরাবর পায়ের

নীচে (পৃথিবীর অপর দিকের) সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে অবস্থিত সর্বনিম্ন বিন্দুকে বলা হয় নাদির। জ্যোতির্বিদ্যার গণনাদিতে নভোমণ্ডলে এরূপ বিন্দু কল্পিত হয়।

নার্কোটিক — ঘুমের ঔষধ ; যে-সব পদার্থের প্রভাবে নিদ্রার উদ্রেক হয়, দেহে অবসাদ ও আচ্ছন্ন ভাব দেখা দেয়। আফিম ও মর্ফিন জাতীয় অ্যালক্যালয়েড ↑ এবং ভেরোনল, লুমিনল ↑ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ 'নার্কোটিক ড্রাগ' বলে পরিচিত।

নার্কোলেপ্‌সি — অদ্ভূত একটা রোগ বিশেষ, যাতে রোগী সহসা সময়ে অসময়ে অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম প্রতিরোধ করবার তার কোন ক্ষমতা থাকে না।

নার্কোসিস — অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রা, ঘুমের ঔষধ ব্যবহারে যেমন হয়।

নার্কোটিক ড্রাগ — ঘুমের ঔষধ।

ন্যাচারাল গ্যাস — কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ তৈলখনি অঞ্চলে, ভূগর্ভ থেকে যে-সব গ্যাস স্বভাবতঃ নির্গত হয়। বিভিন্ন উৎসের এরূপ গ্যাস হয় বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ ; নানা রকম গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ↑ ও হিলিয়াম ↑ প্রভৃতি মৌলিক গ্যাস এর মধ্যে সংমিশ্রিত থাকে।

ন্যাট্রিয়াম — সোডিয়াম ↑ ধাতু ; সোডিয়ামের এই ল্যাটিন নাম থেকেই ধাতুটার সাংকেতিক চিহ্ন 'Na' করা হয়েছে।

ন্যাট্রন — খনিজ পদার্থ বিশেষ ; রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো সোডিয়াম সেস্‌কুইকার্বনেট, $Na_2CO_3 . NaHCO_3 . 2H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ।

ন্যাপ্‌থা—বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ এক রকম সংমিশ্রণকে সাধারণভাবে ন্যাপ্‌থা বলা হয়। প্যারাফিন অয়েল ↑ ও আলকাতরা (কোল-টার ↑) প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন রকম ন্যাপ্‌থা পাওয়া যায়। ডেষ্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঠ থেকেও এক রকম ন্যাপ্‌থা বেরোয়, যাকে বলে উড্‌-ন্যাপ্‌থা ↑। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে অবিশুদ্ধ মিথাইল অ্যালকোহল, CH_3OH.

ন্যাপ্‌থলিন—বিশেষ একটা হাইড্রোকার্বন, $C_{10}H_8$; সাদা, স্ফটিকাকার, তীব্র গন্ধবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ। পেট্রোলিয়াম ↑ ও কোল-টার ↑ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। বাজারে ন্যাপ্‌থলিনের বল বিক্রি হয়, একে ইংরেজীতে বলে **মথ-বল**, কারণ, জামা-কাপড়ে ন্যাপ্‌থলিন দিয়ে রাখলে এর গন্ধে পোকা-মাকড় আসে না। এ ছাড়া বিভিন্ন রঞ্জক দ্রব্য তৈরী করতেও ন্যাপ্‌থলিন দরকার হয়।

ন্যাসেণ্ট গ্যাস—বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে গ্যাস সদ্য উদ্ভূত হয়। উৎপত্তিকালে এরূপ গ্যাস

বিশেষ রাসায়নিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে; একে তখন ন্যাসেণ্ট গ্যাস, বা 'ন্যাসেণ্ট অবস্থায়' গ্যাস বলা হয়।

নিউক্লিও-প্রোটিন — যে প্রোটিন ↑ পদার্থের সঙ্গে নিউক্লিক ↑ অ্যাসিড যুক্ত থাকে; প্রাণী-দেহের বিভিন্ন কোষ বা সেলের ↑ কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস ↑ এই পদার্থে গঠিত।

নিউক্লিক অ্যাসিড—অত্যন্ত জটিল গঠনের একটি জৈব অ্যাসিড; যাতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, শর্করা ও ফস্‌-ফোরিক ↑ অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বভাবজ দু'রকমের নি. অ্যা. পাওয়া গেছে: এক রকম পাওয়া গেছে থাইমাস ↑ গ্ল্যাণ্ডে, ও প্রাণি-দেহের জৈব কোষের কেন্দ্রীনে, আর এক রকম ঈষ্ট ↑ থেকে।

নিউক্লিয়ন—কোন পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীনের সংগঠক কণিকা, যা ধন-তড়িৎবিশিষ্ট প্রোটন ↑ এবং তড়িদ্বিহীন নিউট্রন ↑ নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয়াস — কেন্দ্রীয় বস্তু, অথবা কেন্দ্রীন পদার্থ; মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ধন-তড়িৎবিশিষ্ট মূল বস্তু-কণিকা। এই কেন্দ্রীয় বস্তু ধন-তড়িৎ বিভবের প্রোটন ↑ ও তড়িৎ-বিহীন নিউট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑)। উদ্ভিদ ও প্রাণি-দেহের প্রত্যেকটি কোষের অভ্যন্তরেও এরূপ এক রকম কেন্দ্রীয় বস্তু, বা নিউক্লিয়াস রয়েছে।

নিউক্লিয়ার চার্জ—পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু, বা নিউক্লিয়াসের প্রোটন ↑ কণিকায় যে ধন-তড়িৎশক্তি নিহিত থাকে। এই তড়িৎবিভবের পরিমাণ ওর চারিদিকের ইলেক্ট্রন ↑ কণিকাগুলোর ঋণ-তড়িৎবিভরের সমষ্টির সমান, কিন্তু বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন-কণিকার সংখ্যা ওর চার-দিকের ইলেক্ট্রন-কণিকাগুলোর সংখ্যার সমান। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা তার পরমাণুর এই কেন্দ্রীয় তডিৎশক্তির একক সংখ্যায়, বা তার চারদিকে পরিভ্রণ-কারী ইলেকট্রন-কণিকার সংখ্যার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স — পদার্থ-বিজ্ঞানের যে শাখায় পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের গঠন ও বিভিন্ন সংগঠক কণিকা (প্রোটন ↑, নিউট্রন ↑, পজিট্রন ↑ ইত্যাদি) সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যাদির পরীক্ষা ও গবেষণাদি করা হয়। এক কথায় বলা যায়, পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

নিউক্লিয়ার ফিসন — ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুর পরমাণুগুলোকে বিভিন্ন শক্তি-কণিকায় বিশ্লিষ্ট করার বা ভেঙ্গে-ফেলার প্রক্রিয়া। কথাটার মানেই হলো, পরমাণু-বিভাজন বা পরমাণু-ভাঙ্গা। অ্যাটমিক পাইল ↑, সাইক্লোট্রন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে

সাধারণতঃ নিউট্রন-কণিকার সংঘাতে বিশেষ জটিল কৌশলে এরূপ পরমাণু-ভাঙ্গার কাজ নিষ্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রভূত পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব ঘটে, পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (অ্যাটম বম্ ↑)।

নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেসন — কোন কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক বিক্রিয়ার (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসন ↑) ফলে তাদের মৌলিক গঠন বদলে যায়। এর ফলে এক পদার্থ অপর কোন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এরূপ পরিবর্তনকে বলে নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেসন। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ তেজ-বিকিরণের ফলে স্বভাবতঃই এভাবে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্সম্যুটেসন অব এলিমেণ্ট ↑)।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্সন — যে প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মৌলিক গঠন বদলে গিয়ে অপর কোন নতুন পদার্থের পরমাণুর উদ্ভব ঘটে, অথবা ওই পদার্থেরই আইসোটোপ ↑ সৃষ্টি হয়। রেডিও-আক্টিভ ↑ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে ক্রমাগত তেজ বিকিরণের ফলে স্বভাবতঃই এই প্রক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়ে সাইক্লোট্রন ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, নিউট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকার আঘাতেও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এরূপ মৌলিক রূপান্তর ঘটানো ইদানিং সম্ভব হয়েছে।

নিউট্রন — পরমাণুর কেন্দ্রীন, বা নিউক্লিয়াসে ↑ অবস্থিত তড়িৎবিহীন কণিকা (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)। ধন-তড়িৎবিশিষ্ট প্রোটন ↑ কণিকা ও তড়িৎবিহীন এই নিউট্রন কণিকার সমবায়ে মৌলিক পদার্থগুলোর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন গঠিত। প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের ভর সামান্য (শত-করা এক ভাগ) কিছু বেশি। কেবলমাত্র হাইড্রোজেন-পরমাণুতে নিউট্রন কণিকা নেই ; আছে মাত্র একটা প্রোটন, যার চারদিকে একটা মাত্র ইলেকট্রন ঘুরছে। হেভি হাইড্রোজেনের ↑ নিউক্লিয়াসে অবশ্য একটা প্রোটন ও একটা নিউট্রন থাকে। তড়িৎবিহীন হওয়ার ফলে নিউট্রন কণিকাকে বিশেষ ব্যবস্থায় কেন্দ্রচ্যুত করে ফেলা যায়। মূলতঃ এভাবেই 'নিউক্লিয়ার ফিসন' ↑ সম্ভব হয়, একেই বাংলায় বলা হয় পরমাণু-বিভাজন (অ্যাটম বম্ ↑)।

নিউট্রিনো—তড়িৎ-বিহীন প্রাথমিক পদার্থ-কণিকা। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তথ্যের সমাধান করবার জন্যে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল বস্তু-কণিকার কল্পনা করা হয়েছে। মেসন ↑ কণিকা এরূপ কল্পিত

নিউট্রিনো কণিকার সমবায়ে গঠিত বলে মনে করা হয়।

নিউটন, স্যার আইজ্যাক — বৃটিশ বিজ্ঞানী; লিঙ্কলনশায়ারে জন্ম 1642 খৃঃ, মৃত্যু 1727 খৃষ্টাব্দ। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি 1703 খৃষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু। বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের জন্য 1705 খৃঃ সম্মানজনক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত।

গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও জ্যোতি-বিজ্ঞানে অপূর্ব প্রতিভা ও অবি-স্মরণীয় অবদান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভিটেশন ↑) সূত্র আবিষ্কার, যা এ-যুগে আইনস্টাইনের ↑ আপেক্ষি-কতাবাদের (থিয়োরি অব রিলে-টিভিটি ↑) সূত্রানুসারেও অভ্রান্ত প্রতিপন্ন। বস্তুতঃ নিউটনের 1687 খৃঃ প্রকাশিত 'প্রিন্সিপিয়া' নামক গ্রন্থের তথ্যাদির উপরেই আপে-ক্ষিকতা-বাদ মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। বস্তুর গতি সম্বন্ধীয় সূত্রত্রয় (নিউটন্‌স ল-অব মোসন ↑) আবিষ্কার, বর্ণালির (স্পেকট্রাম ↑) বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, আলোক-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন,—যদিও তাঁর আলোকের কণিকাবাদ (কর্পাসকুলার থিয়োরি ↑) পরে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন। প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন; গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ। গণিতের 'বাইনোমিয়াল থিয়োরেম' এবং 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল্‌কুলাস' নামক গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান—বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী।

নিউটনস্‌-ল-অব মোসন—বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী নিউটন ↑ পদার্থের গতি সম্পর্কে যে তিনটি সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন: (1) বহিস্থ কোন শক্তির প্রভাব ব্যতীত নিশ্চল বস্তু বরাবর নিশ্চল থাকবে, চলমান বস্তু বরাবর একই দিকে একই বেগে চলতে থাকবে। (2) চলমান বস্তুর ভর-বেগের (মোমেণ্টাম ↑) হার প্রযুক্ত শক্তির আনুপাতিক হবে; আর, তার ওই গতি হবে শক্তি যে-দিকে প্রযুক্ত হয়েছে সেই দিকে। (3) কোন শক্তি প্রযুক্ত হলেই তার সমপরিমাণ একটা বিপরীত শক্তির উদ্ভব হবে (যেমন, বন্দুক ছুঁড়লে সম্মুখগামী শক্তির প্রভাবে গুলিটা বেগে সামনে ছুটে যায়, আর তার ফলে উদ্ভূত বিপরীত শক্তির প্রভাবে বন্দুকটা পেছনে ধাক্কা দেয় (জেট্‌ প্লেন ↑)।

নিউটনস্‌-ল-অব কুলিং — উত্তপ্ত পদার্থের তাপের বিকিরণ সম্পর্কে নিউটন যে সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন: কোন পদার্থ যে-হারে তার তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়, তা ওই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে তার চারদিকের পদার্থের (বায়ুর) তাপ-বৈষম্যের

আনুপাতিক হয়ে থাকে। পদার্থটা চারদিকের বায়ু অপেক্ষা 40° ডিগ্রি বেশি উত্তপ্ত হলে যদি প্রতি মিনিটে তার 10° ডিগ্রি তাপ কমে, তবে ওই তাপ-বৈষম্য 20° ডিগ্রি হলে মিনিটে ওর তাপ 5° ডিগ্রি হারে কমবে। অবশ্য এই তাপ-বৈষম্যের পরিমাণ অত্যধিক হলে অনেক সময় এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে।

নিউটনিয়ান ডিস্‌ক — বর্ণালির (স্পেক্‌ট্রাম ↑) সপ্তবর্ণের ধারাবাহিক ও আনুপাতিকভাবে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত গোলাকার চাকৃতি বিশেষ। এই চাক্‌তিখানা অতি দ্রুত ঘোরালে কোন বর্ণ ই লক্ষিত হয় না, সাদা প্রতিভাত হয়। সপ্তবর্ণের সার্থক সমাবেশে বর্ণহীন সাদার (যেমন সূর্যরশ্মি) উৎপত্তি হয়, এই তথ্যের প্রমাণ করবার জন্যে নিউটন এই পরীক্ষা প্রবর্তন করেন।
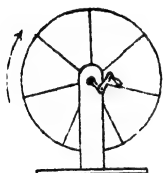
নিউটনিয়ান ডিস্‌ক

নিউমারেটর — ভগ্নাংশিক রাশির ভাজ্য সংখ্যা, অর্থাৎ ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি; বাংলায় বলে 'লব' রাশি; যেমন—2/5 ভগ্নাংশের 2 হলো নিউমারেটার, আর নিচেরটি বা ভাজক সংখ্যাটিকে বলে 'ডিনোমিনেটর' বা 'হর' রাশি।

নিউরস্থেনিয়া—স্নায়বিক দৌর্বল্য; অত্যধিক পরিশ্রম, ভগ্নস্বাস্থ্য, বা দুশ্চিন্তার ফলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের অবস্থা।

নিউরোসিস — রোগ বিশেষ; কোন কঠিন বা অপ্রিয় ব্যাপার এড়াবার চেষ্টায় অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায় যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন কোন শক্ত কাজ দেখলেই হয়তো হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে, বা অকারণে ভীত বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। **নিউরোটিক** মানে নিউরোসিস রোগগ্রস্ত; অকারণে বা সামান্য কারণে যখন কেহ উত্তেজিত ও ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে।

নিওপ্রিন—ক্লোরোপ্রিন থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক প্রকার কৃত্রিম রাবারের ↑ ব্যবহারিক নাম; গাড়ীর টায়ার, টিউব প্রভৃতি তৈরী করতে বহুল প্রচলিত। ক্লোরোপ্রিন তৈরী হয় অ্যাসিটিলিন ↑ ও হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিডের বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায়।

নিওলিথিক পিরিয়ড — নব (উন্নত) প্রস্তর যুগ; প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শেষ ভাগ—যখন মানুষ মসৃণ ও উন্নত ধরণের প্রস্তর-নির্মিত হাতিয়ার ও তৈজসাদি তৈরী করতে শিখেছে। প্রায় 10,000 বছর পূর্বেকার যুগ।

নিকেল—মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ni, পারমাণবিক ওজন 58·69, পারমাণবিক সংখ্যা 28; লোহার

মত চৌম্বক-শক্তিসম্পন্ন, সাদা ধাতব পদার্থ। মরিচা ধরে না; এ-জন্যে ইলেকট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় লোহার জিনিসের উপরে নিকেলের একটা পাতলা আস্তরণ ধরানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে **নিকেল-প্লেটিং** বলে। নিকেল-ষ্টিল ↑, নিক্রোম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন সংকর-ধাতু তৈরী করতে দরকার হয়। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিকেল একটি উৎকৃষ্ট ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে। গন্ধক ও আর্সেনিকের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় 'নিকোলাইট' নামক খনিজ থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়।

নিকেল-ষ্টিল — ষ্টিল (ইস্পাত-লৌহ) ও নিকেলের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতু। এর মধ্যে নিকেলের ভাগ সাধারণতঃ 6% পর্যন্ত থাকে।

নিকেল-সিলভার — প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অনুপাতে তামা, দস্তা ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী এক প্রকার সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম। এর মধ্যে কিন্তু সিলভার বা রৌপ্য কিছুমাত্র থাকে না। সাধারণতঃ এতে 60% তামা, 20% নিকেল ও 20% দস্তা (জিঙ্ক ↑) থাকে।

নিকোটিন—একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{14}N_2$; বর্ণহীন, বিষাক্ত ও তৈলাক্ত তরল পদার্থ। সাধারণতঃ তামাকের পাতা থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার অ্যালকালয়েড ↑। কীটপতঙ্গ-নাশক বিষাক্ত পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিক্রোম—নিকেল ও ক্রোমিয়ামের ↑ এক রকম সংকর-ধাতুর ব্যবহারিক নাম। এর মধ্যে সামান্য কিছু লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকাও ↑ দেওয়া হয়। বিশেষ কঠিন ও তাপ-সহ বলে অত্যধিক উত্তাপেও এর বিশেষ কোনরূপ অবস্থান্তর ঘটে না; এ জন্যে বৈদ্যুতিক উনানে (হিটার) এর তার ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Ne, পরমাণবিক ওজন 20·183, পরমাণবিক সংখ্যা 10; বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় পদার্থ (অন্যতম ইনার্ট গ্যাস ↑)। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে আছে — প্রায় 50,000 ভাগে একভাগ মাত্র। তরলীকৃত বায়ু থেকে 'ফ্র্যাকৃসন্যাল ডিস্টিলেসন' ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করা হয়। ইদানিং যে রঙীন আলোর প্রচলন হয়েছে, যাকে 'নিয়ন-সাইন' বলা হয়, তা স্বচ্ছ কোন আবদ্ধ আধারের স্বল্পীকৃত নিয়ন গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলেই সম্ভব হয়।

নিয়ন ল্যাম্প — ইলেকট্রিক বাল্ব বা কাচের লম্বা টিউব বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে সামান্য নিয়ন ↑ গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থা করে যে আলো তৈরী করা হয়। অল্প চাপের ওই নিয়ন গ্যাসের মধ্যে

তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে সুদৃশ্য গোলাপী-লাল আলোক সৃষ্টি হয়। এরূপ নিয়ন-বাতির ফিলামেণ্ট ↑ থাকে দুটা পৃথক ধাতব চাকতি (বা একটা চাকতি ও একটা তার-কুণ্ডলী)। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে নিয়ন গ্যাসের তড়িতাবিষ্ট কণিকা-গুলো (আয়ন ↑) চাকতি দুটার গায়ে পরিবর্তীভাবে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। এর ফলেই সুদৃশ্য আলোক-রশ্মির উৎপত্তি ঘটে।

নিয়ন-ল্যাম্প

নিয়াণ্ডারথ্যাল ম্যান — প্রাগৈতিহাসিক যুগের জান্তব ধরণের আকৃতিবিশিষ্ট মানুষ। প্রায় লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এই জাতীয় মানুষ বাস করতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান মনুষ্যজাতি এদের বংশধর নয়।

নিয়াণ্ডার্থ্যাল ম্যান

নেক্রপ্সি — সন্দেহের ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্যে মৃতদেহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা (পোষ্ট-মর্টেম ↑)। **নেক্রো** মানে মৃত। **নেক্রোসিস** জীবন্ত প্রাণিদেহের কোন স্থানীয় কোষসমূহের মৃত্যু-জনিত বিকৃতি।

নেপচুন — সৌর পরিবারের একটি গ্রহ; এটি প্লুটো ↑ ও ইউরেনাস ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা নিজস্ব কক্ষ-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে এর প্রায় 164·8 বছর লাগে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 280 কোটি মাইল হবে; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 17 গুণ বড়। পৃথিবীর চাঁদের মত এর একটা মাত্র উপগ্রহ দেখা যায়।

নেপচুনিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ, পারমাণবিক সংখ্যা 93, অন্যতম ট্রান্সইউরেনিক ↑ এলিমেণ্ট। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, এটাও তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑) পদার্থ।

নেবুলা — নভোমণ্ডলের স্থানে স্থানে যে এক রকম মেঘবৎ উজ্জ্বল পদার্থ-কুণ্ডলী দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঘনীভূত গ্যাসীয় পদার্থে এগুলো গঠিত। লক্ষ লক্ষ বছরের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে এ-থেকেই নূতন নূতন বিভিন্ন তারকার সৃষ্টি হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

নেবুলা

নেবুলাইজার — এক রকম যন্ত্র, যা থেকে কোন তরল পদার্থ মেঘের

মত বাষ্পাকারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সভা-সমিতি ও উৎসবে আতর, গোলাপ জল প্রভৃতি সুগন্ধি তরল

নেবুলাইজার
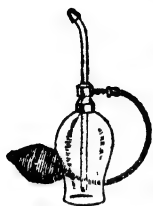
পদার্থ এ-দিয়ে অভ্যাগত লোকের গায়ে মাথায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গল-ক্ষত রোগে তরল ঔষধাদি প্রয়োগের জন্যেও এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নেফোলাইট—মেঘের মত ঘোলাটে সাদা পদার্থ, যেমন — সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেট যৌগিক, যা ইগ্নিয়াস ↑ প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। **নেফ** মানে 'মেঘ'। **নেফোগ্রাফ**—মেঘের আলোকচিত্র গ্রহণের বিশেষ ক্যামেরা যন্ত্র। **নেফোস্কোপ** মানে, আকাশে মেঘের গতি মাপতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়; এর সাহায্যে মেঘের গতিবেগ জেনে ঊর্ধাকাশে বায়ু-প্রবাহের গতিও জানা যায়।

নেফ্রাইটিস — মূত্রস্থলী বা কিড্‌নির ↑ প্রদাহ রোগ। 'নেফ্রোসিস' হলো কিড্‌নি ↑ সম্বন্ধীয় রোগ।

নেস্‌লার সল্যুসন — পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের ↑ জলীয় দ্রব্যের মধ্যে মার্কারি-আয়োডাইড ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবীভূত করে যে সল্যুসন বা দ্রবণ তৈরী করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাদামী রং ফুটে ওঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় (প্রিসিপিটেট্‌ ↑) উদ্ভব হয়।

নোড —(পদার্থ-বিদ্যায়) যে-কোন তরঙ্গের পাদবিন্দু; তরঙ্গের শীর্ষবিন্দুকে বলা হয় 'এন্টিনোড' (চিত্র ↑)। (জ্যোতির্বিদ্যায়) কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের কক্ষ-পথ (অর্বিট ↑) যে বিন্দুতে ইক্লিপ্টিককে ↑ (অর্থাৎ যে কক্ষ-পথে সূর্য সম্বৎসরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়) ছেদ করে। (গণিতে) কোন বক্ররেখার দুই প্রান্তীয় অংশ যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে একটি কোণ সৃষ্টি করে। (উদ্ভিদবিদ্যায়) বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ-কাণ্ডের গাঁট বা সংযোগ-গ্রন্থি, যেমন ঘাস, বাঁশ প্রভৃতির যেখানে পাতা গজায়, বা প্রশাখা বেরোয়।
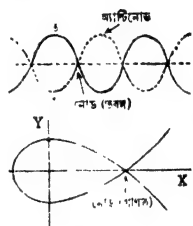
নোড

নোবেল, অ্যালফ্রেড — সুইডেনের রসায়ন বিজ্ঞানী, স্টকহোল্‌মে জন্ম 1833 খৃঃ, মৃত্যু 1896 খৃঃ। ডিনামাইট ↑ ও অন্যান্য বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কার। যুদ্ধের গোলা-বারুদ তৈরী, খনি-খনন, পর্বত-বিদারণ প্রভৃতি কাজে বিস্ফোরকের

ব্যবহার প্রবর্তন; প্রভূত অর্থোপার্জন। সঞ্চিত বিপুল অর্থ জগতের সাংস্কৃতিক কল্যাণে দান। (পরিশিষ্টে নোবেল পুরস্কার ↑)।

নোবল মেটাল — সোনা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতু। জলে বাতাসে এ-গুলোয় মরিচা ধরে না, অথবা সাধারণ কোন অ্যাসিডেও দ্রবীভূত হয় না। এজন্যে এ-সব ধাতুকে সম্ভ্রান্ত ধাতু বা 'নোবল মেটাল' বলা হয়। অন্যান্য সব ধাতুকে বলে 'বেজ্ মেটাল' বা নিকৃষ্ট ধাতু।

নোভা — যে-সব নক্ষত্র হঠাৎ তীব্র আলোক ছড়িয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, পরে সহসা আবার নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ওই সব নক্ষত্রের দেহপিণ্ড কোন কারণে সহসা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে; এর ফলে প্রভূত শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সাময়িক এরূপ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থার পরে নক্ষত্রটাকে আয়তনে ক্ষুদ্রতর ও নিষ্প্রভ দেখায়।

নোভোকেইন — কোকেনের ↑ সমক্রিয়া-বিশিষ্ট ঔষধ বিশেষ; যে ঔষধ দাঁত তোলবার সময়ে দন্তমূলকে বেদনার অনুভূতিহীন করতে ইন্জেকসন করে প্রয়োগ করা হয়।

পজিট্রন — ধন-তড়িৎবিশিষ্ট একটি বিশেষ মৌলিক কণিকা; এর ভর ও তড়িৎ-বিভবের পরিমাণ ঋণতড়িৎ বিশিষ্ট ইলেকট্রন ↑ কণিকার সমান, কিন্তু বিপরীৎ-ধর্মী। এই পজিট্রন কণিকা অতি স্বল্পক্ষণস্থায়ী, এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় এর স্থিতিকাল লক্ষিত হয়েছে। কস্‌মিক ↑ রশ্মির পর্যবেক্ষণের ফলে এর অস্তিত্ব সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। বিভিন্ন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় (রেডিও অ্যাকটিভ ↑) পদার্থ থেকে পজিট্রন কণিকা নির্গত হয়ে থাকে এবং বিশেষ সূক্ষ্ম যান্ত্রিক কৌশলে এর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়।

পটাস — প্রধানতঃ পটাসিয়াম কার্বনেট সল্ট, K_2CO_3 বুঝায়। আবার পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডকেও পটাস বলে; যেমন, কষ্টিক পটাস, KOH; সাধারণভাবে অবশ্য সব রকম পটাসিয়াম সল্টকেই ↑ সচরাচর পটাস বলা হয়ে থাকে।

পটাসিয়াম—মৌলিক ধাতব পদার্থ। এর ল্যাটিন নাম 'ক্যালিয়াম' থেকে এর সাংকেতিক চিহ্ন K হয়েছে। পারমাণবিক ওজন 39·096, পারমাণবিক সংখ্যা 19; সাদা, নরম ও বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন ধাতু; অনেকাংশে সোডিয়াম ধাতুর অনুরূপ। কার্ণেলাইট প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর বিভিন্ন সল্ট জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের

পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ—সব রকম জীবের দেহেই অল্পাধিক পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে।

পটাসিয়াম ব্রোমাইড—পটাসিয়াম ও ব্রোমিনের ↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন সল্ট, KBr ; সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। একে 'পটাস ব্রোমাইড'-ও বলা হয়। কোন কোন রোগে ঔষধ হিসেবে এবং ফটোগ্রাফির ↑ কাজে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট — পটাসিয়াম ও ক্রোমিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে গঠিত যৌগিক পদার্থ $K_2Cr_2O_7$; একে **পটাস বাইক্রোমেট-ও** বলা হয়। লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। ক্রোম-আয়রন ↑ নামক খনিজের সঙ্গে পটাসিয়ামের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিকটা সহজে উৎপন্ন হয়। এটি একটি উৎকৃষ্ট জারক পদার্থ; বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহ করে (অক্সিডাইজিং এজেন্ট ↑); রঞ্জন-শিল্পে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট—সাধারণভাবে বলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$; গাঢ় লাল, স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। এর লাল জলীয় দ্রবণ রসায়নাগারে অক্সিডাইজিং ↑ এজেন্ট হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। জীবাণু-নাশক ও জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

পলি—বহুসংখ্যক অর্থে কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়েথাকে ; যেমন—**পলিগন,** পলিবেসিক ↑, পলিমার ↑ ইত্যাদি।

পলিগন — বহু কোণ (কাজেই বাহু) বিশিষ্ট সরল-রৈখিক ক্ষেত্র। সাধারণতঃ চতুষ্কোণের বেশি হলেই সব সরল-রৈখিক ক্ষেত্রকে পলিগন বলা যায়। তবে পাঁচ কোণ-বিশিষ্ট হলে **পেণ্টাগন,** ছয় কোণ—**হেক্সাগন,** সাত কোণ—**হেপ্টাগন,** দশ কোণ—**ডেকাগন** প্রভৃতি বিশেষ নামও ব্যবহৃত হয়। **'গন'** মানে কোণ বা অ্যাঙ্গেল ↑।

পলিথিন — ইথিলিন ↑ থেকে উৎপাদিত নাইলন ↑ জাতীয় প্ল্যাষ্টিক ↑ ; এই শ্রেণীর পলিমার ↑ পদার্থের বৈশিষ্ট্য হলো এতে জলীয় বাষ্প শোষিত হয় না। বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পলিমর্ফিক— যে সব পদার্থের গঠনে বিভিন্ন স্ফটিকাকার রূপ বিদ্যমান ; যেমন, টিটানিয়াম অক্সাইড প. ক. ; যেহেতু এর গঠনে তিন রকম বিভিন্ন আকারের ক্রিষ্ট্যাল ↑ লক্ষিত হয়।

পলিমর্ফাস — রক্তে সাধারণ আকারের শ্বেত-কণিকাগুলো রক্তকোষের লোহিত-কণিকাগুলোর সঙ্গে যে-ভাবে মিশে থাকে ; ক্ষতাদির ভিতর দিয়ে রক্তে সংক্রমিত রোগ-জীবাণুদের (ব্যাক্টিরিয়া ↑) ধ্বংস

করে রক্তের এই পলিমর্ফ কণিকা-গুলোই জীব-দেহে রোগ সংক্রমণে বাধা দেয়।

পলিমারিজেসন — যে প্রক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থের একাধিক অণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে বৃহত্তর অণুবিশিষ্ট অন্য কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এতে উৎপন্ন পদার্থটার আণবিক ওজন প্রাথমিক অণুর সংখ্যানুপাতে বেড়ে যায়, কিন্তু মূল রাসায়নিক গঠন একই থাকে। অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড (CH_3CHO) পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ার ফলে প্যারাল্ডিহাইডে, $(CH_3CHO)_3$, পরিণত হয়; অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের তিনটা অণু একসঙ্গে মিলে গিয়ে প্যারাল্ডিহাইড অণুর সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পদার্থ অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড-কে এজন্যে বলা হয় **মনোমার** এবং প্যারাল্ডিহাইড হলো **পলিমার** পদার্থ। আরও নানা রকম ভাবে পলিমারিজেসন হতে পারে। একই হাইড্রোকার্বন ↑ অণু পরস্পর শৃঙ্খলিত হয়েও পলিমার সৃষ্টি হতে পারে; যেমন, ইথিলিন ↑ ($CH_2.CH_2$) পলিমারিজেসনের ফলে স্বাভাবিক রাবারের উপাদান আইসোপ্রিন ↑ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্ল্যাস্টিক জাতীয় পদার্থ, কৃত্রিম সুতা (নাইলন ↑, রেয়ন ↑ প্রভৃতি) এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পলিমার পদার্থে গঠিত, কৃত্রিম উপায়ে তৈরি। আবার অনেক স্বাভাবিক পদার্থও বিভিন্ন পলিমার অণুতে গঠিত থাকতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন প্ল্যাস্টিক জাতীয় বিভিন্ন পদার্থ নানা রকম জটিল পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ার ফলেই গঠিত হয়ে থাকে।

পলিমার— পলিমারিজেসনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ (পলিমারিজেসন ↑)। কোন মনোমার ↑ পদার্থের বহু সংখ্যক অণুর পারস্পরিক সংযোগে যে পলিমার পদার্থ গঠিত হয় তাকে বলা হয় 'হাই-পলিমার'।

পলিবেসিক — যে অ্যাসিডের গঠনে ধাতুর-বিক্রিয়ায়-অপসারণযোগ্য দুই বা ততোধিক হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে; যেমন — ফস্ফোরিক অ্যাসিড, H_3PO_4 (ট্রাই-বেসিক); সোডিয়ামের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর তিন রকম সল্ট হতে পারে, যেমন, নর্ম্যাল ↑ সোডিয়াম ফস্ফেট, Na_3PO_4; সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফস্ফেট, Na_2HPO_4, এবং সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফস্ফেট, NaH_2PO_4, (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

পাই —(1) যে কোন জ্যামিতিক বৃত্তের (সার্কল্ ↑) পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত-বোধক স্থির রাশি; যা সংক্ষেপে π চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়; $=22/7$ বা 3·14159; (2) অধুনা অপ্রচলিত ভারতীয় এক রকম মুদ্রা বিশেষ, $=1/3$ পয়সা।

পাইরিন — (1) একটা বিশেষ

হাইড্রোকার্বন, $C_{16}H_{10}$; হল্‌দে স্ফটিকাকার পদার্থ। আলকাতরা (কোল-টার ↑) থেকে পদার্থটা পাওয়া যায়। (2) কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইড, CCl_4, নামক তরল পদার্থকেও কখন কখন 'পাইরিন' বলা হয়; অগ্নি নির্বাপনের জন্যে অনেক সময় ফায়ার-এক্সটিংগুইসার ↑ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাইরাইট্‌স — এক শ্রেণীর ধাতব খনিজ পদার্থের সাধারণ নাম। সাধারণতঃ এ-গুলো বিভিন্ন ধাতুর সালফাইড যৌগিক হয়ে থাকে; যেমন, আয়রন পাইরাইটস, FeS_2; কপার পাই- রাইটস, $CuFeS_2$ (কপার ও আয়রনের সম্মিলিত সালফাইড) ইত্যাদি।

পাইরিডিন — কোলটার ↑ থেকে প্রাপ্ত একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ, C_5H_5N; বর্ণহীন দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ কখন কখন ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দুর্গন্ধযুক্ত ও অপেয় করে কেবল মাত্র জালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে অনেক সময় অবিশুদ্ধ অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে পাইরিডিন মিশ্রিত করা হয়।

পাইরো — আগুন বা উত্তাপ অর্থে রাসায়নিক শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন — পাইরোবোরিক অ্যাসিড (সাধারণ বোরিক ↑ অ্যাসিড উত্তপ্ত করে পাওয়া যায়)। উত্তাপের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থের বিয়োজন প্রক্রিয়াকে বলে **পাইরোলিসিস**। পাইরোমিটার ↑, পাইরোফোরিক অ্যালয় ↑ ইত্যাদি।

পাইরোগ্যালল — একে পাইরো-গ্যালিক অ্যাসিডও বলে; গ্যালিক ↑ অ্যাসিডকে 200° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করে পাওয়া যায়। সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো ট্রাই-হাইড্রক্সিবেঞ্জিন, $C_6H_3(OH)_3$। পদার্থটা মুক্ত অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করাতে এবং ফটো-গ্রাফির কাজে প্রয়োজন হয়।

পাইরোফোরিক অ্যালয় — যে সব সংকর-ধাতু ঘষলে বা ঠুক্‌লে সহসা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। এই শ্রেণীর অ্যালয় ↑ দিয়েই সিগারেট-লাইটারের ফ্লিণ্ট ↑ তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ জিনিসটা সিরিয়াম ↑, লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতের সংমিশ্রণে গঠিত অত্যন্ত কঠিন এক রকম ধাতু-সংকর।

পাইরোমিটার — অত্যধিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের উপযোগী যন্ত্র বিশেষ। সাধারণ থার্মো-মিটারে ↑ উচ্চ তাপমাত্রা মাপা সম্ভব হয় না; কারণ, অত্যধিক তাপে যন্ত্রের কাঁচ-নলই গলে যায়। এই পাইরোমিটার যন্ত্র উত্তপ্ত পদার্থের মধ্যে দেওয়া হয় না। অত্যুত্তপ্ত পদার্থ

থেকে বিচ্ছুরিত তাপ-রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের সংযোগস্থলে যে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত হয় (থার্মো-কাপ্‌ল ↑) গ্যালভ্যানোমিটারের ↑ সাহায্যে তা মেপে উৎসের তাপ-মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এজন্যে একে **থার্মো-ইলেক্‌ট্রিক থার্মোমিটার**-ও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যবস্থায় 'রেডিয়েসন পাইরো-মিটার,' 'অপ্‌টিক্যাল পাইরোমিটার' প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিভিন্ন রকম উষ্ণতামান-যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

পাইরোলুসাইট—ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর একটি খনিজ পদার্থ; প্রাকৃতিক ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, MnO_2। ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থ। প্রধানতঃ এই খনিজ থেকেই ম্যাঙ্গানিজ ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়।

পাইরেক্সিয়া — দেহের তাপবৃদ্ধি; জ্বরের অবস্থা। **পাইরেটিক** মানে জ্বর সম্বন্ধীয়; যেমন— অ্যাস্পিরিন ↑ একটা অ্যান্টি-পাইরেটিক ঔষধ।

পাইরেক্স গ্লাস — এক শ্রেণীর কাচের ব্যবহারিক নাম; যার মধ্যে সিলি-কেটের ↑ ভাগ বেশি থাকে। বিশেষ বিশুদ্ধ, নিষ্ক্রিয় ও তাপসহ কাচ; রাসায়নিক পরীক্ষায় এ-জাতীয় কাচের যন্ত্রাদিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (গ্লাস ↑)

পাইল—অ্যাটমিক পাইল ↑।

পাইলট প্ল্যাণ্ট—কোন শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের জন্যে গবেষণাগারে প্রথমে যে ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্র তৈরি করা হয়; উৎপাদন-প্রচেষ্টা সফল হলে যার অনুকরণে বৃহদাকার যন্ত্র বসিয়ে কল-কারখানা স্থাপিত হয়ে থাকে।

পাউণ্ড — পদার্থের ভর পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক, = 453·592 গ্র্যাম। বায়ুশূন্য স্থানে প্ল্যাটিনাম ধাতুর তৈরী একটা সিলিণ্ডারের বস্তু-পরিমাণকে (মাস ↑) এক পাউণ্ড ধরা হয়েছে। বস্তু-ভরের এই এককটিকে 'ইম্পিরিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ড পাউণ্ড' বলা হয়; বৃটিশ মিউজিয়ামে এটা সংরক্ষিত আছে। পাউণ্ডে আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একক, অর্থাৎ পদার্থের ওজনও বুঝায়। উল্লিখিত এক পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে পৃথিবী যে শক্তিতে (গ্রাভিটেসন ↑) আকর্ষণ করে, অর্থাৎ বস্তুটার ওজনকেও বলে এক পাউণ্ড। এভাবে পাউণ্ড এককে সাধারণতঃ বস্তুর ভর (মাস্ ↑) ও ওজন (ওয়েট ↑) উভয়ই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

পাউণ্ড্যাল — ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ডের হিসেবে বল-শক্তির (ফোর্স ↑) একক বিশেষ। যে পরিমাণ শক্তির প্রভাবে এক পাউণ্ড ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট হারে পরিবর্তিত হয়। এক পাউণ্ড্যাল বল-শক্তি এক পাউণ্ড ↑ ওজন বা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রায় 32 ভাগের এক ভাগ।

পাওয়ার — (1) যান্ত্রিক শক্তিতে সম্পাদিত কর্ম বা ওয়ার্কের ↑ হার; নির্দিষ্ট একক সময়ে কতটা ওয়ার্ক ↑ সম্পাদিত হয় তার পরিমাণ, (হর্স-পাওয়ার ↑)। (2) গুণিতকের সাংকেতিক (ইণ্ডেক্স) রাশি; যেমন x^3 হলো x 'টু-দি-পাওয়ার' 3 $= x \times x \times x$.

পাওয়ার (লেন্সের ↑) — কোন লেন্সের পাওয়ার হলো 1 ÷ (মিটার ↑ এককে লেন্সখানার ফোক্যাল দৈর্ঘ্য); ফোক্যাল দৈর্ঘ্য 2 মিটার হলে সে লেন্সের পাওয়ার হবে $\frac{1}{2} = 0{\cdot}5$ ডাই-অপ্টার (লেন্সের পাওয়ারের একক)। এই পাওয়ার কন্‌কেভ ↑ (অবতল) লেন্সে '—' মাইনাস, আর কনভেক্স ↑ (উত্তল) লেন্সে '+' প্লাস বলে উল্লেখ করা হয়।

পাওয়ার অ্যালকোহল — অবিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ↑, যা কল-কারখানার ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনে পাওয়ার, অর্থাৎ শক্তি উৎপাদন করে বলে এই নাম।

পামিটিক অ্যাসিড — একটা জৈব অ্যাসিড; চর্বিজাতীয় বিশেষ একটি ফ্যাটি ↑ অ্যাসিড, $C_{15}H_{31}COOH$; মোমের মত নমনীয় কঠিন পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ও চর্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে 'ট্রাই-পামিটিন' নামক যৌগিক পদার্থের আকারে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়।

পার—'অতিরিক্ত' অর্থে রাসায়নিক শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন, পারঅক্সাইড — স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত অক্সিজেন-সম্পন্ন অক্সাইড যৌগিক। এরূপ পারম্যাঙ্গানেট ↑, পারক্লোরেট ইত্যাদি।

পারফেক্ট গ্যাস— বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন, উষ্ণতা ও চাপের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতকগুলো নিয়মে বাঁধা (চার্লস-ল ↑, বয়েলস্-ল ↑)। কিন্তু এ সব নিয়ম কোন গ্যাসের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে খাটে না। যে সব গ্যাস এই সকল গ্যাসীয় সূত্র বা নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে বলে মনে করা হয়, তাদের বলা হয় পারফেক্ট বা **আইডিয়াল গ্যাস**। অবশ্য এ হিসাবে সর্বাংশে পারফেক্ট গ্যাস সচরাচর পাওয়া যায় না, কল্পনা করা হয় মাত্র।

পারম্যাঙ্গানেট — পারম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের ($HMnO_4$) বিভিন্ন সল্ট ↑; যেমন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$, সোডিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $NaMnO_4$, প্রভৃতি। উৎকৃষ্ট জীবাণুনাশক ও বীজবারক পদার্থ। পারম্যাঙ্গানেট সল্ট মাত্রেই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহ করে বলে এ-গুলো অক্সিডাইজিং এজেন্ট ↑ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পারম্যাঙ্গানেট বললে সাধারণতঃ পটাস পারম্যাঙ্গানেটই ($KMnO_4$) বুঝায়।

পার্গেটিভ —কোষ্টপরিষ্কারক ঔষধ ; যেমন — ক্যাষ্টর অয়েল, ম্যাগ-সাল্‌ফ ↑, ফ্রুটসল্ট ↑ ইত্যাদি।

পার্ম অ্যালয় — লোহা ও নিকেল ঘটিত এক শ্রেণীর সংকর ধাতু ; এ-গুলো উচ্চ চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশ এ দিয়ে তৈরি হয়। এরূপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পরিবর্তী (অল্টারনেটিং ↑) তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় শক্তির অপচয় কম হয়।

পার্ল—মুক্তা ; শুক্তি, অর্থাৎ ঝিনুকের দেহ-নিঃসৃত এক প্রকার জৈব রস খোলার মধ্যে জমে কঠিন হয়ে এর সৃষ্টি হয়। উজ্জ্বল সাদা মূল্যবান পদার্থ ; কিন্তু রাসায়নিক হিসেবে মূলতঃ জিনিসটা হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$, অর্থাৎ এক রকম প্রস্তর মাত্র।

পার্ল অ্যাস—পটাসিয়াম কার্বনেটের (K_2CO_3) বিশেষ নাম ; কাঠের ছাই থেকে এই পটাস সল্টটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পার্ল স্পার — একটা যুগ্ম কার্বনেট খনিজের বিশেষ নাম ; ম্যাগ্নেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের স্বভাবজাত মিশ্র কার্বনেট, $MgCO_3.CaCO_3$; একে আবার ডলোমাইট-ও ↑ বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ কঠিন প্রস্তর প্রধানতঃ এ দিয়ে গঠিত।

পাস্তুর, লুই—ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী; জন্ম 1822 খৃঃ, মৃত্যু 1895 খৃঃ। জীবাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্ব। 1857 খৃস্টাব্দে অ্যালকোহল ↑ ও দুধের গাঁজন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রচার করে বায়ুবাহিত অদৃশ্য জীবাণুর প্রভাব বিশ্লেষণ। সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুঘটিত কারণ নিরূপণ — অদৃশ্য সব রোগ-জীবাণুর কার্যকারিতা প্রমাণ ও প্রতিকার ব্যবস্থায় 'টিকা' প্রবর্তন। পরবর্তীকালে ক্ষতচিকিৎসায় লিষ্টারের ↑ জীবাণু-প্রতিরোধক (অ্যান্টিসেপ্টিক ↑) ঔষধ আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন। দুশ্চিকিৎস্য অ্যানথ্রাক্স ↑, হাইড্রোফোবিয়া ↑ প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার। দুধের পাস্তুরিজেসন ↑ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন। জীবাণু-তত্ত্বের আবিষ্কারে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন।

পাস্তুরিজেসন—কোন তরল পদার্থ (বিশেষতঃ দুধ) উপযুক্ত উত্তাপে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তার ভিতরের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলবার প্রক্রিয়া। দুধ সাধারণতঃ 65° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে 30 মিনিট কাল ফুটালে তা সব রকম দূষিত জীবাণুমুক্ত, অর্থাৎ পাস্তুরাইজ ড হয়ে থাকে।

প্যাকিডার্ম — মোটা ও শক্ত চামড়া বিশিষ্ট প্রাণিগোষ্ঠি ; যেমন—হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি।

প্যাপিন — কাঁচা পেঁপের দুগ্ধবৎ সাদা রস ; প্রোটিন ↑ জাতীয় খাদ্য-বস্তু জীর্ণ করবার এর এক অসাধারণ

রাসায়নিক ক্ষমতা আছে। এর বিশুদ্ধ চূর্ণ ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়।

প্যান্‌ক্রিয়াস — পাকস্থলীর নিম্নস্থ নলপথের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন পত্রাকার একটি প্রত্যঙ্গ; পাকস্থলীর নির্গম-মুখের প্রায় তিন ইঞ্চি নিচে এই প্যা স. থেকে বিভিন্ন জারক-রস ভুক্ত খাদ্যের সঙ্গে মিশে ক্ষুদ্রান্ত্রে (স্মল ইণ্টেস্টাইন ↑) যায়। চার রকম বিভিন্ন জারক-রস এ থেকে নিঃসৃত হয়, যাদের একটা হলো ইন্‌স্থলিন ↑, যার অভাবে বহুমূত্র, অর্থাৎ 'ডায়েবিটিস' ↑ রোগ হয়।
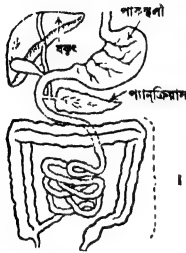
প্যান্‌ক্রিয়াস

প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিল্ম — ফটোগ্রাফির সাধারণ ফিল্মে লাল বর্ণ (আলোক-রশ্মি) ধরা পড়ে না, কিন্তু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিল্মের উপরে লাল বর্ণ সমেত সকল বর্ণের তারতম্যই যথাযথভাবে সাদা-কালোতে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। এর ফলে অর্থোক্রোমেটিক ↑ ফিল্মের চেয়েও এতে বিভিন্ন বর্ণানুপাতিক ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট স্পষ্টতর আলোকচিত্র পাওয়া যায়।

প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডস — থাইরয়েড ↑ গ্ল্যাণ্ডের পাশে ও পশ্চাতে অবস্থিত ছোট ছোট চারটি গ্ল্যাণ্ড ↑ বা গ্রন্থি। এগুলি আমাদের দেহে ক্যালসিয়াম ↑ এবং ফস্‌ফরাসের ↑ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদের অত্যধিক সক্রিয়তায় হাড়ে ক্যাল্‌সিয়াম উপাদান কমে গিয়ে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে; পক্ষান্তরে রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ বাড়ে ও ফস্‌ফরাসের ভাগ কমে যায়। এর ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

প্যারাফর্ম — প্যারাফর্ম্যাল্ডিহাইডের বিশেষ নাম; ফর্ম্যাল্ডিহাইডের একটি পলিমার ↑ যৌগিক পদার্থ। জিনিসটা উত্তপ্ত করলে সহজেই ফর্ম্যাল্ডিহাইডে ↑ পরিণত হয়। প্রচুর ধূম-উৎপাদক পদার্থ।

প্যারাফিন — মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বুটেন, পেণ্টেন প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম। এই শ্রেণীর সব হাইড্রোকার্বনকেই প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন ↑ বলে। এ-গুলো গ্যাসীয়, তরল বা কঠিন সব অবস্থারই আছে; এদের যে-গুলোতে কার্বনের ভাগ কম সে-গুলো গ্যাসীয়, (যেমন—মিথেন ↑, ইথেন ↑ প্রভৃতি); কার্বনের ভাগ বেড়ে হয় তরল প্যারাফিন, (যেমন পেণ্টেন, হেক্সেন প্রভৃতি); আবার কার্বনের ভাগ যে-গুলোতে আরও বেশি সে-গুলো কঠিন প্যারাফিন (ওয়াক্স), যা দিয়ে মোমবাতি, বিভিন্ন মলম, পালিশ প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

প্যারাফিন অয়েল – বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ; খনিজ

পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। সাধারণ জ্বালানি তেল বা কেরোসিন, মোবিল অয়েল, পেট্রল প্রভৃতি হলো বিভিন্ন শ্রেণীর প্যারাফিন অয়েল। এর কোন কোনটা দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়; কোনগুলো আবার ইঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্যারাল্ডিহাইড — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের পলিম্যারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ, $(CH_3CHO)_3$; জীবদেহ অনুভূতিশূন্য ও তন্দ্রাচ্ছন্ন করবার জন্যে এই তরল পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্যারালালোপিপেড — ছয়টি তল-বিশিষ্ট লম্বাটে আকারের কঠিন বস্তু, অথবা ঐরূপ জ্যামিতিক আকারের সরল-রৈখিক ক্ষেত্র।

প্যারালিসিস — পক্ষাঘাত রোগ; মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতায় আংশিক বা সামগ্রিকভাবে দেহের মাংস-পেশীর অসাড়তা ও সঞ্চালনের অক্ষমতাজনিত ব্যাধি। একেবারে অসাড় না হয়ে মাংসপেশী দুর্বল ও অল্প সঞ্চালনক্ষম হলে সে-অবস্থাকে বলে **প্যারিসিস**।

প্যারাল্যাক্স— কোন দূরবর্তী বস্তুকে বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ্য করলে তার অবস্থান তুলনামূলকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় বলে ভ্রম হয়। এভাবে দর্শকের গতি বা স্থান পরিবর্তনের ফলে দৃষ্ট পদার্থেরও অবস্থান বদলে যায় বলে দূর থেকে মনে হয়। এই দৃষ্টি-ভ্রমকেই বলে প্যারাল্যাক্স। পৃথিবীর দৈনিক গতি-জনিত প্যারাল্যাক্সের ফলে দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের দৃষ্ট অবস্থান ও প্রকৃত অবস্থান এক থাকে না, যেখানে দেখছি, সেখানে ওটা প্রকৃতপক্ষে নেই। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলেও আর এক রকম প্যারাল্যাক্স হয়। গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের গাণিতিক হিসাবে এরূপ প্যারাল্যাক্স-জনিত ভ্রম সংশোধন করে নেওয়া সব সময়ে আবশ্যক হয়ে থাকে (অ্যাবারেসন ↑)।

প্যারাল্যাক্স

প্যারাসাইট — পরগাছা ও পরজীবী প্রাণী; যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদ অপর কোন জীব বা উদ্ভিদকে আশ্রয় করে ও তাদের দেহ-রস শোষণ করে বেঁচে থাকে; যেমন— অন্ত্রের কৃমি, মাথার উকুন প্রভৃতি। অর্কিড ↑ প্রভৃতি এরূপ নানা রকম পরগাছা শ্রেণীর উদ্ভিদও আছে।

প্যারাসাইট অর্কিড

প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড — মুখের নিম্ন-চোয়ালের প্রান্তে, কর্ণমূলের কাছে অবস্থিত একটি গ্ল্যাণ্ড ↑ বিশেষ। এর কাজ হলো মুখে লালা(স্যালিভা ↑) রস নিঃসরণ করা। এই গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও প্রদা-হের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে 'মাম্স্' বা 'গলফাঁস' নামক ভাইরাস ↑ ঘটিত এক প্রকার রোগ হয়।

প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড

প্যারিস গ্রিন— রাসায়নিক পদার্থ, কপার আর্সেনাইট এবং কপার অ্যাসিটেটের মিলিত যৌগিক সল্ট $Cu(CH_3COO)_2.3Cu(AsO_2)_2$; একে আবার 'সুইন্‌ফার্ট গ্রিন'-ও বলে। কীটপতঙ্গ-নাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্যালাডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Pd. পার-মাণবিক ওজন 166·7, পারমাণবিক সংখ্যা 46; রূপোর মত সাদা ধাতু। প্ল্যাটিনামের প্রায় অনুরূপ। খনিজ পদার্থে প্ল্যাটিনামের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে এবং সংকর ধাতু তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

প্যালিওণ্টোলজি— প্রাচীন কালের বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম (ফসিল ↑) প্রভৃতির গবেষণার ফলে পৃথিবীতে উদ্ভব ও বংশধারা নির্ণয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। এরূপ **প্যালিও-বোটানি** হলো প্রাচীন কালের শিলীভূত উদ্ভিদাদির পর্যালোচনার দ্বারা পৃথিবীতে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। **প্যালিও** মানে প্রাচীন বা পুরাতন।

প্যালিওজোইক — প্রায় 50 কোটি বছরের অতীত যুগ, যখন পৃথিবীতে আদি জীব-সত্তার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। **প্যালিওসিন** যুগ হলো যখন থেকে বর্তমান কালের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে, প্রায় 5 কোটি বছর পূর্বের যুগ।

প্যাস্কাল, ব্লেসি — ফরাসী ধর্ম-যাজক ও দার্শনিক; জন্ম 1623 খৃঃ, মৃত্যু 1662 খৃঃ। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অসামান্য কৃতিত্ব; ধর্ম-যাজকের কাযাবকাশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গণিতচর্চা। বায়ুর ওজন ও তরল পদার্থের স্থিতিশক্তির সূত্র নির্ধারণ। 'হাইড্রলিক' প্রেস ↑ যন্ত্র উদ্ভাবন। গণিতের 'কনিক সেক্সন' ও 'ইন্‌ফিনিটিসিম্যাল ক্যাল্‌কুলাস' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন এবং 'সম্ভাবনা বাদ' (থিয়োরি অব প্রোবেবিলিটি) প্রবর্তনের জন্য চিরস্মরণীয়।

প্যাস্ক্যাল্স-ল — জলের (বা, যে কোন তরল পদার্থের) চাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ব্লেসি প্যাস্ক্যাল ↑ কর্তৃক প্রবর্তিত সূত্র। কোন পাত্রস্থ তরল পদার্থের কোন অংশে চাপ দিলে সেই চাপ সমভাবে সব দিকে পরি-

বাহিত হয়। এক জায়গায় চাপ প্রয়োগ করলে অন্য সব জায়গায় সেই চাপ গিয়ে সমভাবে পৌঁছায়।

হাইড্রলিক প্রেসারের পরীক্ষা
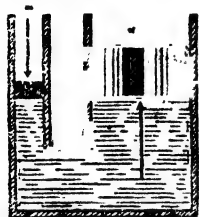
এর ফলে এক বর্গ ইঞ্চিতে 2 পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 2 পাউণ্ড হিসেবে 100 বর্গ ইঞ্চিতে মোট 200 পাউণ্ড পরিমাণ বর্ধিত চাপ পড়বে। এই নিয়মের ব্যবহারিক প্রয়োগে হাইড্রলিক প্রেস ↑ তৈরি হয়েছে।

প্যাসিভ আয়রন — যে লোহার উপরিভাগে আয়রন-অক্সাইডের ↑ (মরিচার) একটা পাতলা আবরণ দিয়ে তাকে বিভিন্ন অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রভাব থেকে রক্ষা করা হয়। তীব্র নাইট্রিক ↑ অ্যাসিডে অল্পক্ষণ ডুবিয়ে, অথবা কোন অক্সিডাইজিং ↑ পদার্থের সাহায্যে এরূপ অক্সাইডের আবরণ দিয়ে লোহাকে প্যাসিভ করা যায়। ক্রোমিয়াম নিকেল, টিন প্রভৃতি ধাতুও এভাবে 'প্যাসিভ' করা যেতে পারে। এরূপ সব ধাতুকে বলে 'প্যাসিভ মেটাল'। কোন অ্যাসিডের সঙ্গে সহজে এদের রাসায়নিক সংযোগ হয় না।

পিউমিস—স্পঞ্জের মত বিশেষ সছিদ্র এক প্রকার হাল্‌কা পাথর, আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গলিত লাভা ↑ প্রস্তরীভূত হয়ে এরূপ হাল্‌কা পাথরের সৃষ্টি হয়।

পিক্রিক অ্যাসিড—চক্‌চকে হলদে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, $C_6H_2(NO_2)_3OH$; রাসায়নিক গঠনের হিসেবে একে ট্রাইনাইট্রো-ফিনল ↑ বলা যেতে পারে। এটা বিষাক্ত ও বিস্ফোরক পদার্থ। এর জলীয় দ্রব পোড়া-ঘায়ে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জক পদার্থে ও বিস্ফোরক হিসেবে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

পিগ্‌ আয়রন — অবিশুদ্ধ লৌহ; লোহার বিভিন্ন খনিজ-পদার্থ থেকে ব্লাস্ট ফার্নেস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে লৌহ নিষ্কাশিত হয়। এই শ্রেণীর লোহা দিয়েই রেলিং, কড়াই প্রভৃতি ঢালাইয়ের কাজ করা হয়. এজন্যে একে সাধারণতঃ ঢালাই-লোহা বা 'কাস্ট আয়রন' বলে।

পিগ্‌মেণ্ট — যে সব রঙীন পদার্থ তেল বা কোন আঠালো পদার্থে মিশিয়ে বিভিন্ন জিনিসের উপরিভাগে আস্তরণের মত রং লাগানো হয়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ (ডাই ↑) ও পিগ্‌মেণ্টের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ডাই-শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ সাধারণতঃ জলে দ্রবণীয় হয়, আর সেই দ্রব জিনিসের তন্তু বা আঁশের মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু পিগ্‌মেণ্ট জলে দ্রবণীয় নয়, এর সূক্ষ্ম কণিকাগুলো জিনিসের উপরিভাগে লেগে থাকে

মাত্র, কাজেই প্রয়োজন হলে তাকে ঘসে উঠিয়ে ফেলা হয়।

পিচ ব্লেণ্ড — প্রধানতঃ এটা ইউরেনিয়াম ↑ অক্সাইডের (U_3O_8) আকরিক একটা খনিজ পদার্থ। এর মধ্যে আবার সামান্য পরিমাণে রেডিয়ামও ↑ থাকে। এই পিচব্লেণ্ড থেকেই মাদাম কুরি ↑ রেডিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কার করেন। পূর্ব আফ্রিকা, বোহিমিয়া প্রভৃতি স্থানে পিচব্লেণ্ড প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড — মুখগহ্বরের ঊর্ধে মগজের নিম্নভাগে মটর দানার মত যে গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিটি আছে। দেহের সব অন্তঃস্রাবী (এণ্ডোক্রেন ↑) গ্ল্যাণ্ডের কার্যকারিতার উপরে এর বিশেষ একটা নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব আছে। এটাতে ছয় রকম বিভিন্ন হর্মোন ↑ উৎপাদিত হয় বলে জানা গেছে; দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শক্তি, উদ্যম প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণে গ্ল্যাণ্ডটির কার্যকারিতা মানবদেহের পক্ষে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক। এর স্বাভাবিকতার অভাবে দেহের বৃদ্ধি ও যৌন শক্তি বিলম্বিত ও ব্যাহত হয়; আবার এই গ্ল্যাণ্ডের অতি-সক্রিয়তায় অল্প বয়সেই যৌনবোধ প্রবল হয়, এবং সব ইন্দ্রিয়ই অত্যধিক সক্রিয় হয়ে অকালে বার্দ্ধক্য আসে।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড

পিটুইট্রিন —পিটুইটারি ↑ গ্ল্যাণ্ডের অন্যতম হর্মোন ↑, বা জৈব রস; এর প্রভাবে সন্তান প্রসবের সময়ে প্রসূতির গর্ভাধার (ইউটারাস ↑) সঙ্কুচিত হয়ে সুপ্রসবে সাহায্য করে।

পিথাগোরাস — গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ; আনুমানিক জীবনকাল 570 খৃঃ পূঃ থেকে 500 খৃঃ পূঃ। ধ্বনি-বিজ্ঞানে অমূল্য অবদান; শব্দতরঙ্গের ক্রমিক পর্যাবৃত্তির তারতম্যে সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উদ্ভব সম্পর্কীয় তথ্য প্রচার। গণিতের বিভিন্ন আনুপাতিক সূত্রের সম্প্রসারণ, জ্যামিতির বিখ্যাত উপপাদ্য (পিথাগোরাস থিয়োরেম ↑) প্রবর্তন। মানবাত্মার অবিনশ্বরতা ও পূর্বজন্ম বিষয়ক মতবাদের প্রবর্তক।

পিথাগোরাস থিওরেম — একটি জ্যামিতিক উপপাদ্য বিশেষ; সমকোণী ত্রিভূজের অতিভূজের বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপরিস্থিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।

পিনিয়ন — যন্ত্রাদির ক্ষুদ্রাকার দাতকাটা চাকা, যা অপর কোন অপেক্ষাকৃত বড় চাকার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে; যেমন, ঘড়িতে নানা রকম ছোটবড় 'পিনিয়ন-'হুইল থাকে।

পিপেট — তরল পদার্থ পরিমাপের জন্যে আয়তনের দাগ-কাটা সরু কাচ নল; রসায়নাগারে মুখ দিয়ে চুষে

অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ তুলে নিতে অথবা মেশাতে যে-নল ব্যবহার করা হয়।

পিপেট

পিরিয়ডিক টেবল—মৌলিক পদার্থগুলোর পারমাণবিক সংখ্যার হিসেবে তৈরি একটা ছক-কাটা পর্যায় ক্রমিক তালিকা। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গুণ ও ধর্মের যে পৌনঃপৌনিক পর্যায়-ক্রম লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ↑ একটা সুসম্বদ্ধ সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন, যা **পিরিয়ডিক-ল** নামে পরিচিত। এই সূত্রানুসারে তিনি মৌলিক পদার্থগুলোকে তাদের গুণ ও ধর্মের পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে এই 'পিরিয়ডিক টেবল' বা পর্যায়ক্রমিক ছক তৈরি করে গেছেন। একে 'মেণ্ডেলিফস্ পিরিয়ডিক টেবল' বলা হয়। এতে সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থগুলো তাদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মানুসারে এবং পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যবধানে ও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত রয়েছে। এই ছকে কোন মৌলিক পদার্থের স্থান দেখে তার গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যাদি প্রায় সুনির্দিষ্টভাবে অনুমান করা যায়। মেণ্ডেলিফ তাঁর এই পিরিয়ডিক টেবলে তৎকাল পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত কতকগুলি মৌলিক পদার্থের স্থান শূন্য রেখে সেগুলির অস্তিত্ব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর সেই সম্ভাবনা অনুযায়ী পরে সে-সব নূতন মৌলিক পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পিস্টিল — ফুলের স্ত্রী-প্রজনন অঙ্গ, ফুলের মধ্যবর্তী যে-অংশ বীজাধার (গর্ভাশয়, ওভ্যারি ↑) গর্ভমুণ্ড (স্টিগ্মা ↑) এবং এদের সংযোজক গর্ভদণ্ড (স্টাইল ↑) নিয়ে গঠিত।
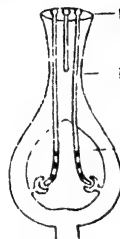
ফুলের 'পিষ্টিল' অংশ

পেট্রল — খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ শোধন করে যে হাল্কা দাহ্য তৈল পাওয়া যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হেক্সেন, হেপ্টেন, অক্টেন ↑ প্রভৃতি নানারকম হাইড্রোকার্বনের জটিল সংমিশ্রণ মাত্র। এ-গুলো ছাড়া আরও অনেক জৈব দাহ্য পদার্থ এর মধ্যে মিশ্রিত থাকে। একে **গ্যাসোলিন**-ও বলা হয়। উৎকৃষ্ট হাল্কা জ্বালানি তেল হিসেবে বর্তমান যুগে এর মূল্য সর্বাধিক। মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির সব 'ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন' ↑ এই পেট্রলে চলে।

পেট্রোলিয়াম— বিভিন্ন স্বভাবজাত হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণ। এর মধ্যে নানারকম জৈব রাসায়নিক পদার্থও থাকে। ভূগর্ভে সঞ্চিত এই অবিশুদ্ধ ঘন তরল দাহ্য পদার্থ পাম্প

করে তোলা হয়। বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ামের রাসায়নিক গঠন অবশ্য কতকটা বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে; আমেরিকার পেট্রোলিয়ামে প্যারাফিনের ↑ ভাগ বেশি, আবার রাশিয়ার পেট্রোলিয়ামে বেঞ্জিন ↑ প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের আধিক্য দেখা যায়। ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেসন ↑ অর্থাৎ আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অবিশুদ্ধ খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রল ↑, প্যারাফিন অয়েল ↑, ভেসেলিন ↑ বা **পেট্রোলিয়াম জেলি,** প্যারাফিন-ওয়াক্স প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম ইথার — খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর হাল্‌কা ও তরল হাইড্রোকার্বনগুলোর যে সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে পেণ্টেন ↑ এবং হেক্সেন ↑ নামক দু'রকম হাইড্রোকার্বন।

পেট্রোলেটাম — পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত একটা মিশ্র হাইড্রোকার্বন; একে 'পেট্রোলিয়াম জেলি' বা ভেসেলিন-ও বলা হয়। অবিশুদ্ধ খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করবার সময়ে ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় এই নরম পদার্থটা পাওয়া যায়। জিনিসটা বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণে গঠিত; সাদা বা হলদে বর্ণের নরম (অর্ধ কঠিন) একটা তৈলাক্ত পদার্থ।

পেনাম্ব্রা — প্রচ্ছায়া; আধা-অন্ধকার ছায়া। কোন অনচ্ছ বস্তুর বাধা পেলে আলোক-রশ্মি প্রতিহত হয়ে বাধার পশ্চাতে গাঢ় অন্ধকার ছায়া

চন্দ্রগ্রহণের সময়ে আমব্রা ও পেনাম্ব্রার সৃষ্টি
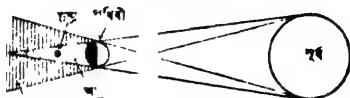
(আম্ব্রা ↑) ফেলে, তার দু'দিকে (গোলাকার বস্তু হলে চারদিকে) যে অর্ধালোকিত ছায়া পড়ে তাকে বলে পেনাম্ব্রা; যেমন পূর্ণগ্রহণের (ইক্লিপ্‌স ↑) সময়ে চাঁদে পৃথিবীর ছায়ার চারদিকে প্রচ্ছায়া পড়ে।

পেণ্টা — পাঁচ সংখ্যক, বা পাঁচ গুণ বুঝাতে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যেমন—পেণ্টাগন, পেণ্টেন ↑, পেণ্টক্সাইড ইত্যাদি।

পেণ্টোজ—সুমিষ্ট ফলের রস থেকে প্রস্তুত যে-শর্করার (ফ্রুট সুগার ↑) অণুতে পাঁচটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো এ-শ্রেণীর শর্করা জলীয় দ্রবে সহজে গেঁজে যায় না।

পেণ্টোথ্যাল — ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য করবার একটা ঔষধের ব্যবহারিক নাম। এটা বার্বিটুরেট ↑ জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। শস্ত্র-চিকিৎসার (সার্জারি ↑) সময়ে শিরার রক্তে ইঞ্জেকসন করে দিয়ে রোগীকে অসাড় অচৈতন্য করতে

ব্যবহৃত হয়। এর রাসায়নিক নাম হলো 'থায়োপেণ্টোন'।

পেণ্টেন—প্যারাফিন শ্রেণীর একটা তরল হাইড্রোকার্বন, C_5H_{12}; এর তিন রকম আইসোমার ↑ থাকতে পারে। খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে পাওয়া যায়।

পেন্সিল লেড — পেন্সিলের সিস্ গ্র্যাফাইটে ↑ তৈরি, যদিও একে 'লেড পেন্সিল' বলে, কিন্তু এতে লেড ↑ বা সীসা কিছুমাত্র থাকে না। গ্রাফাইটের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে এক প্রকার নরম মাটি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরণের শক্ত বা নরম পেন্সিল তৈরি করা হয়।

পেণ্ডুলাম — দোলক যন্ত্র। কোন ভারী ধাতু-খণ্ড সুতা বা তারে ঝুলিয়ে দোলক তৈরি করা হয়। দুলিয়ে দিলে ওই ধাতব খণ্ড এদিক ওদিক দুলতে থাকে। এরূপ দোল খাওয়ার সময়ে সুতা বা তারের স্থির প্রান্তে যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন হয়, আর ওই সুতা বা তারের ওজন যদি অতি সামান্য হয়, তাহলে একটা পূর্ণ দোল খেতে ওই পেণ্ডুলামের যে সময় লাগে তা এই সূত্রানুসারে নির্দিষ্ট হয়: $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$; এখানে T হলো সময়, l সুতার বা তারের দৈর্ঘ্য, g মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ত্বরণ (অ্যাক্সিলারেসন ডিউ টু-গ্র্যাভিটি ↑), গাণিতিক সংকেত-চিহ্ন π (পাই ↑) = 22/7; পেণ্ডুলামের এই দোলন-কাল সর্বদা এরূপ নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট থাকে বলে ঘড়িতে উহা ব্যবহৃত হয়।
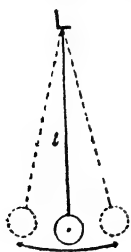
l

পেণ্ডুলাম

পেনি ওয়েট — ট্রয় ↑ ওজনের একটা পরিমাণ, = 24 গ্রেণ। এক ট্রয়-আউন্স ওজনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

পেনিসিলিন — 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' নামক এক প্রকার ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) থেকে যে জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ↑ ঔষধ; এর প্রয়োগে জীবদেহে বিশেষ কতকগুলো রোগ-জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে রোগ প্রশমিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ↑ আবিষ্কার করেন।

পেপ্‌সিন — পাকস্থলীর জারক রসে উৎপন্ন এক রকম এন্‌জাইম ↑ পদার্থ। খাদ্যের প্রোটিন ↑ উপাদান এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় পেপ্টোন ↑ নামক জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই পেপ্টোন দেহের মাংসপেশী গঠন করে। পাকস্থলীর অম্লরসের মাধ্যমে বিশেষ জটিল প্রক্রিয়ায় এই সব রূপান্তরের কাজ চলে।

পেপ্টোনাইজ্‌ড ফুড — কৃত্রিম উপায়ে পেপ্‌সিন ↑ ও প্যান্‌ক্রিয়া-

টিন ↑ (প্যান্‌ক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ড ↑) দ্বারা অর্ধজারিত খাদ্য। এভাবে খাওয়ার আগেই অনেকটা জারিত ও সহজ-পাচ্য করে অনেক সময় রোগীকে এরূপ লঘু খাদ্য দেওয়া হয়।

পেরিগায়েনাস — যে-সব ফুলের বৃন্তের শীর্ষভাগ বাটির আকারে গঠিত হয়ে দল বা পাপড়িগুলি তার ভিতরে চারধার ঘিরে জন্মায়। এই শ্রেণীর ফুলের বীজাধার বা ওভারি ↑ থাকে ওই বাটির মধ্যস্থলে; যেমন, চেরি ফুল, করবী ফুল ইত্যাদি।
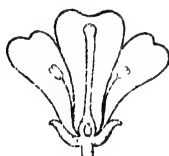
পেরিগায়েনাস ফুল (অর্ধাংশ কাটা)

পেরিনিয়্যাল প্ল্যাণ্ট — বহু বর্ষ-জীবী উদ্ভিদ; যে-সব উদ্ভিদ বহু বছর বাঁচে ও ফুল-ফল দেয়। যে গুলির ফুল-ফল হয়, আর এক বছরেই মরে যায় তাদের বলে **অ্যান্যুয়্যাল** প্ল্যাণ্ট অর্থাৎ 'বর্ষজীবী উদ্ভিদ'।

পেরিমিটার—চতুর্দিকস্থ সীমারেখার দৈর্ঘ্য; কোন ত্রিভূজের পেরিমিটার হলো বাহু তিনটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি। বৃত্তের (সার্কেল ↑) পেরিমিটারকে বলে পরিধি (সারকাম্‌ফারেন্স ↑)।

পেরিস্কোপ — যে যন্ত্রের সাহায্যে সম্মুখস্থ দেয়াল অথবা অপর কোন বাধার অপর দিকের অদৃশ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবি দর্শকের চোখে দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। চিত্রে সাধারণ এক রকম পেরিস্কোপ দেখানো হয়েছে,—একটা টিনের বা কাঠের চোঙের মধ্যে উপর-নিচে দু'খানা আয়না এমনভাবে লাগানো হয় যে, উচু করে ধরলে বাধার অপর দিকের অদৃশ্য বস্তু থেকে আগত আলোক-রশ্মি উপর-দিকের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে চোঙের নিচের দিকে গিয়ে নিচের আয়নায় পুনরায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মি সমকোণে বেরিয়ে এসে চোঙের নিচের একটা ছিদ্রপথে দর্শকের চোখে পড়ে, আর এভাবে বস্তুটার প্রতিবিম্ব তার দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। আয়নার বদলে এতে ত্রিকোণ-কাঁচও (প্রিজ্‌ম ↑) বসানো যেতে পারে। জলের নিচে 'সাবমেরিন জাহাজ' থেকে উপরের দৃশ্যাবলী দেখবার জন্যে এরূপ পেরিস্কোপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ-রকম পেরিস্কোপে আবার দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ ↑) যন্ত্রও ব্যবহার করা যায়, যাতে জলের উপরের অনেক দূরবর্তী বস্তুও যন্ত্রের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

পেরিস্কোপ

পেল্‌ভিস — মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে সংলগ্ন (দেহের পশ্চাদ্দেশের) শ্রোণী-হাড়ের কাঠামো, যার সঙ্গে পদদ্বয়ের
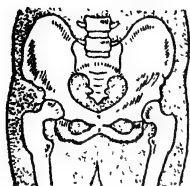
হাড় যুক্ত আছে। এটা দেহকাণ্ডের নিম্নস্থ অনেকটা গোলাকার একক অস্থি-সংস্থান; একে শ্রোণীচক্র, বা বস্থি-কাঠামো ও বলা হয়।

পেল্‌ভিস বা শ্রোণীচক্র

পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি — বিশেষ অবস্থিতি বা সংস্থানের ফলে পদার্থে যে শক্তি সঞ্জাত হয়। কোন উচ্চ স্থানে সঞ্চিত জল পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি, বা স্থৈতিক শক্তি লাভ করে। ওই জল নীচে প্রবাহিত করলে ওর পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি আবার 'কাইনেটিক এনার্জি' বা গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জলের এরূপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ↑, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর ↑ প্রভৃতি চালানো হয়। আবার, একটা জড়ানো তারের স্প্রিং-এ তার ঐরূপ অবস্থিতির ফলে পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি জন্মায়; টেনে সোজা করতে গেলে জোর লাগে—ছেড়ে দিলে সবেগে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্বাভাবিক অবস্থা বা সংস্থান থেকে কোন পদার্থকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, তা থেকে পোটেন্সিয়্যাল এনার্জির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিক সংস্থানে বা অবস্থায় পদার্থের কোন পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি থাকে না।

পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স— তড়িতাবিষ্ট দুই স্থানের মধ্যে তড়িৎ-চাপের (ভোল্টেজ ↑) বৈষম্য। এরূপ দুই স্থান যদি কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের (কণ্ডাক্টর ↑, যেমন—তামার তার) দ্বারা যুক্ত করা যায়, তাহলে তার মাধ্যমে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎ-স্রোত উচ্চ চাপবিশিষ্ট স্থান থেকে নিম্ন-চাপের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তড়িৎ-চাপের এই বৈষম্য (পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স) না থাকলে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটবে না। তড়িৎ-চাপের এই বৈষম্য (P.D.) ভোল্ট ↑ এককে মাপা হয়।

পোল — (1) ম্যাগ্নেটিক পোল, বা চৌম্বক প্রান্ত। কোন চুম্বক-দণ্ডের দুই প্রান্তীয় অংশে চুম্বকীয় শক্তি প্রবল থাকে, লোহার টুকরা ওই দুই স্থানে অধিক আকৃষ্ট হয়। এর এক প্রান্তকে বলে চুম্বকটির 'নর্থ পোল',
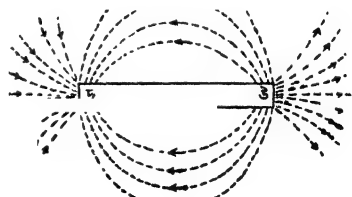
ম্যাগ্নেটিক পোল ও লাইন্‌স অব ফোর্স

বা উত্তর-প্রান্ত ; অপর প্রান্তকে বলে 'সাউথ পোল', অর্থাৎ দক্ষিণ-প্রান্ত। চৌম্বক শক্তি উত্তর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে রেখার আকারে (ম্যাগ্নেটিক লাইনস্ অব ফোর্স) দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছায়। চুম্বকদণ্ডটা সুতায় ঝুলিয়ে দিলে, বা সহজে ঘুরতে পারে এমন-ভাবে রাখলে, ওর উত্তর প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে ও দক্ষিণ প্রান্ত সর্বদা মোটামুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। চুম্বকের এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই কম্পাস↑ বা 'দিগ্‌দর্শন যন্ত্র' তৈরি হয়েছে। কোন চুম্বকের (ম্যাগ্‌নেট↑) চুম্বকীয় আকর্ষণ-শক্তি **'ম্যাগ্নেটিক পোল স্ট্রেংথ'** এককে প্রকাশ করা হয়। (2) পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে 'নর্থ পোল' ও 'সাউথ পোল' বলে, যাকে বলা হয় 'টেরে-স্ট্রিয়্যাল পোল'। (3) পোল আবার দৈর্ঘ্যেরও একটা ইংলণ্ডীয় মাপ ;—$5\frac{1}{2}$ গজ।

পোলারয়েড — আলোক-রশ্মি পোলারাইজড্ (পোলারিজেসন↑) করবার জন্যে ব্যবহৃত এক রকম পাতলা স্বচ্ছ ফিল্মের↑ ব্যবহারিক নাম। সেলুলোজ নাইট্রেটের (নাইট্রোসেলুলোজ↑) তৈরি এই ফিল্মের উপর কুইনিন ও আয়োডিনের↑ একটা যৌগিক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম (আলট্রা-মাইক্রোস্কোপিক↑) চূর্ণ মাখিয়ে পোলারয়েড্ তৈরি হয়। এর মাধ্যমে আলোকরশ্মি পোলারাইজ্‌ড হয়, অর্থাৎ বিশেষ একমুখী তরঙ্গগুলোই ওটা ভেদ করে যেতে পারে ; অন্যান্য তরঙ্গ আটকে বাদ পড়ে যায়।

পোলারিজেসন — (1) ইলেক্‌ট্রিক সেলে↑ এবং ইলেক্‌ট্রোলিসিস↑ প্রক্রিয়ায় ইলেক্‌ট্রোডের↑ গায়ে গ্যাসীয় পদার্থ জমে গিয়ে তড়িৎ-উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে বাধার সৃষ্টি হয় (ডিপোলারাইজার↑)। (2) তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। এই আলোক-তরঙ্গ তার গতিপথের লম্বভাবে (ট্রান্সভার্স↑, অর্থাৎ উপর-নিচে) সঞ্চালিত হয়। সাধারণ আলোক এরূপ তরঙ্গের অসংখ্য বিভিন্নমুখী ধারা-প্রবাহের বা রশ্মির বিচ্ছুরণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ কৌশলে এ-সব বিভিন্নমুখী তরঙ্গ থেকে একমুখী তরঙ্গ পৃথক করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলে 'পোলারিজেসন অব লাইট'। নিকল প্রিজ্‌ম↑, পোলারয়েড↑ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি বিশেষ কৌশলে পরিচালিত করলে একমুখী তরঙ্গবিশিষ্ট আলোক, বা 'পোলা-রাইজ্‌ড লাইট' পাওয়া যায়।

পোলারিমিটার—যে যন্ত্রের সাহায্যে পোলারাইজড্↑ আলোক-তরঙ্গের স্পন্দনগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সাধারণ

আলোক-তরঙ্গ তার গতিপথের লম্বভাবে স্পন্দিত হয়; এই সব তরঙ্গ-স্পন্দন যতটা ঘুরিয়ে বা বেঁকিয়ে পোলারিজেশন ↑ ঘটানো হয়, তা এই পোলারিমিটার যন্ত্রে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

পোলারিস্কোপ—যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-রশ্মির বিভিন্নমুখী তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে বিশেষ একমুখী তরঙ্গ (পোলারাইজড্ লাইট-ওয়েভ) পৃথক করা যায়। 'নিকল প্রিজ্‌ম্' ↑ বা পোলারয়েড ↑ ব্যবহার করে এই যন্ত্র তৈরি হয়ে থাকে। আবার অতি সূক্ষ্ম লম্বা ছিদ্রপথে আলোক-রশ্মি পরিচালিত করে অনুরূপ অপর ছিদ্রপথে বার করেও আলোকতরঙ্গের পোলারিজেসন ঘটানো সম্ভব হয়।

পোলিওমাইলিটিস—শিশুপক্ষাঘাত রোগ; ভাইরাস ↑ ঘটিত একটা সংক্রামক ও দুরারোগ্য ব্যাধি। এতে সাধারণতঃ শিশুদের মেরুদণ্ডের শিরা-রজ্জুর প্রদাহ ও বিকৃতি ঘটে।

পোলোনিয়াম — একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 210, পারমাণবিক সংখ্যা 48; রেডিয়ামের ↑ তেজস্ক্রিয় বিভাজনের এক পর্যায়ে এর উৎপত্তি হয়। এজন্য একে 'রেডিয়াম-এফ'ও বলা হয়। এর থেকে আবার আল্‌ফা ↑ কণিকা বিচ্ছুরিত হয়ে হয়ে পদার্থটি ক্রমে সীসায় রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্স-মুটেসন-অব-এলিমেণ্ট ↑)।

প্রণ্টোসিল — সাল্‌ফোনেমাইড ↑ শ্রেণীর একটি লাল্‌চে রাসায়নিক পদার্থ, (SO_2NH_2)। জীবের দেহাভ্যন্তরে এটা রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে, কিন্তু দেহের বাইরে জীবাণুদের উপরে এর কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না।

প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড— পুরুষের মূত্রাধারের ঠিক নিচে সংলগ্ন গ্রন্থিবিশেষ; এই গ্ল্যাণ্ড থেকেই যৌন উত্তেজনাকালে শুক্ররস নির্গত হয়। বয়স্ক লোকের কখন কখন এই গ্ল্যাণ্ডটির কার্যকারিতা কমে যায় এবং আয়তনে বেড়ে গিয়ে মূত্র-নালিতে চাপ পড়ে, যার ফলে মূত্রকৃচ্ছ্রতা দেখা দেয়।
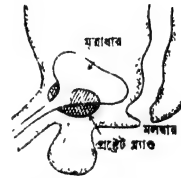
প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বা যৌন-গ্রন্থি

প্রস্থিসিস—চোখ, হাত, পা প্রভৃতি কোন অঙ্গহানি হলে তৎস্থানে কৃত্রিম অঙ্গ সংস্থাপনের প্রযুক্তি বিদ্যা; বিশেষতঃ কৃত্রিম চক্ষু সংস্থাপন। **প্রস্থেটিক সার্জারি** —এতদ্বিষয়ক শস্ত্র-চিকিৎসা।

প্রাইম নাম্বার — মৌলিক সংখ্যা; যে সংখ্যা এক বা সেই সংখ্যা ব্যতীত অপর কোন সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়; যেমন—17, 19, 53 প্রভৃতি।

প্রাইম মেরিডিয়ান — মূল দ্রাঘিমা রেখা; যে দ্রাঘিমা বা দেশান্তর-রেখা (লঙ্গিচিউড ↑) ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ

সহরের উপর দিয়ে গেছে বলে মানচিত্রে অঙ্কিত করা হয়। এই দ্রাঘিমা-রেখাকে 0° ধরা হয়, এবং ম্যাপে তার পূর্ব ও পশ্চিমে ডিগ্রি এককে পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের সংযোজক 'দেশান্তর রেখা' অঙ্কিত হয়।

প্রাইমারি কয়েল — ইণ্ডাক্সন কয়েল ↑, ট্রান্সফর্মার ↑ প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যে তার-কুণ্ডলীর মধ্যে বাইরে থেকে তড়িৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী এই তার-কুণ্ডলীর বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ইণ্ডাক্সনের ↑ ফলে বহিস্থ দ্বিতীয় তার-কুণ্ডলীর (সেকেণ্ডারি কয়েল ↑) মধ্যেও তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হয়।

প্রাইমারি সেল — বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র। সাধারণ 'ভোল্টেইক সেল' ↑ ; যেমন—ডেনিয়েল সেল, লেক্‌ল্যান্স সেল ↑ প্রভৃতি। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ-সব সেলের মধ্যে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তড়িৎ-পরিবাহী তারের মাধ্যমে এর থেকে তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। আবার স্টোরেজ ব্যাটারি ↑, বা অ্যাকুমুলেরটকে ↑ বলে 'সেকেণ্ডারি সেল'।

প্রাইমারি কালার — প্রাথমিক তিনটি রং—লাল, হলদে ও নীল। এই তিনটা রং উপযুক্ত অনুপাতে মিশিয়ে অন্যান্য বিভিন্ন রং তৈরি করা যায়। আবার রঙিন সিনেমা-ফিল্মে ↑ ও সাধারণ ফটোগ্রাফিতেও লাল, সবুজ ও নীলাভ-বেগুনী রং তিনটি প্রাথমিক রং হিসেবে কাজ করে। এই তিন বর্ণের আলোক-রশ্মির যথাযথ সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের রঙিন ছবি ফিল্মে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

প্রিজ্‌ম — ত্রিকোণ কাঁচ-খণ্ড, যার ধারগুলো সমান ত্রিকোণাকৃতি। আবার ছয় কোণ-বিশিষ্ট প্রিজ্‌মও হয়। কাঁচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে তৈরি এরূপ প্রিজ্‌ম আলোক সম্পর্কীয় নানা রকম পরীক্ষায় ও যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। কোয়ার্জের ↑ প্রিজ্‌ম দিয়ে অদৃশ্য অতি-বেগুনী (আলট্রা-ভায়োলেট ↑) রশ্মির পরীক্ষা সম্ভব হয়ে থাকে।
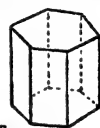
প্রিজ্‌ম

প্রিজ্‌মেটিক কম্পাস — ভূমি জরিপের কাজে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। গোলাকার যন্ত্রের সঙ্গে একখানা প্রিজ্‌ম ↑ এমনভাবে সংলগ্ন থাকে, যাতে দূরবর্তী জিনিসের কৌণিক ব্যবধান যন্ত্রের ডিগ্রি-চিহ্নিত গোলাকার স্কেলের গায়ে (থিয়োডোলাইট ↑) সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। ওই গোলাকার কম্পাস-যন্ত্রে 1° থেকে 360° ডিগ্রি-চিহ্নিত স্কেলের দাগ কাটা থাকে।

প্রিস্টলি, জোসেফ—বৃটিশ রাসায়নিক ইয়র্কশায়ারে জন্ম 1733 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1804 খৃস্টাব্দ। রসায়ন বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ↑, সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অ্যাসিড ↑ প্রভৃতি আবিষ্কার। বস্তুতঃ অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কারেই (1774 খৃঃ) সমধিক খ্যাতি ; কিন্তু ফ্লোজিস্টন ↑ মতবাদে বিশ্বাসী থাকায় অক্সিজেনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে অসমর্থ হন, (ল্যাঁভয়সিয়ার ↑)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শেষ জীবন যাপন ও মৃত্যু।

প্রুফ স্পিরিট — ইথাইল অ্যালকোহলের ↑ জলীয় দ্রব, যার মধ্যে মোটামুটি মাত্র 50% অ্যালকোহলের ভাগ থাকে। এই সর্বনিম্ন পরিমাণের অ্যালকোহল দ্রবও অগ্নি সংযোগে জলে ওঠে। পূর্বে গানপাউডারে ↑ বিস্ফোরণ ঘটাতে এটা ব্যবহৃত হোত ; সামান্য কিছু প্রুফ স্পিরিট রেখে জেলে দিলে তার উত্তাপে নিকটস্থ গান পাউডার ↑ জলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়।

প্রুসিয়ান ব্লু — গাঢ় নীলবর্ণের একটা রাসায়নিক পদার্থ। এর রাসায়নিক নাম ফেরিক ফেরোসায়েনাইড, $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$; পটাসিয়াম ফেরোসায়েনাইডের সঙ্গে কোন ফেরিক ↑ সল্টের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। জিনিসটা রঞ্জক পদার্থ হিসেবেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রোটন — মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ধন-তড়িৎ-বিশিষ্ট কণিকা। এর ভর (মাস ↑) ইলেক্ট্রন কণিকার চেয়ে প্রায় 1840 গুণ অধিক। পক্ষান্তরে এর তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ ইলেক্ট্রনের ↑ তড়িৎ-শক্তির সমান, কিন্তু বিপরীত-ধর্মী (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑)।

প্রোকেইন — কোকেনের ↑ সমক্রিয়াবিশিষ্ট নোভোকেইনের ↑ অনুরূপ একটি সংশ্লেষিত ঔষধের ব্যবহারিক নাম। দাঁত তোলবার সময়ে দন্তমূল অসাড় ও বেদনাহীন করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রোটারগল — রৌপ্য ও প্রোটিন-ঘটিত একটি রাসায়নিক পদার্থের (সিল্‌ভার প্রোটিনেট্) ব্যবহারিক নাম। এর মধ্যে সিল্‌ভার ও প্রোটিনের অতি সূক্ষ্ম কণিকা থাকে ; পদার্থটা জলে দিলে একটা কোলয়ড্যাল ↑ সল্যুসন পাওয়া যায়। জীবাণু-প্রতিরোধক বিশেষ কার্যকরী ঔষধ হিসেবে চোখ ও মূত্র-নালীর ক্ষতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রোটিন — জীবের দেহকোষ প্রধানতঃ যে রাসায়নিক পদার্থে গঠিত। জটিল সব জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জীবদেহে প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রোটিন আবার নানা রকম আছে, কিন্তু সব

প্রোটিনেই বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে; এ সব ছাড়া কখন কখন থাকে সাল্‌ফার (গন্ধক) ও ফস্‌ফরাস ↑। বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিডের বহু জটিল প্রক্রিয়ায় জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রোটিনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেহের পুষ্টি ও গঠনের জন্যে খাদ্যাদিতে প্রোটিনের ভাগ প্রয়োজনারূপ থাকা দরকার। মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, পনীর প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য হলো প্রোটিন-বহুল।

প্রোটোজোয়া — এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু। জীব-জগতের ক্ষুদ্রতম এক বিশেষ শ্রেণীর জীবাণুর সাধারণ নাম। অ্যামিবা ↑, প্যারামোসিয়াম, ম্যালেরিয়া-প্যারাসাইট্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন সব জীবাণু এরূপ এককোষী প্রোটোজোয়া শ্রেণীর।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম—জেলির ↑ মত যে পদার্থে জীবকোষ গঠিত। প্রোটিন জাতীয় অতি জটিল গঠনের এক রকম কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থ; জীবন্ত জৈব কোষ মাত্রই এ-দিয়ে গঠিত।

প্রোডিউসার গ্যাস — অত্যুত্তপ্ত কয়লার (কোক ↑) মধ্যে বায়ু ও সামান্য জলীয় বাষ্পের প্রবাহ চালালে একটা গ্যাসীয় সংমিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে প্রায় 25% কার্বন মনঅক্সাইড (CO), 5% কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), 12% হাইড্রোজেন (H_2) ও প্রায় 58% নাইট্রোজেন (N_2) থাকে। এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (কোল গ্যাস ↑, ওয়াটার গ্যাস ↑)।

প্রোফিল্যাকৃটিক — রোগের আক্রমণাশঙ্কা দূর করবার জন্যে পূর্বেই (সুস্থাবস্থায়) যে সব চিকিৎসা করা হয়। আরোগ্যকারী নয়, রোগের প্রতিরোধক ঔষধের ব্যবহার; যেমন, ম্যালেরিয়া না হতে পারে তার জন্যে সুস্থাবস্থায় কুইনিন বা অনুরূপ কোন ঔষধের ব্যবহার।

···**প্লাজ্‌ম** — যে জটিল পদার্থে জৈব কোষগুলি গঠিত। প্রোটোপ্লাজম ↑ হলো জীব-দেহের সংগঠক কোষগুলির মূল উপাদান; আর **সাইটোপ্লাজ্‌ম** হলো জৈব কোষের কেন্দ্রীন বস্তু (নিউক্লিয়াস ↑) ব্যতীত তার অপরাংশ যে অর্ধ-তরল পদার্থে গঠিত। জৈব কোষের কেন্দ্রীন হলো **নিউক্লিওপ্লাজ্‌ম** ↑ নামক আর এক বিশেষ পদার্থে তৈরি।

প্লাজ্‌মা — রক্ত-রস; রক্তের বর্ণহীন অর্ধ-তরল অংশ, যার মধ্যে রক্ত-কোষগুলি মিশে ভেসে রয়েছে। দেহের বিভিন্ন জৈবকোষ এবং প্রজনন-কোষের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকেও প্লাজ্‌মা বলে।

প্লাজ্‌মোডিয়া— অতি সরল গঠনের এক-কোষী জীবাণু শ্রেণী; যেমন— ম্যালেরিয়া উৎপাদক পরজীবী

(প্যারাসাইট ↑) জীবাণু, মশকের দেহ থেকে যা রক্তে প্রবেশ করে।

প্লাম্বাগো — গ্র্যাফাইট; কার্বনের একটা স্বাভাবিক অ্যালোট্রোপ ↑; একে আবার 'ব্ল্যাক-লেড'ও বলে। লেড বা সীসাকে বলে **প্লাম্বাম**, যা থেকে সীসার সাংকেতিক চিহ্ন Pb হয়েছে; কিন্তু প্লাম্বাগো সীসা নয়।

প্ল্যাটিনাম — একটি মূল্যবান মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Pt, পারমাণবিক ওজন 195·23, পারমাণবিক সংখ্যা 78; রৌপ্যের মত সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ, অত্যন্ত ভারী। কোন অ্যাসিডে ধাতুটা দ্রবীভূত হয় না (নোব্‌ল মেটাল ↑), অত্যধিক তাপসহ। ধাতব পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান। অস্‌মিয়াম ↑, ইরিডিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কোন কোন খনিজ পদার্থে পাওয়া যায়। ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূল্যবান ধাতু হিসেবে অলঙ্কারাদিতেও এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

প্ল্যাটিনয়েড — তামা, দস্তা, নিকেল ও উল্‌ফ্রাম ↑ ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত সংকর ধাতু। এতে সাধারণতঃ 60% তামা, 24% দস্তা, 14% নিকেল ও 2% উলফ্রাম ↑ বা টাংস্টেন থাকে। নামে সাদৃশ্য থাকলেও এতে প্ল্যাটিনাম ধাতু কিছুমাত্র থাকে না।

প্ল্যাঙ্ক, ম্যাক্স — জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী, কিয়েলে জন্ম 1858 খৃঃ, মৃত্যু 1947 খৃঃ। বিভিন্ন শক্তির বিকিরণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য আবিষ্কার; 'কোয়াণ্টাম বাদ' ↑ উদ্ভাবনেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি (1900 খৃস্টাব্দ)। এই কোয়াণ্টাম সূত্রের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি, সৌর-শক্তি, বিভিন্ন বর্ণালির আলোক-শক্তি প্রভৃতির পরিমাণ নির্ধারণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে। এই যুগান্তকারী সূত্র উদ্ভাবনের স্বীকৃতি স্বরূপ 1918 খৃস্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

প্ল্যানেট — গ্রহ; সৌর পরিবারের বিভিন্ন জ্যোতির্মণ্ডল, যেগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে; যেমন—(সূর্য থেকে দূরত্বের পর্যায়ক্রমে) বুধ (মার্কারি ↑), শুক্র (ভেনাস ↑), পৃথিবী (আর্থ ↑), মঙ্গল (মার্স ↑), বৃহস্পতি (জুপিটার ↑), শনি (স্যাটার্ন ↑), ইউরেনাস ↑, নেপচুন ↑, প্লুটো ↑। এই গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি গ্রহই আয়তনে সর্ববৃহৎ; আর বুধ গ্রহ সব চেয়ে ক্ষুদ্র।

প্লাস্টার অব প্যারিস—ক্যালসিয়াম সালফেটের ($2CaSO_4.H_2O$) চূর্ণ। পদার্থটার মধ্যে জল দিলে আঠালো হয়ে ক্রমে শক্ত হয়ে এঁটে যায়। এ-জন্যে হাত-পা ভাঙলে এ-দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হয়।

প্ল্যাস্টিক — যে সব পদার্থ উত্তাপে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়। উচ্চ চাপ ও তাপে প্ল্যাষ্টিক পদার্থ নরম হয়ে পড়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় তার কাঠিণ্য আবার ফিরে আসে। প্ল্যাষ্টিক মাত্রই পলিমার ↑ শ্রেণীর পদার্থ; বিশেষ জটিল পলিম্যারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক গঠনের নানারকম প্ল্যাস্টিক পদার্থ তৈরি হয়েছে। সেলুলয়েড ↑ ব্যাকালাইট ↑, নাইলন ↑ প্রভৃতি এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক পদার্থ।

প্লাস্টিড্স — উদ্ভিজ্জ জৈব কোষের সাইটোপ্লাজমের ↑ মধ্যে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র জৈব কণিকাসমূহ; এগুলি উদ্ভিদদেহের কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; যেমন—ক্লোরোপ্ল্যাস্ট ↑ কণিকা, ক্লোরোফিল ↑ বা সবুজ কণা।

প্লাসেণ্টা — জননীর গর্ভাধারের অভ্যন্তরে স্পঞ্জের মত সছিদ্র পদার্থে গঠিত যে জিনিসটা শিশুকে প্রসূতির সঙ্গে যুক্ত রাখে; এই বিশেষ পদার্থের মাধ্যমে শিশুর রক্তে মাতার দেহ থেকে খাদ্য-রস গিয়ে মেশে, কিন্তু উভয়ের রক্তের আদান-প্রদান হয় না। উদ্ভিদের প্লাসেণ্টা হলো বীজাধারের (ওভারি ↑) অংশবিশেষ, যার সঙ্গে নিষিক্ত বীজ গিয়ে এঁটে যায় ও ক্রমে পুষ্টি লাভ করে।
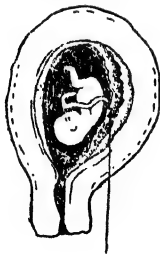
প্লাসেণ্টা

প্লুটো—একটি নবাবিষ্কৃত গ্রহ; মাত্র 1930 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপচুন গ্রহেরও দূরবর্তী একটা কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 367 কোটি মাইল। এর আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে এর 248·4 বছর লাগে।

প্লুটোনিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Pu, পারমাণবিক সংখ্যা 94; অন্যতম ট্রান্সইউরেনিক ↑ এলিমেণ্ট। প্রাকৃতিক কোন খনিজ পদার্থে অদ্যাপি পাওয়া যায় নি; ইউরেনিয়াম ↑ থেকে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্সনের ↑ ফলে পাওয়া গেছে। 'ইউরেনিয়াম-238'-এর সঙ্গে একটা নিউট্রন ↑ যুক্ত হয়ে ইউরেনিয়াম-239 (আইসোটোপ ↑) সৃষ্টি হয়; আবার একটা ইলেক্ট্রন কমিয়ে দিলে তা থেকে পাওয়া যায় নেপচুনিয়াম ↑। আবার তার থেকে আর একটা ইলেক্ট্রন কমালে সৃষ্টি হয় এই প্লুটোনিয়াম। অ্যাটমিক পাইলে ↑ এর $_{94}Pu^{239}$ আইসোটোপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধীরগতি নিউট্রন কণিকার সংঘাতে এর

নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ ঘটিয়ে অ্যাটম বম্ ↑ তৈরি হয়ে থাকে।

ফ

ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল — আলোক-রশ্মির প্রভাবে তড়িৎ উৎপাদন করবার এক রকম সেল ↑ ; যার ক্যাথোডের ↑ গায়ে সিজিয়াম ↑, ক্যাডমিয়াম ↑ প্রভৃতি আলোক-স্পর্শকাতর কোন পদার্থের প্রলেপ মাখানো থাকে। আলোক-রশ্মি পড়লে ওই ক্যাথোড থেকে ইলেক্ট্রনের ধারাপ্রবাহ অ্যানোডের ↑ দিকে চলতে থাকে ; এর ফলে
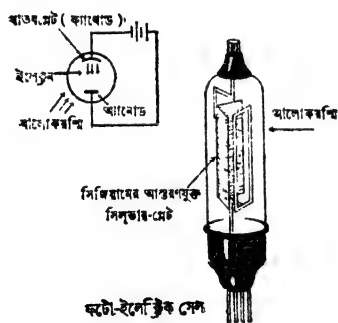
ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল

সেলের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়। আলোক পাতের সঙ্গে সঙ্গে এই তড়িৎ-প্রবাহ সুরু হয়, আর আলোক বন্ধ করলেই তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এক রকম বিশেষ ধরণের বায়ুশূন্য কাঁচ-নলের মধ্যে এরূপ সেল তৈরি হয়ে থাকে। সবাক্ আলোকচিত্রে (টকি ফিল্ম) এই ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল বিশেষভাবে দরকার হয়। আবার, বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফি ↑, ফায়ার-এলার্ম ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে আলোকের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্যেও এরূপ সেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফটোগ্রাফি — ক্যামেরা যন্ত্রে বিশেষ ধরণের প্লেট বা ফিল্মের ↑ উপর কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলে তার হুবহু ছবি তোলবার কৌশল। ক্যামেরার অ্যাপারচারে ↑ সংলগ্ন লেন্সের মধ্য দিয়ে ওই বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ প্লেট বা ফিল্মের উপর পড়ে। কাঁচ, সেলুলয়েড ↑, বা অপর কোন স্বচ্ছ পদার্থে এই ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্ম তৈরি ; এর উপরে সিলভার-ব্রোমাইড (AgBr), বা সিলভার-ক্লোরাইডের (AgCl) আস্তরণ দেওয়া থাকে। আলোক-রশ্মি এসে এর উপর পড়লে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্লেটের আস্তরণের সিলভার ক্লোরাইড, অথবা ব্রোমাইডের কণিকাগুলো প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে, যে বস্তুর ছবি তোলা হবে তা থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির আলো-ছায়ার তারতম্য অনুসারে প্লেটের

উপরে বস্তুটার একটা উল্টো প্রতিচ্ছবি (নেগেটিভ ইমেজ↑) অদৃশ্যভাবে মুদ্রিত হয়ে পড়ে। **ডেভেলপিং**-এর প্রক্রিয়ায় ওই ছবি পরিস্ফুট করে তোলা হয়। পরে অন্ধকার স্থানে নিয়ে প্লেটটাকে সোডিয়াম হাইপো-সালফেট (সোডিয়াম থায়োসাল্‌ফেট, $Na_2S_2O_3$; সাধারণতঃ যা 'হাইপো'↑ নামে পরিচিত) নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে স্থায়ী করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ফিক্সিং। এর পরে প্লেটটাকে ধুয়ে অতিরিক্ত হাইপো দূর করা হয়। এখন এই পরিস্কৃত প্লেটটা শুকিয়ে নিয়ে সিলভার সল্ট-মাখানো বিশেষ এক রকম কাগজের উপর চেপে আলোতে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে প্লেটের উল্টো প্রতিবিম্বটা পুনরায় উল্টে গিয়ে কাগজের উপরে বস্তুটার প্রকৃত প্রতিচ্ছবিটা উঠে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **প্রিন্টিং**। মোটামুটি এই হলো সাধারণ ফটোগ্রাফির কৌশল।

ফটোমিটার — বিভিন্ন আলোক-রশ্মির ঔজ্জ্বল্য তুলনামূলকভাবে স্থির করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এতে উজ্জ্বল্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না ; বিভিন্ন আলোক-উৎসের ঔজ্জ্বল্য এ-যন্ত্রে ক্যাণ্ডেলা↑ এককের সাহায্যে তুলনা করা হয় মাত্র।

ফটো-সিন্থেসিস — উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল↑ (পত্র-হরিৎ) নামক সবুজ বর্ণের এক রকম সূক্ষ্ম কণিকা থাকে। এই ক্লোরোফিল সূর্য-কিরণের প্রভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট↑ সৃষ্টি করে, তাকেই বলে ফটো-সিন্থেসিস। এভাবে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট আত্মসাৎ করেই উদ্ভিদের দেহ পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়। ফটো-সিন্থেসিসের রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুসারে ঘটে থাকে : $6\,CO_2 + 6\,H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$; এভাবে উৎপন্ন কা র্বো হা ই ড্রে ট, অর্থাৎ শর্করা ($C_6H_{12}O_6$), উদ্ভিদেরা আত্মসাৎ করে নেয়, আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে মুক্ত হয়ে অ ক্সি জে ন পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। উদ্ভিদের ক্লোরোফিল (পত্র-হরিৎ) এই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুতঃ ক্যাটালিস্টের↑ কাজ করে মাত্র।

ফনা — নির্দিষ্ট কোন দেশের বা অঞ্চলের প্রাণি-বৈচিত্র্য ; যেমন— ভারতের 'ফনা' বললে এ-দেশের বিভিন্ন প্রাণিকুলের পরিচয় বুঝায়। কোন দেশের উদ্ভিদ-বৈচিত্র্যকে বলে সে-দেশের **ফ্লোরা**। কোন দেশের 'ফনা' ও 'ফ্লোরা' বিচার-বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদি জানা যায়।

ফর্ম্যালিন — ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ↑ জলীয় দ্রব ; এর মধ্যে সাধারণতঃ 40% ফর্ম্যাল্ডিহাইড থাকে। জীবাণু প্রতিরোধক ও জীবাণুনাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফর্ম্যাল্ডিহাইড — গ্যাসীয় পদার্থ, HCHO ; শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধযুক্ত, জলে দ্রবণীয়। মিথাইল অ্যালকোহল ↑ থেকে অক্সিডেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীবাণু প্রতিরোধক পদার্থ। প্ল্যাস্টিক-শিল্পে ও রঞ্জক পদার্থ তৈরি করতে এর যথেষ্ট দরকার হয় ; ঔষধ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

ফর্মিক অ্যাসিড — অম্ল গন্ধযুক্ত বর্ণহীন একটি তরল অ্যাসিড, HCOOH; এ-থেকে ধূম নির্গত হয়, কোন কিছুতে লাগলে ক্ষয়ে যায়। কোন কোন উদ্ভিদ ও পিঁপড়ের দেহে ফর্মিক অ্যাসিড আছে। সোডিয়াম ফর্মেট ↑ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। চর্ম-শিল্পে (ট্যানিং ↑) ও রঞ্জন-শিল্পে (ডাইং ↑) যথেষ্ট প্রয়োজন হয় ; আবার ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং ↑ প্রক্রিয়ায়ও এর ব্যবহার আছে।

ফল্‌স রিব্‌স — বক্ষ-পঞ্জরের নিচের দিকের যে-সব হাড় (পাঁজর) মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্তু সামনে বক্ষাস্থির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পার্শ্ববর্তী অন্য পাঁজরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। (ফ্লোটিং রিব্‌স ↑)।

ফস্‌জিন — বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাস, $COCl_2$; পদার্থটার অন্য নাম কার্বোনিল-ক্লোরাইড। শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। আগেকার দিনে বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হোত। রঞ্জন শিল্পে এর কিছু ব্যবহার আছে।

ফস্‌ফরাস—মৌলিক পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন P ; পারমাণবিক ওজন 30·98, পারমাণবিক সংখ্যা 15 ; সাধারণতঃ এর দু-রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়,—রেড-ফস্‌ফরাস ও হোয়াইট-ফস্‌ফরাস। হোয়াইট ফস্‌ফরাস সাদা (ঈষৎ হল্‌দে) কঠিন পদার্থ, অত্যন্ত বিষাক্ত ও দাহ্য : সাধারণ তাপেই (30° সেন্টিগ্রেড) জ্বলে ওঠে। রেড-ফস্‌ফরাস গাঢ় লাল বর্ণের ; এটা তেমন বিষাক্ত বা দাহ্য নয়। মৌলিক ফস্‌ফরাস সহজ-দাহ্য বলে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না ; বিভিন্ন ফস্‌ফেট, বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট $Ca_3(PO_4)_2$, রূপে পাওয়া যায়। জীবদেহের পক্ষে ফস্‌ফরাস একটা অত্যাবশ্যক উপাদান ; জীবদেহের হাড়ের প্রধান উপাদানই হলো ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। ফস্‌ফরাস-ঘটিত পদার্থ (বিভিন্ন ফস্‌ফেট ↑, সুপার-ফস্‌ফেট ↑ প্রভৃতি) জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। দেশলাই শিল্পে দাহ্য পদার্থরূপে রেড-ফস্‌ফরাস ব্যবহার করা হয়।

ফস্ফর ব্রোঞ্জ — তামা, টিন ও ফস্ফরাসের সংকর ধাতু ; অত্যন্ত কঠিন, সহজে ক্ষয় হয় না। মোটরের বেয়ারিং ↑, গিয়ার প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরি হয়। সমুদ্রজলের ক্ষয়কারী প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্যে জাহাজের তলদেশ তৈরি করতেও এর পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফস্ফাইট — ধাতব পদার্থের সঙ্গে ফস্ফরাস-অ্যাসিডের (H_3PO_3) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সল্ট। ফস্ফরাস অক্সাইড (P_2O_3) ও জলের রাসায়নিক মিলনে ফস্ফরাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

ফস্ফাইড — ধাতব পদার্থের সঙ্গে ফস্ফরাসের সরাসরি মিলনে যে সকল যৌগিক পদার্থ (বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑) উৎপন্ন হয় ; যেমন— অ্যালুমিনিয়াম ফস্ফাইড, AlP, ক্যালসিয়াম ফস্ফাইড, Ca_3P_2, যা জলের সংস্পর্শে জলে ওঠে।

ফস্ফেট — ফস্ফরিক ↑ অ্যাসিডের (H_3PO_4) বিভিন্ন সল্ট। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ফস্ফরাস দরকার ; এ-জন্যে বিভিন্ন ফস্ফেট সল্ট জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জমিতে ফস্ফরাসের অভাব পূরণের জন্যে বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ফস্ফেট সল্ট দেওয়া হয়।

ফস্ফরিক অ্যাসিড — স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, H_3PO_4 ; জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়। বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে গলে যায় ; এ-জন্যে সাধারণতঃ সিরাপের মত ঘন তরল অবস্থায়ই থাকে। ফস্ফরিক অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্টকে বলে 'ফস্ফেট'।

ফস্ফিন — ফস্ফিউরেটেড হাইড্রোজেন, PH_3 ; বর্ণহীন, বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস ; বায়ুর সংস্পর্শে সাধারণ তাপেই জলে ওঠে। এক রকম বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত।

ফস্ফোরেসেন্স — আলোক বিকিরণের বিশেষ ধর্ম। কোন কোন পদার্থ কিছুক্ষণ আলোকে থাকার পরে অন্ধকারেও এক রকম দীপ্তি বিকিরণ করে ; এদের বলে ফস্ফোরেসেণ্ট পদার্থ। কোন কোন খনিজ পদার্থে ও সামুদ্রিক জীবের দেহে অন্ধকারে এরূপ আলোকচ্ছটা দেখা যায়। জোনাকির আলোও এক রকম ফস্ফোরেসেন্স।

…ফাইট — উদ্ভিদ ; যেমন—**জিওফাইট** হলো যে-সব উদ্ভিদ ভূ-নিম্নস্থ শিকড় থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ফলে সংখ্যায় বেড়ে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে। **হিলিওফাইট** হলো যে-সব উদ্ভিদ সারাদিনের সৌরতাপ সহ্য করেও পরিপুষ্ট ও তাজা থাকে।

ফাইব্রিনোজেন — রক্তের একটি অতি-সূক্ষ্ম তরল উপাদান ; কোন স্থান কেটে গেলে ক্ষতমুখের রক্তের এই উপাদানটি ফাইব্রিন নামক এক

বিশেষ জৈব তন্তুতে পরিণত হয়। এইরূপ তন্তু-জালে রক্তের জলীয় অংশ ঘনীভূত হয়ে চাপ বাঁধে, আর তার ফলেই রক্তপাত বন্ধ হয়।

ফাইলোরিয়েসিস — রোগ বিশেষ, যাতে বিশেষ এক জাতীয় পরজীবী জীবাণুর (প্যারাসাইট ↑) আক্রমণে অঙ্গ-বিশেষের মাংসপেশীর অভ্যন্তরস্থ রক্তবহা কৈশিক নলগুলির মধ্যে রক্ত-লসিকা (লিম্‌প ↑) জমে গিয়ে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। এর ফলে মাংসপেশীতে জল জমে ও পেশীতন্তু-গুলি অত্যধিক ফুলে দূষিত হয়। সাধারণতঃ পায়ে এ রোগ হলে বলা হয় 'গোদ'; ইংরেজিতে বলে **এলিফেন্টিয়াসিস**।

ফাউলার সল্যুসন — 'পটাসিয়াম আর্সেনাইট' নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবের বিশেষ নাম; ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফাঙ্গাস — ছত্রাক, অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ; এদের দেহে ক্লোরোফিল ↑ বা পত্র-হরিৎ থাকে না। কাজেই সাধারণ উদ্ভিদের মত পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে এরা ফটো-সিন্থেসিস ↑ প্রক্রিয়ায় শর্করা, বা শ্বেতসার তৈরি করতে পারে না। সাধারণতঃ কোন মৃত উদ্ভিদ বা জীব-জন্তুর বিকৃত দেহাংশ আশ্রয় করে তা থেকে এরা পুষ্টি-রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

ফাঙ্গিসাইড — যে সব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন অনিষ্টকর ফাঙ্গাস ↑ ধ্বংস করে। অনেক সময় জীবদেহের বিভিন্ন স্থানে নানা রকম অনিষ্টকর সূক্ষ্ম ফাঙ্গাস জন্মে দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করে। 'ফাঙ্গিসাইড' জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ এদের বিনষ্ট করে।

ফার্ন — শৈবাল শ্রেণীর এক জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ। পুষ্পহীন বলে এদের বীজ উৎপত্তি ঘটে না; এ জাতীয় উদ্ভিদের স্বকীয় দেহাভ্যন্তরস্থ পুং-কোষ ও স্ত্রী-কোষের সংযোগে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

'ফার্ন' জাতীয় উদ্ভিদ

ফার্মেণ্টেসন—গাঁজন ক্রিয়া; বিভিন্ন জৈব পদার্থে ঈস্ট ↑, ব্যাক্টেরিয়া ↑ প্রভৃতির জীব-ধর্মী এঞ্জাইমের ↑ প্রভাবে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যে সকল এঞ্জাইম ↑ পদার্থ এই গাঁজন বা ফার্মেণ্টেসন ক্রিয়া ঘটায় তাদের বলা হয় **ফার্মেণ্ট**। বিভিন্ন শর্করা জাতীয় পদার্থের জলীয় দ্রবে 'জাইম্‌স' ↑ নামক বিশেষ এক রকম এঞ্জাইমের (ঈষ্ট ↑) প্রভাবে এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন (ফার্মেণ্টসন) ঘটে থাকে। ওই এঞ্জাইম এই প্রক্রিয়ায় মূলতঃ ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে। এর ফলে অ্যালকোহল ↑ উৎপন্ন হয় এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোয়:
$C_6H_{12}O_6$ (চিনি) $- 2C_2H_5OH$

(অ্যালকোহল ↑) + 2 CO_2 (কার্বন ডাইঅক্সাইড)।

ফার্মি, এনরিকো — ইটালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1901 খৃঃ, অদ্যাপি (1961 খৃঃ) জীবিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিস্ট ইটালী ত্যাগ ও আমেরিকায় বসতি স্থাপন। ভারী জল (হেভি ওয়াটার ↑) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা। ধীরগতি নিউট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে ইউরেনিয়াম আইসোটোপের ↑ পরমাণু-বিভাজনে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, এতদ্বিষয়ক তত্ত্ব আবিষ্কারেই প্রসিদ্ধি। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই প্রথম 'অ্যাটম বম্ব' ↑ উদ্ভাবিত হয়। 1938 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

ফারেন্‌হিট—জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1696 খৃঃ, মৃত্যু 1736 খৃঃ। উষ্ণতার মাত্রা নির্ধারণের উপযোগী এক নূতন পদ্ধতিতে তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবন, যা তাঁর নামানুসারে 'ফারেনহিট থার্মোমিটার ↑' বলে পরিচিত; যাতে হিমাংক 32° ডিগ্রি ও স্ফুটনাংক 212° ডিগ্রি চিহ্নিত — মধ্যবর্তী ব্যবধান 180 সমভাগে (ডিগ্রিতে) বিভক্ত। এরূপ তাপমাত্রা অবশ্য নিউটনের ↑ পরিকল্পিত, কিন্তু ফারেন্‌হিট কর্তৃক এর কার্যতঃ প্রয়োগ ও যন্ত্রনির্মাণ।

ফারেনহিট ডিগ্রি — উষ্ণতা পরিমাপের একক বিশেষ। কোন পদার্থের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে প্রধানতঃ তিন রকম একক ব্যবহৃত হয়—ফারেনহিট, রুমার ↑ ও সেন্টিগ্রেড ↑ ডিগ্রি। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) জলের হিমাংক ও স্ফুটনাংক উষ্ণতার পার্থক্যের 180 ভাগের এক ভাগকে 'ফারেন্‌হিট' ডিগ্রি ধরা হয়। ফারেন্‌হিট স্কেলে জলের হিমাংক (সেন্টিগ্রেড ↑ স্কেলের মত) 0° শূন্য ডিগ্রি না ধরে, ধরা হয় 32°F; সুতরাং এতে স্ফুটনাংক হবে 32° + 180° = 212°F. কাজেই ফারেন্‌হিট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ ডিগ্রির চেয়ে অনেকটা কম উষ্ণতা নির্দেশ করে; এক ফারেন্‌হিট ডিগ্রি = 5/9 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি।

ফারমাকোলজি — জীবদেহের উপর বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া ও তাদের ভেষজ গুণ সম্পর্কীয় তথ্যাদির বিজ্ঞান।

ফার্টিলাইজার — উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে-সব পদার্থ জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। নাইট্রোজেন ↑, ফসফরাস ↑, পটাসিয়াম ↑ প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান; কিন্তু এ-সব পদার্থ মৌলিক আকারে উদ্ভিদেরা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এজন্যে বিভিন্ন নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম ↑ সল্ট, নাইট্রো লাইম ↑, বিভিন্ন ফসফেট ↑, সুপার-ফসফেট ↑

এবং নানা রকম খনিজ পটাসিয়াম সল্ট প্রভৃতি জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। আবার বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে তৈরী কম্পোস্টও ↑ উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যেও উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যকীয় রাসায়নিক বিভিন্ন উপাদান থাকে।

ফাল্ক্রাম — যে বিন্দুর দু'ধারে লিভারের দণ্ডটি উপর-নিচে ওঠা-নামা করে। যান্ত্রিক সুবিধা লাভের জন্যে লিভার ↑ ব্যবস্থায় সূক্ষ্মাগ্র পদার্থের যে শীর্ষ-বিন্দুর উপরে লিভার-দণ্ড স্থাপন করা হয়।

ফাল্ক্রাম
লিভার
লিভার ও ফাল্ক্রাল

ফায়ার ড্যাম্প — কয়লার খনিতে যে-সব দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ বেরিয়ে জ্বলে ওঠে ও বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে প্রধানতঃ মিথেন (CH_4) ও অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ↑ থাকে। এ-গুলো বেরিয়ে খনি-গহ্বরের বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় এবং সামান্য আগুনের সংস্পর্শেই জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়; আর সহসা সারা খনিতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে (ডেভি ল্যাম্প ↑)।

ফায়ার এক্স্টিঙ্গুইসার — অগ্নি নির্বাপণের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র। বাতাসের অক্সিজেনের সংযোগেই আগুন জ্বলে; এ-জন্যে প্রজ্জ্বলিত পদার্থকে বায়ু-সম্পর্কশূন্য করে অগ্নি-নির্বাপনের ব্যবস্থা করা হয়। একটা লম্বা ধাতব পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেটের ↑ (Na_2CO_3) জলীয় দ্রব ভরতি থাকে এবং একটা কাচ-পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড ↑ (H_2SO_4) পৃথক ভাবে রক্ষিত হয়। প্রয়োজনের সময়ে পাত্রটার মুখে চাপ দিলে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওই কাচপাত্র ভেঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে এসে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবের সঙ্গে মিশে যায়। উভয়ের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পাত্রটার মধ্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস জন্মাতে থাকে। ভিতরের অত্যধিক চাপে ওই গ্যাস সবেগে পাত্রের মুখের নল দিয়ে বেরিয়ে প্রজ্জ্বলিত পদা-

ফায়ার এক্স্টিঙ্গুইসার যন্ত্র
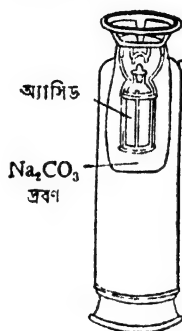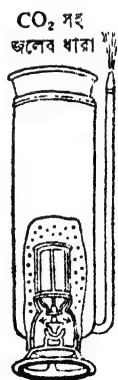
যন্ত্রটা যে ভাবে কাজ করে

র্থের গায়ে লাগে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভারী বলে জ্বলন্ত জিনিসটার উপরিভাগ একটা গ্যাসীয় আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে বাতাস না পেয়ে আগুন নিবে যায়। আর এক রকম ফায়ার-একস্টিংগুইসার যন্ত্রে কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) ব্যবহৃত হয়; পদার্থ টাকে পাইরিন ↑ ও বলে।

ফিউজ (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) — কোন তড়িৎ-চক্রের (সার্কিট ↑) মধ্যে নির্দিষ্ট বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ-প্রবাহের গতি রোধ করবার জন্যে ব্যবহৃত যান্ত্রিক কৌশল। এ-জন্যে অল্প তাপসহ টিন, লেড প্রভৃতি ধাতু, বা কোন ফিউজিব্‌ল অ্যালয়ে ↑ নির্মিত তার তড়িৎ-স্রোতের প্রবাহ-পথে স্থাপিত হয়। নির্দিষ্ট তড়িৎ-বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হলেই তাতে উৎপন্ন তাপে ওই ধাতব তার গলে দিয়ে তড়িৎ-চক্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহও বন্ধ হয়। এই কৌশলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে, বা বাস-গৃহের বৈদ্যুতিক তারে আগুন লেগে যাওয়ার বিপদ নিবারিত হয়।
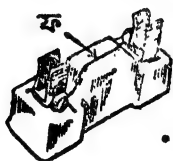
ইলেক্ট্রিক ফিউজ

ফিউজিব্‌ল অ্যালয় — যে সব সংকর-ধাতু অল্প তাপেই গলে যায়। বিস্‌মাথ, লেড, টিন, ক্যাড্‌মিয়াম প্রভৃতি নিম্ন গলনাংকের ধাতুর বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণে এ-রকম সংকর ধাতু তৈরি হয়ে থাকে। এরূপ সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম **উড্‌স মেটাল**। সাধারণতঃ 50% বিস্‌মাথ, 25% লেড, 12·5% টিন ও 12·5% ক্যাড্‌মিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি হয়। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ফিউজে ↑ ও অগ্নি-নিরোধক যন্ত্রাদিতে এরূপ ধাতু-সংকরের তার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফিকস্‌ড অ্যাল্‌কালি — পূর্বে সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) ও পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) নামক অ্যালকালি ↑ দুটো এই নামে পরিচিত ছিল। অ্যামোনিয়াম কার্বনেট উদ্বায়ী বলে তাকে বলা হয় ভোলাটাইল ↑ অ্যালকালি।

ফিক্‌সড এয়ার — কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস, CO_2, বায়ুর মত অদৃশ্য, কিন্তু ভারী গ্যাস বলে কখন কখন এই নামে পরিচিত হয়।

ফিক্সড স্টার— সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে যে সব তারকার আপেক্ষিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না বলে মনে হয়; প্রকৃতপক্ষে অবশ্য অসীম দূরত্বের জন্যেই তাদের পারস্পরিক অবস্থানের তারতম্য লক্ষিত হয় না। ধ্রুব নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় এরূপ একটি স্থির তারকার পর্যায়ভুক্ত।

ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করা হয়। বাতাসের নাইট্রোজেনকে এভাবে ব্যবহারোপযোগী যৌগিকের মধ্যে আবদ্ধ করাকে বলে 'ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন'। জীব-জগতের পক্ষে নাইট্রোজেনের একান্ত দরকার, অথচ বায়ুমণ্ডল থেকে কোন জীবই সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না; এজন্যে এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের মিলনে হয় অ্যামোনিয়া, NH_3; বিশেষ ব্যবস্থায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে তৈরি হয় নাইট্রিক অক্সাইড, NO; এ থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম সল্ট; যা-সব জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন জীবাণুও আবার বায়ুর নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে জমির মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। এই সব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস যৌগিকের মধ্যে সংবদ্ধ হয়; উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে তা আবার ক্রমে বিমুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় (নাইট্রোজেন সাইকল ↑)।

ফিজিওলজি — শারীর-বৃত্ত, শারীর-বিজ্ঞান। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকাণ্ড ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান।

ফিজিওথেরাপি— আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি এক বা একাধিক শক্তির প্রয়োগে কোন কোন বিশেষ রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি।

ফিটাস — মাতৃগর্ভস্থ পূর্ণাবয়ব শিশু; ভ্রূণের পূর্ণ পরিণত অবস্থা।

ফিনল — কার্বলিক অ্যাসিড, C_6H_5OH; বর্ণহীন স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, বিশেষ এক রকম গন্ধ-যুক্ত। জলে দ্রবণীয়, অত্যন্ত বিষাক্ত, তীব্র অ্যাসিড শক্তি-সম্পন্ন; যাতে লাগে তা জ্বলে ক্ষয়ে যায়। এর নিস্তেজ মৃদু দ্রব জীবাণুনাশক ও জীবাণু প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এই জলীয় দ্রবকে সাধারণতঃ 'কার্বলিক লোশন' বলে। রঞ্জক পদার্থ ও প্ল্যাস্টিক ↑ তৈরির কাজে যথেষ্ট ফিনল দরকার হয়।

ফিনলপ্‌থেলিন — সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ, $C_{20}H_{14}O_4$; অত্যন্ত হালকা, অ্যালকোহলে ↑ দ্রবণীয়। রঞ্জন শিল্পে দরকার হয়; আবার ঔষধ হিসেবে জোলাপ রূপেও এর ব্যবহার আছে। অ্যাল্‌কালির ↑ সংস্পর্শে এর দ্রব লাল হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাসিডের সংস্পর্শে বর্ণহীন থাকে। এ-জন্যে কোন পদার্থ অ্যাল্‌কালি, না অ্যাসিড-গুণসম্পন্ন, তা পরীক্ষা করবার জন্যে 'ইণ্ডিকেটর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফিনাইল—(1) হাইড্রোকার্বন↑ র‍্যাডিক্যাল C_6H_5-এর রাসায়নিক নাম। বেঞ্জিনের↑ (C_6H_6) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটিয়ে এই 'ফিনাইল' র‍্যাডিক্যাল পাওয়া যায়। এ থেকেই তৈরি হয় ফিনাইল-অ্যামাইন, $C_6H_5NH_2$, যা অ্যানিলিন↑ নামে পরিচিত। (2) দুর্গন্ধ-নাশক ও বীজবারক পদার্থ হিসেবে আমরা বাজারের যে ফিনাইল ব্যবহার করি, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস; রজন ও তেল ফুটিয়ে এক রকম তরল সাবান তৈরি করে তার মধ্যে ক্রিয়োজেট↑ অয়েল মিশিয়ে সাধারণতঃ এই ফিনাইল তৈরি হয়ে থাকে।

ফিনোলজি—উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দৈহিক গঠন ও জীবন-ধারার উপরে স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

ফিল্‌ট্রেসন—তরল পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থাদি পৃথকীকরণের পদ্ধতি; যাকে বাংলায় বলে পরিস্রাবণ, বা 'ছেঁকে ফেলা'। ফিল্টারপেপার, বা কোন সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়ে ছেঁকে এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফিল্‌ট্রেসন; পরিস্কৃত যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে বলে **ফিল্‌ট্রেট**↑; আর যে জিনিসের মধ্য দিয়ে ছাঁকা হয়, তাকে বলে 'ফিল্টার'।

'ফিল্‌ট্রেসন' পদ্ধতি

ফিলামেণ্ট—সূক্ষ্ম সূত্র। ইলেকট্রিক ল্যাম্প, রেডিও-ভাল্‌ব প্রভৃতির মধ্যে টাংস্টেন↑ প্রভৃতি উচ্চ তাপসহ ধাতুর তৈরী যে সরু তার থাকে। ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে আলোক ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। পূর্বে কার্বনের↑ তৈরী ফিলামেণ্ট ব্যবহৃত হোত, আজকাল সাধারণতঃ তা আর ব্যবহৃত হয় না।

ফিস্‌চুলা—ভগন্দর রোগ; এ রোগে মলদ্বারে ক্ষত হয়ে তার নালি-পথে মল-মূত্র নিঃসৃত হয়; একটা বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধি।

ফিসন—বিভক্ত হওয়া, বা ভাঙার প্রক্রিয়া। অ্যামিবা↑ প্রভৃতি কোন কোন জীবাণুর দেহকোষ বিভক্ত হয়ে হয়ে সংখ্যায় তারা বেড়ে যায়। আবার তারকাদি জ্যোতিষ্কের দেহ-পিণ্ডও বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়—এসব অবস্থাকেই বলে ফিসন। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক-সনের↑ সাহায্যে পদার্থের নিউ-ক্লিয়াস ভেঙ্গে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদিত হয় (অ্যাটম বম্ব↑)। বিশেষভাবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিউক্লিয়ার ফিসন'↑।

ফিসার, হান্‌স — জার্মান রসায়নবিজ্ঞানী ; জন্ম 1881 খৃঃ, মৃত্যু 1945 খৃঃ। রক্তের রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা। রক্তের লোহিত কণিকার রঞ্জক-পদার্থ আবিষ্কারের জন্য 1930 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ফেব্রিফিউজ — জ্বরের ঔষধ ; যে সব ঔষধ জ্বরে ব্যবহৃত হয়। **ফেব্রাইল** মানে 'জ্বর সম্বন্ধীয়'।

ফেরাস — লৌহ-ঘটিত বিভিন্ন সল্ট ; যার মধ্যে লোহার পরমাণু বাই-ভ্যালেন্ট ↑ রূপে কাজ করে, অর্থাৎ এরূপ সল্টে লোহার প্রত্যেকটি পরমাণুর সঙ্গে দুইটি মনোভ্যালেন্ট ↑ অ্যাসিড-র‍্যাডিক্যাল ↑ মিলিত হয়, লৌহ-পরমাণু হয় বাইভ্যালেন্ট; যেমন ফেরাস ক্লোরাইড, $FeCl_2$, ফেরাস সালফেট, $FeSO_4 . 7H_2O$, (SO_4 র‍্যাডিক্যাল-টি বাই-ভ্যালেন্ট), যাকে গ্রিন-ভিট্রিয়ল ↑ (হিরাকস) বলা হয়। ফেরাস সল্টগুলো সাধারণতঃ হাল্‌কা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে।

ফেরিক — লৌহ-ঘটিত বিভিন্ন সল্ট, যার মধ্যে লোহার পরমাণুগুলো ট্রাই-ভ্যালেন্ট রূপে কাজ করে, অর্থাৎ লোহার একটা পরমাণু তিনটা মনো-ভ্যালেন্ট অ্যাসিড-র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে মিলিত হয় ; যেমন—ফেরিক ক্লোরাইড, $FeCl_3, 6H_2O$ (ছয়টি জলীয় অণু নিয়ে এর স্ফটিক গঠিত হয়)। ফেরিক সল্টগুলো সাধারণতঃ হল্‌দে বা পাটকিলে রঙের স্ফটিকাকার হয়ে থাকে।

ফেরিক অ্যালাম — ফেরিক পটাসিয়াম-সালফেট, $Fe_2(SO_4)_3, K_2SO_4, 24H_2O$; লোহার সালফেট ও পটাসিয়ামের সালফেট সল্ট মিলিতভাবে কেলাস-জলের 24-টি অণু (ওয়াটার অব ক্রিস্ট্যালিজেসন ↑) নিয়ে পদার্থটির স্ফটিক গঠিত হয়। বেগুনী রঙের স্ফটিকাকার পদার্থ। একে 'আয়রন-অ্যালাম'-ও বলে।

ফেরোক্রোম—লোহা ও ক্রোমিয়ামের ↑ সংকর ধাতু ; এর মধ্যে 30% থেকে 40% লোহা থাকে। ক্রোমাইট ↑ নামক খনিজ পদার্থ কার্বনের সঙ্গে মিশিয়ে ইলেকট্রিক ফার্নেসে উত্তপ্ত করে তৈরি হয়।

ফেরো-কংক্রিট — লোহার রডের সঙ্গে সিমেন্ট ↑ জমিয়ে বাড়ী তৈরির এক রকম কৌশল। বড় বড় অট্টালিকা সুদৃঢ় করবার জন্যে যে ব্যবস্থায় লোহার কাঠামোর সঙ্গে সিমেন্ট জমানো হয়।

ফেরোম্যাগ্নেটিক — লোহার মত অন্যান্য যে-সব ধাতব পদার্থকে চুম্বকে (ম্যাগনেট ↑) পরিণত করা যায় ; যেমন — নিকেল, কোবাল্ট ও কতকগুলি ধাতুসংকর (অ্যালয় ↑)। চৌম্বকক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে বা চুম্বকায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করলে এগুলির চৌম্বকশক্তি কিছু হ্রাস পায়, অনেকটা থাকে ; কিন্তু বিশেষ একটা তাপ-

মাত্রায় (কুরি টেম্পারেচার) চৌম্বকত্ব সম্পূর্ণ হারায়। এই চৌম্বক-বৈশিষ্ট্য ধাতুগুলির পারমাণবিক গঠনের ও সংস্থানের পরিবর্তনশীলতার ফল।

ফেরোম্যাঙ্গানিজ — লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ধাতুদ্বয়ের সংমিশ্রণে (30% + 70%) প্রস্তুত এক বিশেষ ধরণের ধাতুসংকর।

ফেলস্পার — এক রকম প্রস্তর বিশেষ ; এটা প্রধানতঃ সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের অ্যালুমিনো-সিলিকেটে গঠিত। একে কখন কখন 'ফেল্ড্-স্পার'ও বলা হয়। গ্রানাইট ↑ প্রভৃতি মৌলিক প্রস্তরের প্রধান উপাদান।

ফেল্ট — পশমের তৈরী মোটা বস্ত্র বিশেষ ; বোনা নয়, যন্ত্র-সাহায্যে পশম চেপে তৈরি হয়।

ফোকাস— কোন লেন্সের ↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত, অথবা দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দূরাগত সমান্তরাল আলোক-রশ্মিসমূহ যে বিন্দুতে এসে

আলোক-রশ্মির 'কোকাস' বিন্দু

সংহত হয়, অথবা সংহত হচ্ছে বলে মনে হয়। সূর্য-রশ্মির দিকে মুখ করে একখানা উত্তল (কন্‌ভেক্স) ↑ লেন্স ধরলে কিছু দূরে একটা তীব্র আলোক-বিন্দু সৃষ্টি হয়, এটা হলো ওই লেন্সের ফোকাস। লেন্স বা দর্পণের কেন্দ্র থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে **ফোক্যাল লেংথ**। কেবল আলোক-রশ্মিই নয়, উপযুক্ত কৌশলে এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি প্রভৃতি সব রকম রশ্মিকেই উপযুক্ত কৌশলে এভাবে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করে 'ফোকাস' সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ফোটন—ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট ↑ প্রভৃতির ক্ষেত্রে আলোককে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে করা যায় না, আলোক তখন কণিকা-ধর্মী বলে প্রতিভাত হয়। এরূপ অবস্থায় আলোকের ওই কণিকাকে 'ফোটন' নাম দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোকের প্রত্যেকটি ফোটন কণিকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বর্তমান ; — এই শক্তিকে বলা হয় আলোকের 'র‍্যাডিয়েণ্ট এনার্জি' ↑। তরঙ্গ-ধর্মের বিচারে আবার বিভিন্ন আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দন-সংখ্যার উপরে তার এই বিকিরণ-শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে।

ফোটোস্ফিয়ার — সূর্য-গোলক একটা জ্বলন্ত গ্যাস-পিণ্ড বলে প্রতি-ভাত হয়। এই গ্যাস-পিণ্ডের বহিস্থ অত্যুজ্জ্বল অংশ, যা আমরা দেখতে পাই, তাকে বলা হয় ফোটো-স্ফিয়ার। সৌর দেহের উপরি-ভাগের বিভিন্ন হাল্‌কা গ্যাসের প্রদীপ্ত ও অত্যুজ্জ্বল আবরণটাই হলো ফোটোস্ফিয়ার ; এর উত্তাপ প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

ফোর্টিনস্ ব্যারোমিটার — বিশেষ এক রকমের বায়ু-চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার ↑)। এরূপ ব্যারোমিটারের স্কেল স্থির থাকে, তলদেশে সংলগ্ন একটা স্ক্রু ঘুরিয়ে ভিতরের পারা-স্তম্ভ ওই স্কেলের ঠিক গোড়াতে আনা হয়। এর সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয়ের জন্যে এক রকম সংশোধন-তালিকা থাকে। তা থেকে হিসাব করে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সঠিকভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে।

…**ফোবিয়া**—ভীতি, আতঙ্ক ; যেমন, **হাইড্রোফোবিয়া,** জলাতঙ্ক নামক রোগ বিশেষ ; পাগলা কুকুরের দংশনের ফলে যেমন হয়।

…**ফোরেসিস** — তড়িৎ-প্রভাবে কোলয়ড্যাল ↑ দ্রবণের মধ্যে পদার্থ-কণিকার সঞ্চরণ-শীলতা ; যেমন—**ক্যাটাফোরেসিস** হলো ইলেকট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ধন-তড়িতাবিষ্ট পদার্থ-কণিকার ঋণ-তড়িৎপ্রান্তের (ক্যাথোড ↑) দিকে গতিশীলতা ; এরূপ আবার **অ্যানাফোরেসিস** হলো ঋণ-তড়িতাবিষ্ট কণিকার ধন-তড়িৎপ্রান্তের (অ্যানোড ↑) অভিমুখী ধারাপ্রবাহ।

ফোলিক অ্যাসিড — কোন কোন উদ্ভিদের সবুজপত্রে, প্রাণীর যকৃতে ও ঈস্টে ↑ সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় ; এক প্রকার জৈব অম্ল পদার্থ। সাধারণতঃ এটা 'ভিটামিন বি' নামে পরিচিত। অবশ্য অনুরূপ অনেকগুলি জৈব যৌগিকই এ-নামে আখ্যাত। পদার্থটি জীবদেহের রক্ত ও মাংসের কোষ বৃদ্ধি করে এবং দেহে জীবাণুর (ব্যাক্টিরিয়া ↑) সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে। ভিটামিন ↑ বা খাদ্য-প্রাণ হিসাবে এটা সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ; রক্তশূন্যতা (অ্যানিমিয়া ↑) রোগে ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

ফোসিল — জীবাশ্ম ; অতীত যুগের উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের (বা অংশ বিশেষের) প্রস্তরীভূত অবশেষ, বা পর্বতগাত্রে তাদের কঙ্কালের ছাপ। এ-সবের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাচীন যুগের প্রাণী ও জীবজগতের বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়।

ফুকোজ পেণ্ডুলাম — প্রকাণ্ড এক রকম দোলক-যন্ত্র বা পেণ্ডুলাম ↑ ; যাতে ভারী একটা ধাতব গোলক খুব লম্বা ও সরু তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর দুলিয়ে দিলে গোলকটা এদিক-ওদিকে দুলতে থাকে। এদিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে ভূপৃষ্ঠ নিয়ত ঘুরে যাচ্ছে; ফলে এরূপ
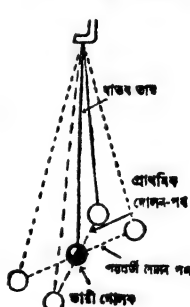
ফুকোজ পেণ্ডুলাম

পেণ্ডুলাম ঝুলিয়ে দেওয়ার কিছু সময় পরেই দেখা যায়, ক্রমে গোলকটার দোলন-পথ পরিবর্তিত হচ্ছে। গোলকটার নিচে একটা লম্বা কাঁটা সংলগ্ন করে নিয়ে এবং তলদেশে বালি ছড়িয়ে (তার উপরে ওই কাঁটাটা দাগ কাটতে পারে, এমন-ভাবে) গোলকটা ঝুলিয়ে দিলে, বালির উপরে কাঁটাটার দাগ অঙ্কিত হতে থাকে। এই দাগ দেখে গোলকটার দোলন-পথের পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমে ঘুরে যাচ্ছে বলে ওই দাগ ক্রমাগত সরে বেঁকে যায়, এক থাকে না। সুদীর্ঘ তারে বাঁধা-দোলকটার ভূ-লম্ব মোটামুটি একই থাকে, কিন্তু তল-দেশের ভূপৃষ্ঠ ঘুরে যায়; এর ফলে গোলকটার দোলন-পথ দৃশ্যতঃ বদলে যায়। এ-থেকে পৃথিবী যে ঘুরছে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এরূপ দোলকের দোলন-রজ্জু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলে তার ভূ-লম্ব মোটা-মুটি স্থির থাকে; এটা কতকটা জাইরোস্কোপের ↑ সঙ্গে তুলনীয়।

ফুট-পাউণ্ড — কর্ম-শক্তির একক বিশেষ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (ফোর্স অব গ্র্যাভিটি ↑) এককে এক পাউণ্ড ওজনের কোন বস্তু এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে এরূপ বল-শক্তি (ফোর্স ↑) প্রয়োগের ফলে নিষ্পন্ন কাজের (ওয়ার্ক ↑) পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক হলো 'ফুট-পাউণ্ড'।

ফুট-পাউণ্ড্যাল — ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ডের মাপে কর্মশক্তির একটা একক। এক পাউণ্ড্যাল ↑ বল-শক্তির (ফোর্স) প্রভাবে কোন বস্তুতে প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট গতিবেগ সঞ্চারিত করতে যে পরিমাণ কাজ (ওয়ার্ক) সম্পন্ন হয়। সি জি. এস. এককের হিসাবে এরূপ কর্মশক্তির একক হলো আর্গ ↑; এক জুল ↑ $= 10^7$ আর্গ।

ফুল্‌মিনেট অব মার্কারি — মারকিউরিক আইসো-সায়েনেটের, $Hg(OCN)_2$, বিশেষ নাম; পারদ ও হাইড্রোসায়েনিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন এক রকম সল্ট। বিস্ফোরক পদার্থ; মৃদু আঘাতেই এটা সশব্দে অতি দ্রুত বিস্ফোরিত হয়। এর সাহায্যে গানপাউডার ↑ প্রভৃতিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ে থাকে।

ফুলার্স আর্থ — মৃত্তিকা-সদৃশ এক শ্রেণীর খনিজ পদার্থ; এর তৈল ও চর্বি জাতীয় জিনিস শুষে নেবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। এজন্যে বস্ত্র-শিল্পে, এবং তৈল ও চর্বি শোধনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদার্থটা প্রধানতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ↑, ক্যাল-সিয়াম ↑, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেটে ↑ গঠিত।

ফ্যাক্টর — কোন সংখ্যার বিভাজক রাশিগুলি, অথবা যে-সব সংখ্যা গুণ

করলে সেই রাশিটি হয়; যেমন— 3×7=21, এখানে 7 ও 3 হলো 21-এর ফ্যাক্টর।

ফ্যাক্টিস — উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে রাবারের ↑ সংমিশ্রণে গঠিত বিশেষ একটা আঠালো পদার্থ; বর্ষাতির কাপড় তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

ফ্যাগোসাইট — রক্তের সংগঠক যে-সব কোষ বহিরাগত জীবাণুদের (ব্যাক্টেরিয়া ↑ প্রভৃতি) ধ্বংস করে; রক্তের শ্বেত-কণিকা কোষ। '**ফ্যাগো**' মানে ভক্ষণ বা ধ্বংসকারী। আবার এই অর্থে '**ফাজ**' শব্দও ব্যবহৃত হয়, যেমন, **ব্যাক্টিরিয়োফাজ**, যা ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে; যেমন, কোন কোন ভাইরাস ↑।

ফ্যাট — জান্তব চর্বি; বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্লিসারাইড ↑ যৌগিকে গঠিত এক শ্রেণীর নমনীয় কঠিন জৈব পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল কিন্তু বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারাইড হলেও এ-গুলো সাধারণতঃ তরল অবস্থায় থাকে; এদের বলে 'অয়েল', ফ্যাট নয়; যদিও রাসায়নিক হিসেবে উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে পেট্রল ↑, কেরসিন প্রভৃতি খনিজ তেলগুলো সব স্বভাবজাত তরল হাইড্রোকার্বন ↑ মাত্র।

ফ্যাটি অ্যাসিড — এক শ্রেণীর জৈব অ্যাসিড। এর বিভিন্ন প্রকার গ্লিসারাইড ↑ যৌগিকই হলো জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল। ফ্যাটি অ্যাসিডের সাধারণ ফর্মুলা হলো R. COOH; এর মধ্যে 'R' হলো হাইড্রোকার্বনের, বা কেবলমাত্র হাইড্রোজেনের বিভিন্ন সংখ্যক অণু, এবং COOH হলো এর স্থায়ী অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑; যেমন, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, $CH_3(CH_2)_{16}$ COOH; একটা ফ্যাটি অ্যাসিড। এর আবার তিনটা অণুর সঙ্গে গ্লিসারিনের ↑ মিলনে গঠিত গ্লিসারাইড ↑ যৌগিকই হলো গরুর চর্বি। বিভিন্ন চর্বি ও তেলের উপাদান হিসাবে গ্লিসারাইডের আকারে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বভাবজাত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো পাওয়া যায়।

ফ্যাদম — সমুদ্রজলের গভীরতা মাপবার জন্যে ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক; 6 ফুট = এক ফ্যাদম।

ফ্যাদোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। জলের উপরিভাগে সৃষ্ট কোন শব্দ জলরাশি ভেদ করে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে, তা এই যন্ত্রে নির্ণীত হয়। জলের মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি জানলে এই সময়-পরিমাণ থেকে হিসাব করে জলের গভীরতা জানা যেতে পারে।

ফ্যারাড — কণ্ডেন্সারের ↑ তড়িৎ-শক্তি-ধারণক্ষমতা পরিমাপের একক বিশেষ। এক 'ফ্যারাড' তড়িৎধারণ-

ক্ষম কণ্ডেন্সারে এক কুলম্ব ↑ তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে, যদি সেই কণ্ডেন্সারের প্লেটদ্বয়ের মধ্যে তড়িৎ-চাপ হয় মাত্র এক ভোল্ট ↑ ।

ফ্যারাডে, মাইকেল — বৃটিশ রাসায়নিক ও তড়িৎ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1791 খৃঃ, মৃত্যু 1867 খৃঃ । রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে স্যার হামফ্রে ডেভির ↑ ছাত্র ও গবেষণাগারের সহকারী। গ্যাস তরলীকরণ, এবং কাচ-শিল্পের রাসায়নিক পদ্ধতির উন্নতি বিধান, পারদ বাষ্পীকরণ প্রভৃতি বহু মূল্যবান অবদান ; কিন্তু তড়িৎ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন মৌলিক তথ্য আবিষ্কারেই সমধিক খ্যাতি, বিশেষতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি ও তড়িৎ-সংক্রমণের তথ্য আবিষ্কার এবং ডায়নামো ↑ ও জেনারেটার ↑ যন্ত্র উদ্ভাবন। তড়িৎ-বিজ্ঞানের 'জনক' বলে খ্যাত।

ফ্যারিংস — গল-নালির পশ্চাদ্বর্তী নিম্নাংশ ; আমাদের খাদ্য-নালির পেছনের প্রাচীরের টন্‌সিল ↑ থেকে শ্বাসনালির মুখ পর্য্যন্ত অংশ ; এর প্রদাহ হলো 'ফ্যারেঞ্জাইটিস'। এর উপরের অংশকে বলা হয় **ন্যাসোফ্যারিংস,** নাসিকার পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত।

গল-নালির 'ফ্যারিংস'

ফ্রনহোফার, যোসেফ ভন — জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1787 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1826 খৃস্টাব্দ। সৌরগোলকের বহিরাবরণের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের অস্তিত্ব নির্দেশক 'ফ্রনহোফার লাইন্‌স' আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। সূর্য-রশ্মির ধারা-বর্ণালিতে (ব্যাণ্ড স্পেক্ট্রাম ↑) যে-সব সঞ্চরমান কৃষ্ণ-রেখা দৃষ্ট হয় সেগুলিই 'ফ্রন্‌হোফার লাইনস' নামে পরিচিত হয়েছে। এ-সব রেখার সঙ্গে বিভিন্ন পরিচিত গ্যাসের বিশেষ উদ্দীপ্তাবস্থার রেখা-বর্ণালিতে (লাইন স্পেকট্রাম ↑) পরিদৃষ্ট রেখার পারম্পর্যের সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সূর্যের ক্রোমোস্ফিয়ারের ↑ বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান আবিষ্কার করেন। এভাবে তৎকালে অজ্ঞাত হিলিয়াম ↑ গ্যাস ফ্রন্‌হোফার কর্তৃক প্রথমে সূর্যে আবিষ্কৃত হয় এবং পরে পৃথিবীতে পাওয়া যায়।

ফ্রয়েড, সিগ্‌মণ্ড — অষ্ট্রিয়াবাসী মনোবিজ্ঞানী ; জন্ম মোরেভিয়ার ইহুদি বংশে 1856 খৃঃ, মৃত্যু 1939 খৃঃ। প্রথম জীবনে চিকিৎসক, পরে ফলিত মনোবিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ। বিভিন্ন মানসিক রোগের প্রতিকারে মনঃসমীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক ; অবচেতন মনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিবিধ ব্যাপারে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কার্যকরী প্রয়োগ-বিধির প্রবর্তক।

ফ্র্যাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেসন—বিভিন্ন স্ফুটনাংকের নানা রকম তরল পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে ওই সব

তরল পদার্থ যে বিশেষ ডিষ্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করা যায়। বিভিন্ন তরল পদার্থ বিভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয়ে থাকে; এ-জন্যে কোন মিশ্র তরল পদার্থকে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় স্থিরভাবে উত্তপ্ত করে ওই উষ্ণতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট তরল পদার্থটাকে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্প ঠাণ্ডা করে তরল পদার্থটা পৃথকভাবে পাওয়া যেতে পারে। এভাবে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে সংমিশ্রণ থেকে বিভিন্ন স্ফুটনাংকের তরল পদার্থ একে একে পৃথক করা যায়, আর সেগুলি ফ্রাক্সনেটিং-কলামের বিভিন্ন পাত্রে জমতে থাকে।

ফ্রাক্টোস — পাকা ফলের মিষ্ট রস ও ফুলের মধু থেকে যে বিশেষ শ্রেণীর শর্করা পাওয়া যায়। একে 'ফ্রুট সুগার', বা **লেভুলোস**-ও ↑ বলে। অবশ্য এর রাসায়নিক গঠন সাধারণ চিনির মত $C_6H_{12}O_6$; কিন্তু ভৌত ধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। স্ফটিকাকার সুমিষ্ট পদার্থ, জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়।

ফ্রিক্সন্যাল ইলেক্ট্রিসিটি — ঘর্ষ-তড়িৎ; বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি। গালা বা কাঁচের কোন জিনিসকে সিল্ক বা পশম (উল) দিয়ে ঘষলে তড়িৎ-শক্তি জন্মায়; সুতার কাপড় দিয়ে ঘষলেও কিছু কাজ হয়। ছোট ছোট কাগজের টুকরা নিয়ে এভাবে উৎপন্ন তড়িতের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা যায়। কিছুক্ষণ ঘষার পরে তড়িতাবিষ্ট হলে ওই কাঁচ বা গালার জিনিসটাকে কাগজের টুকরাগুলোর কাছে ধরলে উৎপন্ন তড়িতের আকর্ষণে টুকরাগুলো আকৃষ্ট হয়ে ওর গায়ে লেগে যায়।

ফ্রিজিং পয়েন্ট — সাধারণ বায়ু-মণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) যে তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে জমতে সুরু করে, অর্থাৎ তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হতে থাকে, তাই হলো ওই তরল পদার্থের 'ফ্রিজিং পয়েন্ট'; বাংলায় বলে হিমাংক উষ্ণতা। জলের বেলায় এই উষ্ণতা বা ফ্রিজিং পয়েন্ট হলো 0° সেন্টিগ্রেড।

ফ্রিজিং মিক্শ্চার — হিমায়ক মিশ্রণ। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ (সল্ট ↑) জলে দ্রবীভূত করলে,বা তাতে বিচূর্ণ বরফ মেশালে সেই দ্রবণ বা সংমিশ্রণের উষ্ণতা অত্যধিক হ্রাস পায়; এত ঠাণ্ডা হয় যে, তার সংস্পর্শে জল জমে যায়। এরূপ মিশ্রণকে বলে 'ফ্রিজিং মিক-শ্চার'। দ্রবীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এই সব সল্ট যে পরিমাণ তাপ শুষে নেয় (হিট্ অব সল্যুসন্ ↑) তার উপরই ঠাণ্ডা হওয়ার মাত্রা নির্ভর করে। অল্প জলে এক টুকরা বরফ

রেখে তার উপর কিছু সাধারণ খাদ্য-লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ছড়িয়ে দিলে বরফের ‘লেটেন্ট হিট্ অব ফিউসন’-এর ↑ প্রভাবে তার উষ্ণতা অত্যধিক হ্রাস পায়, আর তার ফলে সংলগ্ন জল জমে বরফে পরিণত হয়। কাজেই বরফ ও খাদ্য-লবণের মিশ্রণ হলো একটা ‘ফ্রিজিং মিক্শ্চার’। (পরিশিষ্ট ↑)

ফ্রেন্স পালিশ — অ্যালকোহল বা স্পিরিটে সেল্যাক ↑ (বিশুদ্ধ ল্যাক বা গালা) গলিয়ে যে কাঠের-পালিশ তৈরি হয় ; এ দিয়ে কাঠের উপরে চকচকে ও মসৃণ পালিশ করা হয়।

ফ্লাই হুইল — ইঞ্জিন-সংলগ্ন ভারী চাকা, যেটা সোজাসুজি ইঞ্জিনের শক্তিতে ঘোরে এবং কৌশলে তৎ-সংলগ্ন যন্ত্রাদির চাকা ঘোরায়। এই ভারী চাকার প্রভাবে ইঞ্জিনের গতি নিয়মিত হয় এবং সহসা বন্ধ করলেও ইঞ্জিনে মারাত্মক ধাক্কা লাগে না।

ফ্লাওয়ার অব সাল্ফার — বিশুদ্ধ গন্ধকের অতি সূক্ষ্ম হালকা চূর্ণ। অবিশুদ্ধ গন্ধক উত্তপ্ত করলে যে ধূম উৎপন্ন হয়, সাব্লিমেসন ↑ প্রক্রিয়ায় তাকে ঠাণ্ডা করে এরূপ বিশুদ্ধ সাল-ফারের হাল্কা গুঁড়া পাওয়া যায়।

ফ্লাস্ — মল-মূত্রাগারের নালি-পথ জলবিধৌত করবার যন্ত্র। শিকল ধরে টানলে জল-ভরতি একটা বড় পাত্র বা ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরে শিকল-সংলগ্ন লিভারের ↑ অপর প্রান্তে সংলগ্ন একটা নিম্নমুখ পাত্র উপরে উঠে যায় ; আর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাবে তার বাইরের জল ওই পাত্রের মধ্যে ঢুকে একটা বক্র-নলের বাঁকের উপর পর্যন্ত উঠে পড়ে।

শৌচাগারের ‘ফ্লাস’ যন্ত্র
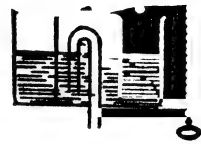
সঙ্গে সঙ্গে ওই উপরে-ওঠা অতিরিক্ত জল সাইফন ↑ প্রণালীতে বক্রনলের ভিতর দিয়ে সবেগে নীচে নেমে নালিমুখ ধৌত করে বেরিয়ে যায়।

ফ্লিন্ট — কাচের মত স্বচ্ছ ও অত্যন্ত কঠিন এক প্রকার প্রস্তর বিশেষ; রাসায়নিক গঠনে সিলিকা ↑ মাত্র, SiO_2। সিরিয়াম ধাতুর সঙ্গে লৌহ মিশিয়ে তৈরি বিশেষ একটা ধাতু-সংকরকেও বলে ‘ফ্লিন্ট’, যার ছোট টুকরা ‘সিগারেট লাইটার’ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়, লোহার চাকার সঙ্গে যার ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়।

ফ্লিন্ট গ্লাস — অত্যন্ত স্বচ্ছ এক প্রকার সিলিকেট ↑ কাচ (গ্লাস ↑)। এর একটা বিশেষ উপাদান হলো লেড-সিলিকেট। লেন্স, প্রিজ্ম ↑ প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরি হয়। পূর্বে বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্ম ফ্লিন্ট ↑ প্রস্তর কেটে তৈরি হোত বলে এ-জাতীয় কাচের এই বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে।

ফ্লেমিং, স্যার আলেকজাণ্ডার — বৃটিশ জীবাণু-বিজ্ঞানী, জন্ম আয়ারশায়ারে 1881 খৃঃ। বিভিন্ন জীবাণু-ঘটিত রোগের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ পেনিসিলিন ↑ আবিষ্কার (1929 খৃষ্টাব্দ)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এডওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নেস্ট চেন-এর সঙ্গে যুক্তভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ (1945 খৃঃ)। পেনিসিলিনের আবিষ্কারক হিসাবেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি।

ফ্লোজিস্টন থিওরি — পদার্থের জ্বলন সম্পর্কীয় প্রাচীন মতবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ একটি ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক পদার্থেই **ফ্লোজিস্টন** নামক এক রকম জ্বলন-কণিকা বর্তমান; পদার্থটা পোড়ালে এই ফ্লোজিস্টন বা জ্বলন-কণিকা বেরিয়ে যায়, আর ফ্লোজিস্টন-হীন ছাই পড়ে থাকে। বিজ্ঞানী প্রিস্টলি ↑ এই মতবাদ ভুল প্রমাণিত করেন। তিনি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করে জ্বলনের মূল রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অবশ্য তার এই তথ্যের ভিত্তিতে ল্যাভসিয়ার ↑ জ্বলনের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখালেন, কোন পদার্থ পোড়ালে ফ্লোজিস্টন, বা অন্য কোন কিছু চলে যায় না; বরং বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস ওই পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে পদার্থটা পরোক্ষভাবে ওজনে বেড়ে যায়। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, জ্বলন হলো দাহ্য পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন সংযোগের একটা রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র।

ফ্লোটিং রিব্‌স — বক্ষ-পঞ্জরের একাদশ ও দ্বাদশ হাড় (রিব্) দুখানা; এরা মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সত্য, কিন্তু সামনে বক্ষাস্থি, অথবা অন্য কোন পঞ্জরাস্থির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে না; সামনের দিকে এই দুইখানা ছোট পঞ্জরাস্থি অবলম্বন-শূন্যভাবে ঝুলে রয়েছে (ফল্‌স রিব্‌স ↑)।

ফ্লোটিং রিব্‌স

ফ্লোরস্পার — খনিজ অবিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, CaF_2। বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড স্ফটিকাকার বর্ণহীন পদার্থ; কিন্তু অবিশুদ্ধ খনিজ অবস্থায় সাধারণতঃ লাল্‌চে দেখায়। এ থেকেই বেশির ভাগ ফ্লোরিন নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

ফ্লোরা — কোন দেশের আঞ্চলিক উদ্ভিদ-বৈচিত্র্য। (ফনা ↑)।

ফ্লোরিন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন F, পারমাণবিক ওজন 19, পারমাণবিক সংখ্যা 9; ক্লোরিনের ↑ অনুরূপ হল্‌দে গ্যাস, কিন্তু এর রাসায়নিক সংযোগ-শক্তি সমধিক। ফ্লোরস্পার ↑, ক্রায়োলাইট ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্লোরাইড
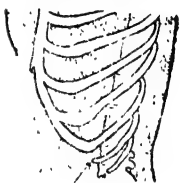
খনিজ থেকে ফ্লোরিন পাওয়া যায়। এই গ্যাসীয় ফ্লোরিন জলে দ্রবীভূত করলে পাওয়া যায় হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড; যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় কাচ ক্ষয়ে যায়।

ফ্লোরেসেন্স — বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন পদার্থের বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বিকিরণ করবার ধর্ম। কুইনিন সাল্‌ফেটের দ্রব, প্যারাফিন অয়েল প্রভৃতি কতকগুলো পদার্থ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (বিশেষ বিশেষ বর্ণের) আলোকরশ্মি শোষণ করে, এবং তার পরিবর্তে অপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ অপর বর্ণের রশ্মি বিকিরিত করে। এদের এই ধর্মকে বলে 'ফ্লোরেসেন্স'; আর ওই সব পদার্থকে বলে **ফ্লোরেসেণ্ট** পদার্থ। এসব পদার্থের উপর আলোক-রশ্মি যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণ এই ফ্লোরেসেন্স ধর্ম থাকে। নিয়ন ল্যাম্পে ↑ নিয়ন গ্যাসের এরূপ 'ফ্লোরেসেন্স' ধর্মের জন্যেই বিশেষ বিশেষ বর্ণ-বিশিষ্ট আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। পদার্থের 'ফস্‌ফোরেসেন্স ↑' ধর্ম আবার অন্যরূপ; মূল আলোক-রশ্মি সরিয়ে নিলে অন্ধকারেও কোন কোন পদার্থের এক রকম আলোক বা দীপ্তি বিকিরণ করবার ধর্মকে বলে ফস্‌ফোরেসেন্স।

ফ্লোয়েম — উদ্ভিদ-দেহের যে স্তরে রসবাহী সূক্ষ্ম নলিকাগুচ্ছ থাকে; উদ্ভিদ-কাণ্ডের ফ্লোয়েম-স্তরের এই অতি সূক্ষ্ম নলিকা-পথেই উদ্ভিদেরা মাটি থেকে খাদ্যরস টেনে নিয়ে সারা দেহে সরবরাহ করে এবং সতেজ ও পরিপুষ্ট থাকে। (চিত্রে উদ্ভিদ-কাণ্ডের ফ্লোয়েম সহ বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে।)

কাণ্ডের বিভিন্ন স্তর

বক্সাইট — স্বভাবজাত খনিজ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3; এই খনিজ পদার্থ থেকেই অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। কাদা-মাটির মত দেখতে এই খনিজ পদার্থটা হাইড্রেটেড ↑ (জল সংযুক্ত) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যৌগিকে গঠিত। ভারতের নানা-স্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়।

বক্সাইট সিমেণ্ট — বিশেষ এক শ্রেণীর সিমেণ্ট ↑; সাধারণতঃ যার প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট। ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেসে বক্সাইট ↑ ও লাইম (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑) এক সঙ্গে উত্তপ্ত করে তৈরি হয়ে থাকে। এ-শ্রেণীর সিমেণ্ট অতি দ্রুত শক্ত হয়ে পড়ে।

বল-কক্‌ — দণ্ডযুক্ত ফাঁপা ধাতব গোলক, যা জলের ট্যাঙ্কে অতিরিক্ত জল-প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে
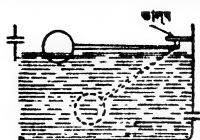
ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্ক ভরতি হলে ফাঁপা বলটা সমসূত্রে ভেসে দণ্ডের প্রান্তীয় ছিপি নলমুখে চেপে এঁটে দেয়।

বল-কক্

এর ফলে জল-প্রবেশ বন্ধ হয়; জল আর ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে পড়তে পারে না।

বল-সকেট জয়েণ্ট— দেহের বিশেষ এক রকম অস্থি-সংযোগ, যাতে একখানা হাড়ের গোলাকার প্রান্ত অপর হাড়ের গর্তে প্রবিষ্ট থাকে। গর্তটা চর্বিজাতীয় পদার্থে মসৃণ থাকায় সংযোগের যদৃচ্ছ সঞ্চালন সহজসাধ্য হয়। অনেক লৌহ-যন্ত্রেও এরূপ সংযোগের ব্যবস্থা থাকে।

বল-বেয়ারিং — গাড়ীর চাকা, বা যন্ত্রাদির কোন ঘূর্ণায়মান অংশ কেন্দ্র-সংলগ্ন যে দণ্ডের গায়ে আঁটা থাকে, তাকে বলে 'অ্যাক্সেল'। এই অ্যাক্সেলের দণ্ডটা যাতে সহজে দ্রুত-বেগে ঘুরতে পারে তার জন্যে 'বল-বেয়ারিং'-এর ব্যবস্থা করা হয়।

বল-বেয়ারিং

গোলাকার একটা ধাতব খাঁচের মধ্যে সুকঠিন কোন ধাতু-নির্মিত কতকগুলো বল পাশাপাশি বসিয়ে বল-বেয়ারিং তৈরি হয়। অ্যাক্সেল-টার দুই প্রান্ত এরূপ দুটো বল-বেয়ারিং-এর মধ্যে বসানো থাকে। এর ফলে অ্যাক্সেলটা সহজে ও অতি দ্রুত বেগে ঘুরতে পারে।

বয়েন্সি — পদার্থের প্লবতা ধর্ম; বস্তুতঃ এটা নিমজ্জিত বস্তুর উপরে তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থের উর্ধ্ব-চাপ। সাধারণতঃ তরল পদার্থের বেলায়ই এই প্লবতা সমধিক লক্ষিত হয়। নিমজ্জিত বস্তু যতটা তরল পদার্থ অপসারিত করে তারই ওজনের সমান হয় এই উর্ধ্ব-চাপ, বা প্লবতার পরিমাণ (আর্কিমিডিস প্রিন্সিপ্‌ল ↑)। এজন্যে তরল পদার্থে নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুর ওজন কম মনে হয়; অপসারিত তরল পদার্থের ওজন ওই বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে কমে যায়। বায়ুরও প্লবতা আছে; এজন্যে কোন বস্তুর প্রকৃত ওজন জানতে হলে বায়ুর প্লবতা-জনিত ওজন-হ্রাস সংশোধন করা দরকার। অবশ্য এই পার্থক্য এত সামান্য যে, সাধারণতঃ বস্তুর বায়ু-মধ্যস্থ হ্রাস-প্রাপ্ত ওজনকেই তার প্রকৃত ওজন বলে ধরা হয়ে থাকে।

বয়েলিং পয়েণ্ট — স্ফুটনাংক; যে উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ ফুটতে থাকে। প্রত্যেক তরল পদার্থই তার একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা, বা তাপ-মাত্রায় ফোটে; ফোটে, যখন ওই উত্তপ্ত তরল পদার্থে উৎপন্ন সর্বোচ্চ বাষ্পীয় চাপ বহিস্থ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বেশি হয়। এই স্ফুটনাংকে

এলে তরল পদার্থের বাষ্প উত্থিত হতে থাকে। বহিস্থ বায়বীয় চাপের তারতম্যে স্ফুটনাংকেরও তারতম্য ঘটে থাকে; পর্বতশিখরে বায়ুর চাপ কম বলে জল অপেক্ষাকৃত অল্প তাপেই ফোটে; নিম্নভূমিতে বেশি উত্তাপ দরকার হয়। কোন তরল পদার্থ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার পারার ওজন;—ব্যারোমিটার ↑) যে উষ্ণতায় ফুটতে আরম্ভ করে তাকেই সাধারণভাবে তার 'স্ফুটনাংক উষ্ণতা' বলা হয়।

বয়েল, রবার্ট — আয়ারল্যাণ্ডবাসী খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, জন্ম 1627 খৃঃ, মৃত্যু 1691 খৃঃ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন ও চাপ সম্বন্ধীয় সাধারণ সূত্র (বয়েল্‌স-ল ↑) আবিষ্কারেই বিশেষ প্রসিদ্ধি।

বয়েল্‌স-ল — কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণের কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন তার উপরে প্রদত্ত চাপের বিপরীত আনুপাতিক হয়, অর্থাৎ চাপ বাড়লে আয়তন তদনুপাতে কমে, চাপ কমলে আয়তন আবার তদনুপাতে বাড়ে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন গ্যাসের চাপ ও আয়তনের গুণফল সর্বদা সমান হবে। বিজ্ঞানী বয়েলের ↑ এই গ্যাসীয় নিয়ম সাধারণতঃ কোন গ্যাসের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে খাটে না। যদি কোন গ্যাস এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে বলে মনে হয়, তবে তাকে 'পারফেক্ট গ্যাস' ↑ বলে।

বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র — ভারতীয় (বাঙ্গালী) পদার্থবিদ ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1858 খৃঃ, মৃত্যু 1937 খৃষ্টাব্দ। আদি নিবাস — রাঢ়িখাল, বিক্রমপুর, ঢাকা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি, লণ্ডনের ডি.এস-সি। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা। পদার্থ-বিজ্ঞানে বেতার-তরঙ্গ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার। উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্রও যে প্রাণিদেহের মত আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তদ্বিষয়ক মৌলিক তথ্যাদি আবিষ্কারে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। দেশ-বিদেশে বিপুল সম্মান। ভারতে মৌলিক গবেষণার প্রসারের জন্য কলিকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠায় অক্ষয় কীর্তি।

বসু, অধ্যপক সত্যেন্দ্রনাথ —প্রখ্যাত ভারতীয় (বাঙ্গালী) গণিতজ্ঞ, পদার্থ-বিজ্ঞানী; কলিকাতায় জন্ম 1894 খৃঃ, অদ্যাবধি (1961 খৃঃ) জীবিত। 1915 খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস-সি; শীর্ষ স্থান অধিকার। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (1944 খৃঃ)। ভারত সরকারের 'পদ্ম-বিভূষণ' উপাধি লাভ; রয়্যাল

সোসাইটির ফেলো (এফ্-আর-এস)। ভারত সরকার কর্তৃক 'জাতীয় অধ্যাপক' মনোনীত। তেজঃকণিকা সম্পর্কিত মতবাদের পরিসংখ্যান-সূত্র উদ্ভাবন ; এই সূত্র আইনস্টাইন ↑ কর্তৃক বস্তু-কণিকার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত এবং তা 'বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব' (স্ট্যাটিষ্টিক্স) নামে খ্যাত। বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতি ও সম্মান।

বাইকার্বনেট—কার্বনিক অ্যাসিডের (H_2CO_3) বিভিন্ন 'অ্যাসিড সল্ট' ↑ অর্ধেক হাইড্রোজেন আয়ন ↑ যদি কোন বেস্-এর ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে অপর অর্ধেক 'হাইড্রোজেন' আয়ন নিয়ে তার যে অসম্পূর্ণ কার্বনেট সল্ট তৈরি হয় ; যেমন—সোডিয়াম বাইকার্বনেট $NaHCO_3$, পটাস বাইকার্বনেট $KHCO_3$, (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

বাইক্রোমেট অব পটাস — পটাসিয়াম বাইক্রোমেট (বা ডাই-ক্রোমেট) সল্ট, $K_2C_2O_7$; লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থে ও অক্সি-ডাইজিং এজেন্ট ↑ হিসাবে সল্টটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাইনোকুলার — সাধারণ এক রকম দূরবীণ, বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিশেষ ; এর মধ্যে একই রকমের দু-খানা লেন্স

বাইনোকুলার

দু'দিকে লাগানো থাকে। এক সঙ্গে দুই চোখ লাগিয়ে এর সংলগ্ন লেন্সের মধ্য দিয়ে দূরের জিনিসের প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ বাইনোকুলার বা 'ফিল্ডগ্লাসের' একটা চিত্র দেওয়া হলো।

বাইনারি কম্পাউণ্ড — দ্বি-মৌল যৌগিক ; দুটা মৌলিক পদার্থের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে ; যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ↑ CaC_2, হাইড্রোজেন সালফাইড H_2S ইত্যাদি যৌগিক।

বাইনারি অ্যালয় — কেবল মাত্র দুইটি ধাতুর সংযোগে যে সংকর ধাতুর সৃষ্টি হয় ; যেমন—পিতল (ব্রাস) হলো একটা বাইনারি অ্যালয় ; কারণ এটা কেবল তামা ও দস্তার মিলনে গঠিত।

বাই-প্রোডাক্ট — উপজাত পদার্থ ; কোন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করবার প্রক্রিয়ায় আনুসাঙ্গিক হিসেবে অন্য যে সব পদার্থ পাওয়া যায়। অনেক সময় এই আনুসঙ্গিক পদার্থ উদ্দিষ্ট পদার্থ অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হয়ে থাকে। যেমন—কোল গ্যাস ↑ তৈরির সময়ে বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া, কোক, কোল-টার ↑ ; এই কোল-টার, বা আলকাতরা থেকে আবার পাওয়া যায় বিভিন্ন

অ্যানিলিন ↑ রং, বিভিন্ন ঔষধ, সুগন্ধ দ্রব্য; স্যাকারিন ↑ প্রভৃতি।

বাইল — পিত্ত রস; যকৃতে উৎপন্ন সবুজাভ-হল্‌দে জৈব রস, যা অন্ত্রে গিয়ে খাদ্যের চর্বি (ফ্যাট ↑) উপাদানকে ভেঙ্গে সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত করে' তাকে জীর্ণ হতে সাহায্য করে। কোন জৈব ক্রিয়ার গোলযোগে এই পিত্ত-রস রক্তে মিশলে জণ্ডিস ↑ বা কাঁওলা রোগ হয়।

বাকনার ফানেল — পরিস্রাবণ (ফিল্‌ট্রেসন ↑) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পোর্সিলেনের ↑ তৈরি বিশেষ ধরণের এক প্রকার ফানেল, যার মধ্যে সছিদ্র তাকের উপরে ফিল্‌টার কাগজ বসানো হয় (চিত্র ↑)। এই ব্যবস্থায় পরিস্রাবণ ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে থাকে।

বাকনার ফানেল
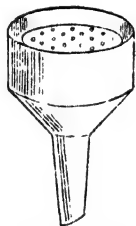
বাটার অব অ্যান্টিমনি — অ্যান্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড, $SbCl_3$; নামক একটি সাদা স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। অ্যান্টিমনি ট্রাইসালফাইড (ষ্টিব্‌-নাইট, Sb_2S_3) ও কন্‌সেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়।

বাফোটক্সিন — ব্যাং-এর মুখের বিষ, 'বাফো' মানে ব্যাং।

বার্জিলিয়াস, জন্‌স জেকব — সুইডেনবাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী; জন্ম 1769 খৃঃ, মৃত্যু 1848 খৃঃ। কয়েকটি তৎকালীন অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আণবিক ও পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ। মৌলিক পদার্থের সূচক সংকেত ('H' হাইড্রোজেন, 'Fe' আয়রন, লৌহ ইত্যাদি) উদ্ভাবনের জন্যেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি।

বার্নিং — দহন বা জ্বলন ক্রিয়া; বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া। বস্তুতঃ কোন পদার্থের 'বার্নিং' বা দহন-ক্রিয়া একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র; এরই তীব্রতার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অবস্থায় উত্তাপ, আলোক ও অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বার্ণ্ট অ্যালাম — ফিটকিরি, বা অ্যালাম ↑ উত্তপ্ত করলে যে সাদা গুঁড়া পাওয়া যায়; পদার্থটা হলো পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, $K_2SO_4\ Al_2(SO_4)_3$। উত্তাপের ফলে অ্যালামের 'ওয়াটার অব ক্রস্টা-লিজেসন ↑' উবে গিয়ে জলশূন্য হয়, স্ফটিকাকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

বায়োকেমিস্ট্রি — বিভিন্ন জৈব পদার্থের রাসায়নিক গঠন, পরিবর্তন ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান; এক কথায় জৈব-রসায়ন শাস্ত্র।

বায়োলজি — জীববিদ্যা। বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী

সম্পর্কে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পর্যালোচিত হয়ে থাকে। বোটানি (উদ্ভিদ-বিজ্ঞান), জুওলজি (প্রাণী-বিজ্ঞান), ব্যাক্ টিরিয়োলজি ↑ প্রভৃতি বিজ্ঞান সবই এর অন্তর্গত।

বায়োটিক — শব্দার্থ হলো জীবন বা দৈহিক সুস্থতা সম্বন্ধীয় ; যেমন— **অ্যান্টিবায়োটিক্স**— যে-সব পদার্থ (পেনিসিলিন ↑ ইত্যাদি) জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে জীবন বা দৈহিক সুস্থতা রক্ষা করে। জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া ↑) প্রতিরোধক ও ধ্বংসকারী ঔষধ।

বায়োটিন—একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; যা 'ভিটামিন-এইচ' নামে পরিচিত। দেহাভ্যন্তরে ঈস্ট ↑ ও কোন কোন হিতকারী জীবাণুর ক্রিয়া এর প্রভাবে ত্বরান্বিত ও কার্যকরী হয়ে থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ; অভাবে বিশেষতঃ চর্মরোগ হয়।

বার্বিচুরেট—বার্বিচুরিক অ্যাসিডের [$CO(NH.CO)_2CH_2$] বি ভি ন্ন সল্ট ; এই শ্রেণীর নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে। জীব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এদের শক্তিশালী (অনেক সময় মারাত্মক) প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ভেরোন্যাল, লুমিন্যাল ↑ প্রভৃতি এ-জাতীয় ঔষধে দেহ অসাড় হয়ে আসে, ঘুম পায়। এগুলোকে সাধারণতঃ 'নার্কোটিক ড্রাগ' ↑ বলা হয়। এ-সব ঔষধ কিছু দিন ব্যবহারে মানুষ নেশার মত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিটা পার্টিকল্ — রেডিও-অ্যাকটিভ (তেজস্ক্রিয়) পদার্থ থেকে যে-সব তেজঃকণিকা নির্গত হয়, তাদের মধ্যে অতি দ্রুতগামী ইলেকট্রন ↑ (β^-) ও পজিট্রন ↑ (β^+) কণিকা-গুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই বিটা-কণিকার গতি আলোক-তরঙ্গের গতির প্রায় সমান।

বিটা-রে — রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ পদার্থের পরমাণু-বিভাজনের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় উদ্গত বিটা-পার্টিকল-গুলো ↑ ধারার আকারে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই কণিকা-ধারার গতি ও ধর্ম আলোক-রশ্মির প্রায় অনুরূপ ; এ-জন্যে এদের সচরাচর বলা হয় বিটা-রশ্মি, বা 'বিটা-রে' (রেডিও-অ্যাকটিভিটি ↑)।

বিটাট্রন — পদার্থের পরমাণু বিভাজনের (ফিসন ↑) সাহায্যে প্রাপ্ত ইলেক্ট্রন কণিকাগুলোকে অত্যধিক

(বিভাজনের অংশ উন্মুক্তভাবে দেখান হয়েছে)
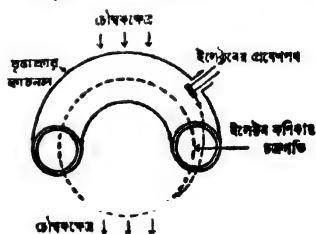
গতি-সম্পন্ন করবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একটা তড়িৎ-

চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত বৃত্তাকার বায়ুশূন্য কাঁচনলের ভিতরে বিশেষ ব্যবস্থায় ইলেকট্রন-কণিকাগুলোকে চক্রাকারে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করানো হয়। এর ফলে বহিস্থ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে কণিকাগুলো ক্রমশ: উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

বিটুমেন — বিভিন্ন ভারী হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণে গঠিত, দেখতে আলকাত্‌রার মত কালো এক রকম পদার্থ। একে সাধারণ কথায় বলে পিচ্‌, যা দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়। পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে হাল্‌কা হাইড্রোকার্বনগুলি বার করে নিলে এই পদার্থ পড়ে থাকে। পদার্থটা আবার কয়লা থেকেও পাওয়া যায়।

বিব্‌-কক্‌ — সহরাঞ্চলে ব্যবহৃত জলের কলের পাইপের মুখে লাগানো, নিচের দিকে বাঁকানো পিতলের তৈরী কল মুখ (ট্যাপ)।

বুটাডিন — বর্ণহীন একটি জৈব রাসায়নিক গ্যাস; যার গঠনে চারটি কার্বন-পরমাণু সারিবদ্ধভাবে যুক্ত থাকে। এক শ্রেণীর কৃত্রিম রাবার ↑ তৈরি করতে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়, যাকে বলে 'বুনা রাবার'।

বুটেন — প্যারাফিন শ্রেণীর একটা হাইড্রোকার্বন, C_4H_{10} ; তৈলখনি থেকে পেট্রোলিয়ামের ↑ সঙ্গে নির্গত হয়। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় এটা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। বিশেষ দাহ্য পদার্থ, মোটর-স্পিরিটের সঙ্গে অনেক সময় মিশ্রিত করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় গ্যাসটা জ্বালিয়ে আলো সৃষ্টি করাও যায়।

বুন্‌সেন, রবার্ট উইল্‌হেল্‌ম — জার্মান রাসায়নিক ; জন্ম 1811 খৃঃ, মৃত্যু 1899 খৃঃ। পদার্থের বর্ণালি-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও নূতন এক রকম ব্যাটারি ↑ (বুন্‌সেন ব্যাটারি) উদ্ভাবন। গবেষণাগারে ব্যবহৃত বায়ুমিশ্রিত কোল-গ্যাসের ↑ দহনে অগ্নিশিখা উৎপাদনের উপযোগী 'বুন্‌সেন বার্ণার' ↑ নামক এক প্রকার বাতি উদ্ভাবনে চিরস্মরণীয়।

বুন্‌সেন বার্ণার — এক রকম গ্যাসের বাতি ; দাহ্য গ্যাস জ্বেলে অগ্নিশিখা উৎপাদনের এক রকম যন্ত্র।
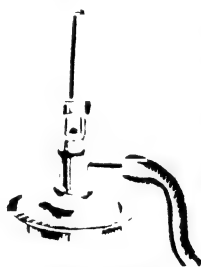
বুন্‌সেন বার্ণার

বিজ্ঞানাগারে সাধারণতঃ এই বার্ণারে বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত কোল গ্যাস ↑ জ্বেলে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করা হয়। এর ধাতব নলের নিম্নাংশের একটা ছিদ্রপথ বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। এভাবে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয়ে ওই নলের মুখে বেরোয় ; আর এই বায়ুমিশ্রিত গ্যাসটা জ্বালালে নলের অগ্রভাগে

অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়। বায়ুর পরিমাণ কমিয়ে-বাড়িয়ে অগ্নিশিখার তীব্রতাও কমানো বাড়ানো সম্ভব হয়।

বুলডজার — মোটর-চালিত ভারি যন্ত্র, বিশেষ ; যার সাহায্যে উঁচু-নিচু জায়গা সমতল করা হয়। দেখতে অনেকটা যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। সামনে থাকে প্রকাণ্ড একখানা লৌহ-প্লেট ; যাতে ক'রে মাটি-পাথরের বড় বড় চাঙ্গর সরিয়ে গুড়িয়ে দেয়।

বিস্‌মাথ — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Bi ; পারমাণবিক ওজন 209, পারমাণবিক সংখ্যা 83; লাল্‌চে আভাযুক্ত সাদা স্ফটিকাকার ভঙ্গুর ধাতু। উত্তাপ ও তড়িৎ পরি-বহনের ক্ষমতা এর অত্যন্ত কম। উত্তাপে গলিয়ে পরে ঠাণ্ডা করলে ধাতুটা জমে আয়তনে কিছু বেড়ে যায়, এজন্যে 'টাইপ-মেটালে' ↑ অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। নিম্ন-গলনাংকের বিভিন্ন সংকরধাতু (উড্ মেটাল ↑) এ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। এর কোন কোন সল্ট ঔষধ হিসেবেও কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

বেক্‌ম্যান থার্মোমিটার — এক প্রকার তাপমান যন্ত্র ; যার সাহায্যে উষ্ণতার অতি সামান্য পরিবর্তনও মাপা যায়। এ-রকম থার্মোমিটারে ↑ পারদ-নলের নিম্নস্থ গোলকের পারদ প্রয়োজন মত উপরের দিকে সংলগ্ন আর একটা কাঁচ-গোলকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা থাকে। এভাবে গোলকের অভ্যন্তরস্থ পারদের পরিমাণ সহজেই কমানো বাড়ানো চলে। এর ফলে বিভিন্ন উষ্ণতায় পারদের আয়তনের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি মাপা যায়। এ-থার্মোমিটারের গায়ে মাত্র 6 বা 7 ডিগ্রি পরিমিত স্কেলের দাগ কাটা থাকে, আর তার প্রত্যেক ডিগ্রিকে এক শত ভাগে ভাগ করা থাকে। এ-জন্যে ডিগ্রির শতাংশও এ-দিয়ে মাপা সম্ভব হয়।

বেকারেল, অ্যাণ্টোইন হেনরি — ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1852 খৃঃ, মৃত্যু 1908 খৃঃ। ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, বিভিন্ন তেজঃ-কণিকার রশ্মি (রেডিও এনার্জি-রে) আবিষ্কারে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন। 1903 খৃষ্টাব্দে কুরি-দম্পতির সঙ্গে যুগ্মভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

বেকিং পাউডার — সোডিয়াম বাইকার্বনেটের ($NaHCO_3$) সঙ্গে টার্টারিক অ্যাসিড ↑, বা 'ক্রিম্ অব টার্টার' ↑ মিশিয়ে বেকিং পাউডার তৈরি হয়। জলে দিলে বা উত্তপ্ত করলে এ-থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস নির্গত হতে থাকে। পাউরুটি তৈরির জন্যে ময়দার জল-মিশ্রিত নরম পিণ্ডের মধ্যে এই পাউডার মেশাবার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ; আর সেই গ্যাসের অসংখ্য বুদ্‌বুদ উঠে

ময়দার নরম পিণ্ডটা ছিদ্রবহুল হয়ে ফেঁপে ফুলে ওঠে।

বেকিং সোডা—'বেকিং পাউডার' ↑ তৈরি করবার জন্যেই প্রধানতঃ প্রয়োজন হয়ে থাকে বলে 'সোডিয়াম বাইকার্বনেট' সল্টকে ($NaHCO_3$) 'বেকিং সোডা' বলা হয়। সোডিয়াম কার্বনেট হলো 'ওয়াসিং সোডা'।

বেঞ্জল — অপরিশুদ্ধ বেঞ্জিনের ↑ ব্যবহারিক নাম। মোটর স্পিরিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একে অনেক সময় বেঞ্জোল-ও বলে।

বেঞ্জাইল — প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণ; উদ্বায়ী তরল পদার্থ। খনিজ পেট্রো-লিয়াম ↑ থেকে পাওয়া যায়। তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ এতে সবিশেষ দ্রবীভূত হয় বলে এ-দিয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরিষ্কার (ড্রাই-ওয়াস) করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রাবক পদার্থ হিসেবেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেঞ্জিন — বর্ণহীন তরল একটা হাইড্রোকার্বন, C_6H_6; কয়লার 'ডেষ্ট্রাক্‌টিভ ডিষ্টিলেসন' ↑ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত আলকাত্‌রা বা কোল-টার থেকে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দাহ্য ও উদ্বায়ী পদার্থ; সহজেই বাষ্পাকারে উবে যায়। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় পদার্থটাকে বেঞ্জল-ও বলা হয়। তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ বেঞ্জাইলের ↑ মত বেঞ্জিনেও অতি দ্রুত দ্রবীভূত হয়। সাধারণভাবে অতি উৎকৃষ্ট একটা দ্রাবক পদার্থ। মোটরগাড়ীর জ্বালানি তেল হিসেবেও বেঞ্জিনের ব্যবহার আছে।

বেঞ্জিড্রিন — মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্র-গুলির উত্তেজক একটি তরল ঔষধের ব্যবহারিক নাম। এই তরল পদার্থটি নাসারন্ধ্রে টেনে নিলে নাকের রক্তবহা নলিকাগুলি সংকুচিত হয়ে 'নাসা-রোগ' উপশম হয়। কখন কখন সর্দিতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেঞ্জোইক অ্যাসিড — একটা তরল ফ্যাটি ↑ অ্যাসিড; রাসায়নিক ফর্মুলা, C_6H_5COOH; এই তরল বর্ণহীন পদার্থটা মাখিয়ে ফল সং-রক্ষণের কাজে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঔষধ হিসেবেও এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

বেণ্টোনাইট — এক প্রকার মৃত্তিকা, দেখতে সাদা। এর মধ্যে জল দিলে ফুলে ওঠে এবং জেলির ↑ মত হয়ে পড়ে। পদার্থটা কাগজ-শিল্পে ও রং (পেইণ্ট) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদার্থটা পেট্রল ↑ বিশুদ্ধি-করণেও লাগে।

বেরাইল — বেরিলিয়াম অ্যালু-মিনিয়াম সিলিকেট, $3BeO.Al_2O_3.6SiO_2$; খনিজ পদার্থ। এই খনিজ থেকেই সাধারণতঃ বেরিলিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

বেরিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Ba; পারমাণবিক

ওজন 137·36, পারমাণবিক সংখ্যা 56 ; রৌপ্যের মত সাদা, কিন্তু নরম ধাতু। বায়ুর সংস্পর্শে অক্সাইডে পরিণত হয়ে এর উপরে একটা আবরণ পড়ে যায়। খনিজ বেরিয়াম-সালফেট (ব্যারাইটিস্ ↑), $BaSO_4$, এবং কার্বনেট, $BaCO_3$, থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়। এর সল্ট-গুলো দেখতে ক্যালসিয়াম সল্টের অনুরূপ, কিন্তু বিষাক্ত। বিভিন্ন বেরিয়াম সল্ট ভার্নিস ↑ রং তৈরি, কাঁচ শিল্প ও আতস-বাজী তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেরিয়াম মিল – পাকস্থলী ও অন্ত্রের 'এক্স-রে' আলোকচিত্র তোলবার আগে অনেক সময় রোগীকে এ-জিনিসটা খাওয়ানো হয়। সামান্য বেরিয়াম সাল্‌ফেট (বেরাইটিস ↑) জলে মিশিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রে এর উপস্থিতির ফলে এক্স-রশ্মির প্রতিফলন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বেরিলিয়াম — একটি মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Be ; পারমাণবিক ওজন 9·013, পারমাণবিক সংখ্যা 4 ; সাদা সুকঠিন ধাতব পদার্থ। পদার্থটা **'গ্লুসিনিয়াম'** নামেও পরিচিত। বেরাইল ↑ নামক খনিজ পদার্থ থেকে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হালকা ও শক্ত ধাতু। তামা, লোহা প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর-ধাতু তৈরি হয়ে থাকে। ইস্পাত ও বেরিলিয়ামের সংকর ধাতু দিয়ে ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিং তৈরি করা হয়। 'অ্যাটমিক পাইল' ↑ যন্ত্রে 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসন' ↑ মন্দীভূত করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

বেল (ইলেক্‌ট্রিক) — বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ; মূলতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে ঘণ্টা-ধ্বনি সৃষ্টি করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। সুইচ টিপলে একটা ছোট ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটের ↑ তড়িৎ-চক্র সম্পূর্ণ হয় ; সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ প্রবাহের ফলে ওই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটের তার-কুণ্ডলী, অথবা তার মধ্যস্থিত লৌহখণ্ড চৌম্বক শক্তি-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই চৌম্বকশক্তির আকর্ষণে নিকটস্থ কাঁচা লোহার একটা পাত আকৃষ্ট হলেই তড়িৎ চক্রটা বিচ্ছিন্ন হয়ে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ; আর সঙ্গে সঙ্গে ওই চৌম্বকশক্তিও লোপ পায়। চুম্বকীয় আকর্ষণের অভাবে লোহার পাতখানা যথাস্থানে এসে তড়িৎচক্র আবার সম্পূর্ণ করে। কাজেই তড়িৎ-প্রবাহের ফলে আবার
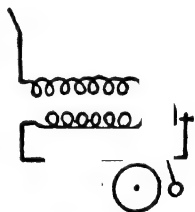
ইলেক্‌ট্রিক বেল

চুম্বকীয় শক্তি জন্মায় ও লোহার পাতখানা আকৃষ্ট হয়। এভাবে পাতখানা মুহুর্মুহু এদিক ওদিকে নড়তে থাকে। এর ফলে পাতখানার গায়ে সংলগ্ন ছোট একটা হাতুড়ি সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাতব পাত্রের (ঘণ্টার) গায়ে পর্যায়ক্রমে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করতে থাকে। যতক্ষণ সুইচ টিপে তড়িৎ-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ততক্ষণ ওই ঘণ্টাধ্বনি চলতে থাকে।

বেল মেটাল — তামা ও টিনের বিশেষ একটা সংকর ধাতু ; এর মধ্যে তামার ভাগ 60% থেকে 85% পর্যন্ত থাকতে পারে। সামান্য আঘাতে অধিকতর স্পন্দিত হয়ে ভাল শব্দ উৎপাদন করে বলে সাধারণতঃ এ দিয়েই ঘণ্টা তৈরি হয়। বাংলায় এই সংকর ধাতুকে 'কাঁসা' বলে।

বেলোমিটার—অতি সামান্য উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার থার্মোমিটার ↑ যন্ত্র। উষ্ণতার অতি সূক্ষ্ম হ্রাস-বৃদ্ধিতে এ-যন্ত্রের বৈদ্যুতিক তারে প্রবাহিত তড়িৎ-প্রবাহের পথে যে সূক্ষ্ম বাধার (রেজিস্টেন্স ↑) সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ এতে নিরূপণ করা যায় এবং তা থেকে হিসাব করে উষ্ণতার পরিমাণ জানা যায়। এ-যন্ত্র বস্তুতঃ তাপ-রশ্মির (রেডিয়্যান্ট রে ↑) শক্তি মাপতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেস — সাধারণতঃ যে-সব ধাতব যৌগিকের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সল্ট ও জল উৎপন্ন হয় তাদের বলে 'বেস', যেমন CuO (কপার অক্সাইড) + H_2SO_4 (সালফিউরিক অ্যাসিড) $= CuSO_4$ (কপার সালফেট, সল্ট) + H_2O (জল)। অতএব এখানে কপার-অক্সাইড হলো 'বেস'। সাধারণতঃ বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডগুলোই 'বেস' বলে পরিচিত।

বেস্ মেটাল — নিকৃষ্ট ধাতু। লোহা, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু সাধারণ অ্যাসিডে গলে, মরচে ধরে কালো হয়ে যায় ; এজন্যে এ-গুলোকে বলে নিকৃষ্ট ধাতু, বা 'বেস্ মেটাল'। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতু সাধারণ কোন অ্যাসিডে গলে না, মরচেও ধরে না, সচরাচর সর্বদাই উজ্জ্বল থাকে। এজন্যে এ-সব ধাতুকে বলা হয় 'নোব্‌ল মেটাল' ↑ বা সম্ভ্রান্ত ধাতু।

বেসিক ডাই — যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবে ডুবিয়ে বস্ত্রাদি (কোন মরড্যাণ্ট ↑ ব্যতিরেকেই) সরাসরি রঞ্জিত করা যায়। মৃদু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে এরূপ অ্যালকালি ধর্মী ↑ রঞ্জকদ্রব্য দিয়ে সুতা, উল প্রভৃতিতে পাকা রং করা যেতে পারে। এ দিয়ে কাপড় ছাপাও হয়।

বেসিক সল্ট — যে-সব সল্টের মধ্যে বেসিক র্যাডিক্যাল ↑ আংশিকভাবে

মিশ্রিত অবস্থায় থেকে যায়। এগুলো অ্যাসিড-সল্টের ↑ মত অসম্পূর্ণ সল্টের পর্যায়ভুক্ত। বেসিক্ (বেস্ ↑) পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়ে অর্ধ-গঠিত অবস্থায় উৎপন্ন সল্টের সঙ্গে (অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড ↑) বেস্-টির কত কাংশ যদি মিশ্রিত থেকে যায়, তাহলে এরূপ বেসিক সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে ; যেমন — 'বেসিক লেড কার্বনেট', $2\,PbCO_3.\,Pb(OH)$; যাকে সাধারণতঃ বলে 'হোয়াইট লেড' ↑ ।

বেসিক শ্ল্যাগ — খনিজ লৌহ থেকে ইস্পাত তৈরির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গলিত তরল লোহার উপরে নানা রকম লৌহেতর পদার্থের যে-সব গাদ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা মোটামুটি হলো লাইম ↑, ফসফরাস, সিলিকা ↑ প্রভৃতির বিভিন্ন অবিশুদ্ধ সল্টের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ এর মধ্যে টেট্রাক্যালসিয়াম ফসফেট ($Ca_4P_2O_9$), ক্যালসিয়াম সিলিকেট ($CaSiO_3$), লাইম (CaO), ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত থাকে। ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম থাকার জন্যে এরূপ 'বেসিক শ্ল্যাগ' উৎকৃষ্ট অজৈব সার হিসেবে জমিতে দেওয়া হয়।

বেসিমার প্রোসেস — অবিশুদ্ধ ঢালাই লোহা (কাস্ট আয়রন ↑) থেকে ইস্পাত তৈরি করবার একটা প্রণালী। প্রথমতঃ ব্ল্যাস্ট ফার্নেসে ↑ লোহা গলানো হয় ; পরে ওই গলিত লোহা 'বেসিমার কন্‌ভার্টার' নামক একটা পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বেসিমার কনভার্টার হলো একটা ডিম্বাকার প্রকাণ্ড পাত্র যার তলদেশে ছিদ্রপথ থাকে। এই ছিদ্রপথে তরল লোহার মধ্যে সজোরে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে লোহার ময়লা সব অক্সিডাইজড ↑ হয়ে পুড়ে যায়; উপরে গাদ ভেসে ওঠে। এর পরে নিচের ওই বিশুদ্ধ গলিত লোহায় স্পিজেল ↑ (লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বনের একটা বিশেষ সংকর ধাতু) পরিমাণ অনুযায়ী মিশিয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণীর ইস্পাত তৈরি করা হয়। লোহার সঙ্গে মিশ্রিত কার্বনের পরিমাণের উপরই ইস্পাতের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ নির্ভর করে (স্টিল ↑)।
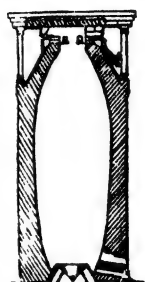
বেসিমার কন্‌ভার্টার

বোন্ অয়েল — জীব-জন্তুর হাড় থেকে 'ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন' ↑ প্রক্রিয়ায় যে তৈলাক্ত মিশ্র পদার্থ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। অত্যন্ত কালো ও ঘন তরল পদার্থ, বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত। এ থেকেই পাইরিডিন ↑ পাওয়া যায়। এই বোন-অয়েলকে আবার 'ডিপেল্‌স্ অয়েল'-ও বলে।

বোন্ ব্ল্যাক — জীব-জন্তুর হাড় ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে বিশেষ বিশুদ্ধ কয়লা (কার্বন) পাওয়া যায়। একে অ্যানিম্যাল চারকোল ↑, আবার অনেক সময় 'বোন্-চার'ও বলা হয়।

বোর, নিল্স — ডেনমার্কের পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1885 খৃষ্টাব্দ, অদ্যাপি (1961 খৃষ্টাব্দ) জীবিত। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন-বিন্যাস নিরূপণের গবেষণায় 'কোয়াণ্টাম'বাদের ↑ সফল প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীতে পারমাণবিক শক্তির গবেষণায় অংশ গ্রহণ এবং গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করে আমেরিকায় পলায়ন। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় প্রথম পরমাণু-বোমা (অ্যাটম বম্ব ↑) তৈরি (1945 খৃঃ)। আমেরিকায় পরমাণু-শক্তি উৎপাদন প্রচেষ্টার গোড়া পত্তন।

বোরন — মৌলিক ধাতব পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন B; পারমাণবিক ওজন 10·82. পারমাণবিক সংখ্যা 5; ধাতুটা পাংশুটে রংয়ের চূর্ণ, বা হলদে স্ফটিকাকার পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। বোর‍্যাক্স ↑ ও বোরিক অ্যাসিড ↑ বোরনের যৌগিক পদার্থ। কাঠিন্য বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাতের সঙ্গে কখন কখন কিছু বোরন মিশ্রিত করা হয়।

বোরিক অ্যাসিড — সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ, H_3BO_3; জলে দ্রবণীয়। একে আবার **বোর‍্যাসিক অ্যাসিড**-ও বলা হয়। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খনিজ বোর‍্যাক্স ↑ থেকেই প্রচুর পরিমাণে বোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে থাকে। মৃদু অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ পদার্থ হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

বোর‍্যাক্স — সোডিয়াম পাইরো-বোরেট, $Na_2B_4O_7 . 10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। পৃথিবীর নানা স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। বাংলায় একে বলে 'সোহাগা'। উত্তাপে এর জলীয় অংশ চলে গিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। কাঁচ-শিল্পে, অগ্নি-নিরোধক পদার্থ তৈরি করতে ও সোল্ডারিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়। মৃদু অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ পদার্থ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

বোর‍্যাসিক অ্যাসিড — বোরিক অ্যাসিড ↑।

ব্যাক্টেরিয়া — বিশেষ এক শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীবাণু; এক-কোষী প্রোটোপ্লাজ্‌ম ↑ বিশেষ। মাই-ক্রোব ↑, জার্ম, ব্যাসিলি ↑ প্রভৃতি সবই ব্যাক্টেরিয়া জাতীয়। আপন দেহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে (ফিসন ↑) এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে; একটা ব্যাক্টেরিয়া থেকে 24 ঘণ্টায় এভাবে দেড় কোটি পর্যন্ত ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন আকারের ব্যাক্টেরিয়

আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত: গোলাকার চ্যাপ্টাগুলো **কক্কাই**, কাঠির মত লম্বাগুলো **ব্যাসিলি**, ইত্যাদি। বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে জীব-দেহে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়; কিন্তু সব জীবাণুই রোগ সৃষ্টি করে না। অনেক উপকারী ব্যাক্টেরিয়াও আছে। মাটির মধ্যে নানা রকম ব্যাক্টেরিয়া থাকে, যার প্রভাবে উদ্ভিদের গ্রহণ-উপযোগী বিভিন্ন নাইট্রেট ↑ সল্ট উৎপন্ন হয় (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বিভিন্ন রকম ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে।

ব্যাক্টেসাইড — যে-সব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে। জীবাণু-ঘটিত রোগে জীবাণুদের ধ্বংস, বা তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করবার জন্যে যে সব ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ব্যাকট্রিয়োফাজ — রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া ↑) ধ্বংসকারী বিশেষ ভাইরাস ↑; অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ (ফাজ ↑)।

ব্যাকেলাইট — বিশেষ এক শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑ জাতীয় পদার্থের ব্যবহারিক নাম। এর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী বেক্‌ল্যাণ্ডের ↑ নামানুসারে পদার্থটার এই নাম দেওয়া হয়েছে। ফিনল ↑ ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ↑ মিলনে উৎপন্ন এক রকম রাসায়নিক পদার্থের একটা পলিমার ↑। বিশেষ এক শ্রেণীর থার্মোসেটিং ↑ প্ল্যাস্টিক।

ব্যাচিলাস্ — কাঠির মত লম্বা আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যাক্টেরিয়ার ↑ বিশেষ নাম। এদের অতি-সূক্ষ্ম লম্বা দেহ কোন বিশেষ জীবাণুর ক্ষেত্রে বক্রও হতে পারে; পেছনে থাকে চুলের মত কয়েকটি লেজ। কলেরার ব্যাসিলাসগুলো কমার মত বাঁকা। শব্দটার বহুবচনে হয় 'ব্যাচিলি'।

ব্যাচিলাস্
(বহুগুণ বর্ধিতাকার)

ব্যাটারি — বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদক এক রকম যন্ত্র বিশেষ। একাধিক প্রাইমারি ↑, বা সেকেণ্ডারি সেল ↑ শ্রেণীবদ্ধভাবে বা সমান্তরাল করে সাজিয়ে ব্যাটারি তৈরি হয়। সেলগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে (অর্থাৎ পর পর সিরিজে সংলগ্ন) রাখলে ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ বেড়ে যায়; সমান্তরালভাবে (অর্থাৎ প্যারালাল কানেক্‌সনে) সাজানো সেলের ব্যাটারি থেকে বেশি সময়ের জন্যে তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ড্রাই-ব্যাটারি ↑ গুলো লেক্‌ল্যান্স ↑ সেলে তৈরি হয়ে থাকে।

ব্যাথোস্ফিয়ার — যে সুদৃঢ় লৌহ-আধারে করে ডুবুরীরা সমুদ্রের গভীরে নামে; জলের গভীরতা-জনিত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে

এমন ধাতুনির্মিত আধার। **'ব্যাথো'** মানে গভীরতা সম্বন্ধীয়।

ব্যান্টিং, স্যার ফ্রেডারিক গ্রাণ্ট— ক্যানাডা রাজ্যের রাসায়নিক ও জীব-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1868 খৃঃ, মৃত্যু 1941 খৃঃ। ডায়বিটিস ↑ বা বহুমূত্র রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ ইন্সুলিন ↑ আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি ; 1923 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ব্যা রা ই টা — খনিজ বেরিয়াম অক্সাইড, BaO ; বিভিন্ন স্থানে সাদা চূর্ণ আকারে পাওয়া যায়।

ব্যারাইটিস — খনিজ বেরিয়াম সালফেট, $BaSO_4$; ভারী সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। সাধারণতঃ সীসার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। জলে দ্রবণীয় নয় ; তেলে মিশিয়ে এর চূর্ণ দিয়ে সাদা পেইণ্ট তৈরি হয়। সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই বেরিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। জিনিসটা কখন কখন **হেভিস্পার** নামেও পরিচিত।

ব্যারোগ্রাফ — আবহাওয়া-সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদিতে ব্যবহৃত এক রকম বিশেষ চাপমান-যন্ত্র। এর সাহায্যে
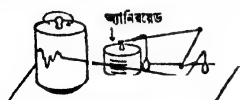
অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার

বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কাগজের উপরে রেখাপাতের সাহায্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রধানতঃ একটা 'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার' ↑ নিয়েই যন্ত্রটা গঠিত হয় ; বাইরের বায়বীয় চাপের তারতম্যানুসারে এর গাত্র-সংলগ্ন একটা কাঁটা উঁচু-নীচু হয়ে কাগজের উপরে চাপ-নির্দেশক রেখাপাত করতে থাকে।

ব্যারোমিটার — বায়ু-চাপমান যন্ত্র। সাধারণ চাপমান-যন্ত্রে থাকে একমুখ বন্ধ একটা কাঁচনল, মোটামুটি 36" ইঞ্চি লম্বা। পারা (মার্কারি ↑) ভর্তি করে নিয়ে এর খোলা মুখটা অন্য একটা পারা-ভর্তি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে খাড়াভাবে রাখা হয়। মোটামুটি এ-রকম ব্যারোমিটারকে বলে 'মার্কারি ব্যারোমিটার'। কাঁচ-নলের মধ্যে পারা-স্তম্ভ কিছু নেমে গিয়ে এক স্থানে স্থির হয়ে যায়। উপরে যে বায়ুশূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়, তাকে **টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম** ↑ বলে। কাঁচনলের মধ্যস্থিত পারা-

ব্যারোমিটার
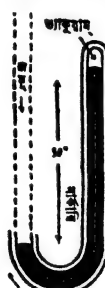
স্তম্ভের উচ্চতা মেপে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নির্ধারিত হয়। এর কারণ, এই পারা-স্তম্ভের ওজনের সমান হবে বায়ুমণ্ডলের চাপ ; যেহেতু নিচের খোলা পাত্রের পারার উপরে বায়ুর যে চাপ পড়ে নলের পারাস্তম্ভের ওজন স্বভাবতঃই তার সমান হবে। পারা-ভর্তি এরূপ লম্বা নল অক্ষ

পাত্রের পারার মধ্যে উল্‌টে না ধরে একটা বাঁকানো নলে পারা নিলেও বস্তুতঃ একই কাজ হয়। সাধারণ আবহাওয়ায় বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 30", বা 75 সেন্টিমিটার পারা-স্তম্ভের ওজনের সমান হয়ে থাকে। এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বায়ুর চাপ সাধারণতঃ 15 পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় 7½ সের। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চতায় ও বিভিন্ন উষ্ণতায় বায়ুমণ্ডলের এই চাপের তারতম্য ঘটে (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। এ ছাড়া বায়ুর চাপ নির্ধারণের জন্যে অ্যানিরয়েড ↑ প্রভৃতি নানা রকম ব্যারোমিটারও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যারিস্ফিয়ার — পৃথিবীর কেন্দ্রে সর্বাধিক ভারী যে গলিত ধাতব পিণ্ড আছে বলে অনুমান করা হয়। শিলাস্তরের চেয়েও ভারী বলে এই কেন্দ্রীয় ধাতু-পিণ্ড নিচে রয়েছে এবং তার উপরে শিলা-স্তরের গোলক (লিথোস্ফিয়ার ↑) গঠিত হয়েছে।

ব্যাল্‌সাম — রজন (রেজিন ↑) জাতীয় উদ্ভিজ্জ সুগন্ধী আঠালো পদার্থ। সাধারণতঃ উদ্বায়ী সব উদ্ভিজ্জ তৈলকেও ব্যাল্‌সাম বলে। (ক্যানাডা ব্যালসাম ↑)।

ব্যালান্স — পরিমাপক যন্ত্র। অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রকে বলে 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'। এক গ্র্যামের ↑ দশ হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত এতে মাপা চলে; কোন কোন ব্যালান্সে আরও সূক্ষ্ম মাপ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এরূপ ব্যালান্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটা একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে রক্ষিত হয়, যাতে বাইরের বায়ুপ্রবাহে ওজনের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ওজনের জন্যে
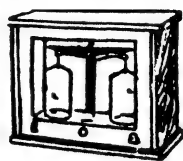
কেমিক্যাল ব্যালান্স এতে নানা রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি থাকে। এর লিভার ↑ দণ্ডটার ঠিক মধ্যস্থলে সংলগ্ন থাকে অ্যাগেট ↑ প্রস্তরে নির্মিত একটা ত্রিকোণ; সেটা আবার অ্যাগেট-নির্মিত একটা স্থির সমতলের উপর বসানো থাকে। সাধারণ কেমিক্যাল ব্যালেন্সের একটা মোটামুটি চিত্র দেওয়া হলো।

ব্যাল্‌নিওথেরাপি — রোগীকে উষ্ণ বা ঠাণ্ডা জলে নানাভাবে স্নান করিয়ে বিশেষ বিশেষ রোগের এক রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি (হাইড্রোপেথি ↑)। ব্যাল্‌নিও মানে 'স্নান' বা স্নান সম্বন্ধীয়।

ব্যালাস্ট — খালি বা অল্প বোঝাই জাহাজকে সমুদ্র-তরঙ্গের আন্দোলনে স্থির রাখবার জন্যে প্রস্তরাদি যে-সব ভারী জিনিস বোঝাই করা হয়।

ব্যালাষ্টিক্স — বন্দুক, কামান

প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের কার্যকারিতা (ভিতরে গ্যাসের চাপ কতটা হবে, গোলাগোলি কত জোরে, কত দূরে নিক্ষিপ্ত হবে ইত্যাদি) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষিপ্ত গোলার শক্তি পরীক্ষার জন্যে যে ঝুলানো কাষ্ঠখণ্ডের উপরে গোলা-গোলি ছোড়া হয় তাকে বলে **ব্যালাস্টিক পেণ্ডুলাম**।

ব্রঙ্কাই — শ্বাস-নলের যে শাখাদুটি দুই ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। এদের স্ফীতি ও প্রদাহ জনিত রোগকে বলে **ব্রঙ্কাইটিস**। ব্রঙ্কাই থেকে যে সব সরু নল দুই ফুস্‌ফুসে ছড়িয়ে গেছে তাদের বলে **ব্রঙ্কিওল্‌স**।
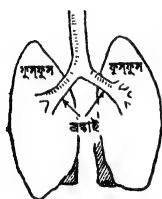
'ব্রঙ্কাই'।নলদ্বয়

ব্রাইট্‌স ডিজিজ — মূত্রাধার বা কিড্‌নির ↑ প্রদাহ-রোগ বিশেষ।

ব্রাইয়োফাইটা — মস্‌ ↑ জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণী; শৈবাল জাতীয় যে-সব উদ্ভিদ স্পোরের ↑ সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে তাদের সাধারণ নাম।

ব্রাস — পিতল; প্রধানতঃ তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতু। অনুপাত ও উপাদানের তারতম্যে বিভিন্ন শ্রেণীর 'ব্রাস' বা পিতল তৈরি হয়ে থাকে।

ব্রুয়িং — বিশেষ ধরণের পচন ক্রিয়া, বা 'গেঁজে যাওয়া'। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিয়ার (মদ্য) প্রস্তুত হয়। বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ (মল্ট ↑) জল-মিশ্রিত করে রাখলে কয়েক দিনের মধ্যেই গেঁজে গিয়ে তার শ্বেতসার মল্টোসে ↑ রূপান্তরিত হয়। মিষ্ট স্বাদযুক্ত ওই তরল পদার্থ ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে নিলে যে পরিস্রুত তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে ঈষ্ট ↑ দিয়ে পুনরায় গাঁজিয়ে নিলে 'বিয়ার' তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'ব্রুয়িং' বলে।

ব্রোমিন — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Br; পারমাণবিক ওজন 79·916, পারমাণবিক সংখ্যা 35; গাঢ় লাল উদ্বায়ী তরল পদার্থ, শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধ-বিশিষ্ট। হ্যালোজেন ↑ শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোব্রোমিক ↑ অ্যাসিড তৈরি হয়। এর বিভিন্ন সল্টকে ব্রোমাইড ↑ বলে। ঔষধ হিসেবে ও ফটোগ্রাফির ↑ কাজে যথেষ্ট দরকার হয়। ম্যাগ্নেসিয়াম ব্রোমাইড ও বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবদেহ থেকে বিভিন্ন উপায়ে ব্রোমিন পাওয়া যায়।

ব্রোমাইড — হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড (HBr) একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড, যা হাইড্রোজেন ও ব্রোমিনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত একটি অ্যাসিড। এই হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট

হলো ব্রোমাইড ; যেমন — পটাসিয়াম ব্রোমাইড, KBr, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ; সিলভার ব্রোমাইড, AgBr, একটি আলোক-স্পর্শ-কাতর রা সা য় নি ক পদার্থ, ফটোগ্রাফির কাজে অত্যাবশ্যক।

ব্রোমাইড পেপার — সিলভার ব্রোমাইড, AgBr, সন্ট মাখানো এক রকম কাগজ ; যার উপরে ফটোগ্রাফির ↑ ছবি তোলা হয়।

ব্রোঞ্জ — টিন ও তামার সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতু। অবশ্য, টিন না থাকলেও কোন কোন সংকর ধাতুকে ব্রোঞ্জ বলা হয় ; যেমন, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের সংকর ধাতুকে বলে 'অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ'।

ব্রোঞ্জ এজ — যে যুগে মানুষ ব্রোঞ্জের উৎপাদন ও ব্যবহার আয়ত্ত করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ; অনেকটা সভ্য যুগ — আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব 2000 বছর পূর্বের যুগ।

ব্র্যাগ, স্যার উইলিয়াম — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1862 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1942 খৃষ্টাব্দ। পুত্র উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগও খ্যাতনামা পদার্থ-বিজ্ঞানী ! পুত্রের সহযোগিতায় এক্স-রে ↑, রেডিও অ্যাকটিভিটি ↑, ক্রস্ট্যালোলজি ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির আবিষ্কার। পিতাপুত্র মিলিতভাবে 1915 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

ব্রাহি, টাইকো — ডেনমার্কবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ; জন্ম 1546 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1601 খৃষ্টাব্দ। 'কেসিওপিয়া' নামক নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার। সে-যুগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবেও গগন-পর্যবেক্ষণে অপূর্ব দক্ষতা ও নির্ভুল গণনা ; যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে গ্যালিলিও ↑ ও কেপ্‌লারের ↑ বিশ্বরহস্যের তথ্যাদির আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে।

বৃটেনিয়া মেটাল — বিভিন্ন গঠনের বিশেষ এক শ্রেণীর সংকর ধাতু। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে 80% থেকে 90% টিন কিছু অ্যান্টিমনি ও কপার (তামা) ; কখন কখন সামান্য দস্তা এবং সীসাও মেশানো হয়। রূপোর মত সাদা এই শ্রেণীর সংকর ধাতু দিয়ে বিশেষতঃ চামচ, চায়ের পাত্রাদি তৈরি করা হয়।

বৃটিশ থার্ম্যাল ইউনিট — তাপের একক বিশেষ ; যে পরিমাণ তাপ-শক্তির (হিট ↑) প্রয়োগে এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফা রে ন হা ই ট ↑ বৃদ্ধি পায়। ক্যালোরির ↑ হিসেবে এর পরিমাণ হলো 252 ক্যালোরি (থার্ম ↑)।

ব্ল্যাক অ্যাশ — লেব্ল্যাঙ্ক ↑ প্রণালীতে যে অবিশুদ্ধ ও অপরিষ্কৃত সোডা, Na_2CO_3, (সোডিয়াম কার্বনেট ↑) পাওয়া যায়, তার বিশেষ নাম।

ব্ল্যাক লেড — গ্র্যাফাইট ↑ ; একে 'প্ল্যাম্বাগো'-ও ↑ বলা হয়। খনিজ স্ফটিকাকার পদার্থ। রাসায়নিক

হিসেবে পদার্থটা কার্বনের একটা অ্যালোট্রোপ ↑ ; নরম ও কালো কঠিন পদার্থ, যা দিয়ে পেন্সিলের শিস্ তৈরি হয় (পেন্সিল লেড ↑)। যন্ত্রাদিতে ব্যবহারের জন্যে এক রকম পিচ্ছিল তৈলাক্ত পদার্থ (লুব্রিকাণ্ট ↑) তৈরি করবার জন্যেও পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্ল্যাস্ট ফার্ণেস — অবিশুদ্ধ খনিজ লৌহ থেকে মোটামুটি বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম চুল্লি বিশেষ। 'ফায়ার-ব্রিক' ও ইস্পাতের চাদর দিয়ে এরূপ চুল্লি তৈরি হয়। 'কন্‌ভার্টার' পাত্রে লাইম-ষ্টোন ↑ ($CaCO_3$) ও কয়লার সঙ্গে খনিজ লৌহ মিশিয়ে এই চুল্লিতে প্রচণ্ড
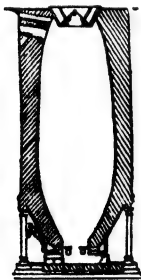
'কন্‌ভার্টার'

তাপে উত্তপ্ত করা হয়। নিচের ছিদ্রপথে ওর মধ্যে পাম্প করে বায়ু-প্রবাহ প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে কয়লা আংশিকভাবে পুড়ে কার্বন-মনোক্সাইড, CO, গ্যাস উৎপন্ন হয়। ওই কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস লৌহ-খনিজের আয়রন অক্সাইডকে রিডিউস ↑ করে বিশুদ্ধ লোহায় রূপান্তরিত করে। উত্তাপের ফলে এদিকে আবার লাইম-ষ্টোন বিশ্লিষ্ট হয়ে লাইম (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস জন্মায়। এই লাইম ↑ লৌহ-খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত বালি ও বিভিন্ন ময়লা নিয়ে তরল লোহের উপরে গাদের (বেসিক স্ল্যাগ ↑) আকারে পৃথক হয়ে পড়ে। ফার্ণেসের তলদেশের ছিদ্রপথে তরল লোহা বার করে নেওয়া হয়। এই লোহাকেই 'পিগ্-আয়রন' বা 'কাস্ট আয়রন' ↑ বলে।

ব্লিচিং পাউডার — 'ক্লোরাইড অব লাইম'; এক রকম সাদা চূর্ণ পদার্থ। প্রধানতঃ এর মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড, $CaOCl_2$। বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্লেকড্ লাইম ↑, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [$Ca(OH)_2$] মধ্যে ক্লোরিন ↑ গ্যাস অন্তঃপ্রবিষ্ট করে পদার্থটা তৈরি করা হয়। দুর্গন্ধ ও জীবাণু নাশ করবার জন্যে ডিসিন্‌ফ্যাক্ট্যাণ্ট ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদি বর্ণহীন সাদা ধব্‌ধবে করবার জন্যেও এর বিশেষ ব্যবহার আছে। রঙীন জিনিসের জৈব রঞ্জক পদার্থ এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বর্ণহীন হয়ে যায়। মূলতঃ এটা অক্সিডাইজিং এজেণ্টের ↑ কাজ করে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ব্লিচিং' বা বর্ণহীন করা।

ব্লু-ভিট্রিয়ল — কপার সালফেটের ($CuSO_4 . 5H_2O$) বিশেষ নাম। স্ফটিকাকার নীল বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ। একে 'ব্লু-স্টোন'-ও বলা হয়;

বাংলায় বলে তুঁতে। পোকা-মাকড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এর জলীয় দ্রব গাছ-পালায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্লু-প্রিণ্ট— নীলবর্ণের এক রকম কাগজের উপরে বিশেষ কৌশলে সাদা রেখায় অঙ্কিত নক্সাদি। এক রকম আলোক-সুগ্রাহী কাগজের উপরে মোটামুটি ফটোগ্রাফির ↑ প্রক্রিয়ায় এ-রকম নক্সা ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধারণ কাগজের উপরে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইড, $K_3Fe(CN)_6$, ও কোন জৈব অ্যাসিডের ফেরিক সল্ট মাখিয়ে কাগজটাকে এরূপ আলোক-সুগ্রাহী করা হয়। সাধারণ কালি দিয়ে অঙ্কিত নক্সার কাগজটা উল্লিখিত কাগজের উপর চেপে কিছু সময় রোদে রাখা হয়। সূর্যালোকের প্রভাবে ফেরিক সল্ট ↑ ফেরাস সল্টে রূপান্তরিত হয়ে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইডের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে প্রুসিয়ান-ব্লু ↑ উৎপন্ন হয়; যা ওই কাগজে এঁটে লেগে যায়। সূর্যালোকের অভাবে কালির দাগগুলির নিচে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, কাজেই দাগগুলির নিচেটা অবিকৃত থাকে। পরে ওই কাগজ জলে ধুয়ে নিলে পরিষ্কার ব্লু-প্রিণ্ট পাওয়া যায়। দাগের নিচের অবিকৃত ফেরিক সল্ট ও পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইড ধুয়ে গিয়ে নক্সার দাগগুলো ফটোগ্রাফির মত ওই নীল রঙের উপর সাদা রেখায় ফুটে ওঠে। ব্লু-প্রিণ্টের জন্যে ব্যবহৃত ওইরূপ আলোক-সুগ্রাহী কাগজকে **ফেরো-প্রুসিয়েট পেপার** বলে।

ভ

ভলাণ্টারি — ঐচ্ছিক, ইচ্ছানুসারে পরিচালিত; যেমন — **ভলাণ্টারি মাস্‌ল** হলো জীবদেহের যে-সব মাংসপেশী (মাস্‌ল ↑) ঐচ্ছিক স্নায়ুর (ভলাণ্টারি নার্ভ) ক্রিয়ায় ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালন করা যায়; যেমন— হাত, পা, বুক, পেট প্রভৃতির মাংস পেশীগুলি। কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌, বা হৃৎপিণ্ডের (হার্ট ↑) মাস্‌ল স্বতঃই চলে, জীবের ইচ্ছাধীন নয়; এদের বলে **ইন্‌ভলাণ্টারি মাস্‌ল**।

ভলিউম — আয়তন; ঘন পরিমাণ। কোন বস্তু তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নিয়ে যতটা স্থান অধিকার করে থাকে, তার পরিমাণকে বস্তুটার ভলিউম, বা আয়তন বলে; এবং তা 'ঘন' বা 'কিউবিক' এককে পরিমিত হয়; যেমন—ঘন ফুট, কিউবিক সেণ্টিমিটার ইত্যাদি।

ভলিউম মেজার — আয়তন বা ঘন পরিমাণের বিভিন্ন একক-কে বলে 'কিউবিক মেজার'। যেমন—
কঠিন পদার্থের বেলায়:

1728 ঘন ইঞ্চি = 1 ঘন ফুট
27 ঘন ফুট = 1 ঘন ইয়ার্ড

(এক ঘন ইঞ্চি = 16·387 ঘন
সেন্টিমিটার ↑)

তরল পদার্থের বেলায় :

4 জিল = 1 পাইট বা
·5682 লিটার ↑
2 পাইট = 1 কোয়ার্ট
4 কোয়ার্ট = 1 গ্যালন ↑
= 4·546 লিটার

(মেট্রিক এককে)

1000 কিউবিক মিলিমিটার =
1 কিউবিক সেন্টিমিটার (সি. সি.)
1000 কিউবিক সেণ্টিমিটার =
লিটার (প্রায়)

ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস—আয়তনিক বিশ্লেষণ ; কোন পদার্থের সংগঠক উপাদানগুলির শতাংশিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে যে পদ্ধতিতে তাকে বিশ্লেষণ করা হয়। পদার্থটার দ্রবণের সঙ্গে অপর কোন পদার্থের জানা-শক্তিবিশিষ্ট দ্রবণের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে উভয়ের আয়তনিক পরিমাণ স্থির করা যায় ; এবং তার থেকে অজানা পদার্থটার উপাদানিক গঠন জানা যেতে পারে ; এর জন্যে সাধারণতঃ ক্ষারীয় (অ্যাল্‌কালি ↑) দ্রবণের সঙ্গে কোন অ্যাসিডের পরিমাণগত বিক্রিয়া ঘটানো (টাইট্রেসন ↑) হয়।

ভাইরাস—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগজীবাণু, বা রোগসৃষ্টিকারী জীবকণা। এরা আকারে ক্ষুদ্রতম ব্যাক্টেরিয়া ↑ থেকেও ক্ষুদ্র ; এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণেও সাধারণতঃ এদের দেখা যায় না। অবশ্য 'ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপে' ↑ আজকাল কোন কোন ভাইরাস বহু গুণ বর্ধিতাকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাস নানা জাতীয় আছে; বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণে জলাতঙ্ক, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। ব্যাক্টেরিয়া শ্রেণীর বিভিন্ন জীবাণুরা বিভিন্ন জৈব পদার্থ আশ্রয় করেও বেঁচে থাকতে ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে; কিন্তু ভাইরাসগুলো সজীব দেহ আশ্রয় না করে বাঁচে না, বংশবৃদ্ধিও করতে পারে না। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে মনে হয়, এ-গুলো অতি জটিল গঠনের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ ; হয়তো বিশেষ এক রকম জীব-ধর্মী প্রোটিন ↑ কণিকা।

ভার্চুয়াল ইমেজ — সাধারণ সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোন বস্তুর যেরূপ প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি হয়। এ-রকম প্রতিফলনে বস্তু থেকে
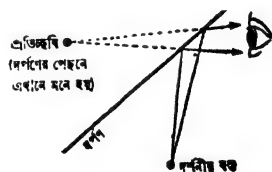
ভার্চুয়াল ইমেজ

আগত আলোক-রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে পড়ে সত্য ; কিন্তু যেখানে প্রতিচ্ছায়াটা

দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বস্তুটা থেকে কোন আলোক-রশ্মি সেখানে যায় না, বা সেখান থেকে কোন আলোক-রশ্মি দর্শকের চোখে আসেও না। এ-রকম 'ইমেজ' ↑, বা প্রতিবিম্ব আলোক-রশ্মির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নয়; কাজেই তা পর্দায় ফেলাও সম্ভব হয় না। এরূপ অপ্রকৃত, বা অবাস্তব প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্বকে 'ভার্চুয়াল ইমেজ' বলা হয়।

ভার্টিকাল — লম্ব, অর্থাৎ সমকোণে দণ্ডায়মান; যেমন — **ভার্টিকাল বয়লার,** স্টিম-ইঞ্জিনের যে বাষ্পাধার দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে (রেল-ইঞ্জিনের বয়লার থাকে ভূ-সমান্তরাল, অর্থাৎ শোয়ানো, **হোরাইজণ্টাল**)। **ভার্টিকাল** অ্যাঙ্গেল — বিপরীত বা বিপ্রতিক কোণ (জ্যামিতিক)।

ভার্টিগো — মাথা-ঘোরা রোগ; যার ফলে রোগীর চারদিকের সব জিনিস ঘুরছে, দুলছে বলে মনে হয়।

ভার্টিব্রেট — মেরুদণ্ডী প্রাণী; মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। এদের **ভার্টিব্রেটা**-ও বলে। পোকা, মাকড়, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির মেরুদণ্ড নেই বলে এই শ্রেণীর জীবকে বলে 'ইনভার্টিব্রেট', বা অমেরুদণ্ডী।

ভার্টেক্স —শীর্ষ; কোন কিছুর সর্বোচ্চ অংশ; যেমন—মাথার উপরিভাগ, ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

ভার্ডিগ্রিস — অব্যবহারে জল-হাওয়ার প্রভাবে তামার জিনিসের উপরে সবুজ বর্ণের যে পদার্থ সৃষ্টি হয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো কপার কার্বনেট, অথবা বেসিক কপার অ্যাসিটেট ↑; বায়ুতে মিশ্রিত বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে তামার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এরূপ যৌগিকের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিষাক্ত পদার্থ।

ভার্ণাল ইকুইনক্স — বসন্তকালের যে দিনে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়; এই দিনে সূর্য-পরিক্রমা পথে পৃথিবী যে অবস্থানে আসে। এ-দিনে সূর্য দ্বিপ্রহরে ঠিক মাথার উপরে নিরক্ষ-রেখার বরাবর থাকে, দিন-রাত্রি সমান হয়। 21শে মার্চ তারিখ হলো পৃথিবীর এই 'ভার্ণাল ইকুইনক্স'। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে এই দিনে সূর্য ও পৃথিবী এরূপ অবস্থানে আসে (ইকুইনক্স ↑)।

ভার্নিয়ার, পিরি — ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত; জন্ম 1580 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1637 খৃস্টাব্দ। সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্যে বিখ্যাত 'ভার্নিয়ার স্কেল' ↑ নামক যন্ত্র উদ্ভাবনে চিরস্মরণীয়।

ভার্নিয়ার — দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত পরিমাপের উপযোগী এক বিশেষ ধরণের স্কেল। সাধারণ স্কেলে সচরাচর ইঞ্চির দশমাংশের দাগ কাটা থাকে। এই ভার্নিয়ার-স্কেল-যন্ত্রের সাহায্যে ওই দশমাংশ ইঞ্চিরও সূক্ষ্মতর মাপ পাওয়া সম্ভব

হয়। ভার্নিয়ার স্কেলে সাধারণ স্কেলের গায়ে আর একটি চলমান অংশ লাগানো থাকে, যেটা সরিয়ে সরিয়ে হিসাব করে ইঞ্চির শতাংশও এর সাহায্যে সহজে নির্ণীত হতে

ভার্নিয়ার স্কেল

পারে। সাধারণতঃ ভার্নিয়ার স্কেলের চলমান অংশে 9/10 বা 0·9 ইঞ্চিকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে; কাজেই এর প্রত্যেক ভাগ হবে ·09 ইঞ্চি। প্রকৃত স্কেলের দশমাংশ অপেক্ষা ভার্নিয়ার স্কেলের দশমাংশ কাজেই ·01 ইঞ্চি কম; এই ·01 হলো **ভার্নিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট**। এখন, যেন (চিত্র ↑) ক থেকে খ বিন্দুর দূরত্ব মাপতে হবে। প্রকৃত স্কেলের 0 বিন্দু ক'এর উপরে রাখা হলো; দেখা গেল, খ' বিন্দু 2·2 ইঞ্চির সামান্য দূরে রয়েছে। এখন ভার্নিয়ার স্কেলের 0 বিন্দু সরিয়ে সরিয়ে খ' বিন্দুর বরাবর রাখলে ওর পরবর্তী কোন্ দাগ প্রকৃত স্কেলের কোন্ দাগের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়, তা লক্ষ্য করতে হবে। এখানে দেখা গেল, 3 দাগে এরূপ হয়েছে। সুতরাং সাধারণ স্কেলের মাপ 2·2-এর সঙ্গে $\cdot 01 \times 3$ যোগ দিয়ে 'কখ'-এর সঠিক দৈর্ঘ্য হবে $2{\cdot}2 + {\cdot}03$ অর্থাৎ 2·23 ইঞ্চি।

ভার্মিসাইড—পোকা-মাকড় বিনষ্ট-কারী যে-কোন বিষাক্ত পদার্থ। যে সব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ ধ্বংস হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে বলে **ভার্মি**, বা **ভার্মিন**।

ভার্মিফিউজ — যে-সব ভেষজ বা রাসায়নিক পদার্থ উদরস্থ করলে অন্ত্রে উৎপন্ন ক্রিমি-কীটাদি বিনষ্ট হয়। স্যাণ্টোনিন ↑ হলো এরূপ একটা শক্তিশালী 'ভার্মিফিউজ'।

ভার্মিলিয়ন — সিন্দুর; রাসায়নিক হিসেবে মারকিউরিক সালফাইড, HgS; পারা ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনে গঠিত লাল চূর্ণ পদার্থ। মহিলারা সীমন্তে পরেন; সাধারণ লাল রং (পেইণ্ট) হিসেবেও এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

ভাল্‌ব — (1) কোন ছিদ্র বা নল-মুখে যে ঢাক্‌না কৌশলে এমনভাবে বসানো থাকে যাতে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ কেবল এক দিকে যেতে পারে, কিন্তু বিপরীত দিকে বেরুতে পারে না। (2) বেতার যন্ত্রাদিতে ইলেকট্রিক বাল্‌বের মত কাঁচের যে টিউব থাকে, তাকেও সাধারণতঃ ভাল্‌ব বলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে বলা উচিত 'থার্মোআয়োনিক ↑ ভাল্‌ব'। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দূরাগত ক্ষীণ কম্পনের তড়িত্তরঙ্গকে পরি-শোধিত ও পরিবর্ধিত করা হয়।

ভাবা, ডাঃ হোমি জাহাঙ্গীর — বিশিষ্ট ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী; বোম্বাইয়ে জন্ম 1909 খৃঃ, অদ্যাপি (1961 খৃষ্টাব্দ) জীবিত। শিক্ষা বোম্বাই ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় — গণিতে 'ট্রাইপস' ও 'রাফেল-বল' বৃত্তি লাভ। এফ-আর-এস। রোমে অধ্যাপক ই. ফ্রেমির অধীনে একাদিক্রমে তিনবার 'অ্যাইজ্যাক বৃত্তি' লাভ। 'কস্‌মিক-রে' ↑ ও 'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' সম্পর্কিত গবেষণায় বিপুল খ্যাতি। বোম্বাইয়ে টাটা রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ; ভারত সরকারের পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতি। পদ্ম-বিভূষণ' উপাধি।

ভিটা-গ্লাস — এক বিশেষ রাসায়নিক গঠনের কাচের ব্যবহারিক নাম। বিশেষ গুণ ও ধর্মে সাধারণ কাচের থেকে এ-কাচের কিছু প্রভেদ আছে। বিশেষতঃ এর স্বচ্ছতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এর ভিতর দিয়ে আল্‌ট্রাভায়োলেট ↑ রশ্মি চলাচল করে।

ভিটামিন — খাদ্য-প্রাণ; বিভিন্ন খাদ্য বস্তুতে কার্বন-ঘটিত যে-সব অতি সূক্ষ্ম জৈব রাসায়নিক পদার্থ জীব মাত্রেরই পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন খাদ্যে এরূপ বিভিন্ন পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে থাকে; কিন্তু যাদের অভাবে নানা রকম রোগ দেখা দেয়, জীবদেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। খাদ্যের প্রাণ-স্বরূপ এই শ্রেণীর অত্যাবশ্যক পদার্থগুলোকে বলে ভিটামিন; বাংলায় বলে 'খাদ্য-প্রাণ'। পূর্বে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে এদের বিভিন্ন গুণাগুণ মাত্র বিচার করে ভিটামিন-এ ভিটামিন-বি, সি, ডি প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক স্বরূপ ও গঠনও অনেক ক্ষেত্রে জানা গেছে:

ভিটামিন-এ — রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো $C_{20}H_{29}OH$; দুধ, মাখন, তাজা শাকসব্জি, মাছের তেল, চর্বি প্রভৃতিতে আছে। খাদ্যে এর অভাব ঘটলে 'রাত-কানা' রোগ হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, গাত্রচর্ম তৈলহীন খস্‌খসে হয়ে ওঠে।

ভিটামিন-বি — সমপর্যায়ের অনেকগুলো রাসায়নিক পদার্থ বুঝায়; একসঙ্গে বলা হয় 'ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স'। ভিটামিন-বি$_1$ (অ্যানিউরিন, থায়ামিন) গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্য-শস্যের বহিরাবরণে থাকে; অভাবে শক্তিহীনতা, অগ্নিমান্দ্য ও বেরিবেরি রোগ জন্মায়। ভিটামিন-বি$_2$ (ল্যাক্টোফ্লেবিন, বা রিবোফ্লেবিন) দুধ, ডিম প্রভৃতিতে থাকে; অভাবে চর্মরোগ হয়, শিশুরা উপযুক্তরূপে বাড়ে না। ভিটামিন-বি$_{12}$ (ফোলিক অ্যাসিড) একটি লালচে স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ; কোন কোন তাজা শাকসব্জি, জীবজন্তুর লিভার ও

ঈস্ট ↑ প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। খাদ্যে এ-জাতীয় ভিটামিনের অভাবে রক্তহীনতা দেখা দেয়।

ভিটামিন-সি (অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড) টাট্‌কা শাকসব্জি ও ফলের রসে থাকে। অভাবে স্কার্ভি ↑ রোগ হয়।

ভিটামিন-ডি (ক্যাল্‌সিফেরল) বিভিন্ন মাছের যকৃতের তেলে পদার্থটা থাকে। সূর্য-কিরণেব প্রভাবে মানুষের দেহে এটা স্বভাবতঃই জন্মায়; এর রাসায়নিক প্রভাবে খাদ্যের ক্যাল-সিয়াম উপাদান দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে। কাজেই পদার্থটার অভাবে দেহের হাড় শক্ত হয় না; বিশেষতঃ শিশুদের রিকেট ↑ রোগ হয়।

ভিটামিন-ই — বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল ও তাজা শাকসব্জিতে থাকে। খাদ্যে ক্রমাগত এর অভাবে স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যা হয়, প্রজননশক্তি লোপ পায়।

ভিটামিন-এইচ—(বায়োটিন) জীব-জন্তুর লিভারে ও ঈষ্টে ↑ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা ডিমের শ্বেতাংশ খেলে (টক্স্যামিন ↑) এর জৈবক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। অভাবে বিভিন্ন দুরা-রোগ্য চর্মরোগ জন্মায়।

ভিটামিন-কে— স্বভাবতঃই মানুষের দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে। টাট্‌কা মাখনে ও উদ্ভিদের সবুজ পাতায় পদার্থটা থাকে। অভাবে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা লোপ পায়, তার ফলে কেটে-কুটে গেলে অজস্র রক্তপাত হতে থাকে।

এগুলো ছাড়া বিভিন্ন খাদ্যে আরও নানা রকম ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ বিচার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে নানা রকম নতুন নতুন ভিটামিন ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

ভিট্রিয়ল — কন্সেন্ট্রেটেড সালফিউ-রিক অ্যাসিডকে (H_2SO_4) 'অয়েল অব ভিট্রিয়ল' ↑ বলা হয়। এজন্যে বিভিন্ন সালফেট সল্ট ↑ বর্ণানুসারে বিভিন্ন 'ভিট্রিয়ল' নামে পরিচিত; যেমন — 'ব্লু-ভিট্রিয়ল' হলো কপার সালফেট, $CuSO_4, 5H_2O$; 'গ্রিন-ভিট্রিয়ল' হলো ফেরাস সালফেট, $FeSO_4.\ 7H_2O$; আর 'হোয়াইট ভিট্রিয়ল' বলতে বুঝায় জিঙ্ক-সালফেট, $ZnSO_4, 7H_2O$; এরূপ ভিট্রিয়ল সল্টগুলো সবই হয় স্ফটিকাকার— আর এদের প্রত্যেকটারই 'ওয়াটার অব ক্রিস্টালিজেসন' ↑ থাকে।

ভিট্রিয়াস — কাচ-সদৃশ, কাচের মত (স্বচ্ছ); যেমন, **ভিট্রিয়াস হিউমার** হলো চক্ষু-গোলকের অভ্যন্তরে স্বচ্ছ (কাচের মত) জেলিবৎ যে জৈব পদার্থ থাকে।

ভিন্‌কুলাম — বন্ধনী বা ব্রাকেটের পরিবর্তে বিভিন্ন গাণিতিক রাশির সমাহার বা একরাশিত্ব বুঝাতে তাদের উপরে যে রেখা ব্যবহৃত হয়; যেমন, $3x+\overline{y-1}$.

ভিনিগার — বিশেষ এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে বিয়ার, ওয়াইন প্রভৃতির

ইথাইল-অ্যালকোহল ↑ উপাদান অক্সিডাইজ্‌ড হয়ে গেঁজে গিয়ে যে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে 3% থেকে 6% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ জন্মায়। পাশ্চাত্য দেশে জিনিসটা খাদ্যদ্রব্যে মেশানো হয়।

ভিনো, অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট ড্য — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রসায়ন-বিজ্ঞানী; শিকাগোয় জন্ম 1901 খৃঃ, অদ্যাপি (1961 খৃঃ) জীবিত। প্রথমে বায়ো-কেমিষ্ট্রির ↑ অধ্যাপক; পরে 1938 খৃঃ থেকে নিউ ইয়র্কের কর্নেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'জৈব রসায়ন' বিভাগের অধ্যক্ষ। জৈব রাসায়নিক গবেষণায় বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। মানুষের মূত্র-গ্রন্থির ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রক ও সন্তান প্রজননের সহায়ক হর্মোন ↑ দুটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও গঠন সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক অবদানের জন্য 1955 খৃঃ রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ভিব্রিও — বক্রাকার রোগ-জীবাণু; এদের দেহ সূক্ষ্ম কাঠির মত লম্বা, কাজেই এই রকম ব্যাক্টে-রিয়াকে সাধা-রণভাবে বলে ব্যাসিলাস ↑। বিভিন্ন ব্যাসি-লাসের মধ্যে আবার বক্রাকারগুলোর বিশেষ নাম হলো 'ভিব্রিও'। সাঁতার কাটার সুবিধার জন্যে এদের দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম একটা লেজের মত অঙ্গ থাকে; কলেরার 'কমা-ব্যাসিলাস'ও বিশেষ এক শ্রেণীর ভিব্রিও।

ভিব্রিয়ো
1000 গুণ বর্ধিত

ভিস্কোসিটি — ঘন তরল পদার্থের আঠালো-ভাব। বস্তুতঃ যে ধর্মের জন্যে তরল পদার্থের বিভিন্ন স্তর পরস্পরের সঙ্গে এঁটে থাকতে চায়, সহজে প্রবাহিত হয় না। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আণবিক সংঘর্ষের ফলেই তরল পদার্থে প্রবহনের গতি ক্রমে মন্দীভূত হয়ে পড়ে। গাঢ় তেল, জিলেটিন ↑, গঁদের আঠা প্রভৃতির মধ্যে এই ভিস্কোসিটি ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়; এ-রকম সব পদার্থকে বলে **ভিস্কাস** পদার্থ। অবশ্য সব তরল পদার্থেরই কিছু-না-কিছু ভিস্কোসিটি আছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের ভিস্কোসিটি, অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার-স্পরিক আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে, তাকে বলে **ভিস্কোমিটার**।

ভেক্টর — বিভিন্ন ভাববোধক যে-সব গাণিতিক রাশিকে রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। রাশিটির পরি-মাণকে রেখার দৈর্ঘ্যে, এবং তার স্বরূপ বা দিক রেখাটার কৌণিক অবস্থান দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোন লোক কোন এক দিকে ঘণ্টায় 5 মাইল বেগে ছুটছে; এখানে '5 মাইল' এই রাশিটাকে ভেক্টর

রাশি বলা হবে ; যেহেতু 5 ইঞ্চি একটা রেখা টেনে (এক ইঞ্চি = এক মাইল ধরে') এর পরিমাণ প্রকাশ করা যায় ; আবার ওই অঙ্কিত সরল রেখার দিক,বা অবস্থান দেখে লোকটির গতিপথের দিক নির্দিষ্ট হতে পারে। এভাবে দুটি ভেক্টর রাশি যদি কোন ত্রিভূজের সন্নিহিত দুটি বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে সাধারণতঃ ওদের সমষ্টিগত ভেক্টর রাশি প্রকাশিত হবে ওই ত্রিভূজের তৃতীয় বাহুর দ্বারা।

ভেক্টর — রোগ-জীবাণুর বাহক। মশা, মাছি, ইঁদুর প্রভৃতিকে বিশেষ অর্থে 'ভেক্টর' বলা হয় ; কারণ, এরা রোগীর দেহ বা দেহনিঃসৃত মল-মূত্রাদি থেকে রোগ-জীবাণু বহন করে নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে রোগ সংক্রামিত করে।

ভেনম্ — জান্তব বিষ ; বিষধর সাপের বিষ-দাঁত থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত লালা। বোল্‌তা, ভীমরুল, বিছা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের হুলের বিষকেও 'ভেনম্' বলা হয়।

ভেনাক্যাভা — হৃৎপিণ্ডের ডান-দিকে যে-দুটি শিরার পথে দেহের রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌছায়। এদের মধ্যে উপর দিকের শিরাটাকে বলে 'সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা' ও নীচেরটাকে বলা হয় 'ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা'।

ভেনারাল ডিজিজ — গনোকক্কাই প্রভৃতি জীবাণু-সংক্রমণের ফলে রক্ত-দুষ্টিসহ রোগীর যৌন-অঙ্গের ক্ষত ও প্রদাহজনিত বিভিন্ন ব্যাধি ; যেমন—সিফিলিস ↑, গনোরিয়া ইত্যাদি।

ভেনাস — শুক্র গ্রহ। গ্রহটা পৃথিবী ও বুধ গ্রহের কক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিজস্ব একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 6 কোটি 70 লক্ষ মাইল। পৃথিবীর হিসেবে 225 দিনে শুক্র-গ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 225 দিন। পৃথিবীর চেয়ে এর উপরিভাগের উত্তাপ সম্ভবতঃ অনেক বেশি। এর চারিদিকে কোন বায়ু-মণ্ডল আছে বলে মনে হয় না ; সম্ভবতঃ মেঘের মত কোনরূপ বাষ্পীয় আবরণে পরিবেষ্টিত রয়েছে।

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ — এক প্রকার প্রাণিভূক্ উদ্ভিদ। এর সাদা ফুল ফোটে, আর পাতাগুলো আঠালো। ফুলের আকর্ষণে পাতার উপর কীট-পতঙ্গ এসে পড়লে আঠায় জড়িয়ে ফাঁদের মত আবদ্ধ হয়ে মারা যায় ; আর উদ্ভিদটা ধীরে ধীরে সেটাকে জীর্ণ করে আত্মসাৎ করে ফেলে।

ভেন্ট্রিকল — দেহাভ্যন্তরস্থ কোন প্রত্যঙ্গের শূন্য গহ্বর ; যেমন—হৃৎ-পিণ্ডের নিম্নাংশে দুদিকে দুটি ভে. ল. আছে ; ডানদিকেরটা থেকে রক্ত ফুসফুসে (লাংস ↑) যায়—আর বাঁ-দিকের গহ্বরটা থেকে রক্ত সারা

দেহে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মস্তিষ্কেরও কোন কোন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ভেন্ট্রিকল' বা শূন্য-গহ্বর আছে।

ভেনিসেক্সন — দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরা চিড়ে রক্ত বার করে দেওয়া, বা নল প্রবেশ করনো; 'রক্তদান', বা 'ইণ্টারভেনাস ইঞ্জেকসনের' সময়ে যেমন করা হয়।

ভেপার — পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থা; যে অবস্থায় তাপ অক্ষুণ্ণ রেখে কেবলমাত্র তার চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থটাকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। এরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পদার্থের তাপ তার নির্দিষ্ট 'ক্রিটি-ক্যাল' টেম্পারেচারের ↑ কম থাকে। এই অবস্থায় পদার্থকে বলে 'ভেপার'; কারণ তখন কেবল মাত্র চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থটাকে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করা চলে; যেমন—পেট্রলের বাষ্প, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

ভেপার প্রেসার — উপযুক্ত উত্তাপে সব তরল পদার্থই বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। পদার্থের এরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় তার অণু-গুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, পরস্পরের মধ্যে আণবিক আকর্ষণ হ্রাস পায়। কোন আবদ্ধ পাত্রে এই বাষ্প ক্রমাগত জমলে স্বভাবতঃই তার চাপ বৃদ্ধি পায় এবং পাত্রের গায়ে চাপ দিতে থাকে; এই বাষ্পীয় চাপ ক্রমে শেষে চরমে পৌছায়। এই সর্বোচ্চ চাপ নির্ভর করে পদার্থের গঠন ও তাপমাত্রার উপর। পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে ওই বাষ্প সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড ↑) হয়ে উঠলে আরও বাষ্প যদি প্রবেশ করানো যায়, তবে আর তা বাষ্পীয় আকারে পাত্রের অভ্যন্তরে জমতে পারে না, অতিরিক্ত বাষ্প সঙ্গে সঙ্গে তরল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বাষ্পের ওই সর্বোচ্চ চাপকে বলে 'সম্পৃক্ত বাষ্পীয় চাপ', অথবা 'স্যাচুরেটেড ভেপার-প্রেসার'।

ভেলোসিটি — গতিবেগ, অর্থাৎ গতির হার; গতিশীল কোন বস্তু কোন একক সময়ে একই দিকে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে। একটা ট্রেন প্রতি ঘণ্টায় 30 মাইল বেগে সমভাবে ছুটছে; এখানে 'ঘণ্টায় 30 মাইল' এই হলো ট্রেনটার ভেলো-সিটি, বা গতিবেগ।

ভেলোসিটি (রিলেটিভ)— তুলনা-মূলক, বা আপেক্ষিক গতিবেগ; কোন বস্তুর গতিবেগ অপর কোন বস্তুর গতি বা স্থিতির তুলনায় যেরূপ অনুমিত হয়। মনে করা যাক্, 'ক' ও 'খ' দুটা ট্রেন পাশাপাশি একই দিকে ছুটছে — 'ক' ঘণ্টায় 20 মাইল ও 'খ' ঘণ্টায় 15 মাইল ভেলোসিটি নিয়ে চলছে। ক'এর গতি খ'এর তুলনায় ('খ' থেকে দেখলে) মনে হবে যেন ঘণ্টায় 5 মাইল; এই হলো ক'এর 'রিলেটিভ ভেলোসিটি'। দুটা বস্তুর গতিবেগ যদি কোন ত্রিভুজের

ছুটা সন্নিহিত বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হয় (ভেক্টর রাশি ↑) তবে বস্তু ছুটার পরস্পরের 'রিলেটিভ ভেলোসিটি' অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি ওই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হবে।

ভেসেলিন — 'পেট্রোলিয়াম জেলি', বা পেট্রোলেটাম ↑ ।

ভোলেটাইল — উদ্বায়ী ; বায়ুমণ্ডলের সাধারণ তাপ ও চাপেই যে-সব কঠিন বা তরল পদার্থ স্বতঃই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়। উদ্বায়ী পদার্থের 'ভেপার প্রেসার' ↑ স্বভাবতঃই হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ; কাজেই এরূপ বাষ্পীভবন সম্ভব হয়ে থাকে। পেট্রল ↑, অ্যালকোহল ↑, কর্পূর প্রভৃতি এরূপ 'ভোলেটাইল' বা উদ্বায়ী পদার্থ ; কিন্তু সাধারণ তেল, জল, পারদ প্রভৃতি স্বাভাবিক তাপ ও চাপে তেমন কিছু লক্ষ্যণীয়ভাবে বাষ্পীভূত হয় না ; কাজেই এ-গুলো ভোলেটাইল নয়, 'ননভোলেটাইল' অর্থাৎ অনুদ্বায়ী পদার্থ।

ভোল্ট — বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের একটা একক বিশেষ। তড়িৎ-পরিবাহী তারের ছুই প্রান্ত, অথবা তার যে-কোন ছুই স্থানের মধ্যে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য এক ভোল্ট হবে, যদি ওদের মধ্যে এক কুলম্ব ↑ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে এক জুল ↑ পরিমাণ শক্তি বা এনার্জি প্রকাশ পায়। সাধারণ ষ্টোরেজ ব্যাটারির ↑ ছুই তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য প্রায় 2 ভোল্ট, সাধারণ টর্চ-লাইটের ড্রাই সেলের ↑ প্রায় $1\frac{1}{2}$ ভোল্ট হয়ে থাকে। কলকাতা শহরে বাড়ী বাড়ী যে তড়িৎ সরবরাহ হয় তার ভোল্টেজ 220 থাকে। এই তড়িৎ-চাপ বা ভোল্টেজ দ্বারা ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ এবং পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ↑ (P. D.) উভয়ই পরিমিত হয়ে থাকে।

ভোল্টমিটার — বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে তড়িতাবিষ্ট ছুই স্থান, বা বস্তুর মধ্যে তড়িৎ-বিভবের বৈষম্য, অর্থাৎ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ↑ মাপা হয়। ইটালীয় বিজ্ঞানী ভোল্‌টা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। মোটামুটি এটা একটা অ্যাম্‌মিটার ↑ যন্ত্রের অনুরূপ, কেবল এর মধ্যে একটা প্রয়োজনারূপ উচ্চ তড়িৎ-প্রতিবন্ধক (রেজিষ্টেন্স) সন্নিবিষ্ট থাকে এবং যন্ত্রের স্কেলে ভোল্ট ↑ এককের সংখ্যা-নির্দেশক দাগ কাটা থাকে।

ভোল্‌টা, কাউণ্ট অ্যাল্‌সাণ্ড্রো — ইতালীয় বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1745 খৃঃ, মৃত্যু 1827 খৃষ্টাব্দ। তড়িৎ-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান। নূতন পদ্ধতির ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ↑ ও ব্যাটারি ↑ (ভোল্টেইক ব্যাটারি)

উদ্ভাবন। তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য থেকে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ মাপার উপায় উদ্ভাবনেই সমধিক প্রসিদ্ধি, যার একক উদ্ভাবকের নামানুসারে 'ভোল্ট' ↑ বলে খ্যাত।

ভোল্টামিটার — কোন প্রবাহ-পথে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ স্থির করবার এক রকম যন্ত্র। মূলতঃ যন্ত্রটা হলো একটা ইলেক্‌ট্রোলিটিক সেল ↑ মাত্র। এর কপার, বা সিলভার সল্টের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ওই সল্টের ধাতব আয়ন ↑ বিমুক্ত হয়ে যায়। ওই বিমুক্ত ধাতু-কণিকাগুলো গিয়ে ক্যাথোডের ↑ গায়ে সঞ্চিত হতে থাকে। ক্যাথোডের ওজন বৃদ্ধির পরিমাণ থেকে বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ সহজেই স্থির করা যায়। এভাবে বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ থেকে আবার বিমুক্তকারী তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি বা পরিমাণ সহজেই হিসাব করে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ভ্যাক্‌সিন — বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে সেই সব রোগাক্রান্ত জীবের দেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই রোগের নিস্তেজীকৃত যে জীবাণুরস নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ভ্যাক্‌সিনেসন' বা 'টিকা দেওয়া'। গো-বসন্তের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল; তাই 'ভ্যাক্‌সিন' কথাটার উদ্ভব হয়েছে। ডাঃ জেনার ↑ প্রথমে এভাবে গো-বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন; পরে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ↑ বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর টিকা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রবর্তন করেছেন। প্রথম দিকে কেবল জীবিত রোগ-জীবাণু নিয়ে টিকা দেওয়া হোত; আজকাল দেখা গেছে, মৃত বা নিস্তেজিত জীবাণু ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

ভ্যাকুয়াম — শূন্য স্থান; যে স্থানে বায়ু, গ্যাস, বা অপর কোন পদার্থের কোন অণু-পরমাণু কিছুমাত্র নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ শূন্যস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এজন্যে মোটামুটি সম্ভাব্যরূপে বায়ু বা কোন গ্যাস-শূন্য স্থানকেই সাধারণতঃ 'ভ্যাকুয়াম' বলা হয়। বায়ু-নিষ্কাশক পাম্পের সাহায্যে আবদ্ধ স্থান থেকে বায়ু বা গ্যাস নিষ্কাশিত করে এরূপ ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে গ্যাসীয় চাপ অতি সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। 'রেডিও ভাল্‌ব' ↑, 'ক্যাথোড-রে টিউব' ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগ এরূপ যথাসম্ভব ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্য করে নিতে হয়।

ভ্যাট্-ডাই — যে-সব রঞ্জক পদার্থে বস্ত্রাদি রঙীন করবার জন্যে কোন মরড্যান্টের ↑ প্রয়োজন হয় না। রং ধরাবার জন্যে সাধারণতঃ বস্ত্রাদি আগে বিশেষ কোন রাসায়নিক দ্রবে

(মরড্যাণ্ট ↑) ভিজিয়ে নিতে হয়; কিন্তু 'ভ্যাট্-ডাই' জাতীয় রঞ্জক পদার্থে সেরূপ করা দরকার হয় না। নীল প্রভৃতি বিভিন্ন কৃত্রিম রং এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ। যে পাত্রে বস্ত্রাদি ডুবানো হয় তাকে বলে 'ভ্যাট'।

ভ্যানাডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 50·95, পারমাণবিক সংখ্যা 23; অত্যন্ত কঠিন, সাদা ও মূল্যবান ধাতু। কোন কোন দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করবার প্রক্রিয়ায় ধাতুটার অক্সাইড ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে কখন কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ এক শ্রেণীর কঠিন ইস্পাত (ভ্যানাডিয়াম স্টিল) তৈরি করতেও সামান্য ভ্যানাডিয়াম ধাতু মিশ্রিত করা হয়।

ভ্যা নি সি য়া ন হো য়া ই ট — সম-পরিমাণ 'হোয়াইট লেড' ↑, [$2PbCO_3 . Pb(OH)_2$], এবং বেরিয়াম সালফেটের ($BaSO_4$) সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রিত পদার্থ তেলে মিশিয়ে নিলে উৎকৃষ্ট সাদা রং (পেইণ্ট) তৈরি হয়ে থাকে।

ভ্যা ল্ ক্যা না ই জ্ ড রাবার — রাবারের সঙ্গে গন্ধক বা গন্ধকঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ মিশিয়ে উত্তাপে দ্রবীভূত করলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন পদার্থ স্বভাবজাত রাবারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক হয়ে যায় এবং অনেকটা শক্ত হয়ে ওঠে। একে ছাঁচে ঢেলে যে-কোন আকার দেওয়া যায়। মোটর গাড়ীর টায়ার প্রভৃতি এরূপ ভ্যাল্‌ক্যানাইজ্‌ড রাবারে তৈরি হয়ে থাকে।

ভ্যাল্‌ক্যানাইট — শক্ত এক রকম ভ্যাল্‌ক্যানাইজড্ রাবার ↑ বিশেষ। রাবারের সঙ্গে গন্ধকের বিশেষ এক রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জিনিসটা তৈরি হয়। এর তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা একেবারে থাকে না বলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে তড়িৎ-রোধক অর্থাৎ 'নন্‌কণ্ডাক্টর' পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ভ্যালেন্সি — যৌগিক গঠনে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগশক্তি-বোধক সংখ্যা। কোন মৌলিক পদার্থের একটা পরমাণু অপর কোন মৌলিক পদার্থের যতগুলো পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসায়নিক সংযোগ ঘটায় এবং তাদের যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেই সংখ্যাটি হলো ওই পদার্থ-বিশেষের ভ্যালেন্সি। হাইড্রোজেন গ্যাসকে মনোভ্যালাণ্ট ↑ বলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ এর যেন ভ্যালেন্সি এক; কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মৌলিকের এই ভ্যালেন্সি-সংখ্যা নির্ণীত হয়ে থাকে। কোন মৌলিকের একটি পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন-

পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, বা যে-কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্যুত করে' তার স্থান অধিকার করতে পারে, সেই সংখ্যাকে বলে ওই মৌলিক পদার্থের 'ভ্যালেন্সি'। এভাবে যে মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে, তাকে বলে **মনো-ভ্যাল্যাণ্ট** এলিমেণ্ট; দুইটির সঙ্গে যুক্ত হলে বলা হয় **ডাইভ্যাল্যাণ্ট**; এরূপ ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট, টেট্রাভ্যাল্যাণ্ট ইত্যাদি। রাসায়নিক ক্রিয়ায় বুঝা যায়, একটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে একটা ক্লোরিন-পরমাণু যুক্ত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl, সৃষ্টি হয়, —কাজেই ক্লোরিন মনোভ্যাল্যাণ্ট। একটা অক্সিজেন পরমাণু দুটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলে হয় জল, H_2O; কাজেই অক্সিজেন ডাইভ্যাল্যাণ্ট। এভাবে অ্যামোনিয়া ↑, NH_3, থেকে বুঝা যায়, নাইট্রোজেন ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট। মিথেন গ্যাস, CH_4; কাজেই কার্বন টেট্রাভ্যাল্যাণ্ট, ইত্যাদি।

আবার, সব মৌলিক পদার্থই যে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হবে, এমন কোন কথা নেই। সে ক্ষেত্রে আবার তুলনামূলকভাবে ভ্যালেন্সি সংখ্যা নির্ণীত হয়। ক্লোরিন মনো-ভ্যাল্যাণ্ট; এর একটা পরমাণু সোডিয়ামের একটা পরমাণুর সঙ্গে মিলে হয় 'সোডিয়াম ক্লোরাইড', $NaCl$ (লবণ); সুতরাং সোডিয়াম ধাতুও মনোভ্যাল্যাণ্ট। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি নির্দিষ্ট; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মৌলিকের দু-রকম ভ্যালেন্সিও হতে পারে; যেমন, আয়রন (লোহা) তার ফেরাস ↑ সল্টে ($FeCl_2$) হয় ডাইভ্যাল্যাণ্ট; এবং ফেরিক ↑ সল্টে ($FeCl_3$) হয় ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর এই সংযোগ-শক্তি, অর্থাৎ ভ্যালেন্সিকে হাতের মত কল্পনা করা যায়; যেন পরমাণুগুলো হাতে হাতে মিলিয়ে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। কাজেই যে পরমাণুর যত ভ্যালেন্সি তার যেন ততটা হাত; একেই বিজ্ঞানের সাধু ভাষায় বলে 'ভ্যালেন্সি বণ্ড'।

মডারেটর — অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে 'নিউক্লিয়ার ফিশন' ↑ প্রক্রিয়ায় নিউট্রন ↑ কণিকার গতি মন্দীভূত করতে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয়; যেমন—গ্রাফাইট ↑, বেরিলিয়াম ↑, হেভি ওয়াটার ↑ ইত্যাদি।

মন্যাড — যে মৌলিক পদার্থের ভ্যালেন্সি ↑ এক; মনোভ্যাল্যাণ্ট ↑, বা ইউনিভ্যাল্যাণ্ট এলিমেণ্ট ↑।

মণ্ড্ গ্যাস — প্রায় 650° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত কয়লার উপর বায়ু ও জলীয় বাষ্পের প্রবাহ চালিয়ে যে দাহ্য গ্যাসীয় সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2); হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকে। একে কখন কখন 'ওয়াটার গ্যাস'-ও ↑ বলা হয়।

মনেল মেটাল — একটি অতি-কঠিন ধাতুসংকর (অ্যালয় ↑); বিভিন্ন অনুপাতে নিকেল ↑, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ↑, সিলিকন ↑ এবং কার্বনের সংমিশ্রণে তৈরী। রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্ষয় হয় না; জাহাজের ইঞ্জিন, রসায়ন-শিল্পের কলকব্জা প্রভৃতি এই ধাতু-সংকর দিয়েই সচরাচর তৈরি হয়ে থাকে।

মনোকটিলিডন — এক-বীজপত্রী উদ্ভিদ। ধান, গম প্রভৃতি শস্যের একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, অর্থাৎ শস্য-বীজটা ভাঙতে গেলে তেঁতুল-বীজের (ডাইকটিলিডন) মত দু-ভাগ হয়ে যায় না, একক থাকে। কাজেই এদের বলে মনোকটিলিডন।

মনোক্রোমেটিক লাইট — এক বর্ণের আলোক; যে আলোকরশ্মি একই স্পন্দন ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ প্রবাহের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑ ওয়েভ) ফলে উদ্ভূত হয়। সূর্যালোক, প্রদীপের শিখা প্রভৃতির সাদা আলোক মনোক্রোমেটিক নয়; কারণ, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-স্পন্দনের সংমিশ্রিত প্রবাহের ফলে এরূপ সাদা আলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্যে প্রিজ্মের ↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরণের ফলে সাদা আলোক-রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালির (স্পেক্ট্রাম ↑) সপ্তবর্ণ দেখা যায়। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি এক-বর্ণী সব আলোক-রশ্মি হলো মনোক্রোমেটিক।

মনোটাইপ — এক রকম মুদ্রণ-যন্ত্র; যাতে ছাপার অক্ষরগুলোর আলাদা আলাদা টাইপ বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত হয়ে এককভাবে লাইনে সাজিয়ে ছাপা হয়। শব্দের অক্ষরগুলো প্রথমে কাগজের লম্বা ফালির মধ্যে যান্ত্রিক কৌশলে কাটা হয়। ওই কাগজ যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে কাটা অক্ষরগুলোর টাইপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে। সেগুলো পরে এক-এক লাইনে সাজিয়ে এসে ছাপার কাজ হয়। এই মুদ্রণ-যন্ত্রে প্রতিবারেই নূতন টাইপে সুন্দর নিখুঁত ছাপা হয়ে থাকে।

মনোবেসিক অ্যাসিড — যে অ্যাসিডে একটি মাত্র অপসারণযোগ্য হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, যেটি রাসায়নিক ক্রিয়ায় ধাতব পরমাণুর দ্বারা অপসারিত হয়ে ধাতুটার সম্পূর্ণ শমিত সল্ট ↑ তৈরি হয়ে থাকে; যেমন—নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3; কিন্তু সাল্ফিউরিক অ্যাসিড, H_2SO_4, নয়; অপসারণ-যোগ্য

দুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকায় একে বলা হয় **ডাইবেসিক** অ্যাসিড।

মনোভ্যালান্ট — এক ভ্যালেন্সি-বিশিষ্ট পদার্থ। যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি ↑ এক। একে ইউনিভ্যালান্ট এলিমেণ্ট, বা মন্যাড-ও ↑ বলে।

মনোমার — যে সব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ তাদের মূল প্রাথমিক অণুর অবিমিশ্র একক সমবায়ে গঠিত। এরূপ স্বাভাবিক 'মনোমার' রাসায়নিক পদার্থের একাধিক অণু বিশেষ রাসায়নিক সংযোগে পরস্পর সংবদ্ধ হয়েই পলিমার ↑ পদার্থের সম্মিলিত ও বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি হয়; যেমন— অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড, CH_3CHO, একটা মনোমার পদার্থ; কিন্তু প্যারাল্ডিহাইডের $(CH_3CHO)_3$ প্রত্যেকটি অণু মনোমার অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের তিনটা অণুর একক সংযোগে গঠিত হয়; কাজেই এটাকে বলা হয় পলিমার (পলিম্যারিজেসন ↑)। সাধারণ রাসায়নিক যৌগিক মাত্রই হয় মনোমার।

মনোলিথ — পাথর বা সিমেণ্টের যে-সব প্রকাণ্ড নিরেট ব্লক দিয়ে অট্টালিকার থাম বা ভিত্তি তৈরি হয়; একক প্রস্তর-নিমিত।

মন্যাটমিক এলিমেণ্ট — যে-সব মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণু একটি মাত্র পরমাণু নিয়ে গঠিত; যেমন—হিলিয়াম ↑ ।

মর্টার — (1) রসায়নাগারে বিভিন্ন পদার্থ চূর্ণ করবার জন্যে কঠিন পাথরের তৈরী যে পাত্র ব্যবহৃত হয়। ওর পেষণ-দণ্ডটাকে বলে **পেস্‌ল**। বাংলায় সাধারণতঃ একে বলে 'খল'। (2) বাড়া তৈরি করতে চুণ, সিমেণ্ট ↑ ও বালির যে জলীয় সংমিশ্রণ দিয়ে ইট গাঁথা হয়। এ-সব উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্টার তৈরি হয়ে থাকে।

মর্টার-পেস্‌ল

মরড্যাণ্ট — বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে যে-সব পদার্থের দ্রবে সেগুলো আগে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। রঞ্জক পদার্থটা অ্যাসিড-ধর্মী হলে মরড্যাণ্টটা হয় সাধারণতঃ বেসিক ↑ -ধর্মী (ধাতব হাইড্রক্সাইড) পদার্থ। আবার রঞ্জক পদার্থটা বেসিক-ভাবাপন্ন হলে মরড্যাণ্টটা অ্যাসিড জাতীয় হয়ে থাকে। বস্ত্রাদি মরড্যাণ্টের দ্রবে ভিজালে ওর সূক্ষ্ম কণিকাগুলো বস্ত্রের তন্তুর মধ্যে ঢুকে যায়; তারপরে তার সঙ্গে রঞ্জক পদার্থের রাসায়নিক মিলনের ফলে অদ্রাব্য রঙীন পদার্থ সৃষ্টি হয়। ওই অদ্রাব্য বর্ণ-কণিকাগুলো বস্ত্রে এঁটে গিয়ে রং পাকা হয়ে থাকে।

মর্ফিন — একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑

অর্থাৎ উপক্ষার জাতীয় যৌগিক, $C_{17}H_{19}O_3N$; মূলতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ, আফিম থেকে পাওয়া যায়। সাদা, কঠিন ও বিষাক্ত পদার্থ; কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় দেহের যন্ত্রণা উপশমের জন্যে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেবনে (বা ইন্‌জেকসনে) গভীর নিদ্রা ও অচৈতন্য ভাব দেখা দেয়। কিছুদিন ব্যবহারে নেশার মত মারাত্মক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

মর্ফিয়া—মর্ফিন ↑।

মর্ফোলজি — জীব-জগতের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন ও আকৃতিগত ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। কোন জীবের পরিণত অবয়ব ধারণ করবার জৈব প্রক্রিয়াকে বলে 'মর্ফোসিস'।

মল্ট — বার্লি, চাউল, গম প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ জলে ভিজিয়ে রাখলে বিশেষ এক রকম এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে তা গেঁজে যায়; একে উত্তপ্ত করে শুকিয়ে নিলে মল্ট তৈরি হয় (ব্রুয়িং ↑)।

মল্টেস্‌ — ঈস্ট ↑ ও বিভিন্ন জীবাণু থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ, বা বিশেষ এক রকম 'এন্‌জাইম' ↑। এর প্রভাবে মল্টের জলীয় মিশ্রণের মধ্যস্থ মল্টোজ ↑, বা মল্ট-সুগার নামক শর্করা হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে গ্লুকোজে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মল্টোজ — এক রকম শর্করা, যাকে 'মল্ট-সুগার'ও বলা হয়। রাসায়নিক হিসেবে অবশ্য এটা সাধারণ শর্করা $C_{12}H_{22}O_{11}$, কিন্তু বিভিন্ন ভৌত ধর্মে কিছু-কিছু প্রভেদ আছে। কঠিন স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। সাধারণ ইক্ষু-চিনি অপেক্ষা এর মিষ্টত্ব কিছু কম। ডায়েস্টেস ↑ নামক এন্‌জাইমের রাসায়নিক ক্রিয়ায় মল্টের ↑ শ্বেতসার এরূপ মল্টোজে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মলিব্‌ডিনাম — একটি মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 95·95; সুকঠিন সাদা ধাতব পদার্থ, অনেকটা লোহের মত। বিশেষ ধরণের ইস্পাত (স্টিল ↑) ও অন্যান্য ধাতু-সংকর তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

মলিকিউল — অণু; পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ (ভ্যালেন্সি ↑) হয়ে অণুর সৃষ্টি হয়। মৌলিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম (সাধারণ হিসেবে) অংশকে বলে পরমাণু, বা অ্যাটম; এরূপ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত অণু, বা মলিকিউল হলো যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। অবশ্য মৌলিক পদার্থেরও অণু থাকে; যেমন—H_2, হাইড্রোজেনের একটা অণু, যা দুটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে গঠিত হয় যৌগিক পদার্থের অণু; যেমন—H_2O হলো জলের একটা অণু, NH_3 অ্যামোনিয়ার ↑ অণু।

মলিকিউলার ওয়েট — আণবিক ওজন ; কোন যৌগিক বা মৌলিক পদার্থের অণুর সংগঠক পরমাণুগুলোর ওজনের (অ্যাটমিক ওয়েট ↑) সংখ্যাগত যোগফল। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর ওজন আনুপাতিক হিসেবে যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মহলানবিশ, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র— বাঙ্গালী পরিসংখ্যানবিদ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী ; কলিকাতায় জন্ম 1893 খৃঃ, অদ্যাপি (1961 খৃঃ) জীবিত। শিক্ষা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ; এম. এস-সি 1918 খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক। পরিসংখ্যান-বিদ্যাকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রয়্যাল সোসাইটির সদস্য, (এফ. আর. এস)। কলিকাতায় ভারতীয় পরিসংখ্যান সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে অসামান্য দান ; আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন।

মাইকা -- অভ্র, আঁভ ; কাচের মত স্বচ্ছ এক রকম কঠিন খনিজ পদার্থ ; পাতলা স্বচ্ছ স্তরে গঠিত। জিনিসটার গঠন এরূপ যে, স্তরে স্তরে খুলে ফেলা যায়। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে উৎকৃষ্ট তড়িৎ-রোধক পদার্থ (ইন্সুলেটর ↑) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাইকোলজি—ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আবার ছত্রাক-ঘটিত রোগকে বলে **মাইকোসিস**।

মাইকেলসন, এলবার্ট আব্রাহাম— মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1851 খৃঃ, মৃত্যু 1931 খৃঃ। বিখ্যাত 'মোরেল-মাইকেলসন' পরীক্ষার জন্য স্মরণীয় ; ইথারের ↑ বিশ্ব পরিব্যাপ্তির কল্পনা অসার প্রতিপাদিত 1887 খৃষ্টাব্দ। তথাকথিত ইথারের কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর গতি নির্ধারণের চেষ্টা ; — বিফলতায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের ভিত্তি রচিত।

মাইক্রন—এক মিটারের ↑ দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

মাইক্রো — অতি ক্ষুদ্র ; বিভিন্ন শব্দের পূর্বে কথাটা ব্যবহার করে ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করা হয় ; যেমন— মাইক্রোস্কোপ ↑, মাইক্রোমিটার ↑ ইত্যাদি। **মাইক্রো-ফ্যারাড** বলতে এক ফ্যারাড ↑ তড়িতের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বুঝায়।

মাইক্রোফোন — যে যন্ত্রের সাহায্যে মৃদু শব্দতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করে তীব্রতর শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে শ্রুতিগোচর করা হয়। টেলিফোন ↑, রেডিও ↑ প্রভৃতির প্রেরক-যন্ত্রে এর সাহায্যে উৎপন্ন তড়িৎ-স্পন্দন ধাতব তারের

মাধ্যমে, অথবা বেতার-তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে পৌছায়। ওই তড়িৎস্পন্দনকে পুনরায় শব্দ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করে কথাবার্তা শ্রুতিগোচর হয়। সাধারণ মাই-ক্রোফোনে অল্‌গাভাবে কার্বনের গুঁড়াভর্তি একটা পাত্রের মুখে একটা ডায়ফ্রাম ↑ সংলগ্ন থাকে। শব্দতরঙ্গের প্রভাবে ওই ডায়ফ্রামটা আন্দোলিত হলে কার্বনের গুঁড়া-গুলোও তদনুযায়ী কম্পিত হতে থাকে। এই কম্পনের তারতম্যের ফলে ওই কার্বন-গুঁড়ার মাধ্যমে প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতের পথে প্রতিবন্ধকতার তারতম্য ঘটে। এই তারতম্য অনুযায়ী প্রেরক-যন্ত্রের ডায়ফ্রামটা কম্পিত হতে থাকে; ফলে, প্রেরকযন্ত্রের শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ শব্দতরঙ্গ আবার গ্রাহক-যন্ত্রেও সৃষ্টি হয়। অবশ্য আজকাল আরও নানারকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন গঠনের মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাইক্রোস্কোপিক সল্ট — সোডিয়াম-অ্যামোনিয়াম-হাইড্রো-জেন ফস্‌ফেট, $NaNH_4.HPO_4.4H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। উত্তাপে বোর‍্যাক্সের ↑ মত এরও স্বচ্ছ দানা তৈরি হয়।

মাইক্রোমিটার — এক রকম যন্ত্র; যার সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য, বা সূক্ষ্মতম কোণের পরিমাণও সংলগ্ন মাইক্রোস্কোপের ↑ সাহায্যে নির্ণীত হয়ে থাকে। সাধারণ **মাইক্রো-মিটার গেজ** হলো এক রকম যন্ত্র, যা দিয়ে সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্যের মাপ সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা যায়। এর বাঁকানো অংশের এক প্রান্ত যে দণ্ডের সঙ্গে স্ক্রু-র প্যাঁচে সংবদ্ধ থাকে, তার গায়ে ওই স্ক্রু-র প্যাঁচের হিসেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে। স্ক্রু ঘুরিয়ে এ-দিয়ে দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত মাপা সম্ভব হয়।
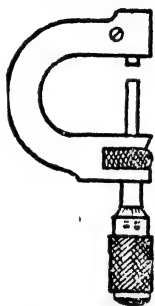
মাইক্রোমিটার গেজ

মাইক্রোস্কোপ — অণুবীক্ষণ যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য পদার্থও বর্ধিতাকারে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস'-ও এক রকম সাধারণ মাইক্রোস্কোপ পর্যায়ভুক্ত; কারণ, এর উত্তল (কন্‌ভেক্স) লেন্সের ↑ মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র পদার্থ বর্ধিতাকারে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলো 'কম্পাউণ্ড' মাইক্রোস্কোপ; যে যন্ত্রের মধ্যে আই-পিস ↑ এবং অব্জেক্টিভ ↑ নামে সাধারণতঃ দু'খানা উত্তল লেন্স সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্রষ্টব্য পদার্থ থেকে আলোকরশ্মি 'অব্জেক্টিভ' ↑ লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে তার একটা হুবহু উল্‌টা প্রতিচ্ছায়া বর্ধিতাকারে যন্ত্রের
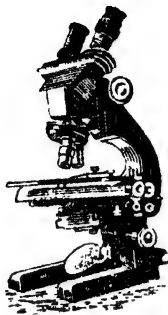
অভ্যন্তরে গিয়ে পড়ে। (অবশ্য অতি সূক্ষ্ম কোন পাতলা জিনিস দেখতে হলে তার ভিতর দিয়ে সোজা-সুজি ভাবে আলো-র শ্মি ফেলতে হয়।) 'আইপিস্' লেন্স খানার ফোক্যাল লেংথের ↑ মধ্যে এসে পড়লে ওই প্রতিচ্ছায়াটা উল্টা অবস্থায়ই আই-পিসের ভিতর দিয়ে আরও বর্ধিতাকারে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। অবশ্য বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে

আধুনিক মাইক্রোস্কোপ
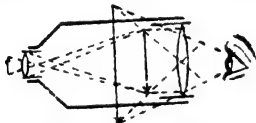
মাইক্রোস্কোপে কিভাবে ছোট জিনিস বড় দেখায়

আরও নানারকম সব বিধি-ব্যবস্থা সমন্বিত জটিল গঠনের বিভিন্ন শ্রেণীর মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র আছে।

মাইল্ড স্টিল — অপেক্ষাকৃত নরম ইস্পাত। এর মধ্যে কাঁচা লোহার সঙ্গে কার্বন ও বিভিন্ন ধাতব উপাদান (ষ্টিল ↑) অতি সামান্য পরিমানে মিশ্রিত হয়। গৃহাদির কাঠামো তৈরি করবার কাজে মাইল্ড ষ্টিল ব্যবহৃত হয়। এ-দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বা যন্ত্রাদি তৈরি করলে সহজেই ক্ষয়ে যায়, তীক্ষ্ণধারও হয় না; এ-সব কাজে 'হার্ড ষ্টিল' দরকার।

মাইয়োপিয়া — চোখের স্বল্প দূরত্বের দৃষ্টি-দোষ (সর্ট সাইট ↑)। চক্ষু-গোলকের এই ত্রুটির ফলে নিকটের জিনিস দেখা যায়, কিন্তু কিছু দূরবর্তী পদার্থ পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। অবতল (কন্‌কেভ) লেন্সের ↑ চশমা ব্যবহারে চোখের এই দোষ সংশোধিত হয়।

মাইয়োসিন — দেহের পেশী-তন্তুর প্রোটিন ↑ জাতীয় প্রধান উপাদান। পদার্থটা জলে দ্রবণীয় নয়, কিন্তু ভুক্ত বস্তুর অ্যাল্‌কালি ↑ উপাদানের জলায় দ্রবে গলে গিয়ে পেশীর মধ্যে এক রকম জেলির ↑ মত জিনিসের সৃষ্টি করে। এর জন্যেই দেহের মাংস-পেশীগুলো সহজেই সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে।

মাইয়োসিস — চোখের মণির (পিউপিল ↑) অস্বাভাবিক সংকোচন; রোগ বিশেষ। আবার চক্ষু পরীক্ষার জন্যে যে-সব ঔষধ প্রয়োগে চোখের মণির এরূপ সংকোচন ঘটে তাদের বলে **মাইয়োটিক্স**।

মাইয়োকার্ডিটিস — হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরক মাংসপেশীর স্ফীতি ও প্রদাহজনিত এক প্রকার রোগ বিশেষ। **মাইয়ো** মানে 'মাস্‌ল' ↑, বা মাংসপেশী সম্বন্ধীয়।

মাইসিটিন— বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের দেহ-নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যার প্রভাবে জীবদেহে বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ রকম পদার্থকে মাইসিন-ও বলা হয়। টাইফয়েড, টাইফাস প্রভৃতি রোগের ঔষধ ক্লোরোমাইসিটিন ; ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষা, প্রভৃতির ঔষধ স্টেপ্‌টোমাইসিন; বিভিন্ন ভাইরাস ↑-ঘটিত রোগে 'অরিয়োমাইসিন'। এগুলো সবই বিভিন্ন ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ পর্যায়ের জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

মানৃজ মেটাল — তামা ও দস্তার (জিঙ্কের ↑) এক বিশেষ সংকর ধাতু; সমুদ্র-জলের ক্রিয়ায় ক্ষয় হয় না বলে জাহাজের তলদেশ সাধারণতঃ এ-দিয়ে তৈরি হয়।

মার্কনি, গাগ্লিয়েমো—ইটালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত যন্ত্রবিদ; জন্ম 1874 খৃঃ, মৃত্যু 1937 খৃঃ। আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রের (রেডিও ↑) পরীক্ষায় ইটালী সরকারের সাহায্য লাভে বঞ্চিত; ইংলণ্ডের ডাক ও নৌ-বিভাগের আনুকূল্যে প্রথম বেতার সংবাদ প্রেরণ, 1897 খৃঃ। শব্দ-বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ, 1909 খৃঃ। বেতার যন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের গবেষণায় জীবনপাত।

মার্কারি—বুধ গ্রহ ; সৌর পরিবারের গ্রহগুলোর মধ্যে এই গ্রহটা সূর্যের নিকটতম কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে মাত্র 3 কোটি 60 লক্ষ মাইল ; আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় উনত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সম্ভবতঃ গ্রহটার উপরিভাগ প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং এর কোন বায়ুমণ্ডল নেই। পৃথিবীর 88 দিনে বুধ গ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 88 দিন।

মার্কারি — পারা, পারদ। মৌলিক তরল ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Hg, পারমাণবিক ওজন 200·61 ; পারমাণবিক সংখ্যা 80 ; রৌপ্যের মত সাদা ভারী পদার্থ। স্বাভাবিক তাপ ও চাপে পারদই একমাত্র তরল ধাতু। সিনাবার ↑ নামক মার্কারি-সালফাইড, HgS, খনিজ আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করে ও তার মধ্যে বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে বিশুদ্ধ পারদ নিষ্কাশিত করা হয়। থার্মোমিটার ↑, ব্যারোমিটার ↑, ম্যানোমিটার ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন সংকর ধাতু (অ্যামাল্‌গাম ↑) বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন হয়। পারদের যৌগিক পদার্থগুলো সাধারণতঃ বিষাক্ত; কিন্তু ক্যালোমেল (মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড, Hg_2Cl_2,) প্রভৃতি

কতকগুলো যৌগিক আবার ঔষধ-রূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কারি কম্পাউণ্ড — পারদের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে মার্কারি কখন মনোভ্যালান্ট ↑ এবং কখন বাইভ্যালান্ট ↑ দু'রকমেই মিলিত হতে পারে। মনোভ্যালান্ট মার্কারি সল্টকে **মার্কিউরিয়াস** এবং বাই-ভ্যালান্ট শ্রেণীর মার্কারি যৌগিককে **মার্কিউরিক** সল্ট বলে; যেমন—মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড, Hg_2Cl_2, (সাধারণতঃ যাকে বলে ক্যালোমেল) বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার মার্কিউরিক ক্লোরাইড, $HgCl_2$, (সাধারণতঃ যা 'করোসিভ সাব্লিমেট' নামে পরিচিত) কীটপতঙ্গ নাশক বিষাক্ত পদার্থ। ভার্মিলিয়ন ↑ অর্থাৎ সিন্দুর হলো মার্কিউরিক সালফাইড, HgS; আয়ুর্বেদীয় বিশিষ্ট ঔষধ মকরধ্বজ বা স্বর্ণ-সিন্দুর হলো গন্ধক ও পারার রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন বিশেষ এক প্রকার সালফাইড যৌগিক; নামে স্বর্ণ-সিন্দুর হলেও এর মধ্যে কিন্তু সোনা থাকে না, সোনা মাত্র ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কারি ভেপার ল্যাম্প — পারদ-বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে নীলাভ তীব্র আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এজন্যে ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব বা টিউবের মধ্যে পারদের বাষ্প ভর্তি করে এক রকম ল্যাম্প তৈরি হয়ে থাকে। এর আলোকে প্রচুর অতি-বেগুনী (আল্‌ট্রা-ভায়োলেট ↑) রশ্মির উদ্ভব হয়। এজন্যে কৃত্রিম সূর্য-রশ্মির বিশেষ চিকিৎসায় এইরূপ আলোক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্গেরিন — উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজাত তৈল ও চর্বির সংমিশ্রণে তৈরী মাখম-সদৃশ এক রকম খাদ্য বস্তু। এর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ মেশানো হয়; জীবাণুর প্রভাবে ওই দুধ বিকৃত হয়ে মাখমের মত গন্ধ বেরোয়। এর পরে ওর মধ্যে বিভিন্ন ভিটামিন ↑ ও উপযুক্ত রং মিশিয়ে ব্যবহারোপযোগী মার্গেরিন তৈরি হয়ে থাকে।

মার্কেসাইট — আয়রন ডাইসাল-ফাইড (আয়রন পাইরাইট্‌স ↑) নামক সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। এর বিভিন্ন আকারের পালিশ-করা টুকরা চক্‌চকে সাদা পাথরের মত সস্তা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়।

মার্স — মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী ও বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা কক্ষপথে গ্রহটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে প্রায় 14 কোটি 15 লক্ষ মাইল। আয়তনে পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীর চাঁদের মত দুটা উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষ-পথে মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ

করছে। গ্রহটার বছর আমাদের 687 দিনে হয়; অর্থাৎ পৃথিবীর 687 দিনে মঙ্গল গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। গ্রহটার উপরিভাগ অত্যন্ত ঠাণ্ডা, প্রায় শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে। মঙ্গল গ্রহের এক রকম বায়ুমণ্ডল আছে বলে মনে হয়, কিন্তু কোন জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মার্শ গ্যাস — মিথেন গ্যাস, CH_4; একে আবার 'ফায়ার ড্যাম্প'-ও ↑ বলে। এটা প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর প্রথম হাইড্রোকার্বন ↑ ; বর্ণহীন, গন্ধহীন অদৃশ্য দাহ্য গ্যাস। বায়ুর সংস্পর্শে এতে অগ্নি-সংযোগ ঘটলেই সহসা জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ বিভিন্ন জৈব পদার্থাদি পচে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে; জলাভূমি, বিশেষতঃ কয়লার খনিতে মার্শ গ্যাস উদ্ভূত হয়।

···মাল্টি — অনেক, বহুসংখ্যক; যেমন—**মাল্টিসেলুলার**, বহুকোষী; যার গঠনে বহুসংখ্যক কোষ, বা সেল ↑ রয়েছে। **মাল্টিপ্যারাস** মানে বহুসন্তানবতী (নারী)।

মাল্টিপ্‌ল — গুণিতক রাশি; যে সংখ্যা অপর একাধিক সংখ্যা-দ্বারা বিভাজ্য; যেমন — 21 হলো 7-এর একটা মাল্টিপল।

মাস্ — পদার্থের ভর, অর্থাৎ মোট বস্তু-পরিমাণ। কোন বস্তুর উপরে শক্তি প্রয়োগ করলে প্রকৃতপক্ষে তার ভরের অনুপাতেই বস্তুটার গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আবার কোন বস্তুর ওজন তার ভরের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এজন্যে কোন বস্তুর ভর সাধারণতঃ তার ওজনের সাহায্যে নির্ণীত হয়; যেমন, এক পাউণ্ড 'মাস্' বললে বুঝতে হবে বস্তুটার ওজন এক পাউণ্ড।

মাস্ স্পেক্ট্রোগ্রাফ — এক রকম যন্ত্র; যার সাহায্যে বিভিন্ন ভরের ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন ↑ কণিকা-গুলোকে তাদের ভরের ক্রমানুসারে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু 234, 235 এবং 238 ভর-বিশিষ্ট বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত; 'মাস্ স্পেক্ট্রোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে এদের পৃথক করা যায়। কোন পদার্থের পারমাণবিক ওজন, বা বিভিন্ন আইসোটোপের ↑ সঠিক ভর-ও এই যন্ত্রের সাহায্যে করা নির্ণয় যেতে পারে। যন্ত্রটার এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'পজিটিভ-রে অ্যানালিসিস'।

মাস্ স্পেক্ট্রাম — মাস্ স্পেক্ট্রো-গ্রাফ ↑ যন্ত্রের সাহায্যে ধন-তড়িতান্বিত আয়ন-কণিকার ধারা সম্পাতে এক রকম বিশেষ বর্ণালি (স্পেক্ট্রাম্ ↑) সৃষ্টি করা যায়; এই বিশেষ বর্ণালিকে বলা হয় মাস্-স্পেক্ট্রাম। এর মূল তথ্য প্রদত্ত চিত্র থেকে মোটামুটি বুঝা যাবে। পদার্থের তড়িতাবিষ্ট আয়ন-কণিকার ধারা 'অ'-চিহ্নিত বৈদ্যুতিক প্লেট দু'টার

মধ্য দিয়ে বেরিয়ে নিম্ন দিকে কিছু বেঁকে যায়; তখন এই ধারাপথের লম্বভাবে 'ম'-চিহ্নিত চৌম্বক ক্ষেত্র
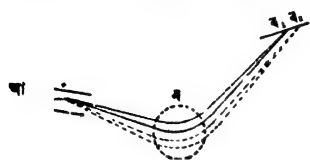
'মাস্-স্পেক্ট্রাম'
উৎপাদনের পদ্ধতি

সৃষ্টি করলে ওই ধারা ঊর্ধমুখে বেঁকে গিয়ে পর্দায় $ব_1 ব_2$ বর্ণালির সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন ভরের কণিকা-গুলো ফটোগ্রাফিক প্লেট বা পর্দায় বিভিন্ন দূরত্বে বর্ণালির রেখাপাত করে থাকে। মাস্ স্পেক্ট্রামের এই বর্ণালি-রেখার সংস্থান দেখে বিভিন্ন ভরের কণিকার অস্তিত্ব পৃথকভাবে নিরূপণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিচিত্র কৌশলে মহাশূন্যে বহু দূরবর্তী জ্যোতিষ্কগুলোর উপাদানসমূহের স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে।

মাস্কোভাইট— বিশেষ এক জাতীয় সাদা অভ্র (মাইকা ↑); যার পাত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ইন্সুলেটর ↑ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মিউকাস মেম্ব্রেন — গলা, নাক প্রভৃতির অভ্যন্তরে যে পাতলা পর্দার আবরণ থাকে। এই পর্দার গায়ে থাকে অনেকগুলি **মিউকাস গ্ল্যাণ্ড**, বা শ্লেষ্মা-গ্রন্থি, যেগুলি থেকে জেলির মত ঘন তরল পদার্থ (শ্লেষ্মা) নিঃসৃত হয়, যাকে বলে **মিউকাস**। ঐ পদার্থকে **মিউকোসা**-ও বলে।

মিউর‍্যাটিক অ্যাসিড — হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিড, HCl, পূর্বে এই নামে পরিচিত ছিল।

মিউটেসন — আকস্মিক কোন কারণে জীবের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পিতামাতার গুণাবলী থেকে অন্যরূপ নূতন গুণাবলীর বিকাশ। সন্তানে অর্জিত এই সব নূতন গুণ, ধর্ম ও স্বভাব তার পরবর্তী বংশাবলীতেও সঞ্চারিত হতে পারে। এক্স-রশ্মির ↑ প্রভাবে কখন কখন জীবের স্বকীয় প্রকৃতির এরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে, কস্মিক ↑ রশ্মির প্রভাবেও এরূপ হওয়া সম্ভব। [সাদা ফুলের গাছে কখন কখন দু-একটা এমন বীজ জন্মে যার গাছে লাল ফুল ফোটে। এই লাল ফুলের গাছে যদি বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে লাল ফুলই ফোটে তবে তাকে **মিউট্যাণ্ট** বলা হয়।]

মিটার — (1) পরিমাপক যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন কিছুর পরিমাণ স্থির করা যায়; যেমন—থার্মোমিটার ↑, ভোল্টমিটার ↑ ব্যারোমিটার ↑ প্রভৃতি। (2) মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একটা একক; — প্রায় 39·37 ইঞ্চি।

মিটিয়র— উল্কাপিণ্ড; মহাশূন্য থেকে যে সব পদার্থ-পিণ্ড মাঝে মাঝে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। একে

'মিটিওরাইট'-ও বলে। দূরন্ত বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করবার সময়ে এই নৈসর্গিক পদার্থ পিণ্ডগুলো বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলতে থাকে। লোকে সাধারণতঃ একে বলে উল্কাপাত। অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলো বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কখন কখন আবার পৃথিবীতে এসে পড়ে। এর মধ্যে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, বিশেষতঃ লৌহই বেশীর ভাগ থাকে।

মিটিয়রোলজি — আ বা হা ও য়া বিজ্ঞান; বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন — বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর চাপ, তাপ, আর্দ্রতা, গতি, অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আব্‌হাওয়ার এসব তথ্যাদি থেকে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির পূর্বাভাস বিভিন্ন যুক্তি ও হিসাবের সাহায্যে অনেকটা সঠিকভাবে জানা যায়।

মিডিয়ান — কোন ত্রিভূজের যে-কোন বাহুর মধ্যবিন্দু থেকে বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা। কাজেই প্রত্যেক ত্রিভূজের তিনটি মিডিয়ান থাকে। এভাবে অঙ্কিত তিনটি মিডিয়ান যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে তাকে বলা হয় ত্রিভূজের সেণ্ট্রয়েড, বা মধ্যবিন্দু।

মিডিয়ান

মিডিয়াম — মাধ্যম; যে পদার্থের ভিতরে অন্য কোন পদার্থ স্থিত বা পরিচালিত হয়; যেমন—'পেইণ্ট' তৈরি করতে রঙীন পদার্থের চূর্ণ সাধারণতঃ তিসির তেলে গুলে নেওয়া হয়; এখানে ওই তেল হলো রং-এর মিডিয়াম। শব্দ-তরঙ্গ বায়ুর ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে, কাজেই বায়ু হলো শব্দ-তরঙ্গের মিডিয়াম।

মিথাইল অ্যালকোহল — পদার্থটা সাধারণতঃ 'উড্‌ স্পিরিট' ↑ CH_3OH, নামে বিশেষ পরিচিত। 'ডেস্ট্রাক্টিভ ডিষ্টিলেশন' ↑ প্রক্রিয়ায় কাঠ চোলাই করে এই বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থটা পাওয়া যায়। একে কখন কখন 'উড্‌ ন্যাপ্‌থা'ও ↑ বলা হয়। দ্রাবক পদার্থ হিসাবে এবং 'মেথিলেটেড স্পিরিট' ↑ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শিল্প-কাজেও এর নানা রকম ব্যবহার আছে।

মিথাইল কার্বিনল — ইথাইল অ্যালকোহল ↑।

মিথিলিন — হাইড্রোকার্বন (CH_2) র‍্যাডিক্যাল। ইথিলিন ↑, C_2H_4, প্রভৃতি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মত মিথিলিনের কিন্তু পৃথক অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে এটা মিলিত হয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিকের সৃষ্টি করে থাকে; যেমন, CH_2Cl_2 মিথিলিন ক্লোরাইড। কাজেই এটা মিথিলিন, বা 'মিথাইল'

গ্রুপ নামে পরিচিত একটা জৈব র‍্যাডিক্যাল↑ মাত্র।

মিথিলিন-ব্লু — গাঢ় নীলবর্ণের এক প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের ($C_{66}H_{18}N_{8}SCl$) বিশেষ নাম; জলে দ্রবণীয়। রঞ্জক পদার্থ হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ঔষধ হিসেবে ও জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

মিথিলেটেড স্পিরিট — ইথাইল অ্যালকোহলের↑ সঙ্গে সাধারণতঃ 5% 'মিথাইল অ্যালকোহল' (উড্-স্পিরিট↑) মিশিয়ে যে তরল জ্বালানি পদার্থ তৈরি হয়। স্পিরিট ল্যাম্প, স্টোভ প্রভৃতিতে জ্বালানো হয়; দ্রাবক পদার্থ হিসেবে নানা রকম রং, ভার্নিস↑ প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মদ্য জাতীয় ইথাইল অ্যালকোহলকে অপেয় ও বিষাক্ত করবার জন্যেই এর মধ্যে মিথাইল অ্যালকোহল মেশানো হয়। কখন কখন আবার মিথিলেটেড স্পিরিটে পাইরিডিন↑ পেট্রোলিয়াম↑ প্রভৃতিও সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়ে থাকে।

মিথেন — মার্শ গ্যাস↑, CH_4; ফায়ার ড্যাম্প↑।

মিনারেল — খনিজ পদার্থ; সাধারণতঃ যে-সব অজৈব, বা ধাতব পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ভূগর্ভে পাওয়া যায়; যেমন—লোহা, দস্তা, তামা প্রভৃতি। কয়লা একটা জৈব খনিজ পদার্থ। খনিজ তৈলগুলো প্রধানতঃ জৈব হাইড্রোকার্বন↑ শ্রেণীর। এ-গুলোও অবশ্য খনিজ পর্যায়ভুক্ত; তবে এদের সাধারণতঃ বলা হয় 'মিনারেল অয়েল', অথবা 'প্যারাফিন↑ অয়েল'।

মিনারেলোজি — বিভিন্ন খনিজ পদার্থের গঠন উপাদান, পরিশোধন, বিশ্লেষণ প্রভৃতির বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

মিনিয়াম — রেড লেড↑।

মিরিয়াপড — কেন্নো বিছা প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর বহুসংখ্যক পা আছে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওই সব পায়ের সাহায্যে যারা বুকে হেঁটে চলাফেরা করে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের কোন কোনগুলো আবার তাদের পায়ের সংখ্যানুযায়ী মিলিপেড (সহস্র পদী), সেন্টিপেড (শতপদী) প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও পরিচিত হয়ে থাকে।

মিরিয়াপড

মিরেজ — মরীচিকা; মরুভূমিতে উত্তপ্ত ও হাল্কা বায়ুর বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী বস্তুর যে প্রতিচ্ছায়া দেখে তাকে নিকটবর্তী বলে ভ্রম হয়। এ রকম ছায়া উল্টা হয়ে পড়ে, যেন বৃক্ষাদি আকাশ থেকে মাটির দিকে ঝুলছে; যেমন জলাশয়ের তীরবর্তী বৃক্ষাদির ছায়া জলে প্রতিফলিত হয়। এভাবে

দূরবর্তী তরঙ্গায়িত বালুকারাশির এরূপ ছায়া নিকটেই জলাশয়ের মত পরিদৃষ্ট হয়ে মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিভ্রান্ত করে।

মিলি — হাজার ভাগের এক ভাগ। এক সহস্রাংশ ভাগ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়; যেমন—মিলিগ্র্যাম, এক গ্র্যামের 1/1000 ভাগ, প্রায় ·0154 গ্রেণ। এইরূপ মিলিলিটার ↑, মিলিমিটার ↑ ইত্যাদি।

মিলি-অ্যাম্‌মিটার — অতি সূক্ষ্ম মাপের অ্যাম্‌মিটার ↑ যন্ত্র: যাতে মিলি অ্যাম্পিয়ার ↑, অর্থাৎ এক অ্যাম্পিয়ারের হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত তড়িৎ-প্রবাহ মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

মিলি-বার — বায়ুমণ্ডলায় চাপ পরিমাপের একক বিশেষ, আবহাওয়া বিজ্ঞানে কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 60° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় 45° অক্ষাংশের (ল্যাটিচিউড ↑) বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে এক 'বার' বলা হয়; এই চাপ ব্যারোমিটারে ↑ প্রায় 75 সেন্টিমিটার পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান। মিলি-বার হলো এই চাপের হাজার ভাগের একভাগ।

মিল্কিওয়ে — গ্যালাক্সি ↑ ; বাংলায় বলে ছায়াপথ। মহাশূন্যে অনেকটা স্থান জুড়ে যে সাদা আলোকপুঞ্জ দেখা যায়। পরস্পর নিকটবর্তী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র ও গ্যাসীয় পিণ্ডের সমবায়ে এই ছায়াপথ গঠিত। বহু দূরবর্তী বলে ওই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না, আলোকপুঞ্জ মাত্র দেখা যায়।

মেগা — দশ লক্ষ গুণ বুঝাতে কথাটা ব্যবহৃত হয়; যেমন, **মেগা-সাইক্‌ল** মানে কোন অল্টার্নেটিং কারেণ্টের ↑ দশ লক্ষ বার বিবর্তন (পজিটিভ থেকে নেগেটিভ ও নেগেটিভ থেকে পজিটিভ)। সাধারণভাবে কোন কিছুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বৃহদায়তন বুঝাতেও কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন — **মেগাকোলন** বললে অন্ত্রের কোলন ↑ নামক অংশের অত্যধিক বৃদ্ধি বুঝায়।

মেগোম — দশ লক্ষ ওম্ ↑ ।

মেটাজোয়া — যে-সব জীবের দেহ দুই বা ততোধিক কোষ-স্তরে গঠিত; বস্তুতঃ এককোষী প্রোটোজোয়া ↑ ও স্পঞ্জ জাতীয় জীব ব্যতীত সব প্রাণীই মেটাজোয়া শ্রেণীর।

মেটামার্সাল — পায়ের পাতার অভ্যন্তরস্থ খণ্ডে খণ্ডে সংযুক্ত হাড়গুলি। এগুলির গঠন ও সংস্থানের বৈশিষ্ট্যের জন্যে এদের 'মেটামার্সাল বোন' বলে। হাতের পাতার এরূপ পরস্পর সংযুক্ত হাড়গুলিকে বলে **মেটাকার্পাল** বোন্‌স।

মেটামার্সাল

মেটাল — ধাতব পদার্থ। সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি যে-সব মৌলিক

পদার্থের বিশেষ এক প্রকার ধাতব ঔজ্জ্বল্য আছে, পিটিয়ে পুড়িয়ে যাকে সূক্ষ্ম তার ও পাতে পরিণত করা যায়, এবং সাধারণতঃ যার উত্তাপ ও তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা থাকে। ধাতব পদার্থ মাত্রই অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে অক্সাইড↑ সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ সকল ধাতুই মোটামুটি ইলেক্ট্রোপজিটিভ↑ ধর্ম বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

মেটালয়েড — ধাতুকল্প; যে সব মৌলিক পদার্থের গুণ ও ধর্ম অনেকাংশে ধাতব পদার্থের মত। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় এদের ধাতুর ন্যায় মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতব পদার্থের সকল গুণ ও ধর্ম এদের থাকে না। এজন্যে আর্সেনিক↑, অ্যান্টিমনি↑ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থকে বলে মেটালয়েড।

মেটালোগ্রাফি—বিভিন্ন ধাতু ও ধাতুসংকর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, তাদের শিল্প-উৎপাদন, বিশুদ্ধতা, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে **মেটালার্জি** হলো খনিজ থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন, ধাতুসংকর তৈরি, খনিজের ধাতব রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ক ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

মেটাবলিজ্‌ম—জীবের দেহাভ্যন্তরে যে-সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ভুক্ত পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে নূতন নূতন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, এবং তার ফলে জীব-দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে। এইরূপ বিভিন্ন সব 'মেটাবলিক' প্রক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরে যে-সব পদার্থের সৃষ্টি হয় তাদের বলে **মেটাবোলাইট**।

মেটাল্ডিহাইড — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের↑ (CH_3CHO) পলিম্যারিজেসন↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি কঠিন যৌগিক পদার্থ; জিনিসটা সাদা, বিষাক্ত ও দাহ্য; যা 'মেটাফুয়েল' নামে বিক্রয় হয়। জ্বালানি হিসেবে ও কীট-পতঙ্গ নাশক পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেটাবোলাইট — মেটাবলিজ্‌ম↑।

মেটামেরিজম্—রাসায়নিক হিসেবে সমগোত্রীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের এক প্রকার আইসোমেরিজম↑ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় গঠিত যৌগিকগুলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমান সংখ্যক নির্দিষ্ট পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরমাণুগুলোর বিভিন্নরূপ সংযোজনের ফলে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি ঘটে; যেমন, ডাই-ইথাইল ইথার, $C_2H_5O.C_2H_5$, এবং প্রোপাইল ইথার, $CH_3O.C_3H_7$ পরস্পর হলো **মেটামেরিক** পদার্থ; কারণ, এই সমগোত্রীয় পদার্থ দুটার মধ্যে সমান সংখ্যক কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে, কিন্তু তাদের পরস্পর সংযোজনের বিভিন্নতার জন্যে পদার্থ দুটার গুণ ও

ধর্মের পার্থক্য ঘটেছে। সমগোত্রীয় পদার্থ না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এরূপ ঘটলে পদার্থগুলোকে **আইসোমেরিক,** বা আইসোমার ↑ বলা হয়।

মেট্রাইটিস — প্রসূতির গর্ভাশয়ের (ইউটেরাস ↑) স্ফীতি ও প্রদাহ্জনিত এক বিশেষ স্ত্রী-রোগ। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর-পর্দাকে বলা হয় **এণ্ডোমেট্রিয়াম।**

মেট্রিক সিষ্টেম — পরিমাপের দশমিক পদ্ধতি। মিটার ↑, গ্র্যাম ↑ প্রভৃতি এককের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গণনাদিতে দশের গুণিতক বা দশমাংশের হিসাবে বিভিন্ন পরিমাপের দশমিক প্রণালী: যেমন, **মিটার** হলো দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক — প্রায় 39·37 ইঞ্চি। তার আবার ডেকামিটার, কিলোমিটার; অথবা সেণ্টিমিটার, মিলিমিটার প্রভৃতি। ওজনের একক গ্র্যাম ↑; কিলোগ্র্যাম, মিলিগ্র্যাম প্রভৃতি। **মেট্রিক টন** = 1,000 কিলোগ্র্যাম ↑।

মেডুলা অবলঙ্গেটা — মস্তিষ্কের নিম্নভাগের (সেরিবেলাম ↑) অংশ বিশেষের নাম। মস্তিষ্কের এই অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল ও দেহের আরও অনেক প্রয়োজনীয় জৈবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চিত্রে তীর-চিহ্নিত অংশ।

মেডুলা অবলঙ্গেটা

মেডুলা — জীবদেহের কোন অংশ বিশেষের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ; যেমন, হাড়ের মধ্যে থাকে মজ্জা, কোন কোন উদ্ভিদের শাখা ও কাণ্ডের অভ্যন্তরে থাকে এক রকম নরম শাঁস। এ-গুলোকে বলে মেডুলা।

মেণ্ডেল, গ্রিগর — অষ্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানী; জন্ম 1822 খৃঃ, মৃত্যু 1884 খৃঃ। অবসর সময়ে উদ্ভিদের বংশগতি সম্বন্ধে নিভৃতে সুদীর্ঘ গবেষণা; 1866 খৃষ্টাব্দে জীবের বংশানুক্রম বিষয়ে যুগান্তকারী তথ্য প্রচার; যার উপরে আধুনিক প্রজনন-বিজ্ঞান (জেনেটিক্স ↑) ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। জীবিতকালে অখ্যাত; কিন্তু মৃত্যুর পরে বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজের অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ।

মেণ্ডেলিফ — রাশিয়াবাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী, জন্ম 1834 খৃঃ, মৃত্যু 1907 খৃঃ। মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক তালিকা (পিরিয়ডিক টেব্‌ল ↑) প্রণয়ন এবং পদার্থের গুণ ও ধর্মের পৌনঃপৌনিক ক্রমপর্যায়ের সূত্র (পিরিয়ডিক-ল ↑) আবিষ্কারেই অবিস্মরণীয় কীর্তি। তৎকালীন অজ্ঞাত বিভিন্ন মৌলের গুণাগুণ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী; যার ফলে নূতন মৌলের সন্ধানে পরবর্তীকালে সহজ-সাফল্য।

মেণ্ডেলিফ টেবল — বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ মৌলিক পদার্থগুলোর

গুণ ও ধর্ম অনুসারে যে পর্যায়ক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন ; যাকে সাধারণতঃ বলে ‘পিরিয়ডিক টেবল’। (পিরিয়ডিক ল ↑)।

মেন্‌থল — জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{20}O$; সাদা, স্ফটিকাকার, তীব্র ঝাঁজ ও গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ। একে সাধারণতঃ বলে ‘পিপারমেণ্ট’ ; ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মেরিডিয়ান — (1) দ্রাঘিমা বৃত্ত ; ভৌগোলিক দূরত্ব হিসেবের জন্যে যে সব বৃত্তরেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়েছে। এ-গুলোকে ‘লাইন্‌স অব লঙ্গিটিউড’ ↑, বা ‘টেরেষ্ট্রিয়াল মেরিডিয়ান’ বলে। (2) জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যাদি নির্ধারণের জন্যে যে-সব মহাবৃত্ত রেখা ‘সেলেস্তিয়াল স্ফিয়ারের’ ↑ জেনিথ ↑ ও নাদির ↑ বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়ে গগন-মণ্ডল বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে। এদের বলে ‘সেলেস্তিয়াল মেরিডিয়ান’।
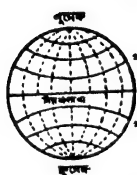
মেরিডিয়ান লাইন্‌স

মেল্টিং পয়েণ্ট — গলনাংক উষ্ণতা ; যত ডিগ্রি উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন পদার্থের গলনাংক বিভিন্ন, এবং তা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভরশীল (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑)। এজন্যে কোন পদার্থের গলনাংক বললে সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (760 মিলিমিটার) পদার্থটা ওই উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়, বুঝতে হবে ; যেমন, সালফার, বা গন্ধকের গলনাংক 112·8° সেণ্টিগ্রেড ; অর্থাৎ গন্ধক সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 112·8° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়।

মেসন — কস্‌মিক ↑ রশ্মিতে প্রাপ্ত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কণিকা। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এর অস্তিত্ব ও গুণাগুণ নিরূপিত হয়েছে। এর ভর ইলেক্ট্রন ↑ এবং প্রোটন ↑ কণিকার ভরের মাঝামাঝি। মেসন কণিকা ধন-তড়িৎবিশিষ্ট ও ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট দু’রকমেরই আছে ; এমন কি, সম্ভবতঃ তড়িৎবিহীন মেসন কণিকাও কস্‌মিক রশ্মিতে বিদ্যমান। এ-সব নৈসর্গিক কণিকার তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ ইলেক্ট্রন কণিকার সমান। কস্‌মিক বা মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে এই মেসন কণিকা মহাশূন্য থেকে অজস্র ধারায় অহঃরহ ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়ে থাকে।

মেসোজোইক — ভূতাত্ত্বিক গবেষণা মতে পৃথিবীর মধ্যযুগ ; প্রায় 25 কোটি থেকে 7 কোটি বছরের মধ্যবর্তী অতীত যুগ। 25 কোটি বছরের আগে ছিল পৃথিবীর **প্যালিওজোইক**, বা প্রাচীন যুগ। আর 7 কোটি বছর অতীত থেকে

চলছে বর্তমান **নিওজোইক,** বা নবযুগ। ভূ-স্তরের শিলার গঠন ও সংস্থান এবং বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম (ফোসিল ↑) পরীক্ষা করে এই যুগ বিভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর মেসোজোইক যুগে বিরাটাকার আদিম সরীসৃপ ও পক্ষিকুল বিচরণ করতো, অধুনা তারা বিলুপ্ত।

মেসোফাইট — বিশেষ এক উদ্ভিদ শ্রেণী; যারা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়ই জন্মায় ও বেঁচে থাকে। এদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্যে মাঝামাঝি আর্দ্রতা ও উষ্ণতা থাকা চাই। **মেসো** মানে মধ্যবর্তী বা মাঝামাঝি; যেমন, **মেসোফিল** হলো উদ্ভিদপত্রের দু'দিকের বহিস্ত্বকের মধ্যবর্তী কোমল অংশ; আবার **মেসেনকেফালন** হলো মধ্যমস্তিষ্ক (মিডল ব্রেন)।

মোজেইক — (1) সিমেণ্টের মধ্যে রঙীন প্রস্তরাদি বসিয়ে নানা চিত্রবিচিত্র যে-সব নক্সা তৈরি করা হয়।

মোজেইক

সুদৃশ্য করবার জন্যে ঘরের মেজেতে এভাবে 'মোজেইক' করা হয়ে থাকে। (2) জীবাণুর প্রভাবে অনেক সময়ে উদ্ভিদের পাতার স্থানে স্থানে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে অনেকটা মোজেইক চিত্রের মত দেখায়। উদ্ভিদের এই রোগকে **'মোজেইক ডিজিজ'** বলে। (3) টিন, পারা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও গন্ধকের এক রকম সংমিশ্রণ উত্তপ্ত করে যে রঙীন পদার্থ পাওয়া যায়। জিনিসটা দেখতে অনেকটা স্বর্ণরেণুর মত; একে বলে **মোজেইক গোল্ড।**

মোটর নার্ভ — দেহের যে স্নায়ুমণ্ডলী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মশক্তি জোগায়। আমরা কাজকর্ম করি, হাটি, চলি, এই মোটর নার্ভের কার্যকারিতার ফলে। 'সেন্সরী নার্ভ' নামে দেহে আর এক রকম স্নায়ুমণ্ডলী আছে, যা দেহে ব্যথা-বেদনা প্রভৃতির অনুভূতি জাগায়।

মোনাজাইট — এক রকম খনিজ পদার্থ; যার মধ্যে সিরিয়াম ↑, থোরিয়াম ↑ এবং বিভিন্ন রেয়ার-আর্থ ↑ ধাতু মিশ্রিত থাকে। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে হিলিয়াম ↑ গ্যাসও সংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে 'মোনাজাইট' খনিজ পাওয়া যায়।

মোমেণ্ট (অব ফোর্স) — শক্তি প্রয়োগে কোন বস্তু ঘোরালে ওই বস্তুতে যে চক্রাকার গতিশীলতা জন্মায় তার পরিমাণকে বলে ওই শক্তির (ফোর্সের) মোমেণ্ট। এভাবে ঘূর্ণনের স্থির বিন্দু (শক্তি-কেন্দ্র) থেকে গতিপথের উপর অঙ্কিত লম্ব রেখার দৈর্ঘ্যকে প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণ দিয়ে গুণ করে মোমেণ্টের

পরিমাণ স্থির করা হয়। সুতা বেঁধে 'খ' বস্তুকে 'ক' বিন্দু থেকে ঘোরালে প্রযুক্ত শক্তি যদি 'প' (পাউণ্ড) হয়, তবে ওই ফোর্সের মোমেণ্ট হবে প×কখ। যন্ত্রাদির বেয়ারিং, দরজা জানালার কব্জা প্রভৃতিতে যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তার মোমেণ্ট এভাবে স্থির করা হয়।

মোমেণ্টাম — কোন গতিশীল বস্তুর ভর (মাস ↑) এবং গতিবেগের (ভেলোসিটি ↑) গুণফল। যদি 150 গ্র্যাম ↑ ওজনের (ভরবিশিষ্ট) একটা বল প্রতি সেকেণ্ডে 100 সেণ্টিমিটার গতিতে ছোটে, তাহলে বলটার মোমেণ্টাম হবে 150×100= 15,000 সেণ্টিমিটার-গ্র্যাম-সেকেণ্ড একক। সাধারণভাবে, কোন বস্তুর ভর m এবং গতিবেগ v হলে তার মোমেণ্টাম M হবে mv।

মোল — গ্র্যাম এককে কোন পদার্থের আণবিক ওজন; অর্থাৎ কোন পদার্থের একটি অণুর সংগঠক পরমাণুগুলোর ওজনের মোট সমষ্টি গ্র্যামে ↑ প্রকাশ করলে তাকেই বলে পদার্থটার মোল, বা **গ্র্যাম মলিকিউল** ↑। আবার এক লিটার জলে এক মোল পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত করলে সেই দ্রবকে বলে **মোলার সল্যুসন**।

মোল্ড — (1) ঢালাইয়ের ছাঁচ; গলিত ধাতু যে-সব নির্দ্দিষ্ট আকারের গর্তে ঢেলে বিভিন্ন গঠনের ঢালাই জিনিস তৈরি করা হয়। (2) বিশেষ এক শ্রেণীর ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑); বাসি রুটির উপরে এই শ্রেণীর সবুজ বর্ণের ছত্রাক জন্মায়।

ম্যাক্রো — 'বৃহৎ' অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, কোন লোকের মাথা অস্বাভাবিক বড় হলে তাকে বলা হয় 'ম্যাক্রোসেফালিক'। কোন পলিমার ↑ পদার্থের সম্মিলিত বৃহদাকার অণুকে বলে 'ম্যাক্রো-মলিকিউল'। এই 'ম্যাক্রো' কথাটা হলো ক্ষুদ্রার্থবোধক **মাইক্রো** ↑ শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

ম্যাক্রোস্কোপিক — অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে খালি চোখেই যে-সব পদার্থ দেখা যায়। **মাইক্রোস্কোপিক** (আণুবীক্ষণিক) শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

ম্যাক্সওয়েল—স্কটল্যাণ্ডবাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1831 খৃঃ, মৃত্যু 1879 খৃষ্টাব্দ। গ্যাসীয় সংমিশ্রণে বিভিন্ন গ্যাসের অণুদের পারস্পরিক গতি ও অণুপ্রবেশ বিষয়ক সূত্র নির্ধারণ। তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ↑) তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর (হার্জ ↑) জন্য প্রসিদ্ধি।

ম্যাগ্মা — পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন গলিত পদার্থাদি; প্রাকৃতিক নিয়মে কালক্রমে যা থেকে গ্র্যানাইট ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন কঠিন প্রস্তর সৃষ্টি হয়েছে বলে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

ম্যাগ্‌নেট — চুম্বক ; যে বিশেষ লৌহ সাধারণ লোহাকে আকর্ষণ করে। বিভিন্ন কৌশলে আয়রন (লোহা), নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি ফেরোম্যাগ্নেটিক ↑ পদার্থের এরূপ চৌম্বক ধর্ম সৃষ্টি করা যায়। স্থায়ী চুম্বকের চারিদিকে চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। অবশ্য চুম্বক-দণ্ডের দুই প্রান্তদেশে (ম্যাগ্নেটিক পোল ↑) চৌম্বক শক্তি
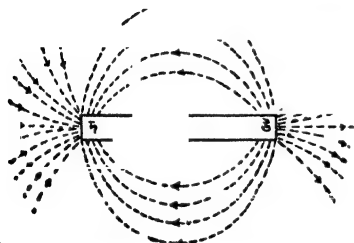
ম্যাগ্নেটিক লাইন্‌স অব ফোর্স

প্রবল থাকে। একটা চুম্বকদণ্ড সুতায় ঝুলিয়ে দিলে ওর এক প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। এজন্যে এই দুই প্রান্তকে যথাক্রমে ম্যাগ্নেটের 'নর্থ পোল' ও 'সাউথ পোল' বলে।

ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ (টেরেস্ট্রিয়াল) — ভূ গোলকের এক রকম স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তি লক্ষিত হয়; পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে প্রায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত যেন একটা বিরাট চুম্বক রয়েছে, এবং তারই প্রভাবে যেন ভূ-পৃষ্ঠে একটা শক্তিশালী 'ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড' সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর এই স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তিকে বলে টেরেষ্ট্রিয়াল (পার্থিব) ম্যাগ্নেটিজম্। একটা চুম্বক-দণ্ড সুতায় ঝুলিয়ে দিলে তার দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত ঐ পার্থিব চৌম্বকশক্তির প্রভাবে সর্বদা পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর বরাবর উত্তর ও দক্ষিণে মুখ করে থাকে। চুম্বকের এই ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগেই কম্পাস, বা 'দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র' তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক মেরু ভৌগোলিক মেরু থেকে পূর্ব-পশ্চিমে কিছু সরে আছে ; অবশ্য মোটামুটি ভাবে এদের একই ধরা হয়।

ম্যাগ্নেটিক অ্যাক্সিস — চৌম্বক অক্ষ ; কোন চুম্বকদণ্ডের দুই প্রান্তীয় কেন্দ্রের সংযোজক রেখা।

ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর সমদূরবর্তী কাল্পনিক বৃত্ত-রেখাকে বলে ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর (চুম্বকীয় নিরক্ষরেখা)। এই বৃত্ত রেখায় অবস্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ম্যাগ্নেটিক ডিপ ↑ থাকে না। পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর ও ভৌগোলিক ইকোয়েটর ↑ এক না হলেও প্রায় কাছাকাছি।

ম্যাগ্নেটিক ডিপ — পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্র ও ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান। ম্যাগ্নেটিক মেরিডিয়ানে ↑ ভূ-পৃষ্ঠের লম্ব-ক্ষেত্রে সহজে ঘুরতে পারে এমনভাবে রক্ষিত একটা চুম্বক শলাকা ভূ-পৃষ্ঠের

সমান্তরাল ক্ষেত্রের সঙ্গে যে কোণ সৃষ্টি করে তার ডিগ্রি পরিমাণকে বলে **ডিপ্ অ্যাঙ্গেল**, বা ম্যাগ্নেটিক ডিপ্। 'ডিপ্ সার্কেল' নামে এক যন্ত্র সাহায্যে ম্যাগ্নেটিক 'ডিপ অ্যাঙ্গেল' সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে।
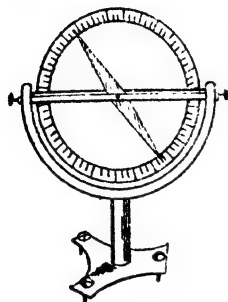
ম্যাগ্নেটিক ডিপ্-সার্কেল

ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেসন — পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরিডিয়ান ↑ ও চুম্বকীয় মেরিডিয়ানের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান; অর্থাৎ পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরু ও চুম্বকীয় উত্তর মেরুর মধ্যবর্তী কোণ। কম্পাস, বা দিগ্-দর্শন যন্ত্রের চুম্বক শলাকার অবস্থান দেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের এই 'ডেক্লিনেসন' কোণ নিরূপণ করা হয়। এরূপ কোণকে **ম্যাগ্নেটিক ভেরিয়েসন**-ও বলা হয়।

ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেসন

ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম — চুম্বক ঝটিকা; বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে পার্থিব চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্রে অনেক সময়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে, যার ফলে কম্পাস যন্ত্রের চৌম্বক শলাকা আকস্মিকভাবে দিক্ পরিবর্তন করে। একেই বলে 'ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম'। সৌর কলঙ্কের আধিক্য ও অরোরা-বোরিয়েলিসের ↑ আকস্মিক ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির সময়ে এরূপ হতে দেখা যায়।
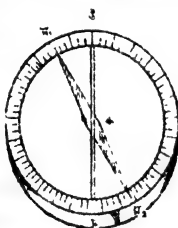
ম্যাগ্নেটাইট — চৌম্বক শক্তিবিশিষ্ট এক প্রকার খনিজ লৌহ; অত্যন্ত কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। লোহার এক রকম স্বভাবজাত অক্সাইডে, Fe_3O_4, খনিজটা গঠিত।

ম্যাগ্নেটো — তড়িৎ-উৎপাদক এক রকম ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চৌম্বক শক্তির প্রভাবে এর অভ্যন্তরস্থ তার-কুণ্ডলীতে তড়িৎ শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই তড়িৎ প্রবাহের পথে সন্নিকটবর্তী দুই প্রান্তের সামান্য ব্যবধানের (স্পার্ক গ্যাপের) মধ্যে তড়িৎ-স্ফুরণ ঘটে। ইণ্টারন্যাল কম্বাস্সন ইঞ্জিনে ↑ পেট্রলের বাষ্প এইরূপ স্পার্ক, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শেই জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনেই এরূপ ক্ষুদ্র ম্যাগ্নেটো যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগ্নেটোমিটার — এক রকম যন্ত্র, যার সাহায্যে বিভিন্ন চুম্বকের চৌম্বকশক্তির পরিমাণ, বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের চৌম্বক শক্তির তীব্রতা পরিমিত হয়ে থাকে। সাধারণ ম্যাগ্নেটোমিটারে প্রধানতঃ একটা

ক্ষুদ্র চুম্বক-দণ্ড ও একটা লম্বা ধাতব শলাকা পরস্পরের লম্বভাবে কেন্দ্র স্থলে সংবদ্ধ থাকে। শলাকাটা একটা গোলাকার স্কেলের উপরে আবর্তিত হয়ে ওর সঙ্গে সংবদ্ধ চুম্বক-দণ্ডটার আবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। বাইরের কোন চৌম্বক শক্তির প্রভাবে যন্ত্রের ওই চুম্বক-দণ্ডটার যেরূপ আবর্তন ও অবস্থান লক্ষিত হয়, তা থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ সহজেই স্থির করা যেতে পারে। এরূপ যন্ত্রকে বলে **ডিফ্লেক্সন** ম্যাগ্নেটোমিটার ; আবার আর এক রকমের **ভাইব্রেসন** ম্যাগ্নেটোমিটার যন্ত্রও আছে।

ম্যাগ্নেলিয়াম — অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের একটা সংকর ধাতু ; অত্যন্ত হাল্‌কা ও শক্ত। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও সহজে এ-দিয়ে বিভিন্ন আকারের হাল্‌কা জিনিস তৈরি করা যায়। কখন কখন এর মধ্যে কিছু তামাও মেশানো হয়ে থাকে। বিমানপোতের খোল সাধারণতঃ এই সংকর ধাতু দিয়েই তৈরি হয়ে থাকে।

ম্যাগ্নেলিয়া মেটাল — লোহা, টিন, অ্যান্টিমনি ও লেড (সীসা) ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটা সংকর ধাতু। এ-দিয়ে সাধারণতঃ যন্ত্রাদির বেয়ারিং তৈরি হয়। এর মধ্যে সীসার ভাগই থাকে বেশি।

ম্যাগ্নেসিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন Mg ; পারমাণবিক ওজন 24·32, পারমাণবিক সংখ্যা 12 ; বিশেষ হাল্‌কা ও রূপোর মত সাদা ধাতু। বায়ুর সংস্পর্শে এর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়, ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইডের আবরণ পড়ে। জ্বালালে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে, ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড, MgO, জন্মায়। এই তীব্র আলোর সাহায্যে রাত্রিকালে ফটোগ্রাফির ↑ কাজ হয়। ম্যাগ্নেসাইট ($MgCO_3$,), ডোলোমাইট ($MgCO_3 . CaCO_3$), কার্ণালাইট ($KCl . MgCl_2 . 6H_2O$), প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। ম্যাগ্নেলিয়াম ↑ প্রভৃতি হাল্‌কা সংকর-ধাতু,আগুনে-বোমা প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ কখন কখন ঔষধরূপেও (ম্যাগ্‌-সাল্‌ফ ↑) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্‌ফেট — সংক্ষেপে যাকে বলে ম্যাগ্‌-সাল্‌ফ, $MgSO_4$; বিরেচক পদার্থ, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যৌগিকটা 'ইপ্‌সম সল্ট' ↑ নামেও পরিচিত।

ম্যাগ্নেসিয়া — ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড MgO ; ঔষধ হিসেবে যে 'ম্যাগ্নেসিয়া-অ্যাল্‌বা' ব্যবহৃত হয়, তা হলো 'বেসিক ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট' সল্ট ; যাকে সংক্ষেপে বলে 'ম্যাগ্‌-কার্ব'।

আর ম্যাগ্নেসিয়াম বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবকে সাধারণতঃ বলা হয় 'ফ্লুইড ম্যাগ্নেসিয়া'।

ম্যাগ্নেসাইট — খনিজ অবিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট, $MgCO_3$; এই খনিজ থেকেই সাধারণতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট, বা **ম্যাগকার্ব** অত্যন্ত হাল্‌কা সাদা চূর্ণ পদার্থ; যা টুথ-পাউডার তৈরি করতে ও কোন কোন ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাট্রিক্স — ঢালাইয়ের ছাঁচের মত যে স্থানে, বা যে জিনিসের উপরে চেপে অথবা ঢেলে দিয়ে নির্দিষ্ট আকারের বহুসংখ্যক অনুকল্প জিনিস তৈরি করা যায়, যেমন—ছাপার টাইপের, বা ব্লকের 'ম্যাট্রিক্স' ছাঁচে ঢেলে সহজে বহু সংখ্যক অনুরূপ টাইপ, বা ব্লক করা হয়। কথাটার বহুবচনে **ম্যাট্রিসেস**।

ম্যানোমিটার — যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাসীয় পদার্থের চাপ নির্ধারণ করা যায়। আবদ্ধ স্থানে স্বল্প-পরিমাণ গ্যাসের অবস্থিতিজনিত নিম্ন-চাপ মাপবার জন্যেই সাধারণতঃ এরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
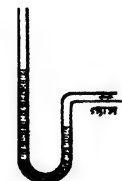
ম্যানোমিটার

উচ্চ চাপ পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রকে বলে **প্রেসার গেজ**। প্রদত্ত চিত্র থেকে ম্যানোমিটারের মোটা-মুটি গঠন জানা যাবে।

ম্যাঙ্গানিজ — মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Mn; ধাতুটার পারমাণবিক ওজন 54·93; পারমাণবিক সংখ্যা 25; লাল্‌চে সাদা সুকঠিন ধাতু, কিন্তু ভঙ্গুর। পাইরোলুসাইট ↑ নামক একটা খনিজ (ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড MnO_2) থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংকর ধাতু, বিশেষতঃ ইস্পাত তৈরি করতে এর যথেষ্ট দরকার হয়। প্রায় 13% ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাত (ম্যাঙ্গানিজ-স্টিল ↑) অত্যন্ত কঠিন হয়, এবং তা সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। বিভিন্ন অনুপাতে কপার, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে 'ম্যাঙ্গানিজ ব্রোঞ্জ' ↑ নামক সংকরধাতু তৈরি হয়ে থাকে।

ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড — ভারী কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থ, MnO_2; একে ম্যাঙ্গানিজ পারঅক্সাইড-ও বলা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় 'অক্সি-ডাইজিং এজেন্ট' ও ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে যৌগিকটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচ-শিল্পে, লেক্‌ল্যান্স সেল ↑ প্রভৃতিতে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

ম্যাঙ্গানিজ-স্টিল — বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন স্টিল ↑; এই স্টিলে লোহার সঙ্গে অনধিক 13% ম্যাঙ্গানিজ মেশানো হয়ে থাকে।

ম্যাঙ্গানিন — ম্যাঙ্গানিজ সংযুক্ত এক প্রকার সংকর ধাতু। এতে সাধারণতঃ থাকে 83% তামা, 13% ম্যাঙ্গানিজ, 4% নিকেল। এর তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা উত্তাপে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না; এজন্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বিশেষ বিশেষ তার-কুণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাঙ্গানেট — ম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের (H_2MnO_4) সল্ট↑; যেমন, সোডিয়াম ম্যাঙ্গানেট, Na_2MnO_4; সবুজ বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ, জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার পারম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের ($HMnO_4$) সব সল্টকে বলা হয় **পারম্যাঙ্গানেট**; যেমন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট↑, $KMnO_4$; গাঢ় লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়; পদার্থটা সচরাচর জীবাণুনাশক ও প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যামিলা — বক্ষ-স্তনের বোঁটা। **ম্যামেলিয়া** মানে স্তন্যপায়ী প্রাণী; সাধারণতঃ উষ্ণরক্ত ও রোমশ প্রাণীরা স্তন্যদায়ী এবং স্তন্যপায়ী হয়ে থাকে।

ম্যালাকাইট — উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের খনিজ প্রস্তর বিশেষ; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো 'বেসিক কপার কার্বনেট', $CuCO_3$, $Cu(OH)_2$; এই খনিজ প্রস্তর থেকেই সাধারণতঃ তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। রঙীন পাথর হিসেবে সস্তা অলঙ্কারাদিতেও এর ব্যবহার আছে।

ম্যালিক অ্যাসিড — এক প্রকার জৈব অ্যাসিড; সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে এটা হলো হাইড্রক্সি-সাক্সিনিক অ্যাসিড, $COOH.CH_2.CH(OH).COOH$; কাঁচা আপেল ও অন্যান্য ফল থেকে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়।

..ম্যালেসিয়া—কোমলায়ন, ; 'নরম হওয়া' অর্থে কথাটা ব্যবহৃত হয়; যেমন, **অষ্টিয়োম্যালেসিয়া** মানে অস্থির নমনীয়তা, বা হাড়ের অস্বাভাবিক কোমলতা-জনিত রোগ বিশেষ। শৈশবে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন↑ ও সূর্যকিরণের অভাবে হাড়ে যথোপযুক্তভাবে ক্যালসিয়ামের↑ অভাব ঘটলে এ-রোগ হয়ে থাকে।

ম্যাষ্টিক — (1) বার্নিশ তৈরি করতে যে বিশেষ এক শ্রেণীর রজন (রেজিন↑) ব্যবহৃত হয়। (2) জল চোঁয়ানো রোধ করবার জন্যে বাড়ীর ছাদ বা জলাধারের সংযোগে যে-সব নরম পদার্থ লাগানো হয়; যেমন—বিটুমেন↑ জাতীয় পদার্থ; অথবা ইটের গুঁড়া, লেড অক্সাইড ও তিসির তেলের (লিন্‌সিড অয়েল) আঠালো মিশ্রণ।

রক কৃষ্ট্যাল — স্ফটিকাকার বিশুদ্ধ সিলিকা↑, অর্থাৎ সিলিকন ডাই-

অক্সাইড, SiO_2 ; স্বভাবজাত এক প্রকার স্ফটিকাকার বালুকা বিশেষ।

রক সল্ট — স্ফটিকাকার খাদ্য-লবণ ; খনিজ সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl ; যাকে বলে 'সৈন্ধব লবণ'।

রকেট — রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাসের নিম্নমুখী চাপের প্রভাবে যে আধার দুরন্ত বেগে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শেষে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হতেও পারে ; 'হাউই' জাতীয় জিনিস। বিভিন্ন গঠন ও আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর রকেট ইদানিং তৈরি হয়েছে। অস্ত্র হিসেবে গত মহাযুদ্ধে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। **'ভি-2 রকেট'** হলো অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটা লম্বা খোল ; খোলটার অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক আধারে তরল অক্সিজেন ↑ অ্যালকোহল ↑ ও অন্যান্য হাল্‌কা জ্বালানি পদার্থ ভরতি করা হয়।

সাধারণ রকেটের গঠন
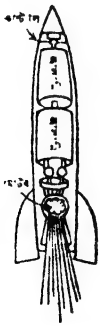
ওই সব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত ধূম ও গ্যাস রকেটের পশ্চাভাগ থেকে সবেগে নিক্রান্ত হয় ; আর এই প্রচণ্ড পশ্চাৎচাপের ফলে রকেটটা সম্মুখ-গতি লাভ করে এবং সবেগে উপরে উঠে উপযুক্ত ব্যবস্থায় বহু দূরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ ভি$_2$ শ্রেণীর রকেট প্রায় 70 মাইল উপরে উঠে মোটামুটি 200 মাইল দূরে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হতে পারে। আজকাল বহু উন্নত ধরণের দুরন্ত শক্তিশালী রকেট সব উদ্ভাবিত হয়েছে (স্পুট-নিক ↑)। রকেটের গতি অনেকটা জেট ↑ বিমানের অনুরূপ ; কিন্তু জেটের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যে খোলের সামনের ছিদ্র পথে বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে ; কিন্তু রকেটের সেরূপ দরকার হয় না। রকেটের জ্বালানির দহন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে' তা বায়ুশূন্য ঊর্ধ্বাকাশেও উঠতে পারে ; কিন্তু গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যে জেট-প্লেন বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

রঙ্গ্যালাইট — সোডিয়াম সাল্‌-ফোক্সিলেট ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ↑ সংযোগে গঠিত একটি রাসায়নিক যৌগিক, $NaHSO_2.HCHO$; বিশেষতঃ রঞ্জন-শিল্পে বিজারক পদার্থ (রিডিউসিং এজেন্ট ↑) হিসাবে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রন্‌টগেন, উইলহেল্‌ম কোন্‌র্যাড — জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1845 খৃঃ, মৃত্যু 1923 খৃঃ। এক্স-রশ্মি ↑ অর্থাৎ 'রন্‌টগেন-রে' ↑ আবিষ্কারে (1895 খৃঃ) প্রসিদ্ধি। সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ এই অভাবনীয় আবি-ষ্কারের জন্যে চিরস্মরণীয়, এবং 1901 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

রনট্‌গেন-রে — এক্স-রে ↑ ; যাকে বাংলায় বলে 'রঞ্জেন রশ্মি'। এই অদৃশ্য আলোকরশ্মি মাংসপেশী ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি ও অস্থি-পঞ্জরের ছায়াপাত করে থাকে। আভ্যন্তরীণ রোগ নির্ণয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই শক্তিশালী অদৃশ্য রশ্মির অবদান অপরিসীম। আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী রনট্‌গেনের নামানুসারে রশ্মিটা খ্যাত।

রমন, স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট — ভারতীয় (মাদ্রাজী) পদার্থবিজ্ঞানী জন্ম 1888 খৃঃ, অদ্যাপি (1961 খৃঃ) জীবিত। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। কয়েক বছর সরকারী চাকুরীর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপক' ; বিশেষতঃ আলোক-বিজ্ঞানে ও শব্দবিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেসন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে আলোক-বিজ্ঞানে 'রমন এফেক্ট' ↑ নামে এক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার। এফ. আর. এস সম্মান, 1914 খৃঃ ; 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত 1929 খৃঃ। 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ 1930 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ। অতঃপর ব্যাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করেন। ভারত সরকারের 'জাতীয় অধ্যাপক' সম্মান লাভ। বর্তমানে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'রমন ইনষ্টিটিউট' নামক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মৌলিক গবেষণায় নিরত।

রমন এফেক্ট — কোন মনোক্রোমেটিক ↑ (একবর্ণী) আলোক-রশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের (তরল বা গ্যাসীয়) মাধ্যমে পরিচালিত করলে ওই আলোক-রশ্মির কতকাংশ আলোকের গতিপথের লম্ব-দিকে বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালি (স্পেক্ট্রাম ↑) পরীক্ষা করলে মূল আলোকরশ্মির বর্ণরেখার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কয়েকটা বর্ণরেখা দেখা যায়। এই নবাবিষ্কৃত রেখাগুলোর নামকরণ হয়েছে **রমন-লাইন্‌স**। মাধ্যমের তরল বা গ্যাসীয় অণুগুলোর গায়ে প্রতিহত হয়ে ওই আলোক-তরঙ্গের কতকাংশ পাশের দিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং এর ফলেই ওই নূতন রেখাগুলোর উদ্ভব ঘটে। একবর্ণী আলোকের এই ধর্মকে বলে 'রমন-এফেক্ট'। এই তথ্য আবিষ্কারের মৌলিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্রথম একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী 1930 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের আণবিক কম্পন-শক্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

রম্বাস — যে জ্যামিতিক সামান্তরিক চতুর্ভুজের বাহুগুলো সব পরস্পর সমান, কিন্তু কোন কোণই সমকোণ

নয়; অর্থাৎ বিষমকোণী-সমবাহু সামা-ন্তরিক চতুর্ভুজ। এরূপ চতুর্ভুজের বাহুগুলোও অসমান হলে তাকে বলে **রম্বয়েড**, বিষম-সামান্তরিক।

রস, স্যার রোনাল্ড — বৃটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, জন্ম 1857 খৃঃ, মৃত্যু 1932 খৃঃ। কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ; ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কারণ অনুসন্ধানে সুদীর্ঘ গবেষণা। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী (বর্তমানে কার্ণানি) হাসপাতালের পরীক্ষাগারে ম্যালেরিয়ার বাহক অ্যানোফিলিস ↑ মশকের অন্ত্রে প্লাস্-মোডিয়াম ↑ নামক একটি বিশেষ জীবাণু আবিষ্কার। এভাবে ম্যালে-রিয়া সংক্রমণের বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ধারণ; এই তথ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে 1902 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

রাদারফোর্ড, লর্ড — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী; নিউজিল্যাণ্ডে জন্ম 1871 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1937 খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস ↑ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। পরমাণুর সংগঠনে নিউট্রন ↑ কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী — পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা এবং পরমাণুর বিভাজন (ফিসন ↑) সম্পর্কীয় গবেষণার ভিত্তি স্থাপন। পদার্থের মৌলিক গঠন সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির আবিষ্কারে বিপুল খ্যাতি; 1908 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

রাবার — এক রকম স্থিতিস্থাপক (ইল্যাস্টিক ↑) কঠিন জৈব পদার্থ; বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের সাদা রস (ল্যাটেক্স ↑) ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক হিসেবে কাঁচা রাবার হলো হাইড্রোকার্বনের ↑ এক রকম পলিমার ↑ পদার্থ; যাকে **পলি-আইসোপ্রিন** বলা হয়। কাঁচা রাবারের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাবার তৈরি হয়ে থাকে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ রাবারের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট রা বা র (ভ্যা ল্ ক্যা না ই জ্ ড রাবার ↑) তৈরি হয়ে থাকে। রাসায়-নিক পদ্ধতিতে এক রকম কৃত্রিম রাবার তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে।

রামানুজ — স্বাভাবিক প্রতিভাবান ভারতীয় গ ণি ত জ্ঞ। মা দ্রা জী ব্রাহ্মণ; জন্ম 1887 খৃঃ, মৃত্যু 1920 খৃঃ। উচ্চশিক্ষা ব্যতিরেকেই বিশ্ব-বিশ্রুত গণিতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, (এফ. আর. এস)। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহূত হয়ে যোগদান; অসুস্থ অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং মাত্র 33 বছর বয়সে মৃত্যু।

রাস্ট — মরিচা; লোহার এক রকম জলযুক্ত অক্সাইড ($Fe_2O_3.H_2O$); খোলা জল হাওয়ায় বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে লোহার

উপরে এই অক্সাইড, বা মরিচা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রাস্ট ফাঙ্গি — এক শ্রেণীর পরগাছা ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) বিশেষ ; গম, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় এদের আক্রমণে (লোহার মরিচার মত) লাল দাগ ধরে।

রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র — খ্যাতনামা বাঙ্গালী রাসায়নিক ; জন্ম 1861 খৃঃ, মৃত্যু 1944 খৃঃ। কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে (রসায়ন-সহ) বি.এ ; গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ এবং বিলাত গমন। রসায়নে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা ও মৌলিক গবেষণা। রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য আবিষ্কার ; আন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন। প্রাচীন হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে (1916 খৃঃ) প্রধান উদ্যোক্তা এবং এদেশে রাসায়নিক গবেষণার ভিত্তিস্থাপন। ভারতে মৌলিক রসায়ন-শিল্পের সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস' স্থাপন 1893 খৃঃ। অকৃতদার, ঋষিকল্প, দেশহিতব্রতী, বিজ্ঞান সাধক। দেশকল্যাণ ও শিক্ষাবিস্তারে বিপুল অর্থ দান।

রিঅ্যাক্‌সন (কেমিক্যাল) — রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বিশেষ নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক সংযোগে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় ; যেমন— এক ভাগ অক্সিজেন ↑ ও দুই ভাগ হাইড্রোজেন ↑ গ্যাসের কেমিক্যাল রিঅ্যাক্‌সনের (রাসায়নিক বিক্রিয়ার) ফলে যৌগিক পদার্থ, জল (H_2O) উৎপন্ন হয়।

রি-ইন্‌ফোর্সড কংক্রিট — ভিতরে লোহার রড বা জালি দিয়ে সুদৃঢ়ভাবে জমানো সিমেন্টের ↑ গাঁথুনি। রি-ইন্‌ফোর্সড মানে অধিকতর কঠিন বা সুদৃঢ়ীকৃত। (ফেরো কংক্রিট ↑)

রিকেট — দেহের হাড় নরম ও অপুষ্ট থাকার রোগ বিশেষ। খাদ্যে ভিটামিন-ডি ↑ উপযুক্ত পরিমাণে না পেলে শিশুদেরই সাধারণতঃ এ-রোগ হয়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে দেহের হাড় বেঁকে যায়। দুধ, মাখন, মাছের তেল প্রভৃতিতে ভিটামিন-ডি ↑ থাকে। আবার সূর্য-কিরণের প্রভাবেও দেহে আপনা থেকেই এই ভিটামিন ↑ জন্মায়। ভিটামিন-ডি ব্যতিরেকে দেহযন্ত্র খাদ্যের ক্যালসিয়াম ↑ উপাদান আত্মসাৎ করতে পারে না ; যার ফলে হাড় নরম ও অপুষ্ট থেকে যায়।

রিকেট্‌সিয়া — বিশেষ এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু ; আকারে এ-গুলো ব্যাক্টেরিয়ার ↑ চেয়েও ছোট ; কিন্তু ভাইরাসের ↑ চেয়ে

কিছু বড়। এদের আক্রমণে টাইফাস প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

রিগর মর্টিস — মৃত্যুর পরে দেহের কঠিনাবস্থা। 'রিগর' মানে কাঠিন্য; সহজে বাঁকানো-নোয়ানো যায় না এমন অবস্থা।

রিজোন্যান্স—বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের প্রভাবন-ধর্ম; যেমন, কোন শব্দ-তরঙ্গ যদি কোন বস্তুর উপরে পড়ে, আর যদি সেই শব্দ-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি এবং বস্তুটার নিজস্ব কম্পনের ফ্রিকেয়োন্সি ↑ যদি একই হয়, তাহলেঐতরঙ্গের প্রভাবে বস্তুটাতেও অনুরূপ কম্পন জাগবে এবং শব্দ উত্থিত হবে। সম-সুরে বাঁধা দুটো সেতারের একটা বাজালে নিকটবর্তী অপরটা থেকেও শব্দ ঝংকৃত হয়; একে বলে শব্দ-তরঙ্গের 'রিসোন্যান্স', বাংলায় বলা যায় শব্দের অনুরণন। আলোক ও তড়িত্তরঙ্গেরও অনুরূপ প্রভাবন-ধর্ম (রিজোন্যান্স) আছে।

রিডাক্সন — বিজারণ পদ্ধতি; কোন রা সা য় নি ক পদার্থ থেকে সাধারণতঃ অক্সিজেন দূরীকরণ, বা তাতে হাইড্রোজেন সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া; যেমন — টিন-অক্সাইডের সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে ধাতব টিন পাওয়া যায়; এখানে কার্বন টিন-অক্সাইডকে 'রিডিউসড' অর্থাৎ বিজারিত করে, এবং নিজে অক্সিডাইজ্‌ড ↑ হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে কার্বন হলো 'রিডিউসিং এজেন্ট' ↑ অর্থাৎ বিজারক পদার্থ। এভাবে দেখা যায়, রিডাক্সনের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিডেসন প্রক্রিয়াও ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রিডাক্সন প্রক্রিয়া হলো অক্সিডেসন প্রক্রিয়ার বিপরীত। আবার যৌগিক পদার্থের সংগঠক-ধাতুর ভ্যালান্সি ↑ কমিয়েও 'রিডাক্সন' ঘটানো যায়, যেমন ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) রিডিউস্‌ড হয়ে ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) উৎপন্ন হয়।

রিডিউসিং এজেন্ট — বিজারক পদার্থ; যে-সব পদার্থ অপর কোন পদার্থের রিডাক্সন ↑ ঘটায় তাকে বলে 'রিডিউসিংএজেন্ট', বা বিজারক; যেমন, হাইড্রোজেনের মধ্যে কপার অক্সাইড, CuO, উত্তপ্ত করলে রিডাক্সনের ফলে ধাতব কপার (তামা) পাওয়া যায়। এখানে হাইড্রোজেন হলো কপার-অক্সাইডের 'রিডিউসিং এজেন্ট'।

রিফ — সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণী। খনিগর্ভে খনিজ পদার্থের স্তরগুলিকেও 'রিফ' বলে।

রি ফ্র্যা ক্ স ন (অব লাইট) — আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ; এক মাধ্যম থেকে আলোক-রশ্মি অপর কোন মাধ্যমের ভিতর পরিচালিত হলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। একে বলে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ, বা রিফ্র্যাক্সন; যেমন— বায়ু থেকে কোন আলোক-রশ্মি

জলের মধ্যে (বা, জল থেকে বাইরের বায়ুতে) প্রবেশ করলে ওই রশ্মির গতিপথ একটি নির্দিষ্ট কোণে বেঁকে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমের সাধারণ তলের যে বিন্দুতে আলোক-রশ্মি আপতিত হয় সেই বিন্দুতে
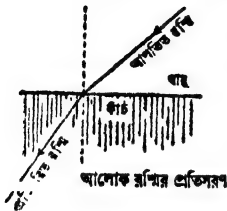
আলোক রশ্মির প্রতিসরণ

ওই তলের উপর অঙ্কিত লম্ব-রেখাকে বলে **নর্ম্যাল** ; এই নর্ম্যালের সঙ্গে আপতিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বলে **অ্যাঙ্গেল-অব-ইন্সিডেন্স**, বা 'আপতন কোণ' ; আর প্রতিসরিত রশ্মি (রিফ্রাক্টেড রে) ওই লম্বের অপর পার্শ্বে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে বলে **অ্যাঙ্গেল-অব-রিফ্রাক্‌সন**, অথবা 'প্রতিসরণ কোণ'। আলোক-রশ্মি বায়ু, অথবা অপর কোন হাল্‌কা মাধ্যমের ভিতর দিয়ে জল, কাঁচ প্রভৃতি ঘনতর স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতরে প্রবেশ করলে তার অ্যাঙ্গেল-অব-ইন্সিডেন্স অপেক্ষা অ্যাঙ্গেল অব-রিফ্রাক্‌সন ক্ষুদ্রতর হয়, অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি নর্ম্যালের দিকে বেঁকে যায়। আবার কোন রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হাল্‌কা মাধ্যমে প্রবেশ করলে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। কোন বস্তুতে এরূপ প্রতিসরিত রশ্মি কতকটা বেঁকবে তা ওই বস্তুর প্রতিসরণ-ক্ষমতা, বা **'রিফ্রাক্টিভ ইণ্ডেক্স'**-এর উপর সর্বদা নির্ভর করে। আলোক-রশ্মির এরূপ প্রতিসরণের ফলে জলের তলায় কোন জিনিস অপেক্ষাকৃত উপরে দেখায়, অর্থাৎ জলের গভীরতা কম বলে মনে হয়।

রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল — দুই সমকোণের (180°) চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু চারি সমকোণের (360°) চেয়ে ক্ষুদ্রতর জ্যামিতিক কোণ। বাংলায় বলে প্রবৃদ্ধ কোণ।

রিফ্লেক্‌সন (অব লাইট)—আলোক-রশ্মির প্রতিফলন ; কোন কোন মসৃণ জিনিসের উপরিভাগে আলোক-রশ্মি পড়লে ওই রশ্মি ভিন্ন পথে ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতিফলিত হয় ; একে বলা হয় আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন, বা রিফ্লেক্‌সন। প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির গতিপথের এরূপ পরিবর্তন নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ঘটে থাকে। প্রতিফলক তলের যে বিন্দুতে আলোক-রশ্মি আপতিত হয়, সেই বিন্দু থেকে ওই তলের উপর অঙ্কিত লম্ব-

আলোক-রশ্মির প্রতিফলন
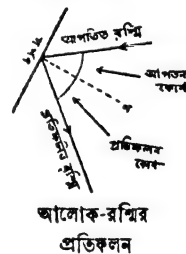
রেখাকে **নর্ম্যাল** বলে। আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি ওই নর্ম্যালের

সঙ্গে একই সমতলে উভয় দিকে সমান কোণ উৎপন্ন করে; অর্থাৎ আলোক-রশ্মি যতটা বেঁকে প্রতিফলক তলের উপর পড়ে, ততটা বেঁকেই আবার প্রতিফলিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, আলোকরশ্মির 'আপতন-কোণ' সর্বদা 'প্রতিফলন কোণের' সমান হয়। আপতিত রশ্মি ও নর্ম্যালের মধ্যস্থ কোণকে বলে **অ্যাঙ্গেল অব ইন্সিডেন্স** (আপতন-কোণ) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ও নর্ম্যালের মধ্যস্থ কোণকে বলা হয় **অ্যাঙ্গেল অব রিফ্লেক্সন** (প্রতিফলন কোণ)।

রিফ্লেক্স ক্যামেরা — বিশেষ এক রকম ফটোগ্রাফিক ↑ যন্ত্র বিশেষ, বা ক্যামেরা ↑। এরূপ ক্যামেরায় যে ছবি তুলতে হবে যন্ত্রচালক তা পূর্বাহ্নেই যন্ত্রের মধ্যে দেখে নিতে পারে। এর অ্যাপারচারের সংলগ্ন লেন্সের ↑ মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি এসে যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ একখানা দর্পণে প্রতি-ফলিত হয়। উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে আগত রশ্মি এভাবে প্রতিফলিত হয়ে একখানা কাঁচের উপর বস্তুটার প্রতিচ্ছায়া ফেলে। যন্ত্রচালক বস্তুটার ওই প্রতিচ্ছায়া পূর্বাহ্নে যন্ত্রমধ্যে দেখে নিয়ে উপযুক্ত সময়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দর্পণখানা উপরে তুলে দিতে পারে ; সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটা থেকে আগত আলোক-রশ্মি সোজা গিয়ে ফিল্ম বা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পড়ে ছবি উঠে যায়।

রিফ্রিজারেটর — যে-যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগের তাপ সবিশেষ হ্রাস করে প্রয়োজনীয় নিম্ন-উষ্ণতায় মোটামুটি স্থির রাখা যায়। একে যান্ত্রিক শীতল-কক্ষ বলা যেতে পারে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় নষ্ট হয়ে যায় এমন, বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য, ঔষধাদি এর শীতল-কক্ষে রেখে দীর্ঘ দিন অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়ে থাকে। এর যান্ত্রিক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক তথ্য হলো মোটামুটি এরূপ : কোন তরল পদার্থ বাষ্পীভবনের ফলে সন্নিহিত মাধ্যমের তাপ শোষণ করে ; যেমন, গায়ের জল হাওয়ায় বাষ্পীভূত হতে থাকলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। রিফ্রি-জারেটর যন্ত্রে এরূপ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ তাপ বিশেষ কৌশলে হ্রাস করবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এরূপ যন্ত্রের জন্যে অত্যধিক চাপ প্রয়োগে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড (SO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3) প্রভৃতি গ্যাস জমিয়ে তরল করা হয়; কৌশলে বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে ওই তরল গ্যাসকে ঠাণ্ডা রাখবার ব্যবস্থা থাকে। তারপর চাপ কমিয়ে দিলে এই তরল পদার্থ ধীরে ধীরে গ্যাসীভূত হতে থাকে ; ফলে, যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগের উষ্ণতাও ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এই গ্যাসকে পুনরায় চাপ দিয়ে তরল করা হয় ; আবার গ্যাসীভূত হয়।

এরূপ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে ; ফলে যন্ত্রের মধ্যস্থ বায়ু ক্রমে অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। অবশ্য আরও নানারমম ব্যবস্থার রিফ্রিজা-রেটর যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছে। থার্মো-স্টাট্ ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ শীতল-কক্ষের উষ্ণতা স্থির রাখবার ব্যবস্থাও করা যায়।

রিভার্বারেসন—শব্দের মূর্চ্ছনা ; বড় হল-ঘরে শব্দ করলে সেই শব্দতরঙ্গ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ চলাচল করে ; শব্দের রেশ থাকে, সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় না। এই হলো শব্দতরঙ্গের রি.ন.। অবশ্য এটা শব্দের পর্যায়-ক্রমিক প্রতিধ্বনির ফল মাত্র।

রিভার্বেরেটরি ফার্নেস — বিশেষ ধরণের এক রকম ফার্নেস বা চুল্লী ; যার অগ্নিশিখা উত্তপ্ত পদার্থের গায়ে সরাসরি লাগে না। চুল্লীর আবদ্ধ তাপ-প্রবাহের ফলে নিম্নবর্তী পৃথক
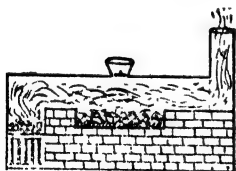
রিভার্বেরেটরি ফার্নেস (নক্সা)

কোন পাত্রের মধ্যে রক্ষিত পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে যায়। বিভিন্ন খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে সচ-রাচর এরূপ ফার্নেস ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; বিশেষতঃ যে স্থলে খনিজের সঙ্গে জ্বালানি পদার্থের সংমিশ্রণ বা সংযোগ ঘটা ধাতুটার বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় নয়।

রিয়েলগার — আর্সেনিক ডাইসাল-ফাইড (As_2S_2) নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। লাল রং-এর খনিজ পদার্থ বিশেষ। বাংলায় একে বলে মনঃশিলা বা মোমছাল।

রিলে (ইলেকট্রিক্যাল) — এক রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর কৌশলটা হলো এই যে, এক সার্কিটে ↑ প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোত অপর কোন সার্কি-টের তড়িৎ-প্রবাহকে প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। প্রথম সার্কি-টের স্বল্প বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে দ্বিতীয় সার্কিটে অপেক্ষাকৃত শক্তি-শালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ ইচ্ছানুযায়ী প্রবিষ্ট ও নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়ে থাকে। দূরাগত স্তিমিত রেডিও ↑ (বেতার)-তরঙ্গের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নে-টিক ওয়েভ ↑) তড়িৎ-প্রবাহকে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে অধিকতর শক্তি-শালী করে তোলা যায়।

রিলেটিভিটি (থিয়োরি অব) — আপেক্ষিকতা বাদ। পদার্থবিজ্ঞানে 'আপেক্ষিকতা' সম্পর্কীয় আইন্-স্টাইনের ↑ প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ মূলতঃ দুটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ; প্রথমতঃ, কোন বস্তুর গতি কখন অন্য নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয় ; দ্বিতীয়তঃ, স্থান ও কাল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ আপেক্ষিক ; ওর

একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কোন বস্তুর গতি অপর কোন স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হতে পারে মাত্র। কিন্তু বিশ্ব চরাচরে কোন বস্তুই স্থির নেই ; —পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সবই মহা-শূন্যে গতিশীল। সুতরাং পদার্থের অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাজেই সব রকম গতিই আপেক্ষিক। এভাবে আবার স্থান এবং কালও পরস্পর আপেক্ষিক ; যেহেতু মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান বস্তুর অবস্থান অনুযায়ী সময় এবং সময় অনুযায়ী অবস্থান হতে বাধ্য। এই মতবাদের বিস্তৃত যুক্তিতে জ্যোতি-র্বিদ্যার বিভিন্ন অভিনব তথ্য উদ্-ঘাটিত হয়েছে ; পদার্থের পার-মাণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় বিবিধ সত্য প্রমাণিত হয়েছে ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল গঠন-বৈচিত্র্য একই নিয়মে গ্রথিত হয়েছে। বহু জটিল যুক্তি ও গাণিতিক সমাধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ বাস্তব পরীক্ষাদিতেও নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

রিলেটিভ ভেলোসিটি — ভেলো-সিটি (রিলেটিভ) ↑ ।

রুজ — লোহার বিশুদ্ধ চূর্ণাকার মরিচা ; বিশুদ্ধ আয়রন অক্সাইডের (Fe_2O_3) গুঁড়া। লাল রঙের এই সূক্ষ্ম ও সুকঠিন দানাযুক্ত চূর্ণ দিয়ে ঘসে অনেক সময় বিভিন্ন ধাতব পদার্থ পালিশ করা হয়।

রুট — উদ্ভিদের মূল, বা শিকড়। আবার, গণিতে বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি ; যেমন—'স্কোয়ার রুট' অব 16 হলো $\sqrt{16}=4$, অথবা -4 ; আবার 'কিউব রুট' হলো ঘনমূল ; যেমন, $\sqrt[3]{27}=3$.

রুড — আয়তনের একটা ইংলণ্ডীয় পরিমাপ, $=\frac{1}{4}$একর ↑ ; 1,210 বর্গ গজ।

রিয়েল ইমেজ — প্রকৃত প্রতিচ্ছায়া ; বক্রতল দর্পণ বা লেন্সে ↑ প্রতি-ফলিত প্রতিচ্ছবি ; যা নিয়ে কোন পর্দার উপরে ফেলা যায়, সিনেমা-ছবিতে যেমন হয়। সাধারণ দর্পণে আমরা দেখি বস্তুর **ভার্চুয়াল ইমেজ,** ↑ অর্থাৎ অপ্রকৃত প্রতি-চ্ছায়া, বা প্রতিবিম্ব ; যাকে পর্দার উপরে প্রতিফলিত করা যায় না। (ইমেজ ↑)।

রুথেনিয়াম — মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Ru, পারমাণবিক ওজন 101·7, পারমাণবিক সংখ্যা 44 ; অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। ধাতুটা অত্যধিক তাপসহ ; এর গলনাংক 2450° সেন্টিগ্রেড। কোন কোন খনিজ পদার্থে প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

রুবি — উজ্জ্বল লাল রঙের এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়-নিক হিসেবে এর প্রধান উপাদান

হলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3, (কোরাণ্ডাম ↑)। স্বভাবতঃই এর সঙ্গে সামান্য ক্রোমিয়াম ↑ মিশ্রিত থাকায় পদার্থটা উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

রুবিডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Rb, পারমাণবিক ওজন 85·48; পারমাণবিক সংখ্যা 37; সোডিয়ামের ↑ মত সাদা ও নরম ধাতু। সোডিয়ামের মত এরও রাসায়নিক সংযোগের শক্তি যথেষ্ট প্রবল,—সহজেই অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলন ঘটে থাকে।

রুমার, রেনি. ডি — ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী, জন্ম 1683 খৃস্টাব্দে, মৃত্যু 1757 খৃস্টাব্দে। বিশেষ ধরণের ডিগ্রি-একক নিয়ে এক তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবন; যাতে জলের হিমাংক 0° ডিগ্রি এবং স্ফুটনাংক 80° ডিগ্রি ধরা হয়েছে। এরূপ পরিমাপের, বা স্কেলের তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবকের নামানুসারে 'রুমার থার্মোমিটার' নামে পরিচিত।

রুমেন—গরু, ছাগল প্রভৃতি রোমন্থক প্রাণীর প্রথম পাকস্থলী; যেখান থেকে এরা ভক্ষিত খাদ্য পুনরায় মুখে আনতে পারে। এদের পাকস্থলীর চারটি অংশ; শেষ বা চতুর্থ অংশকে বলে **অ্যাবোমেসাম,** যেখানে ভুক্তখাদ্যের প্রকৃত পরিপাকক্রিয়া চলে। রোমন্থনের সুবিধার জন্যে পাকস্থলীর এই 'রুমেন' অংশ আছে বলে এসব প্রাণীদের বলে **রুমিন্যাণ্ট।**

রুম্যাটিজ্‌ম—গেঁটে-বাত রোগ; যে রোগে অস্থি-সংযোগ ও মাংসপেশী ফুলে ব্যথা-বেদনা হয়। এ-রোগে সাধারণতঃ রোগীর হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। **রুম্যাটিক ফিভার** হলো রুম্যাটিজ্‌ম বা গেঁটে-বাতের গুরুতর অবস্থায় যে জ্বর হয়।

রেইন-গেজ — বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্র। এর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন স্থানে কত বৃষ্টিপাত হলো তার পরিমাণ জানা যায়। চিত্র থেকে বুঝা যাবে, একটা নির্দিষ্ট আয়তনের ফানেলের মুখে যতটা বৃষ্টির জল পড়ে' নিচের পাত্রে জমে থাকে, পরিমাপক পাত্রে (মেজারিং গ্লাস) ঢেলে তার পরিমাণ স্থির করা হয়, এবং তা থেকে কোন স্থানে বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি সহজেই নিরূপণ করা যায়।
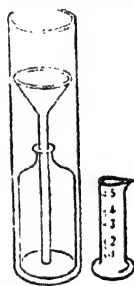
রেইন-গেজ.

রেক্ট্যাঙ্গেল —সমকোণী চতুর্ভুজ; যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারটি কোণই সমকোণ 90° (ডিগ্রি)। এর আবার বাহু চারটি সমান হ'লে বলা হয় **স্কোয়ার,** বাংলায় বর্গক্ষেত্র। **রেক্‌-**

ট্যাঙ্গুলার ফিগার হলো যে-কোন সমকোণী চতুর্ভূজ ক্ষেত্র।

রেক্‌টিলিনিয়ার — সরলরৈখিক, অথবা সরল-রেখাসমন্বিত। যেমন, **রেক্‌টিলিনিয়ার ফিগার** — সরল-রৈখিক ক্ষেত্র। **রেক্‌টিলিয়ার লেন্স** হলো যে লেন্সের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন সরল রেখা আলোক-চিত্রের মত সুস্পষ্ট ও ঋজু দেখায়।

রেজিন — পাইন প্রভৃতি উদ্ভিদের ঘনীভূত রস। এ-জাতীয় বৃক্ষের ছাল কেটে দিলে উদ্ভিজ্জ তেল ও রজন মিশ্রিত ঘন রস নির্গত হয়। এর থেকে উদ্বায়ী তেল বাষ্পীভূত হয়ে উবে গেলে গাছের কাটামুখে কঠিন রেজিন জমে থাকে। একে আবার **রোজিন**-ও বলা হয়,বাংলায় বলে রজন। কোপ্যাল, ক্যানাডা-ব্যাল্‌সাম প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন রকমের রজন পাওয়া যায়। রজনের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল; পদার্থটা যেন এক রকম স্বভাবজাত প্লাস্টিক ↑ শ্রেণীর পলিমার ↑। রেজিনের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ তেল মিশ্রিত থাকলে সাধারণতঃ তাকে বলা হয় **ওলিয়োরেজিন**।

রেটর্ট — বিশেষ গঠনের এক রকম পাত্র, বাংলায় বলে বক-যন্ত্র। সাধারণতঃ কাঁচের তৈরী এরূপ বিশেষ আকারের পাত্রে বিভিন্ন পদার্থ উত্তপ্ত করলে তা থেকে উৎপন্ন গ্যাস বা বাষ্প সহজে সংগ্রহ করা যায়। ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায়ও এরূপ পাত্র ব্যবহৃত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে বাষ্পীয় ডিস্টিলেট-টা ↑ এর নলপথে নির্গমনের সময়ে তরল
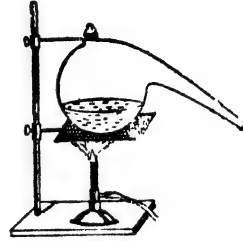
রেটর্ট বা বক যন্ত্র

হয়ে বেরিয়ে আসে। কোল-গ্যাস ↑ তৈরির প্রক্রিয়ায় এরূপ বিরাটাকার ধাতুনির্মিত বক-যন্ত্রে কয়লা উত্তপ্ত করা হয়; ওর নলমুখে নির্গত গ্যাস প্রকাণ্ড সব গ্যাস-হোল্ডারের ↑ মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা হয়।

রেটিনা — চক্ষুগোলকের পশ্চাদ্ভাগস্থ যে-পর্দার গায়ে চোখের বিভিন্ন স্নায়ু এসে মিলিত হয়েছে। মস্তিষ্ক থেকে এসে ওই স্নায়ু-গুলোর প্রান্ত-ভাগ রেটিনার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আলোক-সুগ্রাহী এই সব

সূক্ষ্ম স্নায়ুর রেটিনা-সংলগ্ন প্রান্তগুলো আলোকপাতে উত্তেজিত হয়; সেই উত্তেজনার প্রবাহ স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে বহু জটিল ও বিচিত্র

ব্যবস্থায় আমাদের চোখে বিভিন্ন বর্ণ ও দৃশ্যের অনুভূতি জাগায়।

রেড লেড — লেড অক্সাইড, Pb_3O_4 ; উজ্জ্বল লাল বর্ণের চূর্ণ। পদার্থটা আবার মিনিয়াম ↑ নামেও পরিচিত। পেইন্ট এবং ভার্নিসের ↑ রং হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয় ; কাঁচ-শিল্পে ও অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বাংলায় বলে 'মেটে সিন্দুর'।

রেডিও — কথাটার শব্দার্থ হলো, 'রে', অর্থাৎ রশ্মি সম্বন্ধীয়, অথবা রশ্মির দ্বারা ; যেমন — রেডিও-থেরাপি ↑, রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ এলিমেণ্ট ইত্যাদি। সাধারণতঃ আজকাল 'রেডিও' বললে বেতার-যন্ত্র (রেডিও টেলিফোনি ↑) বুঝায়।

রেডিওঅ্যাক্টিভিটি — বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের স্বয়ংক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা; যেমন, অস্থায়িত্বের জন্যে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থগুলোর পরমাণু-কেন্দ্রীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে (ফিসন ↑) তা থেকে তড়িতাবিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকা-ধারা নির্গত হতে থাকে। বিকিরিত এই তেজঃ-রশ্মির সংগঠক আল্ফা ↑, বিটা ↑, গামা ↑, এই তিন রকম কণিকার ধারা, বা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এদের মধ্যে আল্ফা-কণিকাগুলো ধন-তড়িৎযুক্ত, বিটা-কণিকা ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট এবং গামা-কণিকা হলো তড়িৎবিহীন। এই তেজস্ক্রিয় রশ্মির নিকটে একটা চুম্বক দণ্ড আনলে তার সংগঠক ওই তিন রকম রশ্মি বিভিন্ন পথে বেঁকে পৃথক হয়ে তিন দিকে বিভক্ত হয়ে যায় (চিত্র ↑)। এরূপ ক্রমাগত তেজঃ বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোর পারমাণবিক গঠন বদলে গিয়ে তারা ক্রমে লঘুতর মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্সমুটেসন ↑); যেমন, রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্রমে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় (লেড) পরিণত হয়। কতকগুলো ভারী মৌলিক পদার্থের স্বতঃ-বিভাজনক্ষম বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ↑ স্বভাবতঃ পাওয়া যায়। আবার অ্যাটমিক-পাইল ↑, সাইক্লোট্রোন ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও কতকগুলি ভারী মৌলিক পদার্থের এরূপ রেডিও-অ্যাক্টিভ আইসোটোপ তৈরি করা ইদানিং সম্ভব হয়েছে।

ত্রিবিধ তেজঃরশ্মি

রেডিওগ্রাফি — যে যন্ত্রের সাহায্যে এক্স-রে ↑, গামা-রে ↑ প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মি-পাতের সাহায্যে ফটোগ্রাফিক ↑ প্লেট, অথবা ফ্লোরেসেণ্ট ↑ পর্দার উপরে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। সাধারণতঃ দেহা-

ভ্যন্তরস্থ যান্ত্রিক গোলযোগ নির্ণয়ের জন্যে 'এক্স-রে' সাহায্যে যে যন্ত্রে দেহের কাঠামো ও যন্ত্রাদির এক রকম আলোকচিত্র তোলা হয় তাকেই রেডিওগ্রাফি বলে।

রেডিও টেলিফোনি — সাধারণ রেডিও, বা বেতার-যন্ত্রের কৌশল। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গ-ধারার মাধ্যমে এতে কথাবার্তা, গান-বাজনা প্রভৃতির ধ্বনি দূর দূরান্তরে প্রেরিত হয়। এর প্রেরক-যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ অনবরত বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। মাইক্রো-ফোন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গকে তড়িৎ-স্পন্দনে রূপান্তরিত করে ওই ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক তড়িত্তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-স্পন্দন শূন্যপথে অতি দ্রুত ছড়িয়ে যায় ও দূরবর্তী রেডিও গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে। বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে এই ক্ষীণ তড়িৎ-স্পন্দনগুলো এম্প্লিফায়ার যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে সংবর্ধিত হয়ে রিসিভার যন্ত্রের লাউড-স্পিকারের পর্দায় প্রেরিত শব্দানুযায়ী কম্পন ঘটায়। এর ফলে পুনরায় প্রেরিত শব্দের অনুরূপ শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই শব্দই আমরা রেডিও যন্ত্রে শুনতে পাই। রেডিও সম্বন্ধে এ হলো অতি সাধারণ মোটামুটি বিবরণ। এই বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ, সংশোধন এবং পরিবর্ধনের জন্যে এর মধ্যে থার্মোআয়নিক ↑ ভাল্‌বের ↑ নানা রকম জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে।

রেডিও টেলিগ্রাফি — বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের কৌশল। সাধারণ টেলিগ্রাফ ↑ পদ্ধতির মোর্স-প্রবর্তিত সাংকেতিক ধ্বনি বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এর যান্ত্রিক কৌশল মোটামুটি রেডিও-টেলিফোনির ↑ অনুরূপ।

রেডিওথেরাপি — বিভিন্ন 'রে', বা রশ্মি প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী। এরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন রোগে আলোকরশ্মি, তাপরশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি (এক্স রে ↑) প্রভৃতি তেজঃরশ্মি বিভিন্ন কৌশলে রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রেডিয়াম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑) পদার্থের তেজঃরশ্মি প্রয়োগ করেও ক্যান্সার প্রভৃতি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে।

রেডিও মাইক্রোমিটার — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপশক্তি পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে অতি ক্ষীণ তাপের পরিমাণও নির্ধারণ করা যায়। এরূপ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে একটা থার্মোকাপ্‌ল ↑ এবং একটা গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার ↑। এ-যন্ত্র দুটা

পরস্পরের সঙ্গে তামার তার দিয়ে যুক্ত করে তড়িৎ-চক্র সৃষ্টি করা হয়। বিকিরিত তাপশক্তি থার্মোকাপ্‌লের মধ্যে যে ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে গ্যাল্‌ভ্যানোমিটারে তার পরিমাণ সহজেই নির্ধারিত হয়।

রেডিওমিটার — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মির পরিমাপক এক প্রকার সাধারণ যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটা মোটামুটিভাবে বায়ুশূন্য একটা আধারে রক্ষিত ঘূর্ণ্যায়মান একটা চক্রের মত। এর লম্বা দণ্ডগুলোর মাথায় সংলগ্ন ধাতব চাকৃতিসমূহের এক দিক উজ্জ্বল চক্‌চকে, ও অপর দিক কালো থাকে। কালো রঙের তাপশক্তি শোষণের ক্ষমতা আছে, কাজেই ওই চাকৃতির প্রত্যেকটার কালো দিকে বিকিরিত তাপ-শক্তি দ্রুত শোষণ করে নেয়; ফলে, আধারের অভ্যন্তরস্থ স্বল্পাবশিষ্ট বায়ুতে একটা একমুখী বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটা চাকৃতির একই দিকের কালো অংশের উপরে এরূপ বায়ু-প্রবাহের ফলে চক্রটা ঘুরতে থাকে। চক্রটার এরূপ ঘূর্ণনের বেগ লক্ষ্য করে বিকিরিত তাপের মোটামুটি পরিমাণ জানা যায়।
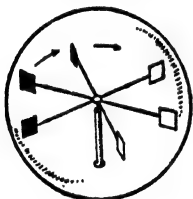
রেডিওমিটার

রেডিয়াম — মৌলিক তেজস্ক্রিয় ধাতু। সাংকেতিক চিহ্ন Ra, পারমাণবিক ওজন 226·05, পারমাণবিক সংখ্যা 88; অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু। মাদাম কুরি ↑ পিচ্‌ব্লেণ্ড ↑ থেকে নিষ্কাশিত করে রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেন। প্রধানতঃ ক্যান্সার রোগের বিশেষ চিকিৎসায় এর সুতীব্র তেজঃরশ্মি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাসায়নিক সংগঠনের হিসেবে ধাতুটা ক্যালসিয়াম ↑ ও বেরিয়ামের অনুরূপ। তেজঃবিকিরণের ফলে (রেডিও-অ্যাক্টিভিটি ↑) রেডিয়াম ধাতু ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় রূপান্তরিত হয়। (ট্রান্সমুটেসন ↑)

রেডিয়ান — জ্যামিতিক বৃত্তাংশ পরিমাপের একটা একক বিশেষ। কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের (রেডিয়াস ↑) সমান করে পরিধি থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে তার উভয় প্রান্তে দুটা ব্যাসার্ধ অঙ্কিত করলে কেন্দ্রে যে-কোণ উৎপন্ন হয় তাকে বলে এক রেডিয়ান। এক রেডিয়ান $=57·3°$ ডিগ্রি; এক ডিগ্রি $=0·017$ রেডিয়ান। একটা নিত্য রাশি।

রেডিয়ান

রেডিয়াস — ব্যাসার্ধ (জ্যামিতিক); বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত অঙ্কিত যে-কোন সংযোজক সরল-

রেখা। কেন্দ্র ভেদ করে উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখাকে বলে বৃত্তের ব্যাস, বা **ডায়মেটার**।

রেডিয়াস ভেক্টর — জ্যো তি-র্বিজ্ঞানের গ ণ না দি তে ব্যবহৃত রাশি। কোন জ্যোতিষ্ক যদি অপর কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে উপবৃত্ত (ইলিপ্টিক ↑) পথে প্রদক্ষিণ করে (যেমন, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরছে), তাহলে যে-কোন অবস্থানে ওই জ্যোতিষ্ক দুটির সংযোগকারী সরল রেখাকে বলা হয় 'রেডিয়াস ভেক্টর'। তুলনা-মূলকভাবে স্থির জ্যোতিষ্কটার অব-স্থানকে অপর জ্যোতিষ্কটার ওই ডিম্বাকার কক্ষপথের **ফোকাস** বলে। রেডিয়াস ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ও কৌণিক অবস্থানাদি পর্যবেক্ষণ করে যে-কোন সময়ে ওই চলমান জ্যোতিষ্কের গতি, স্থিতি, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি জানা যায়। গণিতশাস্ত্রেও কোন স্থির বিন্দুর তুলনায় অপর কোন গতিশীল বিন্দুর বিভিন্ন পরি-মাপ এরূপ রেডিয়াস ভে ক্ট রে র সাহায্যে নির্ধারিত হয়।

ফোকাস

রেডিয়াস ভেক্টর

রেডিয়েটর — যে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়মিতভাবে তাপ-রশ্মি বিকিরণ করা সম্ভব হয়। উত্তপ্ত জল, বা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ এরূপ যন্ত্র থেকে বিশেষ কৌশলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিকিরিত তাপ-রশ্মি চারিদিকের বায়ু উত্তপ্ত করে তোলে। শীতপ্রধান দেশে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু উষ্ণ রাখবার জন্যে সাধারণতঃ এরূপ রেডিয়েটর যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রেডিয়েসন — উৎস থেকে রশ্মি বা তরঙ্গ-প্রবাহের আকারে শক্তির বিকিরণ বা বিচ্ছুরণ। তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন রূপ অদৃশ্য রশ্মি, বা তরঙ্গের আকারে বিকিরিত হয়ে থাকে। আবার ই লে ক ট্র ন ↑, নিউট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকার তরঙ্গাকার ধারা-প্রবাহের ফলেও এরূপ রশ্মির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গ-প্রবাহ, অথবা অদৃশ্য রশ্মির বিকিরণকেই রেডিয়েসন বলা হয়।

রেডিয়্যাণ্ট হিট — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে যে তাপশক্তি বিকিরিত হয়। আমরা সূর্যের যে তাপ পাই তা সূর্যের 'রেডিয়্যাণ্ট হিট', বা বিকিরিত তাপশক্তি। একটা উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দেহের কা ছে আ ন লে তা র রেডিয়্যাণ্ট হিটের ফলে আমাদের তাপ বোধ হয়। কিন্তু উত্তপ্ত লোহা গায়ে লেগে গেলে যে উত্তাপ বোধ হয় তা আর 'রেডিয়্যাণ্ট হিট' নয়।

রেয়ন — কৃত্রিম রেশম। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত সব রকম সেলু-লোজ ↑ জাতীয় পদার্থের সূত্রকেই আজকাল রেয়ন বলে। সাধারণতঃ দু'রকম রেয়ন বিশেষ প্রচলিত—

'সেলুলোজ অ্যা সি টে ট রেয়ন' ও 'ভিস্কোস্ রেয়ন'। যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিলে সেলুলোজ অ্যাসিটেটের ↑ ঘন দ্রব সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সূতার মত বেরিয়ে আসে। উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে এই সূতা থেকে দ্রাবক পদার্থ সম্যক বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায় ; এর ফলে সূতাগুলো বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এই হলো **সেলুলোজ-অ্যাসিটেট রেয়ন**। যন্ত্রের সাহায্যে ভিস্কোস ↑ নামক রাসায়নিক পদার্থের যে সূক্ষ্ম সূতা তৈরি হয়ে থাকে, তাকে বলে **ভিস্কোস রেয়ন**। বিভিন্ন সব সেলুলোজের ↑ উপর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ↑ (NaOH) জলীয় দ্রব ও কার্বন বাই-সালফাইডের ↑ (CS_2) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক রকম স্বচ্ছ অর্ধ-তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, একে বলে ভিস্কোস।

রেয়ার আর্থস্—সমগোত্রীয় কতক-গুলো দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতু। এদের 'রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস'ও বলে। ধাতুগুলোর বিভিন্ন ধর্ম ও গুণ অনেকাংশে অ্যালুমিনিয়ামের মত। মোনাজাইট ↑ নামক খনিজ বালুকা থেকে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। সিরিয়াম ↑ ধাতুসহ প্রায় 16-টা ধাতু এই 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর অন্তর্গত ; এদের এক-একটির পারমাণবিক ওজন 57 থেকে 71-এর মধ্যে। (পরিশিষ্টে তালিকা ↑)।

রেয়ার গ্যাস — ইনার্ট গ্যাস ↑, বা নোবল গ্যাস ; হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডন ↑ নামক মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো প্রকৃতিতে বিরল ও দুষ্প্রাপ্য বলে সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত। এদের মধ্যে র‍্যাডন ↑ ব্যতীত অন্য গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে মিশে আছে। বায়ুমণ্ডলে আর্গন আছে কিছু বেশি ; তার পরিমাণও মাত্র 0·93% এর মত। (অ্যাট্‌মস্ফিয়ার ↑)

রেসিপ্রোকাল — বিপরীত রাশি ; যেমন, 3-এর রে. ল. 1/3 ; 5-এর রে. ল 1/5, ইত্যাদি।

রেসোর্সিন — একটা শক্তিশালী জীবাণু-প্রতিরোধক জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; একে **রেসর্সিনল**-ও বলে। চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জন-শিল্পেও এর কিছু ব্যবহার আছে।

রোজেজ মেটাল — একটি সংকর ধাতুর বিশেষ নাম ; বিস্‌মাথ 50%, লেড (সীসা) 25%, টিন 25% সংযোগে এই ধাতু-সংকর তৈরি হয়। গলনাংক 94° সেন্টিগ্রেড।

রোডোনাইট — গোলাপী বর্ণের এক রকম প্রস্তর বিশেষ ; সুদৃশ্য বলে সস্তা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়।

রোডোফাইটা — এক শ্রেণীর লাল রঙের অ্যাল্‌জি ↑, অর্থাৎ শৈবাল

জাতীয় উদ্ভিদ; প্রধানতঃ সমুদ্রেই এই শ্রেণীর শৈবাল জন্মায়।

রোসেল সল্ট — 'সোডিয়াম পটাসিয়াম টার্টারেট' নামক, [COOK. $(CH.OH)_2$. COONa. $4H_2O$] রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষ দ্রবণীয়। বেকিং পাউডার ↑, সিড্‌লিজ পাউডার ↑ প্রভৃতি তৈরি করতে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়।

র‍্যাটুন — কোন কোন উদ্ভিদ কেটে ফেললে মাটির নিচের গোড়া থেকে যে নূতন চারা গজায়; যেমন, কলা গাছ, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে হয়।

র‍্যাটুন

র‍্যাডন — রেডিয়াম ↑ ধাতুর তেজস্ক্রিয়তার ফলে যে গ্যাসীয় পদার্থের উদ্ভব হয়। মৌলিক পদার্থ বিশেষ; সাংকেতিক চিহ্ন Rn, পারমাণবিক ওজন 222, পারমাণবিক সংখ্যা 86; ক্রমাগত তেজস্ক্রিয়-রশ্মি বিকিরণের ফলে রেডিয়ামের পারমাণবিক গঠন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ওই বিকিরিত তেজঃ-প্রবাহের সঙ্গে এই র‍্যাডন গ্যাস নির্গত হতে থাকে। রাসায়নিক হিসেবে এটা একটা ইনার্ট ↑, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পর্যায়ভুক্ত।

র‍্যাডার — বহু দূরবর্তী অদৃশ্য বস্তুর (বিশেষতঃ বিমানপোতের) গতি, অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণের জন্যে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বিশেষ। রেডিও-ডাইরেক্টিং-অ্যাণ্ড-রেঞ্জিং কথাটা সংক্ষেপ করে যন্ত্রটার নাম 'র‍্যাডার' দেওয়া হয়েছে। এরূপ যন্ত্রের মোটামুটি কৌশল হলো: রেডিও প্রেরক-যন্ত্র থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ (ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরিত হয়। এই তরঙ্গগুলো দূরবর্তী অদৃশ্য এরোপ্লেনের গায়ে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে; আর সেই প্রতিফলিত তরঙ্গমালা ফিরে এসে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যাগত এ-সব তরঙ্গ-প্রবাহের গতি-প্রকৃতি ও দিক লক্ষ্য করে প্রতিফলক এরোপ্লেনের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। প্রেরিত সেই বেতার তরঙ্গের গতি-বেগ জানলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার সময় থেকে এরোপ্লেনের দূরত্ব হিসাব করে জানা যেতে পারে। আজকাল জাহাজেও অনেক সময় এই র‍্যাডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়; মহাসমুদ্রে এর সাহায্যে বহু দূরবর্তী অদৃশ্য তীরদেশের দূরত্ব, দিক প্রভৃতি নির্ণীত হয়ে থাকে।

র‍্যাডার

র‍্যাডিক্যাল — বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু সম্মিলিত-ভাবে যদি কোন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একক পরমাণুর মত কাজ করে, অর্থাৎ নিজে অপরিবর্তিত থেকে অপর পরমাণুর সঙ্গে মিলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে ওই পরমাণু-সমষ্টিকে 'র‍্যাডিক্যাল' বলা হয়; যেমন—NO_3 হলো নাইট্রেট র‍্যাডিক্যাল; সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$, সিল্‌ভার নাইট্রেট $AgNO_3$, প্রভৃতির মধ্যে NO_3 র‍্যাডিক্যালটি যেন একটা পরমাণুর মত বিভিন্ন ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সল্ট ↑ উৎপন্ন করে। কিন্তু এরূপ কোন র‍্যাডিক্যালের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই; রাসায়নিক ক্রিয়ায় এরা মিলিতভাবে কাজ করে মাত্র। এরূপ বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে OH র‍্যাডি-ক্যাল মিলিত হয়ে তৈরি হয় মিথাইল অ্যালকোহল ↑ (CH_3OH), ইথাইল অ্যালকোহল ↑ (C_2H_5OH) প্রভৃতি বিভিন্ন যৌগিক।

র‍্যামজে, স্যার উইলিয়াম — বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী; জন্ম 1851 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1916 খৃঃ। বায়ুমণ্ডলের বিরল গ্যাস (রেয়ার গ্যাস ↑) ক্রিপ্টন, জেনন ও নিয়ন ↑ আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। লর্ড র‍্যালের সহযোগিতায় অন্যতম বিরল গ্যাস আর্গন ↑ আবিষ্কার। পৃথিবীর লঘুতম মৌলিক গ্যাস হিলিয়াম ↑ আবিষ্কারে সবিশেষ খ্যাতি। সূর্যের অভ্যন্তরে এই হিলি-য়ামের অস্তিত্ব নর্ম্যান লকার কর্তৃক 1968 খৃস্টাব্দে সূর্যের বর্ণ-মণ্ডলের বর্ণালি-বিশ্লেষণে লক্ষিত হয়েছিল।

র‍্যালে, লর্ড — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1842 খৃঃ, মৃত্যু 1919 খৃঃ। আলোক ও শব্দ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। র‍্যামজের সহযোগিতায় দুষ্প্রাপ্য আর্গন গ্যাস আবিষ্কার। তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক) তরঙ্গ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি আবিষ্কারেই সবিশেষ খ্যাতি।

র‍্যাসন্যাল নাম্বার — যে-সব রাশির মান সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায়; যেমন, 3, $7\frac{1}{3}$ বা $\frac{22}{7}$ ইত্যাদি। কিন্তু $\sqrt{3}$ নয়; কারণ, এর মান অনির্দিষ্ট, কাজেই একে বলে 'ইর‍্যাসন্যাল নাম্বার'।

ল

লং ওয়েভ্‌স — 1000 মিটারের ↑ অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘের বেতার-তরঙ্গ সমূহ (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑)।

লং টন — 2240 পাউণ্ড; (টন ↑)।

লং সাইট — চক্ষু-গোলকের এক প্রকার দৃষ্টিদোষ; বিশেষ নাম 'হাইপারমেট্রোপিয়া'। চোখের এরূপ ত্রুটির জন্যে নিকটবর্তী জিনিস

পরিষ্কার দেখা যায় না ; বরং দূরের জিনিস ভাল দেখায়। কন্‌ভেক্স (উত্তল) লেন্সের চশমা ব্যবহারে চোখের এরূপ দৃষ্টি-দোষ সংশোধিত হয়ে থাকে।

লঙ্গিচিউড — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে যে বৃত্তরেখাগুলো ভূ-গোলককে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয় ; তাদের বলে 'লাইন্‌স অব লঙ্গিচিউড', বাংলায় এদের বলে দ্রাঘিমা রেখা। এগুলোকে কখন কখন আবার **মেরিডিয়ান**↑ লাইন্‌সও বলে। মানচিত্রে এরূপ বৃত্তরেখা অঙ্কিত করে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের পূর্ব-পশ্চিম অবস্থান নির্ণীত হয়। যে মেরিডিয়ান↑, বা লঙ্গিচিউড লাইন ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ নামক স্থানের উপর দিয়ে গেছে বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাকে বলে মূল দ্রাঘিমা, **প্রাইম মেরিডিয়ান,** অর্থাৎ 0° ডিগ্রি লঙ্গিচিউড। এর পূর্বে-পশ্চিমে মোট 360° ডিগ্রির বিভিন্ন লঙ্গিচিউড লাইন কল্পিত হয়েছে। (ল্যাটিচিউড↑)

লঙ্গিচিউড লাইন্‌স

লঙ্গিচিউডিন্যাল ওয়েভ — কোন শক্তির পরিবহনে মাধ্যম পদার্থের কণিকাগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে প্রবাহপথের বরাবর যে-সব তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তরঙ্গ এরূপ লঙ্গিচিউডিন্যাল গতিতে অগ্রসর হয় ; বায়ু-কণাগুলো তরঙ্গ-প্রবাহের গতিপথে পর্যায়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত ও পর মুহূর্তে সম্প্রসারিত হয়ে হয়ে তরঙ্গধারা এগিয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে এর জন্যে বায়ুর কোন অংশ ছুটে যায় না, কোন পদার্থের কম্পনের ফলে তার সংলগ্ন বায়ুর সংকোচন ও প্রসারণে বায়ু-সমুদ্রে উত্থিত ঢেউগুলো এগিয়ে যায় মাত্র (সাউণ্ড↑)। আলোক অথবা বেতার-তরঙ্গের গতি কিন্তু এরূপ লঙ্গিচিউডিন্যাল নয় ; সেগুলো হলো ট্রান্সভার্স↑।

লগ-বুক — কল-কারখানা, জাহাজ প্রভৃতিতে দৈনিক কর্মবিবরণীর যে লিখিত পুস্তিকা রক্ষিত হয়।

লগারিদ্‌ম — গাণিতিক গুণ, ভাগ প্রভৃতির এক সহজ পদ্ধতি ; সাধারণ লগারিদ্‌মে সূচক সংখ্যায় (ইন্‌ডেক্স↑) দশের গুণিতক প্রকাশিত হয় ; যেমন, $100 = 10^2$, সুতরাং লগ $_{10}$ $100 = 2$; $1000 = 10^3$ কাজেই, লগ $_{10}$ $1000 = 3$; সাধারণভাবে বলা যায়, যদি $a = b^c$, তাহলে b-এর মূলে a-এর লগারিদ্‌ম হলো c ; সংক্ষেপে লেখা হয় $c =$ লগ $_b$ a ; এই পদ্ধতির বহু রকম কৌশল ও সূত্র আছে। এর বিভিন্ন মূল্যমানের তালিকা থাকে, তা থেকে সহজে অল্প সময়ে হিসাবাদি করা যায়।

লড্যানাম — বিশেষ অনুপাতে অ্যালকোহল ↑ ও আফিম মিশ্রিত জলীয় দ্রব ; আফিমের টিংচার ↑ ।

লরেন্স, ডাঃ আর্নেস্ট — মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ; জন্ম 1901 খৃষ্টাব্দ, অদ্যাপি (1961 খৃষ্টাব্দ) জীবিত। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব; কৃত্রিম রেডিয়াম ↑ উৎপাদন। সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে 1939 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ। 'অ্যাটম বম্' উৎপাদনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিদ্যার অন্যতম পুরোধা।

লাইজল — এক প্রকার অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ তরল পদার্থের ব্যবহারিক নাম। মোটামুটি বলা যায়, পদার্থটা সাবান-জলের সঙ্গে বিশেষ অনুপাতে বিশুদ্ধ ক্রিজোল (ক্রিয়োজোট ↑) মিশিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

লাইট—আলোক; বিশেষ এক শ্রেণীর তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি-তরঙ্গের(ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) প্রবাহের ফলে আলোকের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ-ধারাই হলো আলোক-রশ্মি। আলোক-রশ্মি কোন বস্তুর উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুটার আকার আকৃতি অনুযায়ী ওই প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি এসে আমাদের চোখের লেন্সে পড়ে। এই রশ্মির প্রভাবে রেটিনা ↑ সংলগ্ন স্নায়ুসমূহের প্রান্তদেশ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনার স্পন্দন মস্তিষ্কে পরিবাহিত হলে আমরা বস্তুটা দেখতে পাই। আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 4×10^{-5} সেন্টিমিটার ↑ থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগায়। আলোক-তরঙ্গের ওই দৈর্ঘ্য-সীমার বেশি, বা কম দৈর্ঘ্যের (আল্ট্রা ভায়োলেট ↑) তরঙ্গ-রশ্মি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। মোটামুটি হিসাবে আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,326 মাইল $=2{\cdot}9978\times10^{10}$ সেন্টিমিটার।

লাইট-ইয়ার — আলোক-বর্ষ ; দূরত্বের একক বিশেষ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদির দূরত্ব প্রকাশের জন্যে এই একক ব্যবহৃত হয়। এক আলোক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোক-রশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাই বুঝায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে চলে 1,86,326 মাইল ; সুতরাং এক বছরে আলোক $186{,}326\times60\times60\times24\times365$ মাইল অতিক্রম করে ; কাজেই এক আলোক-বর্ষ = প্রায় 6×10^{12} মাইল।

লাইট্নিং — মেঘের তড়িৎস্ফুরণ। নানা কারণে উচ্চাকাশে বিভিন্ন মেঘ পুঞ্জের মধ্যে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন তড়িৎ চাপ-বিশিষ্ট দুটা মেঘখণ্ডের মধ্যে,

অথবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চালিত হয়। এরূপ তড়িৎ সঞ্চরণের সময়ে স্ফুরিত তড়িতের দীপ্তি প্রকাশ পায়, বজ্রধ্বনি শুনা যায়; একেই আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকানো। মেঘ থেকে এই তড়িৎ-স্রোত পৃথিবীতে সঞ্চালিত হলে তাকে সাধারণ কথায় বলে বজ্রপাত।

লাইট্‌নিং কণ্ডাক্টর — লাইট্‌নিং ↑, বা বজ্রপাতের ফলে অনেক সময় গৃহাদি বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই বিপদ নিবারণের জন্যে তড়িৎ-পরিবাহী মোটা কোন ধাতব তার বা রড্ (সাধারণতঃ লোহার) বাড়ীর ছাদের সর্বোচ্চ স্থান থেকে মাটি পর্যন্ত সংযুক্ত করে রাখা হয়; একে বলে 'লাইটনিং কণ্ডাক্টর'। এরূপ একাধিক সূক্ষ্মাগ্র 'কণ্ডাক্টর' বাড়ীর ছাদে থাকলে বাড়ীর যে অংশেই বজ্রপাত হোক না কেন সঞ্চালিত তড়িৎস্রোত ওই ধাতব রডের মাধ্যমে দ্রুত মাটির ভিতর পরিবাহিত হয়ে যায়, ফলে বাড়ীর কোন ক্ষতি হয় না।

লাইম — ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO; লাইম স্টোন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন পাথর স্বল্প বায়ুতে বিশেষ ব্যবস্থায় পুড়িয়ে যে সাদা কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। একে বলে **কুইক্-লাইম**। এই কুইক-লাইমের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনে হয় নরম চুণ, যাকে বলে **স্লেকড লাইম**, যার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$। এই হলো সাধারণ চুণ, যা আমরা ব্যবহার করি। কুইক লাইমের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে (এক্সোথার্মিক ↑ রিঅ্যাকসন)।

লাইম ওয়াটার — চূণের জল; বস্তুতঃ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [$Ca(OH)_2$] জলীয় দ্রব। এর সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের মিলনে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। জলে অদ্রাব্য এই ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উৎপত্তির ফলে পরিষ্কার 'লাইম ওয়াটার' সাদা ঘোলাটে হয়ে ওঠে। উন্মুক্ত স্থানে রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে চূণের জল এভাবে ঘোলাটে হয়ে যায়। এ থেকে বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

লাইম স্টোন — বিভিন্ন পাথর; স্বভাবজাত ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$; পৃথিবীর পাহাড় পর্বত প্রধানতঃ যা দিয়ে গঠিত।

লাফিং গ্যাস — নাইট্রাস অক্সাইড, N_2O; বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ, মিষ্ট গন্ধযুক্ত। গ্যাসটা নাকে গেলে হাসির উদ্রেক হয়ে থাকে; এজন্যেই একে বলা হয় লাফিং গ্যাস। মৃদু অ্যানেস্থ্যাটিক ↑ শক্তির জন্যে দন্ত-চিকিৎসাদিতে কখন কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লাম্বাগো — পৃষ্ঠের বা মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের পেশী-বেদনা ; কটি, বা কোমড়-ব্যথা রোগ।

লাম্বার পাংচার — পেল্‌ভিসের ↑ উপরিভাগে যে পাঁচখানা হাড়ের সংযোগে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ গঠিত, তাদের বলে **লাম্বার** হাড়। মেরুদণ্ডের ওই হাড়ের সংযোগস্থলে স্ুঁচ ফুটিয়ে অভ্যন্তরস্থ রস বার করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে 'লাম্বার পাংচার'। এই জৈব রস মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে চলাচল করে। ম্যানেঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি নানা রোগের চিকিৎসায় এই মেরু-রস পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়।

লাম্বার হাড়

লাভা — আগ্নেয়গিরির (ভল্‌ক্যানো ↑) জ্বালামুখ থেকে নির্গত ধাতব পদার্থ-মিশ্রিত জলন্ত ও গলিত প্রস্তরাদি। এই গলিত পদার্থ কালক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে জমে অনেক সময় স্পঞ্জের মত সছিদ্র, কখন কখন কাচের মত স্বচ্ছ স্তরে পরিণত হয়।

লার্ভা — মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গের শৈশব অবস্থার দেহাবয়ব। ডিম ফুটে প্রথমে এরা যে শূক-কীটের আকার ধারণ করে। **লার্ভাল স্টেজ** মানে লার্ভা অবস্থা।

পতঙ্গের 'লার্ভা অবস্থা

লার্জ ক্যালোরি — তাপ-শক্তি (হিট ↑) পরিমাপের একক বিশেষ। এর পরিমাণ হলো এক কিলোগ্রাম ক্যালোরি ↑, = 1000 ক্যালোরি। (ক্যালোরি ↑)।

লিউকোডার্মা — শ্বেতী, বা ধবল রোগ, যাতে গাত্রচর্ম স্থানে স্থানে সাদা হয়ে যায়। অনেকে একে বলে শ্বেত-কুষ্ঠ ; প্রকৃত পক্ষে এটা কুষ্ঠ রোগ নয়, ছোঁয়াচেও নয়।

লিউকোপিনিয়া—জীবের রক্তে শ্বেত কণিকার স্বল্পতা ; যে অবস্থায় মানুষ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি হারায় ও সহজেই বিভিন্ন জীবাণু-রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

লিউকোসাইট — রক্তের 'হোয়াইট কর্পাস্‌ল' ↑ বা শ্বেত-কণিকা ; শ্বেত রক্তকোষ ; এগুলিই দেহে প্রবিষ্ট রোগ-বীজাণুদের (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে' বিভিন্ন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

লিউয়েনহোয়েক, এ্যাণ্টনি ভ্যান — হল্যাণ্ডবাসী স্বভাব-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1632 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1723 খৃষ্টাব্দ। পুথিগত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বর্জিত, স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা। চশমার লেন্স ↑ দিয়ে প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন এবং তার সাহায্যে অদৃশ্য জীবাণুজগতের আবিষ্কার। রক্তের লোহিত-কণিকা সম্পর্কীয় তথ্যাদি প্রকাশ। জীবাণু-বিজ্ঞানের জনক।

লিকুইড এয়ার — তরল বায়ু। উপযুক্তরূপে চাপ বৃদ্ধি করে ও তাপ কমিয়ে বায়ুকে তরল অবস্থায় আনা যায়। তরল বায়ুর বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। এর মধ্যে বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস দুটি একত্রে তরল অবস্থায় থাকে। অবশ্য সংগঠক অন্যান্য 'রেয়ার গ্যাস'গুলোও তরল অবস্থায় মিশ্রিত থাকে। তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাংক – 182·9° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং তরল নাইট্রোজেনের স্ফুটনাংক –105·7° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সুতরাং স্ফুটনাংকের এই পার্থক্যের জন্যে তরল বায়ু থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও রেয়ার গ্যাসগুলি ফ্রাকসন্যাল ডিষ্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় সুকৌশলে একে-একে পৃথক করা যেতে পারে।

লিকুইফ্যাক্সন অব গ্যাসেস্ — গ্যাসীয় পদার্থের তরলীকরণ প্রক্রিয়া। প্রত্যেক গ্যাসেরই একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ↑) থাকে, যার চেয়ে কম উষ্ণতায় গ্যাসটাকে কেবল মাত্র চাপ প্রয়োগেই তরল করা সম্ভব হয়। কোন গ্যাসের স্বাভাবিক উষ্ণতা এই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের উপরে হলে গ্যাসটাকে প্রথমে উপযুক্ত কৌশলে ঠাণ্ডা করে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নিচে এনে তারপর চাপ বৃদ্ধি করে তাকে তরল করা যেতে পারে। গ্যাসের তাপ কমিয়ে ইচ্ছানুযায়ী ঠাণ্ডা করবার নানা রকম যান্ত্রিক কৌশল ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

লিগ্‌নিয়াস —যার গঠন কাঠের মত উদ্ভিজ্জ তন্তুবিশিষ্ট। **লিগ্‌নিয়াস টিস্যু** উদ্ভিদ-কোষে গঠিত তন্তু।

লিগ্নাইট — এক প্রকার কালচে ধূসর বর্ণের খনিজ কয়লা বিশেষ। সাধারণ খনিজ কয়লার (অ্যানথ্রাসাইট্ ↑) চেয়ে এর মধ্যে হাইড্রোকার্বন ↑ উপাদানের ভাগ অনেক বেশি থাকে। সম্ভবতঃ প্রকৃত কয়লার স্তর সৃষ্টি হওয়ার অনেক কাল পরে ভূ-গর্ভে এই লিগ্নাইট কয়লার স্তর সৃষ্টি হয়েছে। লিগ্নাইট জ্বালিয়েও যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়।
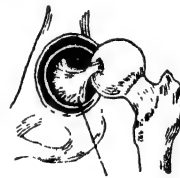
লিগামেণ্ট — সূক্ষ্ম জৈব তন্তুর গুচ্ছ, যা জীবদেহের বিভিন্ন অংশের সংযোগস্থল সংবদ্ধ করে রাখে; বিশেষতঃ অস্থি-সংযোগে থাকে।

লিগামেণ্ট

লিগ্নিন — উদ্ভিদ-দেহের সেলুলোজ ↑ তন্তুর মধ্যস্থিত জটিল রাসায়নিক গঠনের এক প্রকার জৈব পদার্থ। সাধারণতঃ জিনিসটা সেলুলোজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ ↑ থেকে কাগজ, রেয়ন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করবার সময়ে বিভিন্ন রাসায়নিক

প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই লিগ্নিন দূরীভূত করে সেলুলোজকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন হয়।

লিট্‌মাস — স্বভাবজ নীল রংয়ের এক প্রকার উদ্ভিজ্জ রঙ্গীন পদার্থ ; জলে দ্রবণীয়। অ্যাসিডের ↑ সংস্পর্শে লিট্‌মাসের রং লাল হয়ে যায়, এবং অ্যালকালির ↑ সংস্পর্শে পুনরায় নীল হয়। এরূপ বর্ণ পরিবর্তনের জন্যে রসায়নাগারে পদার্থটা 'ইণ্ডিকেটর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিট্‌মাসের জলীয় দ্রবণে কাগজ ডুবিয়ে শুকিয়ে নিয়ে 'লিট্‌মাস-পেপার' তৈরি করা হয় ; রসায়নাগারে সাধারণতঃ এই কাগজ ডুবিয়ে কোন দ্রবণের অ্যাসিড বা অ্যালকালি ধর্ম সহজে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

লিটার — মেট্রিক ↑ পদ্ধতিতে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একটা একক। 4° সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় এবং 760 মিলিমিটার ↑ বায়ু-চাপে (ব্যারোমিটার ↑) এক কিলোগ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে বলা হয় এক লিটার। সাধারণতঃ 1000 সি. সি. (ঘন-সেণ্টিমিটার ↑) এক লিটারের সমান ধরা হয়। বস্তুতঃ এক লিটার = 1000·027 সি. সি.। লিটারের 1000 ভাগের এক ভাগকে বলে 'মিলিলিটার'।

লিডেন জার — স্থির (স্ট্যাটিক ↑) তড়িৎ-শক্তির সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একে এক রকম কণ্ডেন্সার ↑ বলা যায়। যন্ত্রটা হলো মুখ্যতঃ একটা কাঁচ পাত্র ; যার নিম্নাংশের ভিতর ও বহির্ভাগ পাতলা সীসার পাতে মোড়া। পাত্রটার মুখে কোন তড়িৎ-প্রতিরোধক পদার্থে তৈরী ঢাক্‌নার ছিদ্রপথে পিতলের একটা দণ্ড পাত্রের মধ্যে বিলম্বিত থাকে। ওই দণ্ডের নিম্নপ্রান্তে সংলগ্ন ধাতব শিকল ঝুলে ভিতরের সীসার পাতে লেগে যায়। ওই ধাতব দণ্ডের মাধ্যমে তড়িৎশক্তি প্রবাহিত করলে তা যন্ত্রের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। তড়িৎ-শক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনের সময়ে ওই দণ্ড ও বহিস্থ সীসার পাত ধাতব তারের দ্বারা প্রায়-সংযুক্ত করলে ওই সংযোগ-মুখের স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে আবার তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়। এরূপে প্রাপ্ত তড়িৎ তীব্র স্ফুরণের (স্পার্ক) আকারে নির্গত হয়ে থাকে।
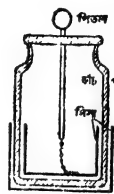
লিডেন জার

লিথ…, লিথো… — প্রস্তর, প্রস্তর সম্পর্কীয় ; যেমন, **হাইড্রোলিথ** ↑, হাইড্রোজেন-উৎপাদক প্রস্তরসদৃশ পদার্থ ; যা জলে দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। লিথোগ্রাফি ↑, লিথোস্ফিয়ার ↑।

লিথার্জ — লেড মনোক্সাইড, PbO, যৌগিকের বিশেষ নাম। লাল

আভাযুক্ত হলদে স্ফটিকাকার পদার্থ। পেইন্ট, ভার্নিস প্রভৃতির রং তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচ-শিল্পেও পদার্থ টা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

…**লিথিক** — প্রস্তর সংশ্লিষ্ট ; যেমন, 'প্যালিওলিথিক ↑ এজ' আদি প্রস্তর যুগ ; নিওলিথিক ↑, নব্য প্রস্তরযুগ।

লিথিয়াম — মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Li ; পারমাণবিক ওজন 6·94, পারমাণবিক সংখ্যা 3 ; রূপোর মত সাদা ও অত্যন্ত হাল্কা ধাতু। সোডিয়ামের ↑ অনুরূপ রাসায়নিক ধর্ম-বিশিষ্ট। নানা রকম হাল্কা সংকর ধাতু তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। মৌলিক ধাতুগুলোর মধ্যে লিথিয়াম সব চেয়ে হাল্কা। **লিথিয়া** হলো লিথিয়াম মনক্সাইড।

লিথোপোন — জিঙ্ক সাল্ফাইড (ZnS) ও বেরিয়াম সালফেটের ($BaSO_4$) সংমিশ্রণে তৈরী এক রকম সাদা পদার্থ। সাদা রং তৈরি করবার জন্যে হোয়াইট লেডের ↑ পরিবর্তে পদার্থটা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লিথোগ্রাফি — প্রস্তর ফলকের উপরে অঙ্কিত চিত্র থেকে কাগজে চিত্র-মুদ্রণের এক প্রকার কৌশল। এজন্যে লাইম স্টোনে ↑ তৈরী মসৃণ ফলকের উপরে তৈলাক্ত কালি দিয়ে ছবি, বা নক্সা আঁকা হয়, পরে বিশেষ এক কৌশলে মুদ্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের উপর ওই ছবির ছাপ তোলা হয়। এই ব্যবস্থায় একাধিক বর্ণের ছবিও মুদ্রিত হয়ে থাকে। এরূপ মুদ্রণকে লিথোপ্রিন্টিং-ও বলে।

লিথোস্ফিয়ার — পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের প্রস্তরময় স্তর। ভূ-গোলকের উপরিভাগের মৃত্তিকা স্তরের নিচে বহু মাইল গভীর যে গোলাকার কঠিন শিলাস্তর রয়েছে।

লিনিয়ার — দৈর্ঘিক, বা লম্বালম্বি ; যেমন, **লিনিয়ার এক্সপ্যান্সন**— দৈর্ঘিক বৃদ্ধি ; উত্তাপ, বা টানের ফলে পদার্থের লম্বায় বেড়ে-যাওয়া।

লিব্নিজ, গট্ফ্রাইড উইলহেল্ম— জার্মান গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ; জন্ম 1646 খৃঃ, মৃত্যু 1716 খৃঃ। গণিতের ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যাল্কুলাস পদ্ধতির আবিষ্কারক। দার্শনিক হিসাবে বিশ্বপ্রকৃতির শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা এবং সর্বাবস্থায় প্রাকৃতিক বিধিব্যবস্থা সবই কল্যাণকর বলে এক মতবাদ প্রচার।

লিবিগ্ কণ্ডেন্সার — যে যন্ত্রের সাহায্যে ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বাষ্পীয় পদার্থকে সঙ্গে সঙ্গে

লিবিগ্ কণ্ডেন্সার

পুনরায় তরল পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। সাধারণ লিবিগ

কণ্ডেন্সারে একটা সরু কাঁচনলের বহিরাবরণ স্বরূপ আর একটা মোটা কাঁচনল সংযুক্ত থাকে। উত্তাপের ফলে আবদ্ধ পাত্রের মুখ থেকে বাষ্পীয় ডিস্টিলেট-টা ↑ বেরিয়ে ওই সরু কাঁচনলের ভিতর দিয়ে নির্গত হয়। নির্গমনের সময়ে বাইরের নলের মধ্যে প্রবাহিত ঠাণ্ডা জল-প্রবাহের শীতলতার সংস্পর্শে ওই বাষ্প পুনরায় তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে নির্গম-নলের মুখে রক্ষিত পাত্রে জমে।

লিভার — এক রকম যন্ত্র বিশেষ। কোন স্থির সূক্ষ্মাগ্র বস্তুর উপর শয়ানভাবে একটা দণ্ড স্থাপন করলে দণ্ডটা ওই স্থির অবস্থানের দুদিকে ঢেঁকি-কলের মত সহজে ওঠা-নামা করতে পারে। এরূপ দণ্ডকে বলে লিভার; আর ওই স্থির সূক্ষ্মাগ্র অবস্থানকে বলে লিভারের **ফালক্রাম** ↑। ফালক্রামের উপর দণ্ডটা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে ওর এক প্রান্তে সামান্য চাপ-শক্তি প্রয়োগ করে অপর প্রান্তে যথেষ্ট বেশি (ভার উত্তোলন প্রভৃতি) কাজ পাওয়া যায়। একেই বলা হয় লিভারের **মেকানিক্যাল এড্ভাণ্টেজ,** বা যান্ত্রিক সুবিধা। লিভারের এই যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ নির্ভর করে দু'দিকের বিপরীত শক্তির প্রয়োগরেখার উপরে ফালক্রাম থেকে অঙ্কিত লম্বদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। এরূপ লিভার ব্যবস্থার সাহায্যেই ক্রেন-যন্ত্রে ভারী মালপত্র সহজে উত্তোলিত হয়।

ফালক্রাম
লিভার
লিভার ব্যবস্থা

লিভার অব সালফার — পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) ও গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে যে রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা প্রধানতঃ পটাসিয়াম-সালফাইড ও বিক্রিয়ার পরে অবশিষ্ট গন্ধকের সংমিশ্রণ মাত্র। উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর পোকা-মাকড় ও ছত্রাক প্রভৃতি বিনষ্ট করবার জন্যে অনেক সময় এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লিম্ফ — লসিকা; দেহস্থ বর্ণহীন জৈব রস। এরূপ রসে রক্তকণিকা সমূহ ভাসমান থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর এরূপ জৈব রস-নিঃসারী গ্ল্যাণ্ড ↑ দেহের নানাস্থানে আছে।

লিমোনাইট — এক প্রকার লৌহ-ঘটিত খনিজ পদার্থ। হল্দে রং-এর (হাইড্রেটেড) ফেরিক অক্সাইড, Fe_2O_3। ম্যাগ্নেটাইট ↑ ও হ্যামেটাইট ↑ নামক লৌহ-আকরিক পদার্থের রূপান্তরের ফলে এর সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ লৌহখনি অঞ্চলের জলমগ্ন স্থানে লিমোনাইট খনিজ প্রচুর পাওয়া যায়।

লিস্টার, লর্ড — বৃটিশ শস্ত্রচিকিৎসক; জন্ম 1827 খৃঃ, মৃত্যু 1912 খৃঃ। জীব-দেহের ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার জীবাণুঘটিত কারণ আবিষ্কার।

জীবাণু-প্রতিরোধক বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা ক্ষতে জীবাণুর সংক্রমণ রোধের উপায় উদ্ভাবন। সার্থক ও নিরাপদ শস্ত্র-চিকিৎসার প্রবর্তক। আধুনিক উন্নত ধরণের শস্ত্রচিকিৎসা-পদ্ধতির জনক বলে খ্যাত।

লুনার কস্টিক — সিল্ভার নাইট্রেটের ↑ ($AgNO_3$) বিশেষ নাম; এক রকম সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না, এমন অন্ধকার আধারের মধ্যে দ্রবীভূত করে পদার্থটাকে সাধারণতঃ দণ্ডের আকারে ছাঁচে ঢালাই করা হয়। সামান্য আলোকের সংস্পর্শেও কালো হয়ে যায় বলে মোটা কালো কাগজে মুড়ে এই দণ্ডগুলো বাজারে বিক্রয় হয়। একটা উৎকৃষ্ট আলোক-সুগ্রাহী পদার্থ হিসাবে এটা সাধারণতঃ ফটোগ্রাফির ↑ প্লেট বা কাগজ তৈরির কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লুনার ইক্লিপ্স — ইক্লিপ্স, লুনার ↑।

লুমিনাস পেইন্ট — ক্যালসিয়াম-সালফাইড প্রভৃতি বিভিন্ন ফস্‌ফোরেসেণ্ট ↑ পদার্থ মিশ্রিত এক শ্রেণীর রং। এরূপ পেইন্ট-মাখানো বস্তু অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। দিনে সূর্যালোক শুষে নিয়ে ওই সব পেইণ্টে মিশ্রিত ফস্‌ফোরেসেণ্ট, বা অনুপ্রভ পদার্থই রাত্রির অন্ধকারে আবার সেই শোষিত আলোক বিকিরণ করে থাকে।

লুমিনসিটি — আলোকের ঔজ্জ্বল্য; কোন আলোকের উৎস থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির এই ঔজ্জ্বল্য 'লুমেন' ↑ এককে মাপা হয়।

লুমিনেসেন্স — প্রতিপ্রভতা; কোন পদার্থের আলোক বিকিরণের স্বাভাবিক ধর্ম। উপযুক্তরূপে উত্তপ্ত করলে সব পদার্থ থেকেই অবশ্য আলোক ও উত্তাপ বিকিরিত হয়; কিন্তু উত্তাপ ব্যতিরেকেই স্বভাবতঃ কোন কোন পদার্থে যে আলোক বিকিরণের ধর্ম লক্ষিত হয়ে থাকে। পদার্থের ফস্‌ফোরেসেন্স ↑ ও ফ্লোরেসেন্স ↑ ধর্মকেই সাধারণভাবে বলা হয় লুমিনেসেন্স, বা প্রতিপ্রভতা এবং এরূপ পদার্থকে বলে লুমিনেসেণ্ট, অর্থাৎ প্রতিপ্রভ পদার্থ।

লুমিন্যাল — বার্বিটুরেট ↑ শ্রেণীর একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম; স্নায়ুর উত্তেজনা নিবারক ও নিদ্রাদায়ক ঔষধ।

লুমেন — কোন আলোক-উৎস থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের একক। এক ক্যাণ্ডেলা ↑ পরিমাণের আলোক-বিশিষ্ট উৎস থেকে এক সেন্টি-মিটার ↑ দূরবর্তী এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনের স্থানে এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ আলোকপাত হয়, তার ঔজ্জ্বল্যকে বলে এক 'লুমেন'। সাধারণতঃ এই এককে আলোকের

ঔজ্জ্বল্য মেপেই আলোকপাতের মোট পরিমাণ স্থির করা হয়।

লুসিফেরিন — জোনাকি প্রভৃতি কোন-কোন প্রাণীর দেহাভ্যন্তরস্থ যে জৈব পদার্থ আলো বিকিরণ করে এবং অন্ধকারে জলতে দেখা যায়। কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে এই জৈব পদার্থ আছে ; এদের বলে 'লুসিফেরাস' জীব।

লেংথ — দৈর্ঘ্য। দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক :

10 লাইন্স = 1 ইঞ্চি = 2·54 সেণ্টিমিটার
12 ইঞ্চি = 1 ফুট
3 ফুট = 1 ইয়ার্ড, বা গজ = ·9144 মিটার
22 ইয়ার্ড = 1 চেইন
10 চেইন = 1 ফার্লং = 201·17 মিটার
8 ফার্লং = 1 মাইল = 1609·3 মিটার

মেট্রিক সিস্টেমে দৈর্ঘ্যের কয়েকটি একক হলো :

10 মিলিমিটার = 1 সেণ্টিমিটার = ·3937 ইঞ্চি
100 সেণ্টিমিটার = 1 মিটার = 1·0936 গজ
1000 মিটার = 1 কিলোমিটার = ·62137 মাইল

লেক্ল্যান্স সেল—তড়িৎ-উৎপাদক একটি যন্ত্র বিশেষ; এক রকম বিশেষ গঠনের প্রাইমারি সেল ↑। এর মধ্যে কার্বনের ↑ একটা দণ্ডকে ধন-তড়িদ্বার (পজিটিভ ইলেক্ট্রোড ↑) করা হয়। ওই কার্বন দণ্ডের চারিদিকে থাকে ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড ও কয়লার গুঁড়ার সংমিশ্রিত পদার্থ। এ সব একটা সছিদ্র পোর্সিলেন ↑ পাত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়। এই পাত্রটা জিঙ্কে ↑ তৈরি অপর একটা বৃহত্তর পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দুই পাত্রের মাঝে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ↑ (NH_4Cl) ঘন জলীয় দ্রব দেওয়া হয় ইলেক্ট্রোলাইট ↑ হিসেবে। জিঙ্কের পাত্রটা ঋণ-তড়িদ্বারের (নেগেটিভ ইলেক্ট্রোড) কাজ করে। তড়িৎ-পরিবাহী তার দিয়ে এখন ভিতরের

ল্যাক্ল্যান্স ড্রাই সেল
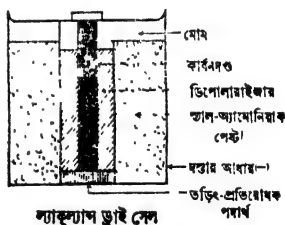
কার্বন-দণ্ড ও বাইরের জিঙ্ক-পাত্র সংযোগ করে দিলে জিঙ্ক এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি ওই তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকে। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) ডিপোলারাইজার ↑ হিসেবে কাজ করে। এভাবে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি ধাতব তারের সার্কিটের ↑ মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন

প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। আবার, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবের পরিবর্তে তার এক রকম আঠালো পেস্ট ব্যবহার করে ড্রাই-সেল ↑ তৈরি করা হয়। এরূপ ড্রাই (লেক্‌ল্যান্স) সেল সাধারণ টর্চ বাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেড — সীসা। মৌলিক ধাতু; ল্যাটিন নাম **প্লাম্বাম** থেকে এর সাংকেতিক চিহ্ন করা হয়েছে Pb। পারমাণবিক ওজন 207·21; পারমাণবিক সংখ্যা 82; নীলাভ-সাদা, নরম ও ভারী ধাতু। গ্যালেনা ↑ নামক খনিজ লেড্ সালফাইড(PbS) রিভার্বেরেটরি ফার্নেসে ↑ উত্তপ্ত করে ধাতব সীসা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। সীসার যৌগিক পদার্থগুলো সবই বিষাক্ত; সাধারণতঃ পেইণ্ট তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয় (রেড লেড ↑)। প্রধাণতঃ জলের পাইপ, ছাপার টাইপ প্রভৃতি তৈরি করতে সীসা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেড অ্যাসিটেট — সীসা ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন $[(CH_3COO)_2Pb.3H_2O]$ সল্ট; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়, কিছু মিষ্ট স্বাদ যুক্ত, কিন্তু বিষাক্ত। পদার্থটা 'সুগার অব লেড' ↑ নামেও পরিচিত।

লেড অ্যাকুমুলেটর — অ্যাকুমুলেটর ↑।

লেড চেম্বার প্রোসেস — ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) প্রস্তুত করবার একটা প্রণালী। সীসার তৈরী প্রকাণ্ড চেম্বারের (প্রকোষ্ঠ) মধ্যে এই প্রণালীতে অ্যাসিডটা তৈরি হয়। এর প্রস্তুত-প্রণালী হলো মোটামুটি এইরূপ: সালফার (গন্ধক) পুড়িয়ে উৎপন্ন সালফার ডাইঅক্সাইডের (SO_2)ধূম ওই লেড চেম্বারের মধ্যে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। উত্তাপের সাহায্যে কোন নাইট্রেট সল্টকে 'ডিকম্পোজ' করিয়ে এই 'নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড' গ্যাস উৎপাদিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ থেকে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন হয়ে থাকে। চেম্বারের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নাইট্রিক অক্সাইড পুনরায় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এদিকে সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) গ্যাস প্রকোষ্ঠের তলদেশে রক্ষিত জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) এই অবিশুদ্ধ জলীয় দ্রবকে বলা হয় **কমার্শিয়াল সালফিউরিক অ্যাসিড**। অতঃপর বিভিন্ন উপায়ে একে বিশুদ্ধ ও নির্জল করে নেওয়া হয়।

লেড মনক্সাইড — লিথার্জ ↑ ।

লেড, হোয়াইট (অথবা, রেড)— 'হোয়াইট লেড' ↑, 'রেড লেড' ↑ ।

লেড গ্লাস — যে কাচে (গ্লাস ↑) লেড অক্সাইড (লিথার্জ ↑) মিশ্রিত থাকে; রঙিন কাচ।

লেন্স — বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট যে স্বচ্ছ পদার্থখণ্ডের মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি পরিচালিত হলে রশ্মিগুলো প্রতিসরিত হয়ে এক বিন্দুতে সংহত, অথবা তা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়। লেন্স হয় সাধারণতঃ কাঁচের তৈরি; যার এক দিক, বা উভয় দিকই বক্রতল-বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যে লেন্সের মধ্যভাগ চার ধার অপেক্ষা মোটা, অর্থাৎ উপরিভাগ উত্তল, তাকে বলে **কনভেক্স** ↑ লেন্স; আর, যে লেন্সের মধ্যভাগ পাত্‌লা, অর্থাৎ উপরটা অবতল তাকে বলে **কন্‌কেভ** ↑ লেন্স। আলোক রশ্মি কন্‌ভেক্স লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতি-সরিত হ'য়ে এক বিন্দুতে সংহত, অর্থাৎ মিলিত হয়; আর, কন্‌কেভ লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ওই বিন্দুকে লেন্সের **ফোকাস** বলে। লেন্সের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে **ফোক্যাল লেংথ**। টেলিস্কোপ ↑ মাইক্রোস্কোপ ↑, ক্যামেরা ↑ প্রভৃতি আলোক-রশ্মি সম্পর্কীয় বিভিন্ন যন্ত্রে এ-সব লেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কন্‌ভেক্স লেন্স

কন্‌কেভ লেন্স

লেনিটিভ—বিশেষ ঠাণ্ডা, অর্থাৎ উগ্র নয়, এমন অল্পক্রিয়াশীল ঔষধ; যেমন, জোলাপ জাতীয় ঔষধ হিসাবে অলিভ অয়েল হলো লেনিটিভ; কিন্তু ক্যাষ্টর অয়েল লেনিটিভ নয়।

লেপ্রসি — কুষ্ঠ ব্যাধি। মাংসপেশী ও স্নায়ুর জীবাণু-ঘটিত রোগ; যাতে দেহের স্থানে স্থানে প্রথমে সাদা দাগ ধরে ও স্থানীয়ভাবে অনুভূতি-হীন অসাড় হয়ে যায়; ক্রমে স্নায়ুর ক্রিয়া সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে সে-সব জায়গা পচে দুরারোগ্য ক্ষত হয়—একে বলে গলিত কুষ্ঠ। আবার শুষ্ক কুষ্ঠে স্থানে স্থানে চামড়া মোটা ও অসাড় হয়ে চাকা-চাকা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগের প্রকোপ বেশি।

লেব্ল্যাঙ্ক, নিকোলাস—ফরাসী রাসায়-নিক; জন্ম 1742 খৃঃ, মৃত্যু 1806 খৃঃ। সাধারণ খাদ্য-লবণ থেকে সোডা তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবনেই সবিশেষ খ্যাতি। পরে অবশ্য এই 'লেব্ল্যাঙ্ক সোডা প্রোসেস' ↑ পরি-ত্যক্ত, এবং অধিকতর সুবিধাজনক 'সল্‌ভে প্রোসেস' ↑ প্রচলিত। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে লেব্ল্যাঙ্কের প্রতি-ষ্ঠিত সোডার কারখানা বাজেয়াপ্ত হয়; এবং তিনি অভাব অনটন ও হতাশায় আত্মহত্যা করেন।

লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস — সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3, প্রস্তুত করবার একটা পুরাতন প্রণালী। একে আবার 'সল্ট কেক্ প্রোসেস'ও বলা হয়। এই প্রণালীতে সাধারণ খাদ্য-লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, $NaCl$) ও সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে উত্তপ্ত করে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম সালফেট, (Na_2SO_4) তৈরি হয়। একে সাধারণতঃ বলে **সল্ট-কেক্**। পরে কয়লা ও লাইম স্টোনের ↑ সঙ্গে এই সল্ট-কেক উত্তপ্ত করে পাওয়া যায় অবিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট, যাকে বলে 'ওয়াসিং সোডা' ↑।

লেভেল — অনুভূম বা সমতল; **স্পিরিট লেভেল** —কোন স্থানের অনুভূম সমতলতা পরীক্ষার জন্যে
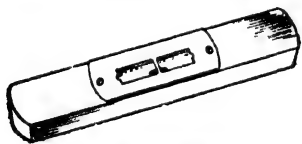
স্পিরিট লেভেল

ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রের কাচনলে আবদ্ধ স্পিরিটের ↑ মধ্যে সামান্য বাতাসের একটা বুদ্‌বুদ্‌ রাখা হয়, সমতল স্থানে রাখলে বুদ্‌বুদ্‌টা নলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আসে, অন্যথায় এদিক-ওদিক হয়।

লেভুলোজ — ফ্রুট সুগার ↑, ফল-শর্করা; এর জলীয় দ্রবণে সমান্তরিত অর্থাৎ একদেশী (পোলারাইজ্‌ড ↑) আলোক-রশ্মি বাঁ-দিকে বেঁকে যায়; এজন্যে একে কখন কখন **লিভোলোজ**ও বলে। **লিভোরোটেটরি** কথাটার মানে 'বামে ঘূর্ণনক্ষম'।

লেসিথিন —এক শ্রেণীর জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো প্রায় জান্তব ফ্যাট্ ↑ বা চর্বির অনুরূপ। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহকোষে ও ডিমের হল্‌দে অংশে যথেষ্ট লেসিথিন থাকে; জীবজন্তুর স্নায়ু ও মস্তিষ্ক থেকেও পাওয়া যায়। লেসিথিনের প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস ↑; এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনও থাকে। বিভিন্ন টনিক ঔষধে লেসিথিন ব্যবহৃত হয়।

লোকাস — কোন গতিশীল বস্তু, বা বিন্দুর সঞ্চরণ-পথ। কোন নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কোন বিন্দু সঞ্চালিত হলে ওই বিন্দুর বিভিন্ন অবস্থানের সংযোগকারী রেখাকে বলে ওই বিন্দুর লোকাস। বৃত্তের পরিধি হলো কেন্দ্রের সমদূরবর্তী বিন্দুর এরূপ গতি-পথ, অর্থাৎ লোকাস।

লোড্‌স্টোন — চৌম্বকশক্তি-বিশিষ্ট প্রাকৃতিক লৌহ-খনিজ। ম্যাগ্নেটাইট ↑ প্রভৃতি স্বভাবজাত কতকগুলো অবিশুদ্ধ খনিজ আয়রন-অক্সাইডের (Fe_3O_4) স্বাভাবিক

চৌম্বক-শক্তি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সেগুলি সাধারণ লোহাকে আকর্ষণ করে। চৌম্বক-শক্তির পরিচয় মানুষ এরূপ লোড্‌স্টোন থেকেই প্রথম পায়। এজন্যে এক সময়ে সব রকম চুম্বক বা ম্যাগ্নেটকেই ↑ লোড্‌স্টোন বলা হতো।

ল্যাক — লাক্ষা; কক্কাস-লাক্কা জাতীয় স্ত্রী-লাক্ষাকীটের দেহনিঃসৃত আঠালো রস। এই কীট-অধ্যুষিত গাছের ডালে ওই রস শুকিয়ে লেগে থাকে, একে তখন বলা হয় স্টিক-ল্যাক। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ থেকে চমৎকার লাল রং ও সেল্যাক ↑ নামক রজন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পে এই সেল্যাক প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ল্যাকার — কাচের মত স্বচ্ছ তরল পদার্থ, যার অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ লাগিয়ে বিভিন্ন জিনিসের ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সোডিয়াম সিলিকেট ↑, স্যালুলয়েড ↑ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের এরূপ ল্যাকার দিয়ে রঙীন পুতুল, পিতলের জিনিস-পত্র প্রভৃতি অনেক দিন চক্‌চকে উজ্জ্বল রাখবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ল্যাক্টিক অ্যাসিড — একটা জৈব অ্যাসিড, $CH_3CH(OH)COOH$; বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ। টকে-যাওয়া দুধে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়। এক রকম ব্যাক্টিরিয়ার ↑ প্রভাবে টকে-যাওয়ার সময়ে দুধের উপাদান ল্যাক্টোজ ↑ নামক শর্করা ল্যাক্টিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ল্যাক্টিক অ্যাসিডের সাধারণতঃ দু' রকম 'স্টিরিয়ো আইসোমেরিক' ↑ রূপ হয়ে থাকে; এদের গুণ ও ধর্মের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ল্যাক্টোজ — জান্তব শর্করা; সব রকম প্রাণীর দুগ্ধে পাওয়া যায়, এজন্যে একে **মিল্ক-সুগার** ও বলে। সাধারণ উদ্ভিজ্জ শর্করা বা চিনির মত এরও রাসায়নিক গঠন $C_{12}H_{22}O_{11}$; স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, মিষ্টত্ব অতি কম। হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় এই 'ল্যাক্টোজ' শর্করা গ্লুকোজ ↑ ও গ্যালাক্টোজ ↑ নামক বিশেষ শর্করায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। আবার বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার ↑ প্রভাবে দুধের এই ল্যাক্টোজ উপাদান ল্যাক্টিক অ্যাসিডে ↑ রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড — অশ্রু গ্রন্থি; চোখের বহিস্থ কোণের উপরদিকে অবস্থিত এই গ্রন্থি উত্তেজিত হলে লবণাক্ত জল উৎপন্ন হয়। হর্ষ বা বিষাদ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনায় উৎপন্ন সেই জলই ভিতরের সূক্ষ্ম নলপথে

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড

অশ্রুরূপে চোখে আসে। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থাতেও এই গ্ল্যাণ্ড ↑, বা গ্রন্থি থেকে সর্বদাই অল্প অল্প জল নিঃসৃত হয়ে চক্ষু-গোলক আর্দ্র রাখে।

ল্যাভুলোজ — ফ্রাক্টোজ, বা ফ্রুট সুগার, $C_6H_{12}O_6$; (ফ্রাক্টোজ ↑)।

ল্যাকোলাইট — ভূগর্ভে কোথাও গলিত প্রস্তরাদি সবেগে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে তার উপরের কোন কঠিন শিলাস্তরে বাধা পেলে সেই শিলা-স্তর বেঁকে ফুলে ওঠে। এভাবে উৎপন্ন উত্তল প্রস্তর স্তূপকে বলে ল্যাকো-লাইট, বা **ল্যাকোলিথ**।

ল্যাকোলাইট স্তর

ল্যাক্ট — দুধ। **ল্যাক্টেসন** হলো দুগ্ধের উৎপত্তি, বা দুগ্ধ নিঃসরিত হওয়া। **ল্যাক্টিল্স**—দুগ্ধবৎ লসিকা (লিম্ফ ↑)-নিঃসারী জৈব গ্রন্থিসমূহ; স্ত্রী-প্রাণীদের দেহেই এই বিশেষ গ্রন্থিগুলি থাকে। অন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রাচীর-পর্দা (মেম্ব্রেন ↑) ভেদ করে স্নেহ পদার্থের (ফ্যাট ↑) অতি সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ গিয়ে থোর‍্যাক্স-স্থিত ↑ লসিকা-আধারের (স্তনের) নলগুচ্ছে সঞ্চিত হয় আর এভাবেই স্তনে দুগ্ধের উৎপত্তি হয়ে থাকে। (ল্যাক্টিক অ্যাসিড ↑, ল্যাক্টোস ↑)

ল্যাক্টোমিটার — দুধের স্বাভাবিক প্রমাণ ঘনত্বের সঙ্গে তুলনামূলক-ভাবে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। এ দিয়ে বস্তুতঃ দুধের স্পেসিফিক গ্রাভিটি ↑ মাপা হয়; দুধে জল মিশ্রিত থাকলে তার স্পেসিফিক গ্রাভিটি কমে যায়, এবং তার থেকে ভেজাল ধরা পড়ে।

ল্যাক্টোমিটার

ল্যাটিচিউড (**লাইন্স** অব) — ভৌগোলিক অক্ষরেখা। সু-মেরু ও কু-মেরু থেকে সমদূরবর্তীভাবে যে কাল্পনিক বৃত্তরেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে মনে করা হয়, তাকে বলে নিরক্ষ-রেখা, বা বিষুব-বৃত্ত (ইকোয়েটর ↑), অর্থাৎ 0° ডিগ্রি অক্ষরেখা। এই নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে উত্তর ও দক্ষিণে অঙ্কিত কাল্পনিক বৃত্তগুলোকে বলা হয় অক্ষরেখা, বা **প্যারালাল্স অব ল্যাটিচিউড**। ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্দিষ্ট করবার জন্যে মানচিত্রে এরূপ ল্যাটিচিউড (এবং লঙ্গি-চিউড ↑) রেখা সমূহ অঙ্কন করা হয়। ওই বিষুব-রেখা বা নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে এক থেকে 90 পর্যন্ত ডিগ্রি চিহ্নিত অক্ষরেখা কল্পিত হয়েছে।

ল্যাটিচিউড লাইনস

I

এই হিসেবে পৃথিবীর সুমেরু প্রান্তকে 90°-উত্তর এবং কুমেরুকে 90°-দক্ষিণ অক্ষাংশ ধরা হয়।

ল্যাটেণ্ট হিট — হিট্, ল্যাটেণ্ট ↑।

ল্যাটেণ্ট ইমেজ — ফটোগ্রাফিতে ফিল্মের ↑ উপরে প্রথমে যে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি ওঠে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডেভেলপ ↑ করে পরিস্ফুট না করা পর্যন্ত যে প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। ল্যাটেণ্ট মানে যা আপাত-অদৃশ্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে, এমন। (ল্যাটেণ্ট হিট ↑)।

ল্যাটেক্স — দুধের মত সাদা উদ্ভিজ্জ রস; কোন কোন উদ্ভিদ-কাণ্ডের ত্বক কাটলে বা চিরে দিলে যে সাদা ও ঘন রস নির্গত হয়। এরূপ বিশেষ এক জাতীয় গাছের ঘনীভূত জৈব রস, বা ল্যাটেক্স হলো রাবার ↑।

ল্যান্থানাম্ — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন La; পারমাণবিক ওজন 138·92, পারমাণবিক সংখ্যা 57; অন্যতম একটি 'রেয়ার আর্থ' ↑ ধাতু।

ল্যানোলিন — বিভিন্ন জীব-জন্তুর, বিশেষতঃ ভেড়ার লোম বা পশম থেকে মোমের মত যে এক রকম চর্বিজাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। পদার্থটা উল্-ফ্যাট নামেও পরিচিত। নানারকম জটিল গঠনের রাসায়নিক জৈব উপাদানে এই ল্যানোলিন গঠিত। মানুষের গাত্রচর্মে পদার্থটা অতি দ্রুত শুষে যায়; এজন্যে বিভিন্ন মলম ও প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়।

ল্যাপারোটমি — উদর, বা পেট চিরে আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক গোলযোগ সম্বন্ধীয় রোগের প্রত্যক্ষ কারণ নিরূপণের জন্যে যে অস্ত্রোপচার, বা শস্ত্র-চিকিৎসা করা হয়।

ল্যাপ্লাস, পিরি সাইমন — ফরাসী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ; জন্ম 1749 খৃঃ, মৃত্যু 1827 খৃষ্টাব্দ। গণিতে অপূর্ব প্রতিভা; মাত্র 20 বছর বয়সে 'ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস' সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ প্রকাশ। ল্যাপ্লাস 'ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশন' নামক বিশেষ এক গাণিতিক সমীকরণের আবিষ্কর্তা। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্যে বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি। নিহারীকা সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রবর্তন, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের তথ্যাদি নির্ধারণ, চাঁদের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি এবং জোয়ার-ভাঁটা প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কারণ নির্ণয় অন্যতম বিশেষ অবদান।

ল্যাবিরিন্থ — আক্ষরিক অর্থে, 'বহু শাখা-প্রশাখায় জড়ানো জটিল গঠন'। বিশেষতঃ বুঝায়, কানের অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন নলপথে-গঠিত শ্রবণ যন্ত্র। বায়ুর শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে কানের পর্দা কম্পিত হয়, আর সেই কম্পনের তরঙ্গ কানের অভ্যন্তরস্থ এই ল্যাবিরিন্থ অংশের তিনটি অর্ধ-গোলাকার নলপথে বাহিত হয়ে

শব্দের উৎসের অবস্থান ও দিক নির্ধারণের অনুভূতি জাগায়; এর মধ্যবর্তী শঙ্খাকৃতি নলের মধ্যে
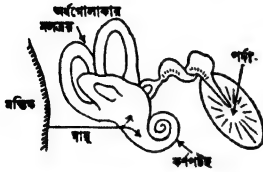
কানের অভ্যন্তরস্থ ল্যাবিরিন্থ

থাকে মূল শ্রবণ-যন্ত্র, যার সঙ্গে সংলগ্ন বিশেষ বিশেষ স্নায়ু-পথে তরঙ্গ-স্পন্দনের উত্তেজনা মস্তিষ্কে গিয়ে শ্রবণের বোধ জন্মায়।

ল্যাভয়সিয়ার, অ্যান্টোইন লরেন্ট—ফরাসী রাসায়নিক; জন্ম 1743 খৃঃ, মৃত্যু 1794 খৃষ্টাব্দে। সরকারী চাকুরীর অবসর সময়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার গবেষণা। বায়ুর অক্সিজেন উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ এবং ফ্লোজিস্টন ↑ মতবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দহন-ক্রিয়ার রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কারে চিরস্মরণীয়। জলের রাসায়নিক গঠনের তথ্য বিশ্লেষণ, আবহতত্ত্ব ও কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গবেষণা। ফরাসী বিপ্লবের কালে বিপ্লবীদের বিচারে নিহত।

ল্যাম্প ব্ল্যাক—ভূষা কালি; তেলের বাতি জ্বালালে উপরের ঢাকনায় যে কালি জমে। তেলের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে তার হাইড্রোকার্বন ↑ উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে এর উৎপত্তি ঘটে। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো বিশুদ্ধ অ্যালোট্রোপিক ↑ কার্বন, বা কয়লা মাত্র।

ল্যাম্ব, ডাঃ ডব্লু, ই — মার্কিন পদার্থ বিজ্ঞানী; জন্ম 1913 খৃষ্টাব্দে, অদ্যাপি (1961 খৃস্টাব্দ) জীবিত। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা; পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। ডাঃ পলিকার্প কুশের ↑ সঙ্গে যুগ্মভাবে 1955 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

ল্যাম্বার্ট — আলোকের উজ্জ্বলতা পরিমাপের একক বিশেষ। যে-সব প্রতিফলক-তল থেকে আলোক-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, তার উজ্জ্বলতা বা দীপ্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যেই বিশেষভাবে এই 'ল্যাম্বার্ট' একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ কোন তলের ঔজ্জ্বল্য এক ল্যাম্বার্ট হবে যদি এক ক্যাণ্ডেলা ↑ পরিমাণের আলোক-পাতে সেই তলের এক বর্গ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান থেকে এক লুমেন ↑ আলোক প্রতিফলিত হয়।

ল্যামিনা — কোন পদার্থের পাত্‌লা স্তর বা পর্দা। 'ল্যামিনেটেড' অর্থে পাত্‌লা পর্দার মত সিটে পরিণত করা কোন পদার্থ বুঝায়, যেমন—'ল্যামিনেটেড ষ্টিল' বললে ইস্পাতের বিশেষ পাত্‌লা সিট বুঝায়; ল্যামিনেটেড প্ল্যাষ্টিক ↑ মানে কাগজের মত পাত্‌লা প্ল্যাষ্টিকের পাত।

ল্যারিংস — শ্বাস-নলের উর্ধ্বভাগের প্রায় দু'ইঞ্চি পরিমাণ অংশ; এটা একটা হাড়ের খাঁচার মত, যার মধ্যে আমাদের বাক্‌যন্ত্র অবস্থিত। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কোন কারণে শ্বাস-নলের এই ল্যারিংস অংশের স্ফীতি বা প্রদাহজনিত রোগকে বলা হয় **ল্যারিঞ্জাইটিস,** যাতে লোকের স্বরভঙ্গ হয়।

ল্যারিংস

স

সডি, ফ্রেডারিক — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী, জন্ম 1877 খৃষ্টাব্দে, অদ্যাপি (1961 খৃ:) জীবিত। অধ্যাপক রাদারফোর্ডের ↑ অধীনে পরমাণু-বিজ্ঞানের বিশেষ গবেষণা; পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (রেডিওঅ্যাক্টিভিটি ↑) ও আইসোটোপ ↑ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার। 1921 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

সফ্‌ট আয়রন — বিশুদ্ধ নরম লোহা; যে লোহার মধ্যে কার্বন বা অন্য কোন পদার্থ প্রায় থাকে না। উপযুক্ত পরিমাণে কার্বন মিশ্রিত করলে এরূপ লোহা কঠিন স্টিলে ↑ পরিণত হয়। এই সফ্‌ট আয়রন, বা কাঁচা লোহায় চৌম্বক শক্তি ষ্টিলের মত স্থায়ী হয় না; চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে এর মধ্যে পূর্ব-সঞ্জাত চৌম্বক ধর্ম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পায়। সফ্‌ট আয়রনে অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি হয় না; হলেও, তা তীক্ষ্ণধার হয় না এবং সহজেই ক্ষয়ে যায়। এ-লোহা আর্মেচার ↑ প্রভৃতি কোন কোন যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয় মাত্র।

সফ্‌ট ওয়াটার — মৃদু জল; যে জলে সাবান গুললে সঙ্গে সঙ্গে ফেনা হয়, এবং অল্প সাবানেই বস্ত্রাদি ভাল পরিষ্কৃত হয়ে থাকে। জলে ক্যাল-সিয়াম ↑, ম্যাগ্নেসিয়াম ↑, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর কোন সল্ট ↑ দ্রবীভূত থাকলে সেরূপ জলে সাবানের সঙ্গে ওই সব সল্টের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অদ্রাব্য পদার্থ জন্মায়; সাবানে ভাল ফেনা ওঠে না, যথেষ্ট সাবানেও কাপড় চোপড় তেমন পরিষ্কার হয় না। এরূপ ধাতব সল্ট মিশ্রিত জলকে বলে **হার্ড-ওয়াটার** ↑, বাংলায় বলে 'খর জল'। উল্লিখিত কোন রকম ধাতব সল্ট বর্জিত মোটামুটি বিশুদ্ধ জলকে বলে সফ্‌ট ওয়াটার।

সফ্‌ট সোপ — বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ পটাসিয়াম সল্টকে বলে 'সফ্‌ট সোপ'। চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক পটাসের ↑ রাসায়নিক মিলনে এ-জাতীয় নরম

সাবান তৈরি হয়। ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট হলো সাধারণ সোপ ↑; যে সাবান আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি। (স্তোপো-নিফিকেসন ↑)।

সর্ট সাইট — মাইয়োপিয়া ↑।

সর্ট সার্কিট — তড়িৎ-চক্রের যে ত্রুটির ফলে প্রয়োজনানুরূপ পথে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত না হয়ে হ্রস্বতম অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বাধামুক্ত পথে প্রবাহিত হয়ে যায়। প্রদত্ত চিত্রে তড়িৎ-উৎস যেন একটা ব্যাটারি ↑, বা জেনারেটর ↑। এর ইলেক্ট্রোড ↑ দুটা তড়িৎ-পরিবাহী তারের দ্বারা সংযুক্ত করে একটা তড়িৎচক্র (সার্কিট ↑) সম্পূর্ণ করা হয়েছে; যার ভিতরে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে বাতি জ্বলছে। এখন ওই চক্রের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তে ক ও প বিন্দুদ্বয় সহসা কোন কারণে যদি সংযুক্ত হয়ে পড়ে, (বা কোন তড়িৎ-পরিবাহী তারে যুক্ত হয়) তবে তড়িৎস্রোত হ্রস্বতম ক-প পথে প্রবাহিত হবে, পূর্বের চক্র-পথে আর যাবে না; ফলে বাতিও আর জ্বলবে না। এরূপ অবস্থাকে বলে সর্ট সার্কিট; তড়িৎ-স্রোত ক ও প বিন্দুতে 'সর্ট সার্কিটেড', অথবা 'সর্টেড' হয়েছে, এরূপ বলা হয়।
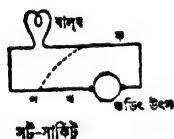
বাল্ব ক প খ তড়িৎ উৎস

সর্ট-সার্কিট

সল — যে-কোন কোলয়ড্যাল সলুসন; (কোলয়েড ↑)।

সল্ট (কেমিক্যাল) — রাসায়নিক লবণ; অ্যাসিড ↑ ও বেসের ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যে-কোন যৌগিক পদার্থ। কোন বেসের ধাতব পরমাণু (অথবা ধাতব প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন রেডিক্যাল ↑) কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটিয়ে তার স্থান অধিকার করার ফলে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়; যেমন— সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, (NaOH) মিলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) সল্ট। এরূপ পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl), ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) ইত্যাদি এক-একটা সল্ট।

সল্ট, (কমন) — সাধারণ খাদ্য-লবণকে বলে 'কমন সল্ট'; যার রাসায়নিক নাম হলো সোডিয়াম-ক্লোরাইড (NaCl)। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট; যে লবণ আমরা খাই।

সল্ট কেক — অবিশুদ্ধ সোডিয়াম সালফেট, $Na_2SO_4.10H_2O$ সল্ট; সোডা ↑, বা সোডিয়াম কার্বনেট তৈরির বিশেষ এক পদ্ধতির প্রথম পর্যায়ে যে জমাট-বাঁধা স্ফটিকাকার পদার্থ পাওয়া যায়। (লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস ↑)।

সল্ট পিটার — যাকে সাধারণতঃ বলে নাইটার ↑ ; রাসায়নিক নাম পটাসিয়াম নাইট্রেট ↑, (KNO_3)। বাংলায় একে বলে 'সোরা'। বাজি-বারুদ প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আবার 'চিলি সল্টপিটার' ↑ হলো সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$)।

সল্ট অব লেমন — পটাসিয়াম কোয়াড্রক্সলেট, $KH_3C_4O_8.2H_2O$, নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। এক প্রকার সাদা স্ফটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ, জলে বিশেষদ্রবণীয়। বিরঞ্জক পদার্থ হিসেবে এর জলীয় দ্রব দিয়ে জামা-কাপড়ের কালির দাগ সহজে তোলা যেতে পারে।

সল্ডার — ধাতব পদার্থের বিভিন্ন অংশ পরস্পর জোড়া লাগাবার জন্যে ব্যবহৃত নিম্ন-গলনাংকবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ সংকর ধাতু ; যা অল্প তাপে সহজে গলে গিয়ে ধাতব জোড়ামুখে লেগে যায়। একে বাংলায় বলে 'রাং ঝাল'। সাধারণতঃ সীসা ও টিন বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে **'সফ্‌ট সল্ডার'** তৈরি হয়। আর এক রকম সল্ডার তামা ও দস্তা মিশিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, যাকে বলে **'ব্রেজিং সল্ডার'**। ধাতব পদার্থ এভাবে জোড়া লাগাবার বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলে **সল্ডারিং**।

সলিউট — দ্রাব্য পদার্থ। সাধারণতঃ যে তরল পদার্থের মধ্যে অপর কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে সল্যুসনের ↑ সৃষ্টি করে তাকে বলে **সলভেন্ট**, অর্থাৎ দ্রাবক পদার্থ ; আর ওই দ্রবীভূত পদার্থকে বলে **সলিউট**, বাংলায় বলে দ্রাব্য পদার্থ। চিনির রসে জল সল্‌ভেন্ট বা দ্রাবক, চিনি সলিউট বা দ্রাব্য, আর ওই রস হলো সল্যুসন, অর্থাৎ চিনির জলীয় দ্রব বা দ্রবণ।

সলিড অ্যাঙ্গেল — সাধারণ জ্যামিতিক কোণ, বা অ্যাঙ্গেল হলো রৈখিক, বা সামতলিক কোণ ; যা ডিগ্রিতে পরিমিত হয়। পক্ষান্তরে কলার মোচার আকৃতিবিশিষ্ট কোন জিনিসের সূক্ষ্ম দিকটা কাটলে 'সলিড অ্যাঙ্গেল' অর্থাৎ 'নিরেট বা আয়তনিক কোণ' সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র ↑)। এরূপ আয়তনিক কোণ পরিমাপের একক হলো এমন একটা 'সলিড কোণ', যার কৌণিক ব্যাসার্ধ (রেডিয়াস ↑), অর্থাৎ কোণটির গভীরতা হবে এক ইঞ্চি এবং সমতলে কর্তিত বৃত্তাকার মুখের আয়তন হবে এক বর্গ ইঞ্চি।
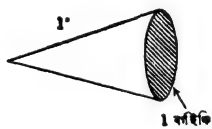
সলিড অ্যাঙ্গেল

সলিড স্টেট — পদার্থের কঠিন অবস্থা ; যে অবস্থায় পদার্থের সংগঠক অণুগুলো তাদের পারস্পরিক

আকর্ষণের ফলে দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়ে তার আকার-আয়তন নির্দিষ্ট রাখে। তাপ, চাপ প্রভৃতি বাইরের কোন শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত কঠিন পদার্থের আকারের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। যদিও তরল ও বায়বীয় অবস্থার মত কঠিন অবস্থায়ও পদার্থের অণুগুলো নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে; তবে কঠিন পদার্থে এই আণবিক স্পন্দন স্থিরাবস্থার দু'দিকে অতি সামান্য সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বলে অণুগুলো পরস্পরকে ছেড়ে যেতে পারে না। এ-জন্যেই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার অপরিবর্তিত থাকে। কঠিন পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে (চেঞ্জ অব স্টেট ↑)।

সলিড সল্যুসন — বিভিন্ন কঠিন পদার্থের একীভূত সংমিশ্রণ। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে যে-সব সংকর ধাতু উৎপন্ন হয় তাদের বলে ওই ধাতুগুলোর 'সলিড সল্যুসন'। অবশ্য তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থের দ্রবণ, অর্থাৎ একীভূত সংমিশ্রণকেই সাধারণতঃ সল্যুসন ↑ বলা হয়।

সলিডিফাইং পয়েণ্ট — স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন তরল পদার্থ যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (টেম্পারেচার ↑) জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তরল পদার্থ সবটা জমে সম্পূর্ণরূপে কঠিনাকার না হওয়া পর্যন্ত এর ওই উষ্ণতার, অর্থাৎ 'সলিডিফাইং পয়েণ্টের' কোন পরিবর্তন ঘটে না, একই থেকে যায়। একই বায়বীয় চাপে প্রত্যেক তরল পদার্থের এই 'সলিডিফাইং পয়েণ্ট' সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে (মেল্টিং পয়েণ্ট ↑)।

সলিনয়েড—কোন গোলাকার দণ্ডের গায়ে ধাতব তার জড়িয়ে যেরূপ তারকুণ্ডলী তৈরি হয়। ওই তারের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে কুণ্ডলীটার অভ্যন্তরে লম্বা-লম্বি ভাবে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে কোন লোহদণ্ড ওই তার-কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট করে রাখলে সেটা চৌম্বক-শক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে।
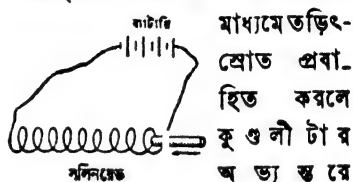
সলিস্টিস্ — পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটা ডিম্বাকার কক্ষপথে প্রতি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে; এর ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। এভাবে সম্বৎসরে পৃথিবী সূর্য থেকে দু'বার সবচেয়ে দূরবর্তী হয়।
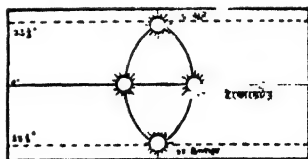
পৃথিবীর 'সলিষ্টিস' অবস্থান

পৃথিবীর এই দুই অবস্থানের দুটি দিনকে বলা হয় সলিষ্টিস্, বা 'অয়নান্ত

দিন'; 21 জুনকে বলা হয় উত্তর অয়নাস্ত দিন, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের উত্তরায়ন পথের শেষ দিন (সামার সলিস্টিস্ ↑); আর 22 ডিসেম্বর হলো 'দক্ষিণ অয়নাস্ত দিন' (উইণ্টার সলিস্টিস্)। উত্তর-অয়নাস্ত দিনে মধ্যাহ্নকালে কর্কট-ক্রান্তিতে (ট্রপিক-অব-ক্যান্সার, অর্থাৎ $23\frac{1}{2}°$ উত্তর অক্ষ-রেখা) অবস্থিত পৃথিবীর সকল স্থানে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে; আবার দক্ষিণ অয়নাস্ত দিনে মকর-ক্রান্তিতে (ট্রপিক-অব-ক্যাপ্রিকর্ণ, $23\frac{1}{2}°$ দক্ষিণ-অক্ষরেখা) অবস্থিত সকল দেশে মধ্যাহ্নকালে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। (ইকুইনক্স ↑)।

সল্যুসন — যে তরল পদার্থের মধ্যে এক বা একাধিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সাধারণতঃ তরল পদার্থের মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ গলে গিয়ে সবত্র সবভাবে পরিব্যাপ্ত থাকলে তাকেই বলা হয় সল্যুসন; বাংলায় বলে দ্রব, বা দ্রবণ। অবশ্য তরল পদার্থের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থের সল্যুসনও হতে পারে। আবার দুই বা ততোধিক কঠিন পদার্থের মিশ্রণে যে সংকরধাতু (অ্যালয় ↑) উৎপন্ন হয়, অথবা কঠিন পদার্থের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ পরিশোষিত হলে তাকেও এক রকম সল্যুসন বলা যেতে পারে (সলিড সল্যুসন ↑)।

সল্যুবিলিটি—কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সল্‌ভেণ্টের ↑ মধ্যে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সলিউট ↑ দ্রবীভূত থাকতে পারে, তার অনুপাতকে ওইসলিউটের সল্যুবিলিটি, বা দ্রাব্যতা বলে। সাধারণতঃ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম সল্‌ভেণ্টের (যেমন, জলের) মধ্যে যত গ্র্যাম সলিউট (যেমন, চিনি বা লবণ) দ্রবীভূত থাকতে পারে তাকেই ওই সলিউট পদার্থটার সল্যুবিলিটি, অর্থাৎ দ্রব্যতা বলা হয়।

সাইক্লোট্রন—উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকা (যেমন — আল্‌ফা পার্টিক্‌ল, প্রোটন, নিউটন ↑ প্রভৃতি) উৎপাদনের জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম জটিল যন্ত্র। যান্ত্রিক কৌশলে প্রচণ্ড গতি সঞ্চারণের ফলে এ-সব আয়নায়িত কণিকাগুলো লক্ষ লক্ষ 'ইলেক্ট্রন ভোল্ট' ↑ শক্তিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ শক্তিশালী কণিকার আঘাতে পদার্থের নিউক্লিয়াস ↑ (স্ট্রাক্‌চার অব অ্যাটম ↑) ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হয়। এভাবে সোডিয়াম ↑ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থের নিউক্লিয়াস বিভাজনের (ফিসন ↑) ফলে পদার্থটা সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয়, অর্থাৎ রেডিও অ্যাক্টিভ ↑ হয়ে ওঠে; আবার
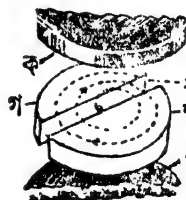
সাইক্লোট্রন

কোন কোন ক্ষেত্রে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্টি হয় (ট্রান্সমুটেসন অব এলিমেণ্ট ↑)। সাইক্লোট্রন যন্ত্রের মূল ব্যবস্থা মোটামুটি এরূপ : ইংরেজী D অক্ষরের অনুরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট শূন্যগর্ভ দুটি অর্ধবৃত্তাকার ইলেক্ট্রোডের উপরে-নিচে দুটা অতি শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বক স্থাপিত হয়। ওই ইলেক্ট্রোড-দ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ বায়ু-শূন্য ঘূর্ণায়মান পথে প্রবিষ্ট তড়িৎ-কণিকাগুলো বহিঃস্থ ওই শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এই অর্ধবৃত্তাকার ইলেক্ট্রোডকে বলে 'ডি'; বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গের প্রভাবে এই দুটা ডি-র অভ্যন্তরে বৃত্তাকারে ঘূর্ণনশীল ওই তড়িৎ-কণিকাগুলো ক্রমশঃ ত্বরান্বিত হতে থাকে। এরূপ সঞ্চরণের ফলে এ-গুলো ক্রমাগত দ্রুত গতিশীল হতে হতে ক্রমে উচ্চ তড়িৎ-বিভব বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে উপযুক্তরূপে শক্তিশালী হলে শেষে এদের প্রচণ্ড সংঘাতে পদার্থের ফিসন ↑ ঘটানো সম্ভব হয়ে থাকে।

সাইক্লোন — ঘূর্ণীবাত্যা। বায়ুমণ্ডলে একদিকে ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু-প্রবাহ এবং অপরদিকে উষ্ণ ও হাল্কা বায়ু-প্রবাহের মুখামুখী সংঘর্ষ ঘটলে স্থানীয় বায়ুর চাপ সহসা বেড়ে যায়, আর পরস্পরের বিপরীতমুখী চাপে বায়ুতে প্রচণ্ড ঘূর্ণন ও আলোড়ন দেখা দেয়। এই ঘূর্ণিত বায়ু-প্রবাহ প্রচণ্ড গতিতে একদিকে ছুটে চলে। ঘূর্ণীবাত্যার চলার পথে বিরাট ধ্বংসলীলা ঘটে। পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে বায়ুর এই ঘূর্ণিপাকের বিশেষ সম্পর্ক আছে; উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণীবাত্যায় বায়ুর ঘূর্ণন হয় বামাবর্তী (অ্যান্টিক্লক-ওয়াইজ) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে হয় দক্ষিণাবর্তী। পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রতীরবর্তী দেশেই সাধারণতঃ ঘূর্ণীবাত্যার সংখ্যা ও প্রচণ্ডতা বেশি লক্ষিত হয়।

সাইটোপ্লাজ্‌ম — উদ্ভিদ-কোষের অন্তর্বর্তী বিশেষ একটি তরল জৈব উপাদান ; যাকে প্রথম অবস্থায় বলে প্রোটোপ্লাজ্‌ম ↑ . অথবা 'জৈব পঙ্ক'। ক্রমে আয়তন বৃদ্ধির পরে কোষের নিউক্লিয়াস, বা কেন্দ্রীন-বস্তু এবং কোষ-প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশে যে তরল জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে বলে সাইটোপ্লাজ্‌ম ; এবং এর মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে উদ্ভিদের প্ল্যাষ্টিড ↑ কণিকাসমূহ, আর তাদের মাঝে মাঝে থাকে শূন্যস্থান বা ভ্যাকুয়োল ↑।

সাইট্রিক অ্যাসিড — সাদা স্ফটিকাকার একটি জৈবঅ্যাসিড, $C_6H_8O_7$; বিভিন্ন অম্লস্বাদযুক্ত ফলের, বিশেষতঃ লেবুর রস থেকে যথেষ্ট পাওয়া যায়। টক লেবুর রসে প্রায় 6% সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। নানা রকম অম্ল-স্বাদী স্বাস্থ্যকর পানীয় প্রস্তুত করতে অ্যাসিডটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাইফন — সাধারণ এক রকম যন্ত্র বিশেষ, যার সাহায্যে কোন পাত্রের তরল পদার্থ নিম্নতলে রক্ষিত অপর কোন পাত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত করা যায়। সাধারণ সাইফন কাচের বা রাবারের একটা বক্রনল মাত্র; ওই নলটা তরল পদার্থে সম্পূর্ণরূপে ভরতি করে তার একমুখ উচ্চতর পাত্রের তরল পদার্থে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পাত্রটার তরল পদার্থের উপরিভাগে যে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পড়ে, তারই প্রভাবে ওই তরল পদার্থ নলপথে উপরে উঠে যায় এবং ধীরে ধীরে নিম্নতল পাত্রের মধ্যে পড়তে থাকে। সাইফনের নল তরল পদার্থে ভরতি করে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা দরকার; নলের মধ্যে সামান্য বায়ু থাকলেও সাইফন ক্রিয়াশীল হয় না। সচরাচর কাঁচ বা রাবারের নল দিয়ে এরূপ সাইফন ব্যবস্থা করা হয়। এক পাত্রের তরল পদার্থ সাইফনের এই সহজ ব্যবস্থায় অনায়াসে অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়ে থাকে।

সাইফন

সাউণ্ড — শব্দ। আঘাতে বা অন্য কোন কারণে কোন বস্তুর বিশেষ দ্রুত কম্পনের ফলে সংলগ্ন বায়ুতে পর্যায়ক্রমিক চাপ-বৈষম্য ঘটে; ফলে সংলগ্ন বায়ুতে এক রকম তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত এই তরঙ্গমালা এসে কানের পর্দা স্পন্দিত করে শব্দের অনুভূতি জাগায়। বায়ু-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার উপরে শ্রোতার কানে শব্দের অনুভূতি হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করে (অডিবিলিটি লিমিট ↑)। বায়ুর মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গ লঙ্গিচিউডিন্যাল ↑ গতিতে প্রবাহিত হয়ে শ্রোতার কাণে এসে পৌছায়। তরল পদার্থের মাধ্যমেও শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে তা অপেক্ষাকৃত মৃদু। শব্দের তীব্রতা ও গতি তার মাধ্যমের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের গতি (0° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায়) প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 332 মিটার; ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল।

সান — সূর্য; জ্যোতিষ্ক বিশেষ। অনন্ত মহাশূন্যে ভাসমান একটা সুবিশাল জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। সূর্যের চারদিকে আমাদের পৃথিবীসহ সব গ্রহগুলো (সোলার সিস্টেম ↑) আপন-আপন উপবৃত্ত কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। সৌরপিণ্ডের ব্যাস প্রায় 8 লক্ষ 66 হাজার মাইল; এর ওজন (মাস ↑) 2×10^{27} টন বলে হিসাব করা হয়েছে। সূর্যের বিভিন্ন অংশের উষ্ণতা পড়ে প্রায় 5700° সেণ্টিগ্রেড হবে। সূর্যের অভ্যন্তরে তার গ্যাসীয় উপাদানগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত

পারমাণবিক ভাঙ্গা-গড়া চলছে; বিশেষতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম ↑ গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে; তা আবার হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ-সব প্রক্রিয়ার ফলে অহরহ প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সূর্যের উষ্ণতা বজায় রয়েছে, কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য এত প্রচণ্ড তাপ ছড়িয়ে চলেছে। সূর্য-রশ্মির স্পেক্ট্রাম অ্যানালিসিস ↑ (বর্ণালি বিশ্লেষণ) প্রক্রিয়ায় জানা গেছে, পৃথিবীতে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে তার অধিকাংশই সূর্যের অভ্যন্তরে গ্যাসীয় অবস্থায় বর্তমান।

সান স্পট — সৌর কলঙ্ক; বিশেষ ব্যবস্থায় সূর্য-গোলকের উপরিভাগে যে-সব অনুজ্জ্বল স্থান লক্ষিত হয়। চারিদিকের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় ওই সব স্থান নিষ্প্রভ হওয়ায় কালো দাগের মত দেখায়। মনে হয়, সূর্যের নিজস্ব একটা আবর্তনের ফলে ওই সব সৌর-কলঙ্কের স্থান পরিবর্তন ঘটে থাকে, সংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মোটামুটি প্রতি 11 বছর পরে-পরে পৃথিবী থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সৌরকলঙ্ক দৃষ্ট হয়ে থাকে। নৈসর্গিক কারণে সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ম্যাগ্নেটিক স্টর্মের ↑ তীব্রতা এবং অরোরা বোরিঅ্যালিসের ↑ ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

সাব্‌সয়েল—পৃথিবীর উপরিভাগের নরম মৃত্তিকা-স্তর ও নিম্নবর্তী কঠিন শিলা-স্তরের মাঝে বালুকা ও প্রস্তরাদি মিশ্রিত যে বিশেষ সছিদ্র মৃত্তিকা-স্তর রয়েছে। ভূগর্ভের এই স্তরেই ভূপৃষ্ঠের পরিশোধিত জল সঞ্চিত ও প্রবাহিত হয় (সাব্‌সয়েল ওয়াটার) এবং নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ এই জলই উত্তোলিত হয়ে থাকে।

সাব্লিমেট—উদ্বায়ী (ভোলাটাইল ↑) পদার্থের কঠিনীভূত বাষ্প। কর্পূর নিশাদল, (স্যাল্ অ্যামোনিয়াক ↑) প্রভৃতি উদ্বায়ী পদার্থ সামান্য উষ্ণতায়ই দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং আবদ্ধ পাত্রের উপরিভাগের শীতল গাত্রে জমে পুনরায় কঠিন হয়, একেই বলে সাব্লিমেট। এই **সাব্লিমেসন** প্রক্রিয়ার সাহায্যে অবিশুদ্ধ উদ্বায়ী পদার্থ বিশুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

সার্কল — বৃত্ত; কোন স্থির বিন্দুর সমদূরবর্তীভাবে অপর কোন বিন্দুর সঞ্চরণ-পথের (লোকাস ↑) দ্বারা সীমাবদ্ধ গোলাকার ক্ষেত্র। ওই স্থির বিন্দুকে বলে বৃত্তের কেন্দ্র, বা **সেণ্টার**; আর ওই গোলাকার সঞ্চরণ-রেখাকে বলে বৃত্তের পরিধি, বা **সারকাম্ফারেন্স**। কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সরল রেখাকে বলে ব্যাসার্ধ বা **রেডিয়াস**; এই ব্যাসার্ধ রেখা উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তাকে বলে বৃত্তের ব্যাস, বা **ডায়মেটার**। পরিধির

যে-কোন দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরল রেখাকে বলে বৃত্তের জ্যা, বা **কর্ড**। কোন বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$ এবং ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$; এখানে r হলো ব্যাসার্ধ, বা রেডিয়াস এবং π (পাই ↑) হলো একটি নির্দিষ্ট রাশি, $= 3{\cdot}14159\cdots$, = প্রায় 22/7।

সার্কিট (ইলেক্ট্রিক্যাল) — তড়িৎ-চক্র; তড়িৎপ্রবাহের সম্পূর্ণ চক্রাকার গতিপথ। তড়িৎ-পরিবাহী তারের অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ চক্রাকার মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ সম্ভব হয়ে থাকে। যদি তড়িৎ-স্রোত কোন ব্যাটারি ↑ বা জেনারেটর থেকে বেরিয়ে তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের মাধ্যমে ঘুরে পুনরায় উৎসে ফিরে আসে, অর্থাৎ উৎসের পজিটিভ ও নেগেটিভ ইলেক্ট্রোডদ্বয় ↑ অবি-

ওপেন সার্কিট ক্লোজড সার্কিট
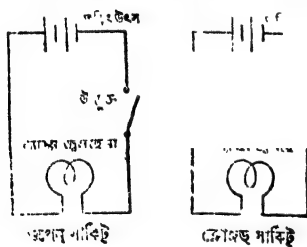
চ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়, তবেই একটি সম্পূর্ণ তড়িৎ চক্র, বা সার্কিট রচিত হবে। তড়িৎপ্রবাহ একই তারের মাধ্যমে উৎস থেকে বাল্বের ফিলামেন্টের ↑ ভিতর দিয়ে আবার ব্যাটারিতে ফিরে এলেই সার্কিট সম্পূর্ণ হয়, ও বাতি জ্বলে। সার্কিটের এক স্থানে 'সুইচ' বসিয়ে প্রয়োজনানুসারে তারের সংযোগ উন্মুক্ত ও সংযুক্ত করে 'ওপেন সার্কিট' ও 'ক্লোজ্‌ড সার্কিট' করা হয়। এই ব্যবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত বা বন্ধ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

সারকোমা — দূষিত মাংস-পেশীর বৃদ্ধি; ক্যান্সার রোগে যেমন হয়।

সার্ড — অনির্ণেয় বর্গমূল; যেমন, $\sqrt{5}$, বা $\sqrt{7}$, অর্থাৎ 5-এর, বা 7-এর বর্গমূল; যে রাশি সুনির্দিষ্ট-ভাবে নির্ণয় করা যায় না।

সাল্‌ফাইড — বিভিন্ন ধাতব বা, অধাতব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সাল্‌ফারের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন দ্বিপাক্ষিক (বাইনারি ↑) যৌগিকের সাধারণ নাম। সাধারণতঃ বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিড-ধর্মী হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইডের (H_2S) ↑ বিক্রিয়ায় এটা উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফার — গন্ধক, মৌলিক অধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 32·00, পারমাণবিক সংখ্যা 16. (অ্যাটমিক নাম্বার ↑)। বিভিন্ন ধাতব পাইরাইট ↑ খনিজ থেকে গন্ধক নিষ্কাশিত হয়ে থাকে; যেমন—আয়রন পাইরাইট, FeS_2, কপার পাইরাইট, $CuFeS_2$, (যাকে বলে 'ফুল্‌স গোল্ড')। আবার কোন কোন দেশের ভূগর্ভে বিশুদ্ধ সাল্‌ফারের স্তর রয়েছে; 'ফ্রাস' পদ্ধতিতে উত্তপ্ত জল পাম্প করে নলপথে

প্রবেশ করিয়ে সেই সালফার গলিয়ে উপরে তোলা হয়। পদার্থটা নীলাভ শিখায় জ্বলে, এবং অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড, SO_2, গ্যাস উৎপন্ন করে। উত্তাপে বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে এর সংযোগে বিভিন্ন ধাতব 'সাল্‌ফাইড' যৌগিক উৎপন্ন হয়। সাল্‌ফার বিভিন্ন আকারে (অ্যালোট্রপি ↑) থাকতে পারে — স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে 'রম্বিক' গঠনের স্ফটিকাকারে, যাকে বলে **আল্‌ফা সাল্‌ফার**। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ↑, H_2SO_4, কার্বন-ডাই-সাল্‌ফাইড ↑, CS_2, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থের এটা একটা মুখ্য উপাদান। রাবার ভাল্‌ক্যানাইজিং ↑ এবং বিভিন্ন রঞ্জক ও রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে, ঔষধে, পোকা-মাকড়-নাশক হিসাবে এর বহুল ব্যবহার আছে। জীবদেহের নানা আভ্যন্তরীণ জৈব ক্রিয়ায়ও এর প্রয়োজন অপরিহার্য।

সাল্‌ফার ট্রাইঅক্সাইড — সাদা, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, SO_3; জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, H_2SO_4, উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড — বর্ণহীন, শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস, SO_2; সাল্‌ফার জ্বালালে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে এর উৎপত্তি হয়। গ্যাসটা পোকা-মাকড় ধ্বংস করে। তরলীকৃত অবস্থায় হিমায়ক যন্ত্রে (রিফ্রিজারেটর ↑) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাল্‌ফার ড্রাগ — সাল্‌ফোনেমাইড, $SO_2.NH_2$, শ্রেণীর বিভিন্ন গঠনের জৈব রাসায়নিক যৌগিক। বিভিন্ন সব জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া ↑)-ঘটিত রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ। সাল্‌ফানিলেমাইড, প্রণ্টোসিল ↑, প্রভৃতি বিভিন্ন ঔষধ এই শ্রেণীর। এগুলি সাধারণভাবে **সাল্‌ফা ড্রাগ্‌স** নামে পরিচিত।

সাল্‌ফার পয়েণ্ট — বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে সাল্‌ফার, বা গন্ধক 112·8° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়; আর বাষ্পীভূত হয় 444·6° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায়। এই দুই উষ্ণতাকে বলে সাল্‌ফার পয়েণ্ট। প্রামাণ্য চাপ (অর্থাৎ, স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ারিক প্রেসার ↑) এবং এই দুই উষ্ণতায় (টেম্পারেচার ↑) যথাক্রমে পদার্থটার তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার স্থিরতা (ইকুইলিব্রিয়াম ↑) রক্ষিত হয়।

সাল্‌ফিউরাস অ্যাসিড — সালফার-ঘটিত একটি মৃদু অ্যাসিড H_2SO_3, সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইডের, SO_2, জলীয় দ্রবণ; সামান্য অ্যাসিডধর্মী। ধাতব ক্ষারের সঙ্গে এই অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **সাল্‌ফাইট** লবণ উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড—সাল্‌ফার-ঘটিত একটা তীব্র অ্যাসিড, H_2SO_4,

যাকে বলে 'অয়েল অব ভিট্রিয়ল'। বর্ণহীন, তৈলবৎ তরল পদার্থ। সর্বশিল্পে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মুখ্য অ্যাসিড। অত্যন্ত জারকধর্মী; জৈব পদার্থ সব পুড়িয়ে দেয়। জলের সংযোগে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে তীব্র বিক্রিয়া ঘটে। সাল্‌ফারের বিভিন্ন বিক্রিয়ায় 'লেড চেম্বার' ও 'কন্‌ট্যাক্ট' পদ্ধতিতে তৈরি হয়। এটা একটা দ্বিক্ষারক (ডাইবেসিক ↑) অ্যাসিড, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাল্‌ফেট ↑ ও বাই-সাল্‌ফেট ↑ সল্ট উৎপন্ন করে। অন্যান্য অ্যাসিড প্রস্তুতিতে, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এবং অ্যাকুমুলেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে অত্যাবশ্যক। প্রায়-নির্জল বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিডকে বলে **অলিয়াম** ↑।

সাল্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন—হাইড্রোজেন-সাল্‌ফাইড, H_2S নামক গ্যাসীয় পদার্থ; পচা ডিমের গন্ধযুক্ত। বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস, সামান্য অ্যাসিড-ধর্মী। ধাতব ক্ষারের সঙ্গে এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাল্‌ফাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফেট -সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পূর্ণ-শমিত বিভিন্ন লবণের সাধারণ নাম; এর অর্ধ-শমিত লবণ হলো বাইসালফেট ↑ সল্ট। অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, $(NH_4)_2SO_4$, নামক লবণটি কৃত্রিম সার হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সায়েনাইড — হাইড্রোসায়েনিক (HCN) অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট ↑; যেমন, পটাসিয়াম সায়েনাইড, KCN। সায়েনাইড সল্ট মাত্রেই তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। সিল্‌ভার প্লেটিং ↑ প্রক্রিয়ায় এবং স্বর্ণঘটিত খনিজ প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ সোনা নিষ্কাশনের জন্যে সায়েনাইড সল্ট প্রয়োজন হয়।

সায়েনেট—সায়েনিক (HCNO) অ্যাসিডের সল্ট; যেমন—পটাসিয়াম সায়েনেট, KCNO। সব সায়েনেট সল্টগুলোই সায়েনাইড সল্টের মত তীব্র বিষাক্ত পদার্থ।

সায়েনোজেন — তীব্র বিষাক্ত বর্ণহীন গ্যাস, C_2N_2; এর রাসায়নিক ধর্ম হ্যালোজেনের ↑ অনুরূপ। হ্যালোজেন শ্রেণীর ক্লোরিন ↑ গ্যাস যেমন বিভিন্ন ক্লোরাইড সল্ট সৃষ্টি করে, সায়েনাজেন ও তেমনই বিভিন্ন সায়েনাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন করে।

সায়েনোটাইপ — ব্লু-প্রিন্ট ↑।

সায়েন্যামাইড — একটা বর্ণহীন স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ, NH_2CN; হাইড্রোসায়েনিক ↑ অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে গঠিত অ্যামাইড ↑ শ্রেণীর সল্ট। অবশ্য কেবল সায়েন্যামাইড বললে সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড, $CaCN_2$, বুঝায়। পদার্থটা আবার **নাইট্রো-লাইম** ↑ নামেও

পরিচিত, যা উদ্ভিদাদির পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট রাসায়নিক সার।

সাহা,ডাঃ মেঘনাদ —প্রখ্যাত ভারতীয় (বাঙ্গালী) পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1893 খৃঃ, মৃত্যু 1856 খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। লণ্ডন ও বার্লিনে গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা ; 'কার্নেগি গবেষণা বৃত্তি' লাভ। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 1934 খৃঃ। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস) ; আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির সদস্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য দান এবং পদার্থবিজ্ঞানের বহু মৌলিক তথ্য আবিষ্কারে বিপুল খ্যাতি। অপূর্ব সংগঠন প্রতিভা ; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

সাহানি, অধ্যাপক রীরবল — ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী ; পাঞ্জাবে জন্ম 1891 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1949 খৃঃ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের (উদ্ভিদ বিজ্ঞানে) ডি. এস-সি। বেনারস ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান ; উদ্ভিদের বিবর্তনবাদ সম্পর্কীয় গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর.এস)। শেষ জীবনে প্রাচীনকালের উদ্ভিদ সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য 'প্যালিও-বোটানি ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা ও সঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি দান।

সি-ওয়াটার — সমুদ্রজল। লবণাক্ত সমুদ্রজলে লবণ ব্যতীত আরও নানা রকম ধাতব রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। মোটামুটি হিসেবে সমুদ্রজলে থাকে—জল 96·4%, লবণ (কমন সল্ট ↑, NaCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড) 2·8%, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) 0·4%, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$) 0·2%, ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) প্রত্যেকটি 0·1% ; এ-সব ছাড়া সামান্য পরিমাণে ব্রোমাইড ↑ এবং আয়োডাইড ↑ সল্ট ও কোথাও কোথাও সমুদ্রজলে পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বদা সব সমুদ্রের জলই যে উল্লিখিত অনুপাতে লবণাক্ত হবে এমন কোন কথা নেই, তবে মোটামুটি এরূপ হয়ে থাকে।

সিক্যাণ্ট — (1) বৃত্তের ছেদক ; অর্থাৎ যে সরল রেখা কোন বৃত্তের পরিধি ছেদ করে উভয় দিকে চলে যায় এবং বৃত্তকে দুই সেগমেণ্ট ↑ বা অংশে বিভক্ত করে।

সিক্যাণ্ট
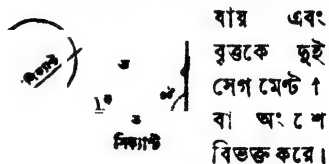
এই সিক্যাণ্ট, বা ছেদক দ্বারা বিভক্ত পরিধির দুই অংশকে বলে বৃত্তচাপ

(আর্ক ↑)। (2) সমকোণী কোন ত্রিভুজের অতিভুজ (হাইপটেনিউজ) ÷ ভূমি (বেস্‌) অর্থাৎ H/B ; এই অনুপাতকে বলে ভূমিসংলগ্ন (ক) কোণের সিক্যান্ট ; যাকে সংক্ষেপে লেখা হয় Sec ক।

সিড্‌লিজ পাউডার — সোডিয়াম বাইকার্বনেট ↑, রোসেল সল্ট ↑ ও টার্টারিক অ্যাসিড ↑ মিশিয়ে এই চূর্ণ তৈরি হয়। জলে দিলে এ থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোয়। অম্লস্বাদযুক্ত এই জলীয় দ্রব পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; আর মৃদু জোলাপের কাজ করে।

সিডারাইট — এক প্রকার লৌহ-খনিজ ; স্বভাবজাত অবিশুদ্ধ ফেরাস কার্বনেটের ($FeCO_3$) বিশেষ নাম। এই খনিজ প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

সিক্রেটিন — খাদ্য গ্রহণের পরে অন্ত্রের উর্ধাংশের গ্রন্থিগুলি থেকে যে মিশ্র জৈব রস নিঃসরিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে প্যান্‌ক্রিয়াসে ↑ যায় এবং সেখান থেকে পরিপূর্ণ জারক রস অন্ত্রস্থ ভুক্ত খাদ্যের সঙ্গে মেশে। এই 'সিক্রেটিন' রস যকৃতে উৎপন্ন বাইল ↑ রসের নিঃসরণেও সাহায্য করে, যার ক্রিয়ায় ভুক্ত খাদ্যের স্নেহপদার্থ জীর্ণ হয়ে থাকে।

সিডিরিয়্যাল ইয়ার — আপন উপবৃত্ত (ডিম্বাকার) কক্ষপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে ; অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বছর, = 365·2564 সৌর দিন। মহা-শূন্যের কোন স্থির জ্যোতিষ্কের তুলনায় এই সময়কালে (বছরে) সূর্য যেন আবার আর একটা উপবৃত্ত কক্ষপথে জ্যোতিষ্কটাকে এক বার প্রদক্ষিণ করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কোন গ্রহের 'সিডিরিয়্যাল ইয়ার' হলো তার আপন কক্ষপথে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটার (পৃথিবীর হিসাবে) যত দিন লাগে ; যেমন, এই হিসাবে মঙ্গলগ্রহের 'সিডিরিয়্যাল ইয়ার' হলো আমাদের 687 দিন (মার্স্‌ ↑)।

সিডিরিয়্যাল ডে — নাক্ষত্রিক দিন ; কোন আপাতদৃষ্ট স্থির জ্যোতিষ্কের তুলনায় আপন মেরুদণ্ডের উপরে পৃথিবীর একবার আবর্তিত হতে যে সময় লাগে। সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর এই সময় হলো আমাদের সাধারণ সৌর দিন, মোটামুটি 24 ঘণ্টা।

সিন্‌ক্রোট্রন — পরমাণু-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এক রকম বিশেষ যন্ত্র ; যার যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রন ↑ প্রভৃতি তড়িৎ-কণিকাসমূহকে অত্যধিক দ্রুত গতিশীল ও শক্তিশালী করা সম্ভব হয়ে থাকে। বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকাকে প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট করবার পক্ষে এ-যন্ত্র বিটাট্রন ↑ ও সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্রের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। বস্তুতঃ শেষোক্ত যন্ত্র দু'টার সম্মিলিত কৌশলে সিন্‌ক্রোট্রন যন্ত্রের জটিল

ব্যবস্থাদি পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত হয়েছে।

সিনাবার — খনিজ মারকিউরিক সালফাইড, HgS ; বিশেষ চক্‌চকে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। এই খনিজ থেকেই অধিকাংশ মার্কারি ↑, অর্থাৎ পারদ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বাংলায় একে বলে হিঙ্গুল।

সিম্‌পোডিয়াম — যে-সব উদ্ভিদের কাণ্ডের গাঁটে-গাঁটে মুকুলোদ্‌গম হয়ে হয়ে ক্রমাগত বেড়ে যায়, কিন্তু কাণ্ডের অগ্রভাগ মুকুলিত হয় না।

সিম্‌পোডিয়াম উদ্ভিদ

সাধারণতঃ এ জাতীয় উদ্ভিদকাণ্ড মাটির নিচে বেড়ে চলে, মুকুলগুলি মাটির উপরে গজিয়ে ওঠে।

সিমন্‌ডস ডিজিজ — অকালবার্ধক্য; দেহের পিটুইটারি ↑ গ্রন্থির বিকলতায় অল্প বয়সেই বার্ধক্যের সব লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার রোগ বিশেষ।

সিম্‌বায়োসিস — জৈব ক্রিয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতা। বিভিন্ন দু'টা উদ্ভিদ অথবা প্রাণী একসঙ্গে পরস্পরের কল্যাণকর সাহচর্যে ও সহযোগিতায় বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া; যেমন, বিশেষ বিশেষ জীবাণুরা (ব্যাক্টিরিয়া ↑) মটর, বিন্ প্রভৃতি উদ্ভিদের শিকড়ে বাসা বেঁধে পরস্পর পরস্পরকে পুষ্টি জোগায় ও বাঁচিয়ে রাখে। আবার উইপোকার পেটে এক রকম বিশেষ জীবাণু থাকে যারা উইকে কাঠের উদ্ভিজ্জ তন্তু (সেলুলোজ ↑) জীর্ণ করতে সাহায্য করে এবং নিজেরাও বেঁচে থাকে।

সিমেন — শুক্র, বা বীর্যরস; পুং-প্রজননাঙ্গে উৎপন্ন ও উত্তেজনা-কালে জননেন্দ্রিয় থেকে নিঃসৃত ঘন তরল পদার্থ। এর মধ্যে ভাসমান থাকে আণুবীক্ষণিক আকারের শুক্রকীট, বা স্পার্মাটোজা ↑ ; অর্থাৎ বংশানুক্রমের জীব-কণা।

শুক্রকীট

সিমেণ্ট — ইমারতাদি তৈরির জন্যে যে চূর্ণ পদার্থ জল মিশিয়ে লাগালে জমে অত্যন্ত কঠিন হয়ে এঁটে যায়। পদার্থটা রাসায়নিক হিসেবে মোটামুটি ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট ↑ জাতীয় পদার্থের মিলনে গঠিত। জল মেশালে জমে যাওয়ার সময়ে এর মধ্যে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। বিশেষ এক রকম লাইম স্টোন ↑ ও মাটি মিশিয়ে অত্যধিক তাপে গলিয়ে 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট' তৈরি হয়ে থাকে। এভাবে উৎপন্ন জমাট বাঁধা পদার্থটাকে পরে 'গ্রাইণ্ডিং' যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ করে সাধারণ সিমেণ্ট পাওয়া যায়।

সিমেণ্টাইট — লোহা ও কার্বনের মিলনে উৎপন্ন একটা বাইনারি

কম্পাউণ্ড ↑। পদার্থটার রাসায়নিক নাম ‘আয়রন কার্বাইড’, Fe_3C; অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর পদার্থ। কাস্ট আয়রনে ↑ পদার্থটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলে তা এত ভঙ্গুর হয়। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ অল্প ও উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত থাকে স্টিল ↑, বা ইস্পাতে।

সিরাম — (1) রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলো যে এক রকম হরিদ্রাভ রসে ভেসে থাকে। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ওই রক্তকোষ-গুলোকে পৃথক করে ফেললে এই সিরাম, বা জৈব-রস পাওয়া যায়। একে সাধারণতঃ বলে লিম্‌প ↑। (2) বিশেষতঃ ঘোড়ার দেহে কোন রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে তার রক্ত-কোষের তরল পদার্থে ওই রোগ-জীবাণুর প্রতিরোধক অ্যান্টি-বায়োটিক ↑ পদার্থ সৃষ্টি করা হয়; বিশেষ অর্থে একেও বলে সিরাম। ঘোড়ার এরূপ সিরাম নিয়ে ওই বিশেষ জীবাণু-দুষ্ট রোগীর দেহে অনুপ্রবেশ করানো হয়, যাকে বলে ‘সিরাম ইন্‌জেক্‌সন’। এই সিরামের অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ রোগীর দেহের রক্তে প্রবিষ্ট-জীবাণুদের রোগাক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি রোধ করে।

সিরিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Ce, পারমাণবিক ওজন 140·13, পারমাণবিক সংখ্যা 58; ইস্পাতের মত কতকটা ধূসর বর্ণের, কিন্তু নরম ধাতু। মোনা-জাইট ↑ প্রভৃতি কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য খনিজ থেকে পাওয়া যায়। গ্যাস লাইটের ম্যাণ্টেল ↑ ও সিগারেট-লাইটারের তথাকথিত ফ্লিণ্ট ↑ নামক পাইরোফোরিক ↑ অ্যালয়ে সিরিয়াম ধাতু মেশানো হয়।

সিল্‌ভার — রৌপ্য, মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ag (আর্জেণ্টাইন), পারমাণবিক ওজন 107·85, পার-মাণবিক সংখ্যা 47; বেশ সাদা ও অপেক্ষাকৃত নরম ধাতব পদার্থ। সহজেই এর তার ও পাত করা যায়। এটা সব চেয়ে ভাল তড়িৎ-পরিবাহী ধাতু। কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ অবস্থায় রৌপ্য পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ রৌপ্যই সিলভার সাল-ফাইড (Ag_2S), সিল্‌ভার ক্লোরাইড, ($AgCl$) প্রভৃতি খনিজ যৌগিক থেকে নিষ্কাশিত হয়। খনিজ সিলভার সালফাইড সাধারণতঃ **আর্জেণ্টাইন**, বা **সিল্‌ভার-গ্ল্যান্স** নামে পরি-চিত। ‘সিলভার ক্লোরাইড’ খনিজকে বলা হয় **হর্ন-সিল্‌ভার**। মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি তৈরি করবার জন্যে রূপা যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফিতে ↑ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিল্‌ভার নাইট্রেট — একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ‘সিলভার সল্ট’, $AgNO_3$; পদার্থটা **লুনার কস্টিক** ↑ নামেও পরিচিত। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ,

জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজে, ঔষধ হিসেবে ও ধোবার কাপড় চিহ্নিত করার কালি (মার্কিং ইঙ্ক) তৈরি করবার জন্যে সল্টটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

সিল্‌ভার প্লেটিং—রূপার ইলেক্ট্রো-প্লেটিং ↑; কোন সিল্‌ভার সল্টের মাধ্যমে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন ধাতব জিনিসের উপরে রূপার পাত্‌লা আস্তরণ দেওয়ার কৌশল।

সিলিকন — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Si, পারমাণবিক ওজন 28·06, পারমাণবিক সংখ্যা 14; রাসায়নিক হিসেবে কার্বনের ↑ অনুরূপ একটা মৌলিক পদার্থ। এর দু'রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়—একটা পাট্‌কিলে রঙের চূর্ণ; অপরটা গাঢ় ধূসর বর্ণের স্ফটিকাকার। বিভিন্ন প্রকার স্বভাবজাত সিলিকা ↑, সিলিকেট ↑ প্রভৃতি হলো এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে গঠিত।

সিলিকা — সিলিকন ডাইঅক্সাইড, SiO_2; বিশুদ্ধ বালুকা। বর্ণহীন কঠিন অদ্রাব্য পদার্থ। অত্যধিক তাপ ব্যতীত গলে না। সাধারণ বালুকা, কোয়ার্জ ↑, ফ্লিণ্ট ↑, রক ক্রিস্টাল ↑ প্রভৃতি সবই মূলতঃ সিলিকা; বিভিন্ন আকারে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কাঁচের প্রধান উপাদান হলো এই সিলিকা গ্লাস ↑); বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন ধাতব সিলিকেট ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে; যেমন, সোডিয়াম সিলিকেট, $NaO.SiO_2$ অর্থাৎ $NaSiO_3$; অনুরূপ পদার্থ ক্যালসিয়াম সিলিকেট, $CaSiO_3$; যা বিভিন্ন পাথরের একটা প্রধান উপাদান।

সিলিকেট — সিলিসিক অ্যাসিডের (H_2SiO_3) বিভিন্ন সল্ট। সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে সিলিকার ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন পাথর, মাটি প্রভৃতি হলো ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালু-মিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর এরূপ সিলিকেট পদার্থে গঠিত। ধাতব সিলিকেট সবই সিলিকার ↑, অর্থাৎ বালির ধাতব যৌগিক রূপ।

সিলিকোন্‌স — সিলিকন অক্সাইড (SiO) ও বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ বিশেষ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন প্ল্যাস্টিকের ↑ মত এক শ্রেণীর জৈব পলিমার ↑ পদার্থ। এরূপ পদার্থের রাসায়নিক গঠনের সাধারণ ফর্মুলা হলো $(R_2SiO)n$; এর মধ্যে R হলো হাইড্রোকার্বন রেডিক্যাল ↑, n হলো সেই সংখ্যা যত সংখ্যক অণু মিলিত হয়ে পলিমারিজেশন ↑ ঘটে। এই শ্রেণীর পদার্থগুলোর জল, তাপ ও তড়িৎ-শক্তি প্রতিরোধ করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। জলের মধ্যে, বা অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে ব্যবহার করবার জন্যে রেজিন ↑,

ল্যাকার ↑ প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে সিলিকোনস মিশ্রিত করা হয়।

সিলিজ্ গ্রীণ — উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ; রাসায়নিক হিসেবে হলো অবিশুদ্ধ কিউপ্রিক আর্সেনাইট, $Cu_3(AsO_3)_2H_2O$; একটা বিষাক্ত পদার্থ। পোকা-মাকড় ধ্বংস করতে ও পিগ্‌মেণ্ট ↑ তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

সিস্‌মোগ্রাফ — ভূ-কম্পন নির্দেশক যন্ত্র; ভূমিকম্পের সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের অতি সামান্য কম্পনেও এরূপ যন্ত্রের শলাকা কম্পনের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী আন্দোলিত হয়ে প্লেটের উপরে তরঙ্গায়িত রেখাপাত করে।

সুটিং স্টার — যে মিটিওরাইট ↑ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার ফলে বায়ুর সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে; আর তাকে জ্বলন্ত একটা নক্ষত্র যেন আকাশের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায় বলে মনে হয়। এজন্যে একে সাধারণতঃ বলা হয় 'সুটিং স্টার'; বাংলায় বলে নক্ষত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে এটা নক্ষত্র নয়; অতি দ্রুত গতিশীল জ্বলন্ত মিটিওরাইট, বা উল্কাপিণ্ড মাত্র।

সুপারকুলিং — প্রত্যেক তরল পদার্থ-ই একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (টেম্পারেচার) ঠাণ্ডা করলে তা জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়; এই উষ্ণতাকে ওই তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েণ্ট ↑, বা হিমাংক বলে। বিশেষ অবস্থায় কোন তরল পদার্থকে আবার এই ফ্রিজিং পয়েণ্টের নিম্নতর উষ্ণতায়ও ঠাণ্ডা করা যেতে পারে; কিন্তু তরল পদার্থটা জমে কঠিন হয় না। কোন তরলকে এরূপ অতি-শীতল করবার ব্যবস্থাকে বলে 'সুপার কুলিং'; আর ওই তরল পদার্থের তখন **মেটাস্টেব্‌ল** অবস্থা বলে। কোন কঠিন পদার্থের একটা ক্ষুদ্র দানা ওর মধ্যে ফেলে দিলে, কখন কখন বা সামান্য একটু নাড়া-চাড়া দিলেই ওই তরল পদার্থ জমে সম্যক কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ওর উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে আবার তার নির্দিষ্ট 'ফ্রিজিং পয়েণ্ট' উষ্ণতায় উঠে যায়।

সুগার অব লেড — লেড অ্যাসিটেট; মিষ্টস্বাদযুক্ত, কিন্তু বিষাক্ত একটি অজৈব যৌগিক পদার্থ।

সুপার নোভা — মহাশূন্যের স্তিমিত (মৃতপ্রায়) তারকাকে বলে **নোভা**, এদের তাপ ও জ্যোতির উৎস (হাইড্রোজেন, ফিসন ↑) নিঃশেষিত হয়ে উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচনের ফলে এদের অভ্যন্তরস্থ জ্বলন্ত অংশ বেরিয়ে এসে মাঝে মাঝে সহসা এদের উজ্জ্বল দেখায়। কখন কখন এরূপ স্তিমিত তারকা, বা নোভার অভ্যন্তরস্থ জ্বলন্ত ও গলিত পদার্থের পারমাণবিক রূপান্তরের (ট্রান্সমুটেসন ↑) ফলে উত্তাপ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং সহসা

বিশেষ উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থায় একে বলে 'সুপার নোভা'।

সুপার প্লানেট — সৌর পরিবারের (সোলার সিষ্টেম ↑) যে-সব গ্রহের দূরত্ব (সূর্য থেকে) পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ যে-সব গ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে আছে; যেমন—মঙ্গল (মারস ↑), বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) প্রভৃতি গ্রহ; এদের **সুপিরিয়র প্লানেটও** বলে। আর পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের নিকটবর্তী বুধ (মার্কারি ↑) ও শুক্র (ভেনাস ↑) নামক গ্রহ দুটিকে বলা হয় 'ইন্‌ফিরিয়র' প্লানেট।

সুপার ফস্‌ফেট — সাধারণতঃ 'সুপার ফস্‌ফেট অব লাইম' বুঝায়; এক রকম কৃত্রিম রাসায়নিক সার (ফার্টিলাইজার ↑)। এর রাসায়নিক গঠনে 'ক্যালসিয়াম-ডাইহাইড্রোজেন ফস্‌ফেট' থাকে। এভাবে যথেষ্ট ফস্‌ফেট ↑ ও ক্যালসিয়াম থাকায় পদার্থটা জমিতে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুপারসোনিক্‌স — শব্দ-তরঙ্গের শ্রুতিসীমা (অডিবিলিটি লিমিট ↑) অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত স্পন্দনশীল শব্দ-তরঙ্গ। বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোয়ার্জ ↑ কৃস্ট্যালের দ্রুত স্পন্দন ঘটিয়ে এরূপ অত্যধিক স্পন্দনবিশিষ্ট তরঙ্গমালা উৎপন্ন করা যায়। একে **আলট্রাসোনিক্‌স-ও** বলে। শ্রুত শব্দ-তরঙ্গের গতি (সাউণ্ড ↑) প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ফুট, ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল। এর চেয়ে অধিক গতিশীলতা বুঝাতেও কখন কখন সুপারসোনিক, বা আল্‌ট্রাসোনিক কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, কোন এরোপ্লেনের 'সুপারসোনিক' গতি বললে বুঝতে হবে, সেটা শব্দ-তরঙ্গের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে।

সুপার স্যাচুরেসন — অতি-সম্পৃক্ততা। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ কোন দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবকে বলে 'স্যাচুরেটেড সল্যুসন' ↑। বিশেষ অবস্থায় কখন কখন ওই দ্রবের মধ্যে আরও দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকতে পারে। কোন তরল পদার্থের এরূপ অবস্থাকে বলা হয় 'সুপারস্যাচুরেসন'; আর ওই দ্রবের তখন মেটাস্টেব্‌ল অবস্থা বলা হয়। ওই দ্রাব্য পদার্থের একটা ক্ষুদ্র দানা ওর মধ্যে ফেলে দিলে দ্রবের এই অতিসম্পৃক্ত অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অতিরিক্ত দ্রবিত পদার্থ স্ফটিকাকারে পৃথক হয়ে পড়ে।

সুপারহিটেড স্টিম — যে জলীয় বাষ্প 100° সেন্টিগ্রেড অপেক্ষাও বেশি উত্তপ্ত। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জল 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয় এবং উৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও সেই 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ

ব্যবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে (বায়ুমণ্ডলীয় চাপের অধিক চাপে) জল বাষ্পীভূত করলে এই 'সুপারহিটেড স্টিম', অর্থাৎ 100° সেণ্টিগ্রেডের অধিক উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সেকৃসন — কর্তিত অংশ; উদ্ভিদ অথবা প্রাণিদেহের যে সূক্ষ্ম অংশ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার জৈব গঠন পরীক্ষা করা হয়। আবার কাটা বা কর্তন অর্থেও কথাটা কখন কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, **রিসেকৃসন** মানে দেহের কোন দূষিত বা রুগ্ন হাড় কেটে ফেলা। **ভিভিসেকৃসন** হলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কোন জীবিত প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ করা। আবার **বাইসেকৃসন** কথাটার মানে সমদ্বিখণ্ডে কাটা।

সেক্টর — কৌণিক বৃত্তাংশ। কোন বৃত্তের যে-কোন দুইটি ব্যাসার্ধ (কেন্দ্র ও পরিধির যে-কোন দু'টি বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা) দ্বারা কেন্দ্রস্থ কোণে সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ। (সার্কল ↑)

সেক্টর

সেকেণ্ড — (1) সময় পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক; যার কাল-পরিমাণ হলো এক 'সিডিরিয়াল ডে'র ↑ মোটামুটি 1/86,164·1 অংশ, অথবা এক 'মিন সোলার ডে'র ↑ 1/86,400 অংশ। (2) জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের একক বিশেষ; = 1/3600 ডিগ্রি; 60 সেকেণ্ড = 1 মিনিট, 60 মিনিট = 1° ডিগ্রি।

সেকেণ্ডারি কয়েল — ট্রান্সফর্মারের ↑ বহির্ভাগের বৃহত্তর তার-কুণ্ডলী। (প্রাইমারি কয়েল ↑)

সেকেণ্ডারি সেল — যে সেলে ↑ সোজাসুজি তড়িৎ উৎপাদিত হয় না; কোন প্রাইমারি সেল ↑, অর্থাৎ ব্যাটারি ↑, ডায়নামো ↑ প্রভৃতি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে তড়িৎ-শক্তি এর মধ্যে কৌশলে আহিত করে রাখা হয় মাত্র। তারপরে প্রয়োজনের সময় এ থেকে আবার তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়; যেমন—কোন স্টোরেজ ব্যাটারি ↑, অ্যাকুমুলেটর ↑ প্রভৃতি।
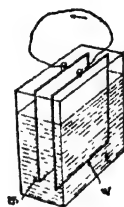
অ্যাকুমুলেটর

সেক্সট্যাণ্ট — সাধারণতঃ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গগনমণ্ডলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির কৌণিক উচ্চতা পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। এর সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর দিঙমণ্ডলের কত ডিগ্রি উর্ধ্বে অবস্থিত তার পরিমাণ যে-কোন সময়ে সহজে মাপা যায়। যন্ত্রে সংলগ্ন একখানা দর্পণ ঘুরিয়ে কোন নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত করে অপর এক খানা স্থির-সংবদ্ধ দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত করা হয়। এই প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রটা যন্ত্রের মধ্যে পৃথিবীর দিঙ্-মণ্ডলে অবস্থিত বলে মনে হয়। ওই

প্রথম দর্পণখান। যত ডিগ্রি ঘুরিয়ে স্থির-দর্পণে নক্ষত্রটার প্রতিফলিত রশ্মি দেখা যাবে, দিঙ্‌মণ্ডল থেকে নক্ষত্রটা তত ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত হবে। যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন বৃত্তাংশে-চিহ্নিত স্কেল থেকে ওই সব ডিগ্রির পরিমাণ সহজেই স্থির করা সম্ভব হয়ে থাকে।
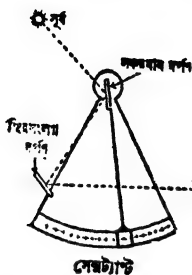
সেক্সট্যান্ট

সেগ্‌মেন্ট বৃত্তাংশ; কোন বৃত্তের যে-কোন একটি জ্যা (কর্ড, সার্কল ↑) বৃত্তটাকে যে দুই অংশে বিভক্ত করে। বৃত্তের ব্যাসও হলো তার একটা জ্যা, যেটা বৃত্তকে সমান দুই অংশে, অর্থাৎ দুই সেগ্‌মেন্টে বিভক্ত করে। এরূপ সেগ্‌মেন্টকে বলে অর্ধবৃত্ত, বা সেমি সার্কল।

সেগমেন্ট

সেডিমেন্ট — কঠিন পদার্থের যে-সব সূক্ষ্ম কণিকা তৎ-মিশ্রিত তরল পদার্থ থেকে থিতিয়ে তলায় পড়ে। **'সেডিমেণ্টারি রক'** মানে সমুদ্রের তলদেশে সমুদ্র-জল থেকে থিতিয়ে-পড়া কঠিন পদার্থাদি জমে যে পাহাড় সৃষ্টি হয়।

সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি — থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপের একটা একক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) জলের স্ফুটনাংক ও হিমাংক উষ্ণতার পার্থক্যের 100 ভাগের এক ভাগ উষ্ণতাকে এক ডিগ্রি (1°C) সেন্টিগ্রেড বলা হয়। সেন্টিগ্রেড স্কেলে জলের হিমাংক (যে উষ্ণতায় জল জমে বরফ হয়, বা বরফ গলতে সুরু করে) 0° সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাংক (যে উষ্ণতায় জল ফুটে বাষ্পীভূত হতে আরম্ভ করে) 100° সেন্টিগ্রেড ধরা হয়। বিভিন্ন থার্মোমিটারে পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে ফারেনহিট ↑ এবং রুমার ↑ নামে অন্য দু'রকম স্কেল বা এককও ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদিতে সচরাচর সেন্টিগ্রেড এককেই পদার্থের উষ্ণতা পরিমিত হয়ে থাকে।

সেন্টিফিউজ — কোন তরল পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত কঠিন পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলোকে পৃথক করে ফেলবার জন্যে ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র। দুটা নলাকার লম্বা পাত্রে ওই তরল পদার্থ রেখে যন্ত্রটার দু'দিকে সংবদ্ধ করা হয়।

সেন্ট্রিফিউজ

পরে ওই পাত্র-সমেত যন্ত্রটাকে অতি দ্রুত বেগে কিছুকাল ঘোরালে মিশ্রিত কণিকাগুলো পাত্রের তলায় (কণিকাগুলো বিশেষ হাল্কা হলে কোন কোন ক্ষেত্রে উপরিভাগেও) একত্র সঞ্চিত হয়ে পড়ে ; পরিষ্কার তরল পদার্থ পৃথক হয়ে যায়। পদার্থ-বিদ্যার যুক্তি অনুসারে ঘূর্ণ্যমান পদার্থে উদ্ভূত সেন্ট্রিফিউগ্যাল ↑. ফোর্সের প্রভাবে এরূপ সম্ভব হয়ে থাকে। এজন্যে এসব যন্ত্রকে 'সেন্ট্রি-ফিউগ্যাল মেসিন'ও বলা হয়।

সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স — কেন্দ্রাতিগ শক্তি; কোন কেন্দ্রীয় বিন্দুর চারদিকে চক্রাকারে কোন বস্তু দ্রুত বেগে ঘোরালে ওই বস্তুতে যে বহির্মুখী গতি-শক্তির সৃষ্টি হয়। আর যে-শক্তির প্রভাবে ওই বস্তুটাকে ঘূর্ণ্যায়মান রাখা হয়, অর্থাৎ তার কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি, বা টানকে বলে **সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স**। সেন্ট্রি-ফিউগ্যাল ফোর্স ও সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পরস্পর সমান, কিন্তু বিপরীত-মুখী। সুতা বেঁধে এক টুকরা পাথর চক্রাকারে ঘোরালে হাতের যে-শক্তি সুতার মাধ্যমে ওটাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে, তা-ই হলো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। আর, এরূপ ঘূর্ণনের ফলে প্রস্তরখণ্ডে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তাকে বলে সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স। সুতাটা যদি ছিঁড়ে যায় তবে ওই প্রস্তরখণ্ডটা তার মধ্যে উদ্ভূত সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্সের প্রভাবে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স — সেন্ট্রি-ফিউগ্যাল ফোর্স ↑।

সেন্টিমিটার — এক মিটারের ↑ শতাংশ ; =0·394 ইঞ্চি।

সেপ্সিস — জীবাণুর বিষ-ক্রিয়ায় দেহের কোন অংশের মাংসপেশী দূষিত হয়ে যাওয়া। **সেপ্টিক** উন্ড মানে জীবাণু-সংক্রমণের ফলে যে ক্ষত বিষাক্ত হয়েছে। **সেপ্টি-সিমিয়া**—রক্তদুষ্টি, রক্তে বিষক্রিয়া।

সেফ্টি ল্যাম্প — ডেভি ল্যাম্প ↑।

সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি — বস্তুর ভার-কেন্দ্র। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ যে বিন্দুতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (গ্র্যাভিটেসন ↑) কেন্দ্রীভূতভাবে বস্তুটাকে আকর্ষণ করে। কোন বস্তুর উপরে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-শক্তির সমষ্টিগত পরিমাণই হলো বস্তুটার ওজন, বা ওয়েট ↑। বস্তুর আকার-আয়তন স্থির থাকলে যে অবস্থাতেই সেটা রাখা যাক না কেন, তার 'সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি', বা ভারকেন্দ্র সর্বদাই স্থির থাকবে ; আর তার ফলে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে সর্বদাই বস্তুটার ভারসাম্য রক্ষিত হবে।

সেরিব্রাম — মস্তিষ্কের প্রধান অংশ ; যাকে বাংলায় গুরু-মস্তিষ্ক বলে। এটা মস্তিষ্ক বা মগজের উর্ধ্বভাগের

বৃহত্তর অংশ। আর, সেরিব্রামের নিচের দিকে করোটির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত মগজের যে ক্ষুদ্রতর অংশ রয়েছে তাকে বলে **সেরিবেলাম**; বাংলায় যাকে বলা হয় লঘু-মস্তিষ্ক।

সেরিব্রাম ও সেরিবেলাম

সেল — রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র। এর মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের মাধ্যমে তা প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।

ল্যাক্ল্যান্স ড্রাই সেল
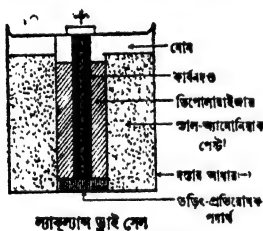
সেল প্রধানতঃ দু'রকম—প্রাইমারি সেল ↑ ও সেকেণ্ডারি সেল। সেকেণ্ডারি সেলে সোজাসুজি তড়িৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে না, (অ্যাকুমুলেটর ↑)। গঠন ও উপাদানের বিভিন্নতা অনুসারে প্রাইমারি সেল আবার নানা রকমের আছে, যেমন, লেক্ল্যান্স সেল ↑, ওয়েস্টন সেল, ডেনিয়েল ↑ সেল প্রভৃতি।

সেলিনিয়াম — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Se; পারমাণবিক ওজন 78·96, পারমাণবিক সংখ্যা 34; পদার্থটা ধাতব নয়; রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা গন্ধকের মত। বিভিন্ন ধাতব সালফাইডের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় নানা রকম ধাতব 'সেলিনাইড' রূপে পাওয়া যায়। রাবার শিল্পে ও রুবি গ্লাস ↑ তৈরি করতে এর ব্যবহার আছে। এর নানা রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়। আলোকের সংস্পর্শে এক রকম স্ফটিকাকার সেলিনিয়ামের তড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতার তারতম্য লক্ষিত হয়; এজন্যে পদার্থটা ফটো-ইলেক্ট্রিক সেলে ↑ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ বিশেষ ধরণের সেলকে **সেলিনিয়াম সেল** বলে।

সেলুলোজ — যে জৈব পদার্থে উদ্ভিদের দেহ-কোষ গঠিত; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তুর রাসায়নিক উপাদান। এর রাসায়নিক গঠন মোটামুটি $(C_6H_{10}O_5)n$; এর n হলো সেই সংখ্যা, যত সংখ্যক অণু সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ গঠিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন গঠনের পলিমার ↑ পদার্থে এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাঠের মণ্ড বা গুঁড়া, তুলা ও বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ আঁস এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ। কাগজ, প্ল্যাস্টিক ↑, রেয়ন ↑, বিস্ফোরক পদার্থ (নাইট্রো

সেলুলোজ ↑) প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্যের প্রধান উপাদান।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট — তুলা প্রভৃতি সেলুলোজ ↑, পদার্থের উপর বিশুদ্ধ (গ্ল্যাসিয়াল) অ্যাসিটিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন সল্ট, বা এস্টার ↑ জাতীয় সাদা কঠিন পদার্থ। এ থেকেই রেয়ন ↑, প্ল্যাস্টিক ↑ প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

সেলুলোজ নাইট্রেট — নাইট্রো-সেলুলোজ ↑। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো সেলুলোজের নাইট্রিক অ্যাসিড-এস্টার ↑। পদার্থ টা একটা উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ; এ থেকে আবার সেলুলয়েড ↑, প্ল্যাস্টিক ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পলিমার ↑ পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে।

সেলুলয়েড — সেলুলোজ নাইট্রেট ↑ ও ক্যাম্ফরের (কর্পূর) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন বিশেষ এক শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থ। ব্যাকেলাইট ↑ নামক পদার্থও এক শ্রেণীর সেলুলয়েড। বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন গঠনের সেলুলয়েড তৈরি হয়ে থাকে। বিশেষ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এক রকম সেলুলয়েডে চলচ্চিত্রের ফিল্ম তৈরি হয়। সব রকম সেলুলয়েডই বিশেষ দাহ্য পদার্থ।

সেলেস্তিয়াল ইকোয়েটর — পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর ↑, বা বিষুব-বৃত্তের সামতলিক ক্ষেত্রকে চারদিকে বর্ধিত করলে সুদূর মহা-শূন্যে তা সেলেস্তিয়াল স্ফিয়ারকে ↑ যে কাল্পনিক বৃত্ত-রেখায় ছেদ করে। এক কথায় বলা যায়, নভোমণ্ডলীর বিষুব-বৃত্ত; অর্থাৎ যে মহাবৃত্তরেখা জেনিথ ↑ ও নাদির ↑ থেকে সম-দূরবর্তীভাবে সেলেস্তিয়াল স্ফিয়ারকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ ও গণ-নাদিতে নভোমণ্ডলে এরূপ বৃত্ত-রেখার কল্পনা করা আবশ্যক হয়ে থাকে।

সেলেস্তিয়াল ডেক্লিনেসন — নভোমণ্ডলে কোন জ্যোতিষ্ক সেলে-স্তিয়াল ইকোয়েটর ↑ থেকে যত ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত তাকে বলা হয় ওই জ্যোতিষ্কের

ডেক্লিনেসন (∠ [illegible])
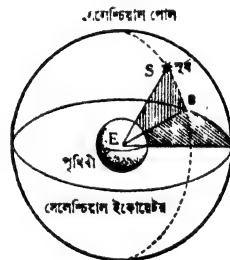
ডেক্লিনেসন। কোন গ্রহ-নক্ষত্রের ডেক্লিনেসন সাধারণতঃ ওই কোণের পরিমাণে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রদত্ত চিত্রে S জ্যোতিষ্কের ডেক্লি-নেসন হলো BES কোণ। (কম্পাস যন্ত্রের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেসন ↑ নিরূপিত হয়ে থাকে।)

সেলেস্তিয়াল স্ফিয়ার — নভোমণ্ডল; মহাশূন্যের সুদূরে যে এক গোলাকৃতি আবরণ বা চাঁদোয়ার গায়ে গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিভিন্ন জ্যোতিষ্কগুলি অবস্থিত বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। পৃথিবীর যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান দর্শক যেন ওই গোলাকার নভোতলের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বলে ধরা হয়।

সেস্‌কুই — এক ও অর্ধাংশ; অর্থাৎ দেড় ভাগ। রসায়নে পূর্ণশমিত ও অর্ধশমিত লবণের মিশ্রণকে বলে 'সেস্‌কুই সল্ট'; যেমন, **সেস্‌কুই কার্বনেট** হলো (পূর্ণশমিত) কার্বনেট ও (অর্ধশমিত) বাইকার্বনেটের মিশ্র সল্ট; যেমন—সোডিয়াম সেস্‌কুই কার্বনেট Na_2CO_3, $NaHCO_3$, $2H_2O$., একটা স্ফটিকাকার মিশ্র রাসায়নিক লবণ।

সোডা — সোডিয়ামের বিভিন্ন সল্ট ↑ বিভিন্ন শ্রেণীর সোডা নামে পরিচিত; যেমন, ওয়াশিং সোডা ↑ হলো সোডিয়াম কার্বনেট, $Na_2CO_3.10H_2O$; বেকিংসোডা ↑ হলো সোডিয়াম বাইকার্বনেট, $NaHCO_3$; কস্টিক সোডা ↑ হলো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, $NaOH$।

সোডা ওয়াটার — চাপ প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস আবদ্ধ পাত্রের জলে দ্রবীভূত ও পরিপৃক্ত করে যে পানীয় তৈরি হয়। বোতলের মুখ খুলে প্রযুক্ত চাপ মুক্ত করলে দ্রবীভূত অতিরিক্ত গ্যাস সশব্দে বেরিয়ে যায়। সুস্বাদু করবার জন্যে বিভিন্ন সুগন্ধ নির্যাস, স্যাকারিন ↑ প্রভৃতি এই জলে মেশান হয়ে থাকে। একে বাংলায় বলে বাতান্বিত জল। লিমনেড, আইসক্রিম সোডা, প্রভৃতি সব রকমের 'ইরেটেড ওয়াটার', অর্থাৎ বাতান্বিত জলেই যথেষ্ট কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। নামে 'সোডা ওয়াটার' বললেও এতে সোডা কিন্তু কদাচিৎ থাকে।

সোডা লাইম — সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা ↑, $NaOH$) এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [স্লেকড লাইম ↑, $Ca(OH)_2$] সংমিশ্রণে উৎপন্ন কঠিন পদার্থ। কুইক-লাইমের ↑ সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রব মিশিয়ে এক রকম নরম পদার্থ পাওয়া যায়; একে উত্তপ্ত করে শুকিয়ে ফেললেই এই 'সোডা লাইম' উৎপন্ন হয়। পদার্থটা কাঁচশিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস শুষে নেয় বলে জিনিসটা আবদ্ধ স্থানের ওই গ্যাসমিশ্রিত দূষিত বায়ু শোধনের জন্যেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম—মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Na (ন্যাট্রিয়াম), পারমাণবিক ওজন হলো 22·997, পারমাণবিক সংখ্যা 11; সাদা নরম

ধাতু। বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন; জলের সংস্পর্শে এর দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা ↑, NaOH) উৎপন্ন হয়, এবং হাইড্রোজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। বাতাসের সংস্পর্শে এর অক্সাইডের সৃষ্টি হয়; ফলে সোডিয়াম অক্সাইডের একটা আবরণ উপরিভাগে জমে গিয়ে বিশুদ্ধ সাদা সোডিয়াম দ্রুত ময়লা হয়ে পড়ে। এরূপ অত্যধিক রাসায়নিক শক্তির জন্যে সোডিয়াম বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না; কিন্তু বিভিন্ন রকম সোডিয়াম সল্ট প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে; এদের মধ্যে সাধারণ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl,) জলে-স্থলে পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। ক্যালসিয়ামের মত সোডিয়ামও জীবদেহের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

সোডিয়াম কার্বনেট — ওয়াশিং সোডা ↑, $Na_2CO_3.10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষ দ্রবণীয়; তীব্র ক্ষারধর্মী। সচরাচর বস্ত্রাদি পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়। (লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস ↑)।

সোডিয়াম বাইকার্বনেট — বেকিং সোডা ↑, $NaHCO_3$; সাদা চূর্ণ পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, একটা বেসিক ↑ সল্ট। বেকিং পাউডার ↑ তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। একেই বলা হয় 'খাওয়ার সোডা', পেটের পীড়ায় লোকে যা খায়।

সোডিয়াম পারক্সাইড — Na_2O_2; সোডিয়াম খোলা বাতাসে পোড়ালে যে হলদে গুঁড়া পাওয়া যায়। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনের ফলে কস্টিক-সোডা, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑ (NaOH) উৎপন্ন হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

সোডিয়াম সালফেট — সোডিয়াম ক্লোরাইড, (NaCl, 'কমন সল্ট' ↑) এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট। পদার্থটার বিশেষ নাম গ্লোবার্স সল্ট, $Na_2SO_4.10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। ঔষধ হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

সোডিয়াম সিলিকেট—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সিলিকার ↑ (SiO_2) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সাদা স্ফটিকাকার সল্ট, Na_2SiO_3। একে আবার ওয়াটার গ্লাস-ও ↑ বলে; জলে দ্রবণীয়। এর স্বচ্ছ জলীয় দ্রব মাখিয়ে ডিম সংরক্ষণ করা হয়। বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওয়াশিং সোপে অনেক সময় জিনিসটা মেশান হয়।

সোডিয়াম থায়োসালফেট — থায়ো ↑ অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট; এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম

হাইপো-সালফাইট, $Na_2S_2O_3.5H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়। পদার্থটা সাধারণতঃ **হাইপো** নামেই সমধিক পরিচিত; ফটোগ্রাফির ↑ কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় (হাইপো ↑)।

সোডিয়াম নাইট্রেট — চিলি সল্ট পিটার ↑, $NaNO_3$; একে 'সোডা-নাইটার'-ও বলে। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। নাইট্রিক-অ্যাসিড ↑ তৈরি করবার জন্যে এবং জমির সার হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড — একে সচরাচর বলা হয় কষ্টিক সোডা, $NaOH$; সাদা কঠিন পদার্থ। খোলা রাখলে বাতাসের জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে গলে যায়। এর জলীয় দ্রব তীব্র ক্ষারধর্মী (অ্যালকালি ↑), যাতে লাগে তাই পুড়ে ক্ষয়ে যায়; বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন। এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সোডিয়াম সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সোপ — সাবান। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণ। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো প্রধানতঃ ষ্টিয়ারিক ↑, পামিটিক ও অলিয়িক ↑ নামক তিন রকম ফ্যাটি অ্যাসিডের তিন রকম সোডিয়াম সল্টের সংমিশ্রণে গঠিত। এ সব ফ্যাটি অ্যাসিডের পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণেও এক রকম নরম সাবান তৈরি হয়ে থাকে, যাকে বলে **সফ্‌ট সোপ** ↑। উত্তাপের সাহায্যে নানা রকম চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কষ্টিক সোডার (বা কষ্টিক পটাসের) রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে সাবান তৈরি হয়। কষ্টিক সোডা বা পটাসের যে জলীয় দ্রব ব্যবহৃত হয় তাকে কস্টিক-লাই বলে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিশেষ এক রকম হাইড্রোলিসিস ↑ (স্যাপোনিফিকেসন ↑) প্রক্রিয়ায় সাবানের সঙ্গে বাই-প্রোডাক্ট ↑ হিসেবে গ্লিসারিন ↑ উৎপন্ন হয়। সাধারণ ব্যবহারের সাবানে কষ্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যান্য ধাতব সল্টগুলোকেও অনেক সময় 'সোপ' বলা হয়; যদিও সেগুলো সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সল্টের মত সাবান জাতীয় নয়।

সোপ স্টোন — এক রকম নরম পাথর; প্রধানতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেটে গঠিত। এরূপ পাথরকে সহজেই মসৃণ গুঁড়ায় পরিণত করা যায়, আর তা বেশ তেলতেলে লাগে; এজন্যে একে সোপস্টোন বলা হয়। এর অন্য নাম ষ্টিয়াটাইট ↑। এর অতি-মসৃণ চূর্ণকে বলে 'ট্যাল্‌ক ↑ পাউডার'। এরূপ পাথরের তৈরী বিভিন্ন জিনিস উপযুক্তরূপে উত্তপ্ত করলে বেশ শক্ত ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে থাকে।

সোলার ইক্লিপ্স — সূর্য-গ্রহণ। ইক্লিপ্স (সোলার) ↑।

সোলার-ডে — সাধারণতঃ সূর্যের উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করে দিনের (দিন-রাত্রির) কাল পরিমাণ করা হয়; কিন্তু সূর্যের উদয়াস্তের সময় নির্দিষ্ট নয়, দিন-রাত্রি ছোট বড় হয়। এজন্যে পর পর দুদিন সূর্যের মেরিডিয়ানে ↑ আসার সময়ের ব্যবধানকে সাধারণতঃ এক দিন ধরা যায়। সূর্যের অয়ন-গতির (সলিষ্টিস্ ↑) জন্যে এই সময়ও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে; সুতরাং সম্বৎসরে দিনের এরূপ পরিবর্তনশীল কাল পরিমাণের গড় নিয়ে প্রকৃত সৌর দিন, বা 'মিন সোলার-ডে' স্থির করা হয়েছে, অর্থাৎ মোটামুটি 24 ঘণ্টা।

…**সোম** — জৈব কোষের বিশেষ উপাদান; কোষের (সেল ↑) সংগঠক কণিকা, যেমন -ক্রোমোসোম ↑। **সেণ্ট্রোসোম** হলো জৈব কোষের কেন্দ্রীনে (নিউক্লিয়াস ↑) অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক কণিকা; যাকে কোষের মধ্য-কণা বলা যায়। জৈব কোষের বিভাজন-প্রক্রিয়ায় (সেল ডিভিসন) এই মধ্য-কণা বা সেণ্ট্রোসোম দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং নূতন কোষ গঠিত হয়ে থাকে।

সোমা — জীব-দেহ। **সোম্যাটিক** কথাটার মানে 'দেহ-সম্বন্ধীয়'; যেমন, **সোম্যাটিক সেল** দেহ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ জীব-দেহের রক্ত-মাংস-হাড় প্রভৃতির সংগঠক জৈব কোষসমূহ; কিন্তু প্রজনন-কোষ নয়।

সোমাইট — অমেরুদণ্ডী পর্যায়ের (ইন্ভার্টিব্রেট ↑) নিম্নশ্রেণীর প্রাণী-দেহের সংগঠক এক-একটি পর্ব বা অংশ; যেমন—কেঁচো, কৃমি প্রভৃতির দেহ খণ্ডে খণ্ডে সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয়, তার এক-একটি খণ্ড বা পর্বকে বলা হয় সোমাইট।

সোমারফিল্ড — জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1868 খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু 1951 খৃষ্টাব্দে। রন্টগেন-রশ্মি বা এক্স-রে ↑ আবিষ্কারক অধ্যাপক রন্টগেনের সুযোগ্য ছাত্র; পরে পদার্থ-বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষক। বিভিন্ন বর্ণালির গঠন, শক্তি-তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবিষ্কার।

সোলার সিস্টেম — সৌর পরিবার; সূর্য ও তার চারদিকে ভ্রাম্যমান নয়টি গ্রহ নিয়ে মোটামুটি এই সোলার সিস্টেম, বা 'সৌর পরিবার' গঠিত। সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে গ্রহগুলো: বুধ (মার্কারি ↑), শুক্র (ভেনাস ↑), পৃথিবী (আরথ ↑), মঙ্গল (মারস ↑), বৃহস্পতি (জুপিটার ↑), শনি (স্যাটার্ন ↑), ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই ন'টা গ্রহ নিজ নিজ নির্দিষ্ট উপবৃত্ত কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

এ-সব ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ-দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বে একটা গ্রহপুঞ্জ (অ্যাস্টারয়েড্স ↑) সূর্যের চার-দিকে ঘুরছে; একেও সৌর পরি-বারের অন্তর্গত ধরা হয়। গ্রহগুলো মহাশূন্যে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

সোলানিন — উদ্ভিদজাত একটি বিষাক্ত উপক্ষার (অ্যাল্‌কালয়েড ↑)। তামাকের শিকড়, বেলেডোনার ↑ মূল প্রভৃতি 'সোলানাম' শ্রেণীর বিশেষ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের রস থেকে পাওয়া যায়।

স্কেলার কোয়ান্টিটি — যে রাশির পরিমাণ স্কেলের একক সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়; অর্থাৎ যার মাত্র সংখ্যাগত পরিমাণ আছে, কিন্তু গতি বা দিগ্‌বাচক সংজ্ঞা নেই; যেমন, উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑), আর্দ্রতা (হিউমিডিটি ↑) প্রভৃতি হলো স্কেলার কোয়ান্টিটি.; কিন্তু বল (ফোর্স ↑), গতিবেগ (ভেলোসিটি ↑) প্রভৃতি নয়। এর কারণ, শক্তি বা গতির পরিমাণ এবং দিক দুই-ই জানা দরকার হয় (ভেক্টর ↑)।

স্কেলিন ট্রায়েঙ্গল — যে জ্যামিতিক ত্রিভূজের সবগুলি বাহু ও কোণ পরস্পর অসমান।

স্ক্রফুলা — গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থিগুলির (গ্ল্যাণ্ড ↑) এক প্রকার ক্ষয়রোগ বিশেষ। কঠিন মারাত্মক ব্যাধি।

স্কুনার — পাশ্চাত্য দেশের এক প্রকার বিশেষ গঠনের পালের নৌকা; সাধারণত. এতে দুটা পৃথক পাল খাটানো হয়ে থাকে। আবার একটা পালযুক্ত অনুরূপ আর এক শ্রেণীর নৌকাকে বলে 'স্লুপ'। এগুলির পাল থাকে ত্রিকোণাকৃতি।

'স্লুপ' নৌকা
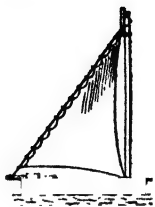
স্ক্রোটাম — অণ্ডকোষ; চামড়ার আধার, বা আবরণসহ তদভ্যন্তরস্থ পুং-প্রজনন গ্রন্থি-কোষের অণ্ডদ্বয়কে (টেস্‌টিস) বলে স্ক্রোটাম।

স্ক্যাণ্ডিয়াম — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Sc, পারমাণবিক সংখ্যা 21; একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু।

স্ক্রুপল — সোনারূপা, মণিমুক্তা প্রভৃতি মাপবার ইংলণ্ডীয় ওজন পরিমাণের একটা একক বিশেষ। এক আউন্সের 24 ভাগের এক ভাগ; =20 গ্রেণ। (ট্রয় ওয়েট ↑)।

স্টাইল — স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভদণ্ড; ফুলের অভ্যন্তরস্থ গর্ভাশয় (ওভ্যারি ↑) থেকে যে-সব সরু দণ্ড উপরে ওঠে ও যাদের মাথায় রেণুস্থলী বা গর্ভমুণ্ড (ষ্টিগ্‌মা ↑) থাকে (পিষ্টিল ↑)।
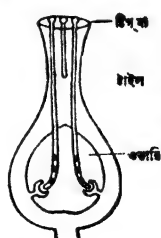
ষ্টাইল বা গর্ভদণ্ড

স্টার্চ — উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার পদার্থ; রাসায়নিক হিসেবে বিশেষ এক শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট ↑। চাউল, গম, যব প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য-বীজে পদার্থটা স্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে। সাদা, স্বাদ-গন্ধহীন পদার্থ; জলে অদ্রাব্য। সামান্য কোন অ্যাসিড সংযোগে এর জলীয় মিশ্রণ ফুটালে বিশেষ এক প্রকার হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তা থেকে ডেক্স্ট্রিন ↑ উৎপন্ন হয়; ক্রমে তা আবার গ্লুকোজে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

স্টার্চগাম — ডেক্স্ট্রিন ↑।

স্ট্রন্সিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ। এর সাংকেতিক চিহ্ন Sr, পারমাণবিক ওজন 87·63, পারমাণবিক সংখ্যা 38; ধাতুটা ক্যালসিয়ামের অনুরূপ, দেখতে সাদা। বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে এর 'স্ট্রন্সিয়ানাইট' নামক স্বভাবজ স্ফটিকাকার কার্বনেট সল্ট পাওয়া যায়; যা থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এর হাইড্রক্সাইড, $Sr(OH)_2$, যৌগিক শর্করা-শিল্পে চিনি পরিষ্কার করতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্ট্রন্সিয়াম-সল্ট লাল আলোক সৃষ্টি করবার জন্যে বাজির বারুদে মিশিয়ে জ্বালানো হয়।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার — পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটা বিশেষ স্তর। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে এই স্তর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 6 মাইল এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় $11\frac{1}{2}$ মাইল উচ্চে অবস্থিত। এই স্তরের উপর-নিচে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা প্রায় স্থির থাকে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার তেমন কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই বায়ু-স্তরের উষ্ণতা নিরক্ষরেখার উপরে প্রায় $-110°$ ফারেন্‌হাইট ↑, আর মেরুপ্রদেশের উপরে প্রায় $-40°$ ফারেন্‌হাইট (অর্থাৎ, অধিকতর উষ্ণ) থাকে।

স্টিম — জলীয় বাষ্প; বাষ্পীভূত জল, (H_2O) মাত্র। জলের বয়েলিং পয়েণ্ট ↑ 100° সেণ্টিগ্রেড; এই বা এর অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে তরল জল এরূপ স্টিম অর্থাৎ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে যায়। জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণ অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। সাধারণতঃ মেঘের মত ধোঁয়াটে সাদা যে পদার্থকে বাষ্প বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অতি সূক্ষ্ম জলকণা মাত্র, জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা; তা প্রকৃত 'স্টিম', বা বাষ্প নয়।

স্টিম ইঞ্জিন — বাষ্পচালিত যন্ত্র বা ইঞ্জিন; জলীয় বাষ্পের অত্যধিক চাপ নিয়ন্ত্রিত করে যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন কৌশলে গতি সঞ্চারিত হয়। বাষ্পচালিত টার্বাইন ↑ যন্ত্রকেও স্টিম ইঞ্জিন বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ যে যন্ত্রের প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় আধারে আবদ্ধ বাষ্পের প্রবল চাপের নিয়ন্ত্রিত শক্তিতে সংলগ্ন সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টন চলাচল করে, এবং ওই

পিস্টনের সঙ্গে সংলগ্ন অ্যাক্সেলের ↑ গতির প্রভাবে বিভিন্ন সব যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইঞ্জিনটা সামগ্রিকভাবে চলতে থাকে, অথবা অপর যন্ত্র চালায়।

স্টিব্‌নাইট — খনিজ অ্যান্টিমনি সাল্‌ফাইডের, Sb_2S_3, বিশেষ নাম। স্বভাবজাত এই সাল্‌ফাইড খনিজ থেকেই প্রধানতঃ বিশুদ্ধ অ্যান্টিমনি ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

স্টিবাইন — এক রকম বিষাক্ত গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা অ্যান্টিমনির গ্যাসীয় হাইড্রাইড ↑ (SbH_3) মাত্র। এটা হলো হাইড্রোজেন ও অ্যান্টিমনির একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑ ।

স্টিয়াটাইট — সোপস্টোন ↑ ।

স্টিয়ারিন — মোমের মত সাদা ও নরম একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; এর মধ্যে প্রধানতঃ স্টিয়ারিক ↑ অ্যাসিড ও পামিটিক ↑ অ্যাসিড সম্মিলিতভাবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। স্যাপোনিফিকেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীব-জন্তুর চর্বি থেকে পদার্থটা পাওয়া যায়।

স্টেইনলেস স্টিল — ক্রোমিয়াম ↑ ঘটিত বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন ইস্পাত ; যাতে সহজে মরিচা ধরে না। এর মধ্যে সাধারণতঃ 70 থেকে 90% লোহা, 10 থেকে 30% ক্রোমিয়াম ↑ এবং মোটামুটি 0·1 থেকে 0·7% কার্বন থাকে। বিশেষতঃ শস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদি এরূপ ষ্টিলে তৈরি হয়ে থাকে।

স্টেলাইট—মূল্যবান যন্ত্রাদি নির্মাণের উপযোগী অতি-কঠিন একটা সংকর ধাতু ; সাধারণতঃ টাংস্টেন, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম এবং মলিব্‌ডিনাম ধাতুর মিশ্রণে এটা তৈরি হয়।

স্টেলার — নক্ষত্র (স্টার) সম্বন্ধীয়।

স্টেলেট মানে তারকাকৃতি; নক্ষত্রের (দৃশ্য) আকারবিশিষ্ট।

স্টোমা — উদ্ভিদের পাতায় যে সব অতি-সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই সব ছিদ্রপথে উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে (ফটোসিন্থেসিস ↑)। পাতার এই সব ছিদ্র, বা স্টোমাগুলো যেন উদ্ভিদের নাসিকা বা মুখের মত। চিত্রে পাতার শিরা-জালের মধ্যে স্টোমার গঠন বর্ধিতাকারে দেখানো হয়েছে। কথাটার বহুবচনে বলে **স্টোমাটা**।

পাতার ষ্টোমা, বা শ্বাস-ছিদ্র

স্টোরেজ ব্যাটারি — যে সব ব্যাটারিতে ↑ কোন জেনারেটর ↑, প্রাইমারি সেল ↑ প্রভৃতি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত করে এনে আহিত ও সঞ্চিত করে রাখা হয়। এভাবে আহিত বা সঞ্চিত তড়িৎশক্তি পরে আবার

তা থেকে প্রবাহরূপে পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময়ে এরূপ ব্যাটারি থেকে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় বলে এগুলোকে সেকেণ্ডারি সেলও বলা হয়। এই শ্রেণীর সেল, অথবা ব্যাটারিতে সোজা-সুজি তড়িৎশক্তি উদ্ভূত বা উৎপাদিত হয় না, সঞ্চিত রাখা হয় মাত্র। এই শ্রেণীর 'লেড অ্যাকুমুলেটর' ↑, 'নিকেল আয়রণ সেল প্রভৃতিকে তাই বলে স্টোরেজ সেল বা ব্যাটারি। সাধারণতঃ মোটর গাড়ীতে সহজে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়ার জন্যে এ-জাতীয় 'স্টোরেজ ব্যাটারি' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
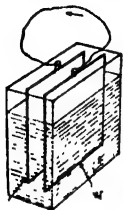
অ্যাকুমুলেটর

স্ট্রিক্‌নিন — 'নাক্স-ভোমিকা' নামক উদ্ভিদের বীজ থেকে প্রাপ্ত একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑, $C_{21}H_{22}N_2O_2$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে সামান্য দ্রবণীয়। পদার্থটা অত্যন্ত তিক্তস্বাদযুক্ত, এবং জীবের স্নায়ু-মণ্ডলীর উপরে বিশেষ মারাত্মক বিষক্রিয়া-সম্পন্ন। অবশ্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অতি সামান্য মাত্রায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন — পেনিসিলিনের ↑ অনুরূপ একটা অ্যান্টিবায়োটিক ↑ পদার্থ; 'অ্যাক্টিনোমাইসেস' নামক এক প্রকার তারকাকৃতি ছত্রাক বিশেষ থেকে পাওয়া যায়। কোন কোন রোগ-জীবাণু প্রতিরোধের ব্যাপারে পদার্থটা পেনিসিলিনের চেয়েও শক্তিশালী; বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগের জীবাণু (টিউবার্কল বেসিলাস ↑) ধ্বংসের জন্যে এর প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ছত্রাক-ঘটিত এই বিশেষ রাসায়নিক পদার্থটা 1944 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

স্ট্যাটিক — স্থির; গতিশীল নয় এমন; যেমন, স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি হলো স্থির-তড়িৎ, অর্থাৎ যে তড়িৎ-শক্তি কোন পদার্থে নিবদ্ধ থাকে, তা থেকে প্রবাহিত হয় না। এরূপ তড়িৎ সাধারণতঃ স্ফুরণের (স্পার্ক) আকারে পাওয়া যায়; প্রবাহের আকারে পাওয়া যায় না। রজন, অথবা কাচের একটা দণ্ড পশম বা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘসলে ওই দণ্ডে 'স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি' জন্মায়; আর ওই তড়িতাবিষ্ট দণ্ডের স্থির তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে হাল্‌কা কাগজের টুকরা আকৃষ্ট হয়।

স্ট্যাটিক্‌স — বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের স্থিরতা, অর্থাৎ 'স্থির অবস্থা' সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য আলোচিত ও নির্ধারিত হয়; যেমন, সেতু নির্মাণের কাজে লোহার পাটির কতটা বক্রতায় সর্বাধিক ওজন বহন করেও সেটা স্থির থাকবে, অথবা জাহাজ নির্মাণের কাজে খোলটা কিরূপ হলে তার

ভারসম্য রক্ষিত হবে, এরূপ বিভিন্ন তথ্যের আলোচনা 'স্ট্যাটিক্‌স', বা স্থিতি-বিদ্যার অন্তর্গত।

স্ট্যাটিস্টিক্‌স — পরিসংখ্যান-বিদ্যা, বা রাশি-বিজ্ঞান। একই জাতীয় বিভিন্ন নমুনার নির্দেশক রাশি বা সূচক-সংখ্যার গড় নির্ণয় করে কোন বিষয়ের সাধারণ তথ্য নির্ধারণের এক বিশেষ বিজ্ঞান। এভাবে কোন দেশের শিক্ষা বিস্তার, শস্যোৎপাদন, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের মোটামুটি তথ্য নির্ধারণ করা রাশিবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

স্ট্যানাম — টিন। মৌলিক ধাতু টিনের ল্যাটিন নাম; এ থেকেই টিনের সাংকেতিক চিহ্ন Sn করা হয়েছে। স্ট্যানিক অক্সাইড হলো SnO_2, স্ট্যানাস অক্সাইড SnO; যে যৌগিক পদার্থের মধ্যে টিন বাই-ভ্যাল্যাণ্ট ↑ তাকে বলে 'স্ট্যানাস'; আর যার মধ্যে কোয়াড্রিভ্যাল্যাণ্ট (ভ্যালেন্সি ↑ চার) তাকে বলে 'স্ট্যানিক' সল্ট।

স্টিগ্‌মা — উদ্ভিদের স্ত্রী-পুষ্পগুলোর গর্ভ-দণ্ডের অগ্রভাগ; যাকে রেণুস্থলী, বা গর্ভমুণ্ড বলা হয়। এর মধ্যে পুং-পুষ্পের রেণুনিষেক ঘটলে তা স্ত্রী-পুষ্পের স্টাইল ↑, বা গর্ভদণ্ডের নলপথে গিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়ে বীজের উৎপত্তি ঘটায়। স্টিগ্‌মা

এপিগাইনাস

থেকে গর্ভ-দণ্ডের মধ্য দিয়ে ওই রেণু ফুলের গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ ডিম্ব-কোষে পৌছায়, আর সেই ডিম্ব-কোষের মধ্যেই বীজ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফুলের স্টিগ্‌মা যেন গর্ভকোষে রেণু প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। কথাটার বহু-বচনে বলে স্টিগ্‌মাটা।

স্ট্যাণ্ডার্ড — সুনির্দিষ্ট ও সর্বস্বীকৃত বিষয়; সবত্র সকলে স্বীকার করে নেবে কোন কিছুর এমন একক। যেমন, **স্ট্যাণ্ডার্ড মেজার** — বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-নির্মিত একটা সুনির্দিষ্ট রডের দৈর্ঘ্যকে এক ফুট ধরা হয়েছে। **স্ট্যাণ্ডার্ড ফিল্ম** হলো সাধারণতঃ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত 35 মিলিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ফিল্ম ↑। **স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ** হলো রেলগাড়ীর দুই পাটি রেল-লাইনের মধ্যে 4 ফুট 8½ ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে সব দেশেই তাকে বলা হয় 'স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ' লাইন। (গেজ ↑)।

স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ার — বায়ু-মণ্ডলীয় চাপের একক বিশেষ; 45° ল্যাটিচিউডে ↑ এবং সাগরপৃষ্ঠের সমউচ্চে অবস্থিত কোন স্থানে 0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বায়ুর চাপ হয় 760 মিলিমিটার (29·92 ইঞ্চি) উচ্চ পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান; এই বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে বলে এক 'নর্ম্যাল, বা স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ার'। এক স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ার = 1·0132 বার ↑, = প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·72

পাউণ্ড পরিমিত চাপ। অবশ্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুমণ্ডলের চাপ এই পরিমাণের উপরে বা নিচে ওঠা-নামা করে থাকে।

স্টাণ্ডার্ড টাইম — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থানে ঘড়ির সময়ের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; কারণ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সর্বত্র এক সময়ে হয় না। পৃথিবীর যত পূর্বাভিমুখে যাওয়া যাবে তত আগে সূর্যোদয় হবে, সময় এগিয়ে যাবে। এভাবে এক দেশে যখন সকাল, তার পূর্বাঞ্চলে তখন অনেক বেলা হয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলে অনেক রাত। এজন্যে পৃথিবীর সর্বত্র সময়ের একটা পারম্পর্য বিধানের জন্যে একটা নির্দিষ্ট স্থানের সময়কে 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' ধরা হয়েছে। ইংলণ্ডের গ্রিনউইচ (0° মেরিডিয়ান) নামক স্থানের সময়কে 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' বা নির্দিষ্টকাল ধরা হয়; একে **গ্রিনউইচ টাইম**-ও বলে। গ্রিনউইচের পশ্চিমে অবস্থিত কোন স্থানে প্রতি ডিগ্রি মেরিডিয়ান ↑ ব্যবধানে 4 মিনিট করে সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম থেকে বাদ দিলে স্থানীয় সময় পাওয়া যায়; আর পূর্বাঞ্চলে ওইরূপ প্রতি ডিগ্রি মেরিডিয়ানে 4 মিনিট করে সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্থানীয় সময় স্থির করা হয়ে থাকে।

স্ট্যাণ্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার — সংক্ষেপে বলে S.T.P.; অথবা, 'নর্ম্যাল টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার' (N.T.P.)। এই সর্বসম্মত নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন মাপা, বা তুলনা করা হয়। এই নির্দিষ্ট চাপের পরিমাণ হলো 760 মিলিমিটার পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান (ব্যারোমিটার ↑) এবং উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) হলো 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স — ইমারতাদিতে উৎকৃষ্ট কন্‌ক্রিট জমাবার জন্যে যে অনুপাতে সিমেণ্ট ↑, বালি ও পাথর-কুচি মেশান হয়। এর সর্বসম্মত নির্দিষ্ট অনুপাত, অর্থাৎ 'স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স' হলো এক ভাগ সিমেণ্ট, দুই ভাগ বালি ও চার ভাগ পাথর কুচি।

স্ট্যাণ্ডার্ড সেল — বিশেষ এক রকম প্রাইমারি সেল ↑ ; যেমন—ওয়েস্টন সেল, যাতে উৎপাদিত তড়িৎ-শক্তি (ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑) দীর্ঘ সময়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট স্থির বিভবযুক্ত থাকে। সাধারণ সেলে বিভিন্ন কারণে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স, বা তড়িৎ-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে; কিন্তু স্ট্যাণ্ডার্ড সেলগুলিতে এই পার্থক্য তেমন লক্ষিত হয় না।

স্ট্যালাক্‌টাইট—প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য হিসাবে কোন কোন পার্বত্য গুহার ছাদ থেকে নিচের দিকে ঝুলন্ত স্তম্ভাকার, অথবা সরু কাঠির মত প্রস্তর, বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট। গুহার তলদেশ থেকে দণ্ডায়মান এরূপ স্তম্ভগুলিকে বলে **স্ট্যালাগ্‌মাইট**।

স্যাকারিন — সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, অত্যধিক মিষ্ট স্বাদযুক্ত। এর রাসায়নিক ফর্মুলা $C_6H_4SO_2$ CONH ; জলে অনেকটা দ্রবণীয়। চিনির চেয়ে প্রায় 550 গুণ অধিক মিষ্ট ; কিন্তু এর কোন খাদ্যগুণ নেই, বেশি খেলে বরং অনিষ্টকর হতে পারে। অবশ্য আজকাল লিমোনেড, আইসক্রিম প্রভৃতি পানীয়ে, এমন কি, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যেও স্যাকারিন ব্যবহার করা হচ্ছে। কোল-টার ↑ থেকে পাওয়া যায় টলুইন ↑ ; আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই টলুইন থেকে স্যাকারিন পাওয়া যায়।

স্যাকারোমিটার — শর্করা-দ্রবের ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ। চিনির জলীয় দ্রবের মধ্যে দ্রবীভূত চিনির পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম হাইড্রোমিটার ↑ যন্ত্র। দ্রবের মধ্যে শতকরা কত ভাগ চিনি আছে যন্ত্রের গায়ে তার নির্দেশক স্কেলের দাগ কাটা থাকে।

স্যাকারো-মিটার

স্যাকারিমিটার — শর্করা-দ্রবের ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ এক রকম যন্ত্র। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্রবের মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মি পোলারাইজ্‌ড ↑ করা হয়। এই পোলারিজেসনের ↑ ফলে আপতিত রশ্মির যে কৌণিক বিবর্তন ঘটে তা থেকে দ্রবের ঘনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। দ্রবীভূত শর্করার পরিমাণ নির্ধারণের এরূপ প্রক্রিয়াকে বলে **স্যাকারিমেট্রি**।

স্যাকারোজ — সুক্রোজ ↑ ।

স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড — যে সব যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর মধ্যে তার সংগঠক পরমাণুগুলোর কোনটিরই অসংবদ্ধ কোন ভ্যালেন্সি ↑ থাকে না; অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রত্যেকটি ভ্যালেন্সি-বণ্ড ↑ পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হওয়ার ফলে গঠিত সুসম্পূর্ণ অণুর সমবায়ে যে-সব যৌগিকের সৃষ্টি হয়। এরূপ স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড, অর্থাৎ সম্পৃক্ত যৌগিকের পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন পরমাণু বা রেডিক্যাল ↑ যুক্ত করে আর কোন নুতন যৌগিক উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। যেমন—মিথেন ↑, CH_4, হলো একটি স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড, বা সম্পৃক্ত যৌগিক, কিন্তু ইথিলিন ↑, C_2H_4, স্যাচুরেটেড নয়; এর সঙ্গে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে 'ইথিলিন ডাইক্লোরাইড', $C_2H_4Cl_2$, (ডাচ্ ফ্লুইড ↑) তৈরি হয়ে থাকে।

স্যাকারোমাইসিস — যে-সব ঈষ্ট ↑ চিনির জলীয় দ্রবকে গাঁজিয়ে অ্যালকোহলে ↑ পরিণত করে।

স্যাচুরেটেড সল্যুসন — সম্পৃক্ত দ্রব। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল দ্রাবক পদার্থে সর্বোচ্চ পরিমাণ

দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবকে বলে সম্পৃক্ত দ্রব, বা স্যাচুরেটেড সল্যুসন ↑। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আরও দ্রাব্য পদার্থ (সলিউট ↑) ওই দ্রবে মেশালে আর তা দ্রবীভূত হয় না (সুপারস্যাচুরেসন ↑)। অবশ্য উষ্ণতা কমালে সলিউট পৃথক হয়ে পড়ে; আর উষ্ণতা বাড়ালে আরও সলিউট দ্রবীভূত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ সল্‌ভেণ্টের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ সলিউটের দ্রবীভূত থাকার অবস্থা, অর্থাৎ 'সল্যুসনের স্যাচুরেসন', বা সম্পৃক্ততা প্রধানতঃ তার উষ্ণতার উপরই নির্ভর করে।

স্যাটেলাইট — উপগ্রহ; যে সব জ্যোতিষ্ক নিজ কক্ষপথে অপর কোন জ্যোতিষ্কের (গ্রহের) চার দিকে পরিভ্রমণ করে; যেমন — চন্দ্র পৃথিবীর স্যাটেলাইট, বা উপগ্রহ। জুপিটার ↑, মারস ↑ প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহেরই বিভিন্ন সংখ্যক স্যাটেলাইট আছে।

স্যাণ্ড — বালি, বালুকা; রাসায়নিক হিসেবে অবিশুদ্ধ সিলিকা ↑, SiO_2, অর্থাৎ 'সিলিকন ডাইঅক্সাইড়'।

স্যান্‌টোনিন — উদ্ভিজ্জ একটা জৈব রাসায়নিক উপক্ষার (অ্যাল্‌কালয়েড ↑) পদার্থ; ঔষধ হিসেবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহারে অন্ত্রে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার কৃমি বিনষ্ট হয়। সূত্রবৎ ও গোলাকার কৃমি সব এতে মরে; কিন্তু চ্যাপ্‌টা ফিতে-কৃমি এতে অবশ্য মরে না। মাত্রাধিক্যে বিষ-ক্রিয়া ঘটে (ভার্মিফিউজ ↑)।

স্যাপোনিফিকেসন — সাবান তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়া। অ্যাল-কালির ↑ বিক্রিয়ায় জান্তব চর্বি, বা উদ্ভিজ্জ তৈল থেকে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার ↑। এই শ্রেণীর এস্টারগুলোর এক রকম হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়াকে বলে স্যাপোনিফিকেসন; যার ফলে সাবান তৈরি হয়। সাধারণতঃ সোপ ↑, বা সাবানকে বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে।

স্যাটার্ণ — শনি গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 88 কোটি 60 লক্ষ মাইল; বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) ও ইউরেনাস ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা কক্ষপথে এটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর সিডিরিয়াল ইয়ার ↑ পৃথিবীর হিসাবে প্রায় 29·46 বছর, অর্থাৎ সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে শনি গ্রহের পৃথিবীর হিসেবে লাগে 29·46 বছর। গ্রহটার ভর (মাস্ ↑) পৃথিবীর প্রায় 95 গুণ অধিক; এর উপরিভাগের উষ্ণতা প্রায় −150° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শনিগ্রহের ন'টা ছোট ছোট উপগ্রহ আছে; গ্রহটাকে বেষ্টন করে একই

শনিগ্রহের বলয়

সমতলে আবার পর পর তিনটা বলয়ও দেখা যায়। মনে হয়, এই বলয়গুলো এর কোন কোন উপ-গ্রহের চূর্ণিত দেহাবশিষ্টে গঠিত হয়ে ওকে বেষ্টন করে ঘুরছে।

স্যাপ্রোফাইট — বিভিন্ন মৃত ও পচা জৈব পদার্থাদির উপরে ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) জাতীয় যে-সব উদ্ভিদ জন্মায়। এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়াও এরূপ স্যাফোফাইট শ্রেণীর ফাঙ্গাস জাতীয় সক্রিয় জৈব পদার্থ বিশেষ; এরা মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ-দেহ বিশ্লিষ্ট করে পচিয়ে ফেলে। **স্যাপ্রোবায়োটিক** মানে গলিত ধ্বংসোন্মুখ পদার্থে উৎপন্ন বিশেষ এক প্রকার জীবাণু। **স্যাপ্রো** মানে পচনশীল।

স্যাফায়ার — স্বভাবজাত এক রকম নীলবর্ণের স্বচ্ছ স্ফটিকাকার প্রস্তর বিশেষ। বাংলায় বলে নীলকান্ত মণি। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো কোরাণ্ডাম ↑, বা অ্যালুমিনা, Al_2O_3; সামান্য কিছু কোব্যাল্ট ↑ সংমিশ্রিত থাকায় প্রস্তরটা নীলবর্ণ দেখায়। সুদৃশ্য মূল্যবান পাথর, অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়।

স্যামারিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Sm, পারমাণবিক ওজন 150·43, পারমাণবিক সংখ্যা 62; রেয়ার আর্থ ↑ ধাতু-গোষ্ঠির অন্যতম। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মোনাজাইটের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কখন কখন অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

স্যাল অ্যামোনিয়াক — অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl; বাংলায় একে বলে নিশাদল। ড্রাই সেল ↑, অথবা ব্যাটারিতে ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

স্যালভোলাটাইল — অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট (NH_4HCO_3), অ্যামোনিয়াম কার্বামেট, ($NH_4O.CO.NH_2$) এবং অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, $(NH_4)_2CO_3$, এই তিন রকম সল্টের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ। সাধারণতঃ একে এক কথায় 'অ্যামোনিয়াম কার্বনেট', বা 'অ্যামন-কার্ব' বলে। অবসাদ ও দুর্বলতায় একটা সাধারণ উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। উদ্বায়ী পদার্থ, তীব্র ঝাঁজ বিশিষ্ট; সর্দি, মাথাধরা প্রভৃতির জন্যে লোকে এর গন্ধ সোঁকে, বা জলে দিয়ে পান করে। আবার কেবল অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, লেবুর রস ও অ্যালকোহল ↑ মিশিয়েও এরূপ এক রকম উত্তেজক পানীয় তৈরি করা যেতে পারে।

স্যালিনোমিটার — লবণাক্ত জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ নির্দেশক এক রকম হাইড্রোমিটার ↑। দ্রবের ঘনত্ব নিরূপণ করবার জন্যে যন্ত্রের গায়ে লবণ ও জলের শতকরা হিসেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে। দ্রবে ডুবিয়ে এরূপ হাইড্রোমিটারের স্কেল থেকে সোজাসুজি দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ জানা যায়।

স্ল্যাগ — ধাতু-মল ; খনিজ ধাতব পদার্থ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ায় ময়লা ও বিভিন্ন সংমিশ্রিত পদার্থের যে গাদ বেরোয় (বেসিক-স্ল্যাগ ↑)। সাধারণতঃ গলিত ধাতুর উপরে এই গাদ বা স্ল্যাগ ভেসে ওঠে।

স্লেক্‌ড লাইম — ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑, $Ca(OH)_2$। কুইক লাইমের ↑ (CaO) সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ ; এই বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে (এক্সোথার্মিক ↑)। সাধারণ জলীয় চূণ (লাইম ↑)।

স্লাইড রুল — গাণিতিক গণনাদির জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ। মোটামুটি এতে এক খানা স্কেল বা রুলারের উপরে আর এক খানা রুলার এমনভাবে সংবদ্ধ থাকে যাতে উপরের রুলারখানা নিচের রুলারের উপরে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া যায়। বিশেষ এক রকম (লগারিদ্‌ম ↑) স্কেলে উভয় রুলারে অনুরূপ দাগ কাটা থাকে। দুই স্কেলের দাগ-সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করে বিশেষ নিয়মের হিসাব-তালিকা (লগারিদ্‌ম টেবল) অনুসারে গুণ ও ভাগের কাজ এর সাহায্যে অতি সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

স্যাল্‌মোনেলা — এক শ্রেণীর বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া ↑ ; এই জাতীয় রোগ-জীবাণুর সংক্রমণেই টাইফয়েড ↑ ও প্যারা-টাইফয়েড ↑ জ্বর হয়।

স্যালিভা — মুখের লালা ; দাঁতের নিচের মাড়ির প্রান্তে কানের নিম্নভাগে অবস্থিত 'প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড' ↑ থেকে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়। খাদ্য গ্রহণের সময় এই লালা-রসের ক্ষরণ সমধিক বৃদ্ধি পায় এবং ভুক্ত খাদ্যকে সুপাচ্য করে তোলে।

স্পাইন — মেরুদণ্ড, বা শিরদাঁড়া। **স্পাইনাল কর্ড**—মেরু রজ্জু, মেরুদণ্ডের হাড়গুলির মধ্যবর্তী স্নায়ু-রজ্জুর গুচ্ছ। এর ভিতর দিয়েই দেহের যাবতীয় স্নায়ুজাল মস্তিষ্কে গেছে ; দেহের সব অনুভূতি, সাড়া ও স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রেরণা এর মাধ্যমেই কার্যকরী হয়। **স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া**—মেরুদণ্ডের পাশে ঔষধ ইন্‌জেকসন করে দেহের নিম্নাংশ অবশ ও অনুভূতিহীন করে ফেলা।

স্পার্ক কয়েল — ইণ্ডাক্‌সন কয়েল ↑।

স্পার্কিং প্লাগ — ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌ন ইঞ্জিনে ↑ তড়িৎস্ফুরণের জন্যে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে পেট্রলের ↑ বাষ্প ও বাতাসের সংমিশ্রণের ভিতরে এর সাহায্যে প্রয়োজনের সময়ে মুহূর্ত মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে থাকে।

স্পার্মাসেটি — মোমের মত এক রকম সাদা জৈব পদার্থ ; তিমি মাছের চর্বি থেকে পাওয়া যায়। এর গলনাংক 40° থেকে 50° সেণ্টিগ্রেড মাত্র। ক্রিম, পোমেড প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যে

ও গায়ে-মাখা সাবান তৈরির কাজে জিনিসটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্পার্ম — শুক্রকীট ; পুরুষের প্রজনন-কোষ। বিভিন্ন জীবের অতি-সূক্ষ্ম এই স্পাম বা জীব-কোষগুলি বিভিন্ন গঠন ও আকার-আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। মাইক্রোস্কোপের ↑ ভিতর দিয়ে দেখলে এদের চেহারার পার্থক্য পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। এদের আবার কখন কখন **স্পার্মাটোজোয়া**-ও বলে।

মানুষের স্পার্ম, বা শুক্রকীট

স্পিজেল — লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বনের এক রকম সংকর ধাতু। বিসিমার প্রোসেসে ইস্পাত (স্টিল ↑) তৈরি করবার প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে এই স্পিজেল মেশান হয়।

স্পিরিট অব সল্ট—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ↑ (HCl)। সাধারণ খাদ্য-লবণ (NaCl) থেকে পাওয়া যায় বলে অ্যাসিডটা কখন কখন এই নামে অভিহিত হয়।

স্পিরিট অব ওয়াইন — ইথাইল অ্যালকোহল ↑।

স্পিনথারিস্কোপ—যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জিঙ্ক-সাল্‌ফাইড মিশ্রিত রং-এর আস্তরণের উপরে অতি সূক্ষ্ম রেডিয়াম ↑ কণিকাগুলিকে অতি-ভাস্বর সমুজ্জ্বল বিন্দুবৎ দেখা যায়। (লুমিনাস পেইণ্ট ↑)

স্পিরিট লেভেল — একটা সাধারণ যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন স্থানের অনুভূম সমতলতা পরীক্ষা করা হয়। একটা ছোট বদ্ধমুখ কাঁচনলের মধ্যে
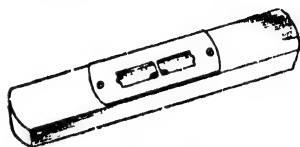
স্পিরিট লেভেল

কোন তরল পদার্থ, সাধারণতঃ স্পিরিট (অ্যালকোহল ↑) পুরে তার মধ্যে সামান্য বাতাসের একটা ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ রাখা হয়। এটাকে সমতল একটা কাঠের ফ্রেমের মাঝখানে এঁটে স্পিরিট-লেভেল তৈরি হয়। কাঁচ-নলটার ঠিক মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে। ফ্রেমটা সমতল স্থানে রাখলে কাঁচনলের বুদ্‌বুদ্‌টা ওই দাগের সঙ্গে মিলে যায় ; আর অসমতল হলে এক দিকে সরে গিয়ে স্থানের অসমতলতা নির্দেশ করে।

স্পেকুলাম মেটাল — এক রকম সংকর-ধাতু ; দুই ভাগ তামা ও এক ভাগ টিন মিশিয়ে এটা তৈরি হয়। মাইক্রোস্কোপ ↑, এপিডায়াস্কোপ ↑ সিনেমা-যন্ত্র প্রভৃতিতে আলোকরশ্মির যথাযথ প্রতিফলনের জন্যে নির্মিত প্রতিফলক দর্পণাদি সাধারণতঃ এ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

স্পুটনিক — পৃথিবীর কৃত্রিম উপ-গ্রহের রাশিয়ান নাম। মহাশূন্যের

বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নিরূপণের জন্যে 1957 সালের 4 অক্টোবর, রাশিয়া প্রথম মনুষ্যনির্মিত কৃত্রিম চাঁদ (প্রথম স্পুটনিক) রকেটের ↑ সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। এটা ওজনে ছিল 184 পাউণ্ড ; প্রতি 90 মিনিটে এ-চাঁদ পৃথিবী পরিক্রমা করেছে। রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক উৎক্ষিপ্ত হয় 1957 সালের 3, নভেম্বর ; এর ওজন ছিল 1120 পাউণ্ড। এর মধ্যে প্রথম শূন্যচারী জীব 'লাইকা' নামক কুকুরটি ছিল ; এটা পৃথিবী পরিক্রমা করতে করতে 14, এপ্রিল, 1958 তারিখ ধ্বংস হয়ে যায়। রেডিও ↑ মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের হালচাল সম্বন্ধে তথ্যাদি এ-সব স্পুটনিক থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। তার পরে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশেই ক্রমাগত এর উন্নততর প্রচেষ্টা চলছে।

স্পুটাম — থুথু, কাশি ও শ্লেষ্মা ; মুখ ও গলা থেকে যে অর্ধ-তরল পদার্থাদি নিঃসরিত হয়।

স্পেক্ট্রাম — বর্ণালি ; সাধারণ আলোক-রশ্মি কোন প্রিজ্‌ম ↑, বা ডিফ্র্যাক্সন-গ্রেটিং-এর ↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে যে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে তোলে। এই বর্ণালির দৃশ্য অংশের এক দিকে লাল ও অপর দিকে বেগুনী রং দেখা যায় ; মাঝে থাকে পর-পর মোটামুটি অন্য পাঁচটা বর্ণের সমাবেশ। সাদা আলোক-রশ্মি এভাবে তার সংগঠক বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে এই স্পেক্ট্রাম, অর্থাৎ বর্ণালির সৃষ্টি করে। আলোক-রশ্মি মাত্রেই তড়িৎ-

স্পেকট্রাম বা বর্ণালী
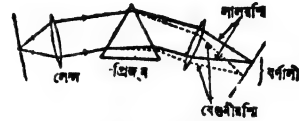
চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের (ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভস্ ↑) ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে (লাইট ↑)। বর্ণহীন সাধারণ আলোকের তরঙ্গমালা বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও স্পন্দনবিশিষ্ট তড়িৎ চুম্বকীয় বিভিন্ন তরঙ্গের (বর্ণের) সমবায়ে গঠিত ; প্রিজ্‌ম ↑ অথবা 'ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং'-এর ↑ মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে তার ওই সংগঠক তরঙ্গগুলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গগুলো নির্দিষ্ট কোণে বেঁকে বর্ণালির পৃথক পৃথক বিভিন্ন বর্ণে প্রকাশ পায়।

মূল আলোক-রশ্মির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকম বর্ণালির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক ল্যাম্পের প্রদীপ্ত ফিলামেণ্ট, বা এরূপ কোন অত্যুত্তপ্ত ভাস্বর পদার্থ থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির বর্ণালিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে মোটামুটি সাতটা বর্ণ (স্পেক্ট্রাম-কালার ↑) ফুটে ওঠে; অবশ্য নানা রকম মিশ্র বর্ণাভাও তার মধ্যে দেখা যায়। এরূপ বর্ণালিকে

বলা হয় **কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্রাম**, বা 'ধারা-বর্ণালি'। কোন প্রদীপ্ত গ্যাস, বা বাষ্প থেকে যে বিশেষ আলোকরশ্মি বেরোয় তার বর্ণালিতে সব বর্ণ থাকে না; কয়েকটা মাত্র বর্ণের রেখা দেখা যায়, মাঝে মাঝে থাকে বর্ণহীন ব্যবধান; একে বলে **লাইন স্পেক্ট্রাম**, অথবা 'রেখা-বর্ণালি'। কোন কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে ওই বর্ণ-রেখাগুলোকে চওড়া ফিতার মত দেখায়, মাঝে মাঝে থাকে বর্ণহীন; একে বলে **ব্যাণ্ড স্পেক্ট্রাম**, অথবা 'ফিতে-বর্ণালি'। এরূপ নানা রকম বর্ণালি সৃষ্টির মূল কারণ হলো এই যে, সাদা আলোক-রশ্মি বিভিন্ন গ্যাস বা সল্যুসনের ↑ ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবার সময়ে তার কোন কোন সংগঠক তরঙ্গ (বর্ণ) ওই গ্যাস, বা সল্যুসনে শোষিত হয় এবং স্পেক্ট্রামে সেই বর্ণ বা তরঙ্গের স্থানে বর্ণহীন ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এজন্যে এ-সব বর্ণালিকে বলা হয় 'অ্যাব্জর্পসন স্পেক্ট্রাম,' বা 'শোষণ-বর্ণালি'।

স্পেক্ট্রোগ্রাফ — যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালির আলোকচিত্র, বা ফটোগ্রাফ তোলা হয়। আবার, এভাবে গৃহীত আলোক-চিত্রকেও অনেক সময় স্পেক্ট্রোগ্রাফ বলা হয়ে থাকে।

স্পেক্ট্রাম অ্যানালিসিস — বর্ণালি বা স্পেক্ট্রামের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থান, আয়তন, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও উপাদান বিশ্লেষণ করবার প্রক্রিয়া। কোন বিশেষ পদার্থ থেকে বিকিরিত, বা কোন মাধ্যম পদার্থে পরিচালিত আলোক-রশ্মির বর্ণালিতে যে বিভিন্ন রূপ বর্ণরেখা উদ্ভাসিত হয় তার বিস্তৃতি ও গঠন সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে। এজন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থায় স্পেক্ট্রোমিটার ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালির বিশ্লেষণ করে আলোক-উৎসের বা মাধ্যম পদার্থের গঠন, উপাদান, ধর্ম প্রভৃতি কৌশলে স্থির করা যেতে পারে। (মাস্-স্পেক্ট্রাম ↑)।

স্পেক্ট্রাম কালার—বর্ণহীন, বা সাদা আলোকরশ্মির ধারা-বর্ণালিতে (কন্টি-নিউয়াস স্পেক্ট্রাম ↑) মোটামুটি যে সাতটা বর্ণ দেখা যায়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিম্নক্রম অনুসারে ওই বর্ণগুলো যথাক্রমে লাল, কমলা, হল্‌দে, সবুজ, নীল, গাঢ়নীল, বেগুনী—এভাবে সাজান থাকে। এই হলো স্পেক্ট্রামের দৃশ্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ অসংখ্য; সুস্পষ্টভাবে ওই সাতটা বর্ণ মাত্র দেখা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্ন বর্ণাভা সৃষ্টি হয়ে থাকে। লালবর্ণের পরবর্তী দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে বলে **ইনফ্রা-রেড রে** ↑ (অবলোহিত রশ্মি); আর বেগুনী রশ্মির চেয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে বলে **আলট্রা-ভায়োলেট** ↑ (অতি-বেগুনী) রে। দৃশ্য বর্ণালির বহিস্থ এই দুই অংশই আমাদের চোখে অদৃশ্য থেকে যায়।

স্পেক্ট্রোস্কোপ—যে-যন্ত্রের সাহায্যে স্পেক্ট্রাম ↑, বা বর্ণালির বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণরেখার পারস্পরিক অবস্থান, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

স্পেক্ট্রোমিটার—যে-যন্ত্রের সাহায্যে স্পেক্ট্রামের ↑ বিভিন্ন বর্ণ-সমাবেশের আকার, বিস্তৃতি, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি মেপে মূল আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও মাধ্যম পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় (স্পেক্ট্রাম-অ্যানালিসিস ↑)।

স্পেসিফিক — নির্দিষ্ট কোন রোগ নিরাময়ের বিশেষ ঔষধ; যেমন—কুইনিন ম্যালেরিয়ার স্পেসিফিক। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের জৈব-কোষগুলির মধ্যে বিশেষ এক শ্রেণীর কোষ বর্ণ-রঞ্জিত করবার জন্যে যে সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদেরও কখন কখন স্পেসিফিক বলে; জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এর দরকার হয়।

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি — আপেক্ষিক গুরুত্ব; কোন পদার্থের গুরুত্ব অর্থাৎ ওজন সম-আয়তন জলের ওজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে স্থির করে যে আনুপাতিক সংখ্যা পাওয়া যায়। সোনার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 19·3; এতে বুঝতে হবে, যে-কোন আয়তনের খানিকটা সোনা সমান আয়তনের জলের চেয়ে 19·3 গুণ বেশি ভারী। 4°সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের গুরুত্ব, বা ওজন হয় সব চেয়ে বেশি; এজন্যে সর্বদা 4° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের তুলনায় পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করা হয়। মনে রাখতে হবে, আপেক্ষিক গুরুত্ব, অর্থাৎ 'স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি' কেবল একটা সূচক সংখ্যা মাত্র। পক্ষান্তরে কোন পদার্থের এক ঘন সেণ্টি-মিটার ↑ আয়তনের ওজন যত গ্র্যাম তাকে বলে পদার্থটার ডেন্সিটি ↑।

স্পেসিফিক হিট — পদার্থের বিশেষ তাপশক্তি। 'হিট, স্পেসিফিক' ↑।

স্পেল্টার — অবিশুদ্ধ জিঙ্ক ↑, বা দস্তার ব্যবহারিক নাম; যেরূপ দস্তা সাধারণতঃ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এবং গ্যাল্ভ্যানাইজিং-এর ↑ কাজে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে সীসা (লেড ↑) প্রভৃতি ধাতু কিছু কিছু মিশ্রিত থাকে; বিশুদ্ধ দস্তা প্রায় 97% থাকে।

স্পোর — প্রজনন-কণিকা। শৈবাল, ছত্রাক (ফার্ণ ↑) প্রভৃতি নিম্ন-পর্যায়ের কোন-কোন উদ্ভিদ, বা অতি সরল গঠনের ক্ষুদ্র জীব-দেহ থেকে বিমুক্ত প্রজনন-কোষ। এগুলিই ক্রমে অনুরূপ পর্যায়ের নূতন উদ্ভিদ বা প্রাণীতে পরিণত হয়। এদের স্পোর সৃষ্টি হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে; স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন হয় না এবং উদ্ভিদ-বীজের মত এদের মধ্যে কোন ভ্রূণও (এম্ব্রায়ো ↑) থাকে না।

স্পোরোজেনিসিস — শৈবালাদি কোন-কোন নিম্নপর্যায়ের উদ্ভিদ বা

প্রাণিদেহে স্পোর ↑, অর্থাৎ প্রজনন-কণিকার উদ্ভব-প্রক্রিয়া। আর **স্পোরোজোয়াইট্‌স** হলো এক শ্রেণীর অতিসূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক পরজীবী জীবাণু (প্যারাসাইট ↑); যেমন, মশার দংশনে মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে এবং তারা স্পোরের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে চলে।

স্প্যাষ্টিক প্যারাপ্লেজিয়া — বিশেষ এক প্রকার পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস ↑) রোগ; মস্তিষ্কে আঘাত-জনিত বিকলতায় এ রোগ হয়ে থাকে। এতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লোপ পায় এবং মাংসপেশী সব শক্ত হয়ে পড়ে; আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন অঙ্গের কম্পন ও খিচুনী দেখা দেয়। **স্প্যাষ্টিক** কথাটার মানে দেহের খিচুনী বা স্প্যাজম সম্পর্কীয়। অনিয়মিতভাবে মাংসপেশীর সংকোচনজনিত খিচুনিকে বলে **স্প্যাজম**।

স্প্লীন — প্লীহা, দেহাভ্যন্তরস্থ একটা যন্ত্রাংশ; এটা থাকে বক্ষের নিম্নাংশে, নিচে কিড্‌নি ↑ ও উপরে লাংস ↑, এদের মাঝে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড থেকে এর মধ্যে রক্ত যাওয়া-আসা করে এবং নূতন রক্তকোষ তৈরি হয়। ম্যালেরিয়া রোগে প্লীহায় রক্ত জমে ও আকারে বর্ধিত হয় এবং দেহ রক্তহীন করে ফেলে

হটেন্‌টট —দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এক আদিম মানব গোষ্ঠি। অধুনা এদের মধ্যে বাণ্টু, বুশম্যান, নামকোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। পশুপালনই এদের প্রধান উপজীবিকা।

হর্টিকাল্‌চার — উদ্ভিদপালন-বিদ্যা; বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদাদির রোপন, সংরক্ষণ, পরিপোষণ প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদির বিদ্যা। শাকসব্জি, ফল, ফুল উৎপাদনের সৌখিন কৃষিবিদ্যা। বিভিন্ন উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রয়োগ, আলোক ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি চাষ-আবাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর অন্তর্গত। জলের মধ্যে (হাইড্রোপোনিক্‌স ↑), মাটিহীন শূন্যে, বালির মধ্যে, এরূপ বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন কৌশলে উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও পালনের প্রক্রিয়াও হার্টিকাল্‌চারের অন্তর্ভুক্ত।

হর্ন সিল্‌ভার — খনিজ অবিশুদ্ধ সিল্‌ভার ক্লোরাইড, AgCl; এই খনিজ থেকেই অধিকাংশ রৌপ্য নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। একে কখন কখন **ক্লোরার্জিরাইট**-ও বলা হয়।

হর্ন ব্লেণ্ড —এক রকম ধাতব খনিজ প্রস্তর বিশেষ; প্রধানতঃ ক্যাল-সিয়াম ↑, ম্যাগ্নেসিয়াম ↑ ও আয়রনের সিলিকেট ↑ যৌগিকের সংমিশ্রণে গঠিত। দেখতে কালো, বা

সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ। অত্যধিক উত্তাপে বালি চূণ ও ম্যাগ্নেসিয়ার ↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে কৃত্রিম উপায়েও অনুরূপ পদার্থ উৎপাদন করা যায়।

হর্মোন — জীব-দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী (অ্যাণ্ডোক্রাইন ↑) গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন জৈব রস; এগুলি সবই অতি জটিল গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক ক্রিয়া সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ↑ থেকে এরূপ বিভিন্ন হর্মোন, বা জৈব রস নিঃসৃত হয়ে থাকে।
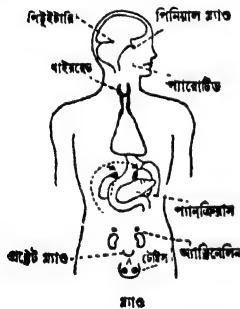
হর্মোন-নিঃসারী গ্ল্যাণ্ড সমূহ

দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনে এই সব রস যথাসময়ে নিঃসৃত হয়ে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। হঠাৎ কোনরূপ ভয় পেলে 'অ্যাড্রিনেলিন' হর্মোন নিঃসৃত হয়; পিটুইটারি ↑ হর্মোন দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে; বিশেষ এক রকম 'সেক্স' হর্মোন নিঃসরণের ফলে পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায়; আর ইন্সুলিন ↑ নামক হর্মোন রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে। এভাবে দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা কাজের জন্যে আরও নানা রকম হর্মোন দেহাভ্যন্তরে স্বতঃই নিঃসৃত হয়ে থাকে। এদের যে-কোন একটির অভাবে দেহের স্বাভাবিক জৈবক্রিয়া ও স্বাস্থ্য বজায় থাকে না।

হর্স পাওয়ার — শক্তি পরিমাপের একটি একক বিশেষ: বাংলায় বলে অশ্ব-শক্তি। 550 পাউণ্ড ↑ ওজনের কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে এক ফুট উচ্চে উত্তোলন করতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে বলে এক 'হর্স পাওয়ার'। এর পরিমাণ হলো 746 ওয়াট ↑, বা প্রায় 3/4 কিলো-ওয়াট ↑। ডায়নামো, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রের কর্ম-শক্তি এই 'হর্স পাওয়ার' এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

হাইগ্রোস্কোপিক — যে সব পদার্থ উন্মুক্ত থাকলে বায়ুর জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে আর্দ্র হয়ে ওঠে; যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড ↑ বা খাদ্য-লবণ, NaCl, কতকটা এরূপ। শুষ্ক চুণ, অর্থাৎ কুইক লাইম ↑, (CaO), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) প্রভৃতি হাইগ্রোস্কোপিক পদার্থ।

হাইগ্রোস্কোপ — যে সব যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের তুলনামূলক বা আনুপাতিক আর্দ্রতার (রিলেটিভ হিউমিডিটি ↑) পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ কোন স্থানের বায়ুতে

সংমিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ চোখে দেখে জানা যেতে পারে; আর এর সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করা যায়।

হাইগ্রোমিটার — বায়ুমণ্ডলের হিউমিডিটি ↑, বা আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র; এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে কোন স্থানের বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প মিশ্রিত রয়েছে তা স্থির করা যায়। সাধারণ হাইগ্রোমিটারে থাকে দুটা থার্মোমিটার ↑; একটার পারদ-গোলক ভিজা কাপড়ে জড়ানো, অপরটার গোলক থাকে শুষ্ক (ওয়েট অ্যাণ্ড ড্রাই বাল্‌ব থার্মোমিটার)। বায়ুর আর্দ্রতা অনুযায়ী ভিজা কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে ধীরে ধীরে উবে যায়; তার ফলে সংলগ্ন বায়ুর তাপ হ্রাস পায়; কাজেই ওই থার্মোমিটারে বায়ুর অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতা জ্ঞাপন করে; অপরটায় স্বাভাবিক উষ্ণতাই ওঠে। এভাবে থার্মোমিটার দুটাতে পরিলক্ষিত উষ্ণতাসূচক ডিগ্রি-স্কেলের পার্থক্য থেকে নির্দিষ্ট তালিকা (হিউমিডিটি চার্ট) দেখে স্থানীয় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের (আর্দ্রতার) শতকরা পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা যায়।
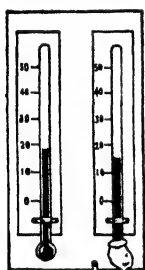
ড্রাই অ্যাণ্ড ওয়েট বাল্‌ব থার্মোমিটার

হাইড্রক্সাইড — যে সব যৌগিক পদার্থ কোন ধাতব পরমাণুর সঙ্গে কোন হাইড্রক্সিল ↑ র‍্যাডিক্যালের মিলনে গঠিত হয়। সাধারণতঃ কোন ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক সংযোগের ফলে হাইড্রক্সাইড যৌগিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। জলের (H_2O) একটা হাইড্রোজেন-পরমাণু বিচ্যুত হলে যে হাইড্রক্সিল (OH) গ্রুপ জন্মায় তার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতব পরমাণু, বা র‍্যাডিক্যাল সংযুক্ত হয়ে এই শ্রেণীর যৌগিকের উৎপত্তি ঘটে; যেমন $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$. ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, বা স্লেক্‌ড্‌ লাইম ↑। হাইড্রক্সাইড-গুলো সবই ক্ষারধর্মী। জলে দ্রবীভূত হলে হাইড্রক্সিল আয়ন ↑ ও ধাতব আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়; এজন্যেই অ্যাসিডের সঙ্গে হাইড্রক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগে সহজেই বিভিন্ন সল্ট ↑ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

হাইড্রক্সিল গ্রুপ — একটা হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটা অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে যে র‍্যাডিক্যাল ↑ গঠিত হয়। এই হাইড্রক্সিল গ্রুপ বা র‍্যাডিক্যাল (OH) রাসায়নিক প্রক্রিয়াদির সহজ ব্যাখ্যার জন্যে কল্পিত হয় মাত্র; এর পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণতঃ হাইড্রক্সাইড শ্রেণীর যৌগিক পদার্থগুলো এর সংযোগেই উৎপন্ন হয়, এরূপ মনে করা হয়; যেমন — $NaOH$,

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, KOH কষ্টিক পটাস, $Cu(OH)_2$ কপার হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি।

হাইড্রলিক প্রেস — যে যন্ত্রের সাহায্যে আবদ্ধ জলের চাপ বহুগুণ পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত চাপ-শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। তরল পদার্থের স্বাভাবিক ধর্মানুসারে (প্যাস্ক্যাল-ল ↑) আবদ্ধ পাত্রে রক্ষিত জলের যে কোন স্থানে চাপ প্রয়োগ করলে তা সর্বত্র সমশক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেই জলের উপরিভাগের আয়তন অনুসারে সে-শক্তি সমষ্টিগতভাবে বেড়ে যায়। এভাবে ক্ষুদ্র একটা পিস্টনের সাহায্যে অল্প জলে যে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করা হয় সেই শক্তি সংযোগ-নলের জলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে বৃহত্তর পাত্রের জলে প্রতি একক আয়তনে সমান শক্তিতে সঞ্চালিত হয়ে যায়। এর ফলে ওই বৃহত্তর পাত্রের অভ্যন্তরস্থ জলের উপরিভাগের আয়তন অনুসারে পরিবর্ধিত শক্তিতে বড় পিষ্টনের নিচে এক উর্ধ চাপ পড়ে। ছোট পিস্টনের এক বর্গ ইঞ্চিতে এক পাউণ্ড শক্তি প্রয়োগ করলে বড় পিস্টনের 50 বর্গ ইঞ্চিতে 50 পাউণ্ড শক্তি সঞ্চারিত হবে। হাইড্রলিক ↑ প্রেসের এই কৌশলে এক দিকে অল্প শক্তি প্রয়োগ করে অপর দিকে অধিক কাজ পাওয়া যায়। এর সাহায্যে ভারী মাল উত্তোলন, তুলা, পাট প্রভৃতির বড় বড় গাঁট বাঁধা প্রভৃতি নানা রকম কাজ সহজে সম্পন্ন হয়ে থাকে।
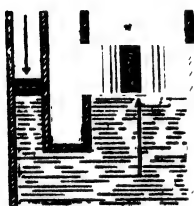
তরল পদার্থের চাপ

হাইড্রলিক প্রেস

হাইড্রলিক সিমেণ্ট — বালি ও সিমেণ্টের ↑ যে সংমিশ্রণ পর্যাপ্ত জলের সংযোগে অল্প সময়ে অত্যধিক শক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ অনুপাতে (স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স ↑) বালি এবং সিমেণ্টের ↑ এরূপ সংমিশ্রণে জল মিশিয়ে ইট জোড়া দেওয়া হয়। একেই 'হাইড্রলিক সিমেণ্ট' বলে; যা পরে হাওয়ায় শক্ত হয়ে যায়।

হাইড্রা — ক্ষুদ্র নলাকৃতি সূক্ষ্ম জলজীব। শোঁয়া নিয়ে এগুলো লম্বায় প্রায় আধ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। মুখের কাছে এদের 6 থেকে 8-টা পর্যন্ত শোঁয়ার মত অঙ্গ থাকে, ওই শোঁয়াগুলোর সাহায্যে ক্ষুদ্র কীটাদি টেনে নিয়ে এরা মুখে পোরে। হাইড্রার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের দেহাংশ স্থানে স্থানে বেড়ে গুটিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটায়, অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অংশে উপজাত

কুঁড়ির মত বর্ধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্যুত হয়ে জলে ভেসে যায়, আর তা থেকে নূতন হাইড্রা জন্মায়। আবার কখন কখন এদের স্ত্রী-পুরুষের সং-যোগেও শিশু-হাইড্রা জন্মাতে পারে। হাই-ড্রাজোয়া ↑ শ্রেণীর এ-সব জীব সচরাচর মিঠা (লবণাক্ত নয় এমন) জলেই জন্মে থাকে।
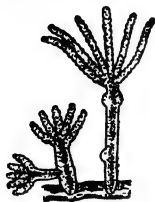
হাইড্রার বংশ বৃদ্ধি

হাইড্রাইড — হাইড্রোজেন-ঘটিত বাইনারি ↑ কম্পাউণ্ডের সাধারণ নাম। কোন কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে এরূপ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; যেমন—সোডিয়াম হাইড্রাইড, NaH। ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড, CaH_2; এভাবে জলকে বলা যায় অক্সিজেন হাইড্রাইড, H_2O, হাই-ড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেন ক্লোরিনের হাইড্রাইড, HCl, ইত্যাদি।

হাইড্রেট — নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের রাসায়নিক সংযোগে স্ফটিকাকারে গঠিত যৌগিক পদার্থ। প্রকৃত পক্ষে যে-সব সল্টের ↑ মধ্যে 'ওয়াটার অব ক্রস্টালিজেসন' ↑ থাকে তাদেরই সাধারণতঃ হাইড্রেট বলে; একে আবার **হাইড্রেটেড সল্ট**ও বলা হয়। যেমন — কপার সালফেট (ব্লু-ভিট্রিয়ল ↑) হলো $CuSO_4, 5H_2O$; নীলবর্ণ স্ফটিকাকার পদার্থ। উত্তপ্ত করলে এর জলীয় ভাগ উবে চলে যায়, সাদা পাউডার পড়ে থাকে। একে বলে 'অ্যান্‌হাই-ড্রাস', বা 'নির্জল' কপার সালফেট।

হাইড্রোকার্বন — হাইড্রোজেন ↑ ও কার্বনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সাধারণ নাম; যেমন — মিথেন, CH_4, ইথেন, C_2H_6 প্রভৃতি। প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর সকল পদার্থই বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনে গঠিত। আর পেট্রল ↑, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তৈলগুলো প্রধানতঃ বিভিন্ন খনিজ হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ মাত্র। হাইড্রোকার্বন কঠিন, তরল ও বায়বীয় সব রকমেরই আছে।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত অ্যাসিড। একে ক্লোরিন 'হাইড্রাইড' ↑, অথবা 'হাইড্রোজেন ক্লোরাইড'-ও (HCl) বলা যেতে পারে। একে কখন কখন আবার মিউরিয়েটিক ↑ অ্যাসিড, অথবা 'স্পিরিট অব সল্ট'ও বলা হয়। বর্ণহীন ধূমায়মান তরল পদার্থ; যাতে লাগে তা পুড়ে ক্ষয়ে যায়। অধিকাংশ ধাতুর সঙ্গে এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় 'ধাতব ক্লোরাইড' সল্ট উৎপন্ন হয় এবং হাইড্রোজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। সাধারণ খাদ্য-লবণ, বা

সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) উপর সাল্‌ফিউরিক ↑ (H_2SO_4) অ্যাসিডের রা সা য় নি ক ক্রিয়ায় অ্যাসিডটা উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন ↑ গ্যাসের সরাসরি মিলনেও এর উৎপত্তি ঘটে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইড্রোগ্রাফি — সমুদ্রের তলদেশের মানচিত্র ; বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের গভীরতা অনুযায়ী তলদেশের অসমতলতা নির্দেশক এরূপ মানচিত্র সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন H ; পারমাণবিক ওজন 1·008, পারমাণবিক সংখ্যা 1 ; বর্ণহীন, গন্ধহীন, দাহ্য গ্যাস। সবচেয়ে হাল্‌কা মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালালে বায়ুর অক্সিজেনের ↑ সঙ্গে তার রাসায়নিক মিলনে সৃষ্টি হয় (H_2O) জল। এর প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত ; এজন্যে হাইড্রোজেন অণুকে H_2 লেখা হয়। এর প্রত্যেকটি পরমাণু আবার একটি প্রোটন ↑ ও একটি ইলেকট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত হয় (হেভি হাইড্রোজেন ↑)। অক্সি-হাইড্রোজেন ফ্লেম ↑ উৎপাদনের জন্যে, রিডিউসিং এজেন্ট ↑ হিসেবে, কৃত্রিম উপায়ে অ্যামোনিয়া ↑ তৈরি এবং উদ্ভিজ্জ ঘৃত (হাইড্রোজেনেটেড অয়েল ↑) উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোজেন গ্যাস বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন আ য় ন — হাইড্রোজেন পরমাণুর ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন ↑, অর্থাৎ প্রোটন ↑ কণিকা। বিভিন্ন অ্যাসিডের জলীয় দ্রবের মধ্যে এরূপ তড়িতাবিষ্ট, অর্থাৎ আয়নায়িত হাইড্রোজেন-কণিকা বিমুক্ত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ধাতব সল্টের ↑ উৎপত্তি ঘটায়। অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগের শক্তি তার সংগঠক হাইড্রোজেনের এরূপ (ধন-তড়িতাবিষ্ট) আয়নায়িত অবস্থার উপরই নির্ভর করে। এজন্যে একে কখন কখন **অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন**ও বলা হয়।

হাইড্রোজেন আ য় ন কন্সেন্ট্রেসন — রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হলে তা থেকে হাইড্রোজেন আয়ন ↑ বিমুক্ত হয় ; আর তা ধন-তড়িতাবিষ্ট (+H) হয়ে থাকে। এই হাইড্রোজেন আয়ন আবার অ্যালকালির ↑ যে 'OH' গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হলো ঋণ-তড়িতাবিষ্ট (−OH)। এদের মিলনে উৎপন্ন হয় জল (H_2O); যা +, বা − কিছুই নয়, তড়িৎহীন। যে কোন জলীয় দ্রবের মধ্যে তার অ্যাসিড ও অ্যালক্যালি ↑ উপাদানের অনুপাত পরীক্ষা করবার

জন্যে তার মধ্যে এরূপ হাইড্রোজেন-আয়নের হ্রাস-বৃদ্ধি নিরূপণ করা হয়। দ্রবটা অ্যাসিডভাবাপন্ন হলে তার মধ্যে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়নের আধিক্য ঘটবে, আর অ্যালক্যালি হলে বিপরীত হবে। সাধারণতঃ এক লিটার ↑ সল্‌ভেণ্টের ↑ মধ্যে এক গ্র্যাম অ্যাটম ↑ সলিউট ↑ দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন তরল পদার্থে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (+H) বিমুক্ত হয়, তাকেই বলে 'হাইড্রোজেন আয়ন কন্সেন্‌ট্রেসন'; সংক্ষেপে একে pH বলে উল্লেখ করা হয়। pH7 বললে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝায়, অর্থাৎ (+H) ও (−OH) সমপরিমাণ আছে, যেমন আছে জলে। pH1 বললে বুঝতে হবে অত্যন্ত অ্যাসিড-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ দ্রবে যথেষ্ট +H বর্তমান। pH 13 বললে বুঝায় অত্যন্ত অ্যালক্যালি-ধর্মী, অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে (−OH) রয়েছে।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড - হাইড্রোজেন ↑ ও অক্সিজেন ↑ গ্যাসের একটা বিশেষ যৌগিক, H_2O_2; ঘন তরল পদার্থ। সাধারণতঃ এর জলীয় দ্রবই বাজারে বিক্রয় হয়। জীবাণুরোধক ও বিরঞ্জক (ব্লিচিং ↑) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জল হলো H_2O; এর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত অক্সিজেন-পরমাণুর মিলনে হয় H_2O_2, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন পরমাণুটি অস্থায়ী; সুতরাং উন্মুক্ত রাখলে এ থেকে সহজেই অতিরিক্ত অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে গিয়ে জলে (H_2O) পরিণত হয়। যে-সব স্থানে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাস সহজলভ্য হয় না, (যেমন—টর্পেডো, সাবমেরিন প্রভৃতিতে) সেখানে কখন কখন অক্সিজেনের উৎস-স্বরূপ এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (হাইপারল ↑)

হাইড্রোজেন ফস্‌ফাইড— ফস্‌ফরাস ↑ ও হাইড্রোজেনের একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড। একে সাধারণতঃ ফসফিন ↑ (PH_3) বলা হয়।

হাইড্রোজেন বম্— হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়ার ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ায় অতি প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদক যে বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে। একে এইচ্-বম্‌ও (H-bomb) বলা হয়। অ্যাটম-বোমায় ↑ ইউরেনিয়াম, বা প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের (ফিশন ↑) ফলে শক্তির উদ্ভব হয়, বিস্ফোরণ ঘটে। আর হাইড্রোজেন-বোমায় হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন সংযোজনের (ফিউসন ↑) ফলে প্রচণ্ড শক্তি বিমুক্ত হয়, অধিকতর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। অবশ্য সাধারণ হাইড্রোজেনে এই ফিউসন ঘটানো সম্ভব হয় না; হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ↑ ডয়টেরন ↑ ও ট্রাইটিয়ামের (হেভি হাইড্রোজেন ↑) ফিউসন ঘটানো হয়ে থাকে। অ্যাটম-

বোমার (অ্যাটম বম্ ↑) বিস্ফোরণে উৎপন্ন প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে হাইড্রোজেনের ওই সব আইসোটোপের কেন্দ্রীন সংযোজন ঘটালে তার বিস্ফোরণে এরূপ অসীম শক্তির উদ্ভব ঘটে। এর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম ↑ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হাইড্রোজেল — কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থের ঘন জলীয় দ্রব, যা বিশেষ ঘনীভূত হয়ে জেলির মত কতকটা স্থিতিস্থাপক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, কোন হাইড্রোসল ↑ ঘনীভূত হয়ে জেলির মত অবস্থায় এলে তাকেই বলে হাইড্রোজেল।

হাইড্রোজেন সালফাইড — বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ; পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত। একে **সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন**ও (H_2S) বলা হয়। যে কোন ধাতব সালফাইডের ↑ সঙ্গে যে কোন রকম মৃদু অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই গ্যাসীয় যৌগিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কিপ্‌স অ্যাপারেটাস ↑ নামক যন্ত্রে সোডিয়াম সালফাইড ও মৃদু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় গ্যাসটা তৈরি হয়। রসায়নাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার সহায়ক বিক্রিয়ক হিসেবে এর বিশেষ প্রয়োজন।

কিপ্‌স অ্যাপারেটাস

হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল — হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন তরল উদ্ভিজ্জ তৈল ও জান্তব চর্বি (লিকুইড ফ্যাটস্ অ্যাণ্ড অয়েলস্) ঘনীভূত করবার প্রক্রিয়া। এই উপায়ে বিভিন্ন জৈব তরল তৈল ও চর্বিকে ঘৃতের মত ঘনীভূত পদার্থে রূপান্তরিত করে 'বনস্পতি' শ্রেণীর কৃত্রিম ঘৃত প্রস্তুত হয়ে থাকে। উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বিতে প্রচুর পরিমাণে ট্রায়োলিন ($C_{57}H_{104}O_6$) নামক তরল পদার্থ থাকে; হাইড্রোজেনের প্রভাবে ওই তরল ট্রায়োলিন ট্রাইষ্টিয়ারিন($C_{57}H_{110}O_6$) নামক কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় তরল তেল কেবল ঘনীভূতই হয় না, তার স্বাভাবিক গন্ধও বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ তরল তেল বা চর্বির মধ্যে নিকেল ↑ ধাতুর সূক্ষ্ম কণিকা মিশ্রিত করে উত্তপ্ত অবস্থায় তার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করানো হয়, এর ফলেই ওইরূপ সব পরিবর্তন ঘটে থাকে। নিকেল এই প্রক্রিয়ায় ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে।

হাইড্রোজেনেসন অব কোল — হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে কয়লা থেকে এক রকম

কৃত্রিম খনিজ তৈল (তরল হাইড্রো কার্বন ↑) প্রস্তুত করবার প্রণালী। সাধারণতঃ প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় ও প্রায় 250 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (ব্যারোমিটার ↑) হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে কয়লার গুঁড়া উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে কয়লার কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এই তরল হাইড্রোকার্বন প্রায় স্বাভাবিক খনিজ তৈলের অনুরূপ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আবার বিভিন্ন পদার্থ ক্যাটালিস্ট হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোকার্বন তৈরির এই প্রক্রিয়া বার্জিয়াস প্রোসেস নামে খ্যাত।

হাইড্রোজোয়া — এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র জল-জীব, বা কীট ; সাধারণতঃ মিঠা (লবণাক্ত নয়, এমন) জলেই এগুলো জন্মায়। হাইড্রোজোয়া শ্রেণীর মধ্যে হাইড্রা ↑, ওবেলিয়া ↑ প্রভৃতি নানা আকারের বিভিন্ন রকম জলজ জীবাণু আছে। শোঁয়া, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে লম্বায় এর কোনটাই সাধারণতঃ আধ ইঞ্চির বেশি হয় না।

ওবেলিয়া

হাইড্রোপোনিক্স — বিভিন্ন উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক সল্টের জলীয় দ্রবের মধ্যে উদ্ভিদ উৎপাদন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মাটি নেই, শুধু জলেই গাছ জন্মায় ; আর তাতে ফল-ফুল হয়। ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে এরূপ বৃহদাকার উদ্ভিদ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আছে।

হাইড্রোপ্লেন — যে বিমানপোত জলে অবতরণ করতে পারে, এবং জল থেকেই আবার আকাশে উঠে যেতে পারে। এরূপ বিশেষ গঠনের এরোপ্লেন জলে ভাসতে ও আকাশে উড়তে পারার উপযোগী করেই নির্মিত হয়ে থাকে।

হাইড্রোফোবিয়া — জলাতঙ্ক রোগ ; ইংরেজিতে এর অপর নাম 'র‍্যাবিস'। হাইড্রো মানে জল, 'ফোবিয়া' ভয় ; এ-রোগে রোগী জল দেখে ভয় পায়। এর অর্থ হলো, তৃষ্ণায় জল পান করতে গেলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, রোগী দূরে সরে যায়। পাগলা শেয়াল-কুকুরে কামড়ালে মানুষের এ রোগ হয়ে থাকে ; ক্ষিপ্ত শেয়াল বা কুকুরের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে ভাইরাস ↑ জাতীয় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু জন্মে ; কামড়ালে তাদের মুখের লালার সঙ্গে ওই জীবাণু অন্য জীবের দেহে প্রবেশ করে। এর ফলে সেই দষ্ট জীবও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আর তার দেহের মাংসপেশী, বিশেষতঃ গল-নালী সংকুচিত হয়ে যায়। এ-অবস্থায় জল পানের চেষ্টা করলে, বা তীব্র আলোক চোখে

পড়লে রোগীর সর্বাঙ্গ কুঁকরে যায়। এক. সময় এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। বিজ্ঞানী পাস্তর ↑ প্রবর্তিত ইঞ্জেকসন প্রয়োগে অবশ্য আজকাল এ রোগ আরোগ্য হচ্ছে।

হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিন ↑ গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাই-ড্রোজেন ফ্লোরাইড। এই গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের (HF) জলীয় দ্রব হলো হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড। বর্ণহীন তরল পদার্থ; ধাতব পদার্থাদি যাতে লাগে তা-ই ক্ষয়ে গলে যায়। সাধারণতঃ কোন অ্যাসিডেই কাঁচ ক্ষয় হয় না; কিন্তু হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে কাঁচ গলে যায়। এজন্যে কাঁচের উপর নক্সা তুলতে, বা লেখার দাগ কাটতে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড কাঁচের বদলে গাটাপার্চার ↑ শিশিতে রাখা হয়।

হাইড্রোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে তরল পদার্থের ডেন্সিটি ↑, অথবা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ মাপা যায়। সাধারণ হাইড্রোমিটার যন্ত্রে থাকে অপেক্ষাকৃত সরু একটা কাঁচনল, যার ঝোলানো তল-দেশের নিচে সংলগ্ন থাকে একটা ছোট কাঁচগোলক। ওই গোলকটার মধ্যে সাধারণতঃ কিছু মার্কারি ↑ দিয়ে ভারী করা হয়। এর ফলে তরল পদার্থের মধ্যে যন্ত্রের নলটা উপরে খাড়াভাবে জেগে ভেসে থাকে। ওই কাঁচনলের গায়ে তরল পদার্থের ঘনত্ব-পরিমাপক স্কেলের দাগ কাটা থাকে। তরল পদার্থের ঘনত্ব যত বেশি হবে ওই নলটা স্বভাবতঃই তত বেশি উপরে ভেসে উঠবে (বয়েন্সি ↑)। স্কেলের দাগ দেখে এভাবে বিভিন্ন তরল পদার্থের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি সহজেই নিরূপণ করা যেতে পারে। ল্যাক্টোমিটার ↑, স্যালিনোমিটার ↑ প্রভৃতি হলো এরূপ বিভিন্ন তরলের ডেন্সিটির স্কেলযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর হাইড্রোমিটার মাত্র।
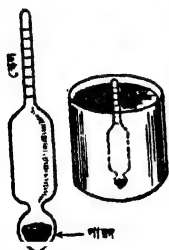
হাইড্রোমিটার

হাইড্রোলিথ — ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের (CaH_2) বিশেষ নাম; কঠিন পদার্থ। এর সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর রাসায়নিক ক্রিয়া এভাবে প্রকাশ করা যায়: $CaH_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2$ (স্লেকড লাইম ↑)+ $2H_2$ (হাইড্রোজেন)। প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছেলেদের উড়ন্ত খেলনা-বেলুনে যে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতি করা হয় তা সাধারণতঃ হাইড্রোলিথের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় তৈরি হয়।

হাইড্রোলিসিস — জলের সংযোগে কোন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জলও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অবস্থাটা ঘটে এইরূপ : যৌগিক পদার্থটা যেন AB ; এখন $AB + H_2O = AOH + BH$; মৃদু অ্যাসিড, বা বেসের ↑ বিভিন্ন সল্ট জলে দ্রবীভূত করলে এই প্রক্রিয়ায় তা আংশিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে ; আর তার ফলে উৎপন্ন ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যাল ↑ ($-OH$) বেসের ধন-তড়িতান্বিত র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে যুক্ত হয়। এস্টার ↑ জাতীয় পদার্থের হাইড্রোলিসিসের ফলে অ্যালকোহলও ↑ অ্যাসিডে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাবান তৈরির স্যাপোনিফিকেসন ↑ প্রক্রিয়াও এক রকম হাইড্রোলিসিসের ব্যাপার।

হাইড্রোসল — যে-কোন কোলয়ড্যাল সল্যুসন ↑ ; বিভিন্ন কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থের জলীয় দ্রব ; যা আবার জেলির মত ঘন হলে তাকে বলে হাইড্রোজেল ↑ ।

হাইড্রোস্ফিয়ার — পৃথিবীর জলীয় মণ্ডল। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগরের সুবিশাল জলরাশির পরিমণ্ডল।

হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন সায়েনাইড (HCN) ; বর্ণহীন ও মারাত্মক বিষাক্ত তরল পদার্থ। একে কখন কখন **প্রুসিক অ্যাসিড**-ও বলা হয়। এর তীব্র বিষ-ক্রিয়ার ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।

হাইড্রোস্ট্যাটিক্স — বিশেষ অবস্থানে তরল পদার্থের স্থির অবস্থিতির ফলে তাতে উদ্ভূত শক্তি, চাপ, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান। বাংলায় একে বলা যায় 'উদ্‌স্থিতি বিদ্যা'।

হাইপটেনিউজ — সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের (90°) বিপরীত বাহু, যা হয় ত্রিভুজটির দীর্ঘতম বাহু।

হাইপথেসিস — অনুমান, প্রকল্প ; পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ কোন ফলের ব্যাখ্যায় যে-সব আনুমানিক অথচ স্বয়ংসিদ্ধ যুক্তি দাঁড় করা হয়।

হাইপারগ্লাইকিমিয়া—দেহের রক্তে অত্যধিক শর্করা সঞ্চার ; যেমন ডায়েবিটিস ↑ রোগে হয়।

হাইপারটনিক — অসমান ঘনত্বের যে-কোন দুটি দ্রবণের (সল্যুসন) মধ্যে গাঢ়তর দ্রবণটিকে বলে 'হাইপারটনিক সল্যুসন'। আর অপরটিকে বলে **হাইপোটনিক সল্যুসন**। অপেক্ষাকৃত মৃদু দ্রবণের (হাইপো ↑) অস্‌মোটিক প্রেসার (অস্‌মোসিস ↑) গাঢ়তর দ্রবণের (হাইপার) চেয়ে বেশি হয়ে থাকে ; কাজেই মৃদু দ্রবণ থেকে দ্রাবক তরল পদার্থটি গাঢ় দ্রবণের দিকে মাঝের পর্দা চুঁইয়ে চলে যায়। জীবদেহের রক্ত স্বভাবতঃই 'হাইপারটনিক' অবস্থায় থাকে।

হাইপারপ্লাসিয়া — কোন-কিছুর অস্বাভাবিক, বা অত্যধিক বৃদ্ধি; যেমন, দেহের কোন অঙ্গবিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে বেমানান-ভাবে বেড়ে যায়। আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলে বলে হাইপোপ্লাসিয়া।

হাইপারমেট্রোপিয়া — চোখের এক রকম দৃষ্টিদোষ; 'লং সাইট ↑'।

হাইপারল — হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ↑ (H_2O_2) ও ইউরিয়ার ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটা যৌগিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। স্ফটিকাকার এক রকম কঠিন পদার্থ $CO(NH_2)_2 . H_2O_2$। জলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থটা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; পুনরায় এ থেকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ফিরে পাওয়া যায়। এজন্যে অস্থায়ী হাইড্রোজেন-পারক্সাইড সংরক্ষণের জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইপারবোলা — কোন সলিড কোণকে ↑ তার শীর্ষবিন্দু ছাড়া অপর যে-কোন বিন্দুতে ভূমির লম্বভাবে কাটলে যে বক্র সীমারেখা পাওয়া যায়। এই বক্র জ্যামিতিক রেখাটি হলো এমন একটি বক্ররেখা যার অন্তবর্তী একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ বক্র-রেখার প্রত্যেকটি বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত সর্বদা সমান থাকে এবং এই স্থিরানুপাত রাশিটির পরিমাণ হয় সর্বদা একের অধিক। হাইপারবোলার ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলে তার 'ফোকাস'; আর ঐ নির্দিষ্ট সরলরেখাটিকে বলা হয় তার 'ডাইরেক্ট্রিক্স'। 'হাইপারবোলিক ফাংসন' প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর সাহায্যে বহু জটিল গাণিতিক তথ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।
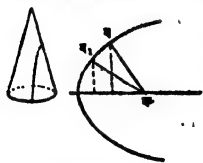
হাইপারবোলা

হাইপারপাইরেক্সিয়া—দেহের অত্যধিক তাপবৃদ্ধি; যেমন জ্বরে দেহের তাপ বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ 105° ফারেনহিটের ↑ উপরে তাপ উঠলে 'হাইপারপাইরেক্সিয়া' অবস্থা বলে।

হাইপারহাইড্রোসিস — রোগীর অত্যধিক স্বেদ বা ঘর্ম নিঃসরণের অবস্থা; যাতে রোগী অত্যধিক দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

হাইপো — শব্দার্থ হলো, নিচে বা কম; যেমন—হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসন ↑, সাধারণতঃ চামড়ার নিচে যে ইঞ্জেকসন করা হয়। **হাইপো অ্যাসিডিটি** — পাকস্থলীর পাচক রসে প্রয়োজনের চেয়ে কম অম্ল-রস বা অ্যাসিড নিঃসরণের জন্যে যে অগ্নি-মান্দ্য ও বদহজম রোগ হয়।

হাইপো (সল্ট) — সোডিয়াম থায়োসালফেট, $Na_2S_2O_3 . 5H_2O$; সল্টটা সংক্ষেপে 'হাইপো' নামে পরিচিত। এর কারণ, পূর্বে

এ-সল্টটাকে ভুলবশতঃ সোডিয়াম হাইপো-সালফাইট বলে মনে করা হতো। বরং একে সোডিয়াম হাইপো-সালফেট বলা যেতে পারে। এর জলীয় দ্রব ফটোগ্রাফির ↑ ফিক্সিং প্রক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইপোকণ্ড্রিয়া — যে মানসিক অবস্থায় মানুষ অকারণে অযথা নিজেকে রোগগ্রস্ত বলে মনে করে।

হাইপোক্লোরাইট — হাইপো-ক্লোরাস অ্যাসিডের (HClO) বিভিন্ন সল্ট। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের হাইপোক্লোরাইট সল্টগুলো সবই বীজাণু-প্রতিরোধক পদার্থ হিসাবে ও ব্লিচিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়; যেহেতু এগুলোর অক্সিডাইজিং ↑ শক্তি যথেষ্ট প্রবল।

হাইপোজিল প্ল্যাণ্ট — সম্পূর্ণরূপে মাটির তলায় প্রোথিত অবস্থায় যে সব উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজপত্রদ্বয় (কটিলিডন্‌স) মাটির ভিতরে থেকে যায়; আর অঙ্কুরিত উদ্ভিদকাণ্ডটি মৃত্তিকা ভেদ করে উপরে ওঠে। আর যে-সব উদ্ভিদের অঙ্কুরিত কাণ্ড তার অগ্রভাগে বীজপত্র নিয়ে উপরে উঠে যায় তাদের বলে **এপিজিল প্ল্যাণ্ট**।

হাইপোডার্মিক ইঞ্জেক্সন — 'হাইপো' মানে নিচে, 'ডার্মিস' চামড়া; সূঁচ বিদ্ধ করে গাত্রচর্মের অব্যবহিত নিচে তরল ঔষধ প্রয়োগ করবার প্রক্রিয়া। এজন্যে ব্যবহৃত সূঁচকে বলা হয় 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ'। রোগীর দেহের মাংস-পেশীর মধ্যে যে ইঞ্জেক্সন দেওয়া হয় তাকে বলে **ইণ্টারমাস্কুলার**, এবং শিরার মধ্যে দিলে তাকে বলে **ইণ্টারভেনাস** ইঞ্জেকসন।

হাইপোথ্যালমাস — মস্তিষ্কের মধ্য স্থলে লঘুমস্তিষ্ক বা সেরিবেলামের ↑ উপরে 'থার্ড ভেণ্ট্রিকল' নামক যে গহ্বর রয়েছে তার তলদেশকে বলে হাইপো-থ্যালমাস। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড ↑ এরই একটা অংশ বিশেষ। এই হাইপোথ্যালমাস হলো মস্তিষ্কের অন্যতম একটি প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্র। মনে হয়, মানুষের নিদ্রা ও জাগরণের স্নায়বিক ক্রিয়া এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর কোন রকম বিকৃতি ঘটলে মানুষ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

হাইপোথ্যালমাস

হাইস্পিড স্টিল — এক বিশেষ শ্রেণীর অতি-কঠিন ইস্পাত। সাধারণ স্টিলের ↑ সঙ্গে 12% থেকে 22% পর্যন্ত টাংস্টেন ↑ ও অল্প পরিমাণ ক্রোমিয়াম ↑, ভ্যানা-ডিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত করে এই হাইস্পিড স্টিল তৈরি হয়ে থাকে। এরূপ ইস্পাতে সাধারণতঃ

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। অত্যন্ত তাপসহ ; অত্যধিক উত্তাপে লাল হয়ে গেলেও এ-স্টিল নরম হয় না।

হার্জ, হেন্‌রিক রুডল্‌ফ — জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ; হ্যাম্‌সবার্গে জন্ম 1857 খৃঃ, মৃত্যু 1894 খৃঃ। তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑) তরঙ্গপ্রবাহের অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি ; এই হার্জীয় (Hertzian) তরঙ্গই বেতার-তরঙ্গ বলে খ্যাত। মূলতঃ এর সাহায্যেই রেডিও ↑, র‍্যাডার ↑ প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল ↑ অবশ্য পূর্বেই এরূপ তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ; কিন্তু এর প্রকৃত আবিষ্কার করেন হার্জ। তারপরে মার্কনি ↑ এই তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগে আধুনিক রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন।

হার্ড ওয়াটার — খর জল ; যে জলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকায় সাবান গুল্‌লে ভাল ফেনা হয় না। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ও লৌহের বিভিন্ন সল্ট এরূপ জলে দ্রবীভূত থাকে। সাবানের সঙ্গে এই সল্টগুলোর রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফ্যাটি-অ্যাসিডের অদ্রাব্য ধাতব সল্ট উৎপন্ন হয়ে সাবানের কার্য-কারিতা নষ্ট করে ফেলে (সোপ ↑, সফ্‌ট ওয়াটার ↑)। হার্ড ওয়াটার দু'রকম ; এক রকম হলো অস্থায়ী, যার মধ্যে বিভিন্ন বাইকার্বনেট ↑ সল্ট দ্রবীভূত থাকে। এরূপ খর জল উত্তাপে ফুটালেই বাইকার্বনেট সল্ট বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যায়, আর অদ্রাব্য কার্বনেট সল্ট জলের তলায় পড়ে। এভাবে প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে সহজেই এরূপ হার্ড ওয়াটারকে সফ্‌ট ওয়াটারে ↑ পরিণত করা যায়, সাবানে কাজ হয়। জলে ধাতব সালফেট সল্ট দ্রবীভূত থাকলে তাকে বলে পার-ম্যানেন্ট, বা স্থায়ী খর-জল। এরূপ হার্ড ওয়াটারকে সফ্‌ট ওয়াটারে পরিণত করতে হলে প্রথমে ওয়াশিং সোডা ↑ মেশাতে হয়, যার রাসায়-নিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট সল্ট উৎপন্ন হয়ে পাত্রের তলায় পড়ে। সব রকম হার্ড ওয়াটারকেই উপযুক্ত পরিমাণে জিওলাইট ↑ মিশিয়ে উত্তপ্ত করে তার খরতা দূর করা যেতে পারে।

হার্ডেনিং অব ফ্যাট — বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ও তরল জান্তব চর্বিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রভাবে গন্ধ-শূন্য ও ঘনীভূত করবার কৌশল (হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল ↑)।

হিউমাস — ব্যাক্টেরিয়া ↑ শ্রেণীর জীবাণুর প্রভাবে লতা, পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাটিতে পচে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যে মিশ্র জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। পদার্থটা এক রকম স্বাভাবিক জৈব সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষি-জমির

মাটিতে এই হিউমাস মিশ্রিত থাকলে উদ্ভিদাদি ভাল জন্মায়।

হিউমিডিটি — বায়ুর আর্দ্রতা; বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক পরিমাণ। উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ভর করে। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর সম্পৃক্ত অবস্থায় যতটা জলীয় বাষ্প তাতে মিশ্রিত থাকা সম্ভব (স্যাচুরেশন ↑) শতকরা হিসাবে তার যত ভাগ প্রকৃতপক্ষে থাকে তাকে বলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বা রিলেটিভ হিউমিডিটি।

হিট্ — তাপ শক্তি। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, বা উত্তাপে পদার্থের সংগঠক অণুগুলোর আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্য বৃদ্ধিতে যে শক্তির উদ্ভব ঘটে। উত্তাপে স্বভাবতঃই পদার্থের আয়তন বাড়ে এবং উপযুক্ত উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে ক্রমে তার অবস্থান্তর ঘটে থাকে : কঠিন পদার্থ তরল হয় (মেল্টিং পয়েন্ট ↑), আরও অধিক উষ্ণতায় ওই তরল পদার্থ বায়বীয় আকার ধারণ করে (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। কোন পদার্থের তাপ শক্তি সংলগ্ন পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত, পরিবাহিত ও বিকিরিত হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে পদার্থে নিবদ্ধ মোট 'হিট্' অর্থাৎ তাপশক্তির পরিমাণ স্থির করা হয়। আর তাপশক্তির প্রকাশ ও হ্রাসবৃদ্ধির অবস্থা, অর্থাৎ পদার্থের উষ্ণতা নির্দেশের জন্যে টেম্পারেচারের ↑ বিভিন্ন একক (সেন্টিগ্রেড ↑, ফারেনহাইট ↑ ও রুমার ↑) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টেম্পারেচার ও হিট এক জিনিস নয়; হিট্ হলো পদার্থে নিবদ্ধ তাপশক্তি, যার পরিমাণ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ণীত হয়; আর টেম্পারেচারে পদার্থে নিবদ্ধ ওই তাপশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি, অর্থাৎ পদার্থটার উষ্ণতা নির্দেশ করে। এক বালতি জলের হিট্, অর্থাৎ মোট তাপশক্তি এক গ্লাস অনুরূপ উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের চেয়ে বেশি হবে; যদিও উভয় জলের টেম্পারেচার ↑ সমান।

হিট্, লেটেন্ট — উষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীতই এক গ্র্যাম পদার্থের অবস্থান্তর (কঠিন থেকে তরল, অথবা তরল থেকে গ্যাসীয়) ঘটাতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। তাপ হ্রাসের ফলে কোন তরল পদার্থ যখন জমে কঠিন হতে থাকে (সলিডিফাইং পয়েন্ট ↑), অথবা তাপ বৃদ্ধির ফলে কোন কঠিন পদার্থ গলে তরল (মেল্টিং পয়েন্ট ↑) হতে, বা ক্রমে বাষ্পীভূত হতে থাকে (বয়েলিং পয়েন্ট ↑) তখন উত্তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সম্যক পদার্থের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওই পদার্থের উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) বৃদ্ধি হয় না, একই উষ্ণতায় থাকে।

পদার্থের এরূপ অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যে প্রযুক্ত তাপশক্তি অবস্থান্তরিত পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এরূপ সঞ্চিত বা পরিশোষিত তাপ-শক্তিকেই বলে তার 'লেটেণ্ট হিট্‌'। আবার বিপরীত প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ কঠিন পদার্থ যখন তরল হতে থাকে (লেটেণ্ট হিট অব ফিউসন), অথবা তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হতে থাকে (লেটেণ্ট হিট্‌ অব ভেপোরিজেসন ↑), তখন সেই অবস্থান্তরিত পদার্থের ওই 'লেটেণ্ট' বা পরি-শোষিত তাপ-শক্তি পুনরায় মুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

হিট্‌, স্পেসিফিক — এক গ্র্যাম পদার্থের ও এক গ্র্যাম (4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট) জলের উষ্ণতা পৃথকভাবে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বর্ধিত করতে যতটা তাপশক্তির (হিট্‌ ↑) প্রয়োজন হয়, এতদুভয়ের অনুপাতকে বলে ওই পদার্থের 'স্পেসিফিক হিট্‌'। এখন, এক গ্র্যাম জল এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে মোটামুটি এক ক্যালোরি ↑ তাপশক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ, অর্থাৎ যত ক্যালোরি তাপশক্তির প্রয়োগে এক গ্র্যাম পদার্থের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ বর্ধিত হয়, সংখ্যাগতভাবে তাকেই ওই পদার্থের 'স্পেসিফিক হিট্‌' বা 'বিশেষ তাপ' বলে ধরা যেতে পারে। সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে এই স্পেসিফিক হিট্‌ পরিমিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক পদার্থের স্পেসিফিক হিটের পরিমাণ নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন ; পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপরেই তার এই বিশেষ তাপের বিভিন্নতা নির্ভর করে।

হিট্‌ অব রেডিয়েসন — বিকিরিত তাপশক্তি। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে 'ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ,' অর্থাৎ চুম্বকীয় তড়িত্তরঙ্গের আকারে তাপ-শক্তি বিকিরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ; আর সেই উত্তপ্ত পদার্থের উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে। উত্তাপের পরিমাণ অনুসারে এরূপ বিকিরিত তাপ-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংথ ↑) সাধারণতঃ দৃশ্য লালবর্ণের আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হতে পারে।

হিট্‌ অব সল্যুসন — দ্রবণজনিত তাপশক্তি; এক গ্র্যাম-মলিকিউল ↑ পরিমাণ পদার্থ জলে দ্রবীভূত করলে যতটা তাপ উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয়। কোন কোন পদার্থ দ্রবীভূত হলে সেই সল্যুসনের ↑ তাপ-বৃদ্ধি ঘটে (এক্সোথার্মিক ↑) ; আবার কোন কোন পদার্থের ক্ষেত্রে তাপ হ্রাস পায় (এণ্ডোথার্মিক ↑)। কোন পদার্থের দ্রবণের ফলে উদ্ভূত তাপ-শক্তির এরূপ হ্রাসবৃদ্ধি সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে মাপা হয়।

হিট্ অব ফর্মেসন—বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক মিলনে এক গ্র্যাম-মলিকিউল ↑ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তিকালে যে পরিমাণ তাপ-শক্তি উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয়। যৌগিক পদার্থের সংগঠন-প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই তাপের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আবার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার (কেমিক্যাল রিঅ্যাকসন ↑) ফলে এক গ্র্যাম-মলিকিউল পরিমাণ নূতন যৌগিকের সৃষ্টি হতে যতটা তাপ উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয় তাকে বলে **হিট্ অব রিঅ্যাকসন**; একেই আবার কখন কখন বলে 'থার্মাল ভ্যালু অব কেমিক্যাল রিঅ্যাকসন'।

হিপ্সোমিটার — সহজে তরল পদার্থের স্ফুটনাংক (বয়েলিং পয়েন্ট ↑) নিরূপণ করবার এক রকম যন্ত্রবিশেষ; সাগরপৃষ্ঠ থেকে কোন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করবার জন্যেই প্রধানতঃ এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তরল পদার্থের স্ফুটনাংক জানলে তা থেকে হিসাব করে স্থানীয় উচ্চতাও জানা যেতে পারে। এর মূল তথ্যটা হলো এই যে, তরল পদার্থের স্ফুটনাংক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভরশীল (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। আবার বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে; স্থানীয় উচ্চতা বাড়লে বায়ুর চাপ কমে যায়, ফলে তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও হ্রাস পায়। এভাবে উচ্চতা অনুসারে বায়ুর চাপ যত কমে তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও তদনুযায়ী কমতে থাকে। এরূপ হিসাব অনুসারে হিপ্সোমিটারে জলের স্ফুটনাংক দেখে কোন স্থানের উচ্চতা সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে।

হিপোক্রেটস — গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী; সুনির্দিষ্ট জীবনকাল অজ্ঞাত (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 460 থেকে 357 খৃঃ পূঃ মধ্যে)। থেস্ নগরীতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসামান্য পারদর্শিতা। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং অস্ত্রোপচার-বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রোগের কারণ ও নিদান সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থাদি রচনা। পাশ্চাত্যের ধন্বন্তরী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক বলে আখ্যাত।

হিমোগ্লোবিন — লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা নামক দু'রকম রক্ত-কণিকা রক্তরসে (সিরাম ↑) ভেসে আছে। বিশেষ এক রকম জৈব রঙীন পদার্থের জন্যে রক্তের ওই লোহিত কণিকাগুলো রক্তবর্ণ হয়; তাই সমগ্রভাবে রক্ত লাল দেখায়। রক্তের এই রঙীন অংশটাই হলো হিমোগ্লোবিন; যা এক রকম প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থে গঠিত। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও লৌহ ঘটিত একটা অতি জটিল গঠনের জৈব যৌগিক পদার্থ। শ্বাস-বায়ুর

সঙ্গে যে অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তা এই জৈব রঙীন পদার্থ, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে শিরা-উপশিরার পথে সারা দেহে ছড়িয়ে যায়। দেহাভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন নিজে অক্সিডাইজ্‌ড ↑ হয় না; অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে 'অক্সি-হিমোগ্লোবিন' নামক একটি অস্থায়ী যৌগিকের আকারে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে সারা দেহে সরবরাহ করে ও দূষিত পদার্থ অক্সিডাইজ্‌ড হয়।

হিলিওক্রাইট — যে-সব সপুষ্পক উদ্ভিদের অগ্রভাগ, বিশেষতঃ ফুলগুলি সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং সূর্যরশ্মির তাপ সহ্য করেও সতেজ থাকে।

হিলিওমিটার—বিশেষ এক ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্কোপ ↑), যার সাহায্যে সূর্যের (গ্রহ-নক্ষত্রেরও) ব্যাস মাপা যায়। 'হিলিও' মানে সূর্য।

হিলিওস্টাট — জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণাদিতে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ; এতে সূর্যের আপাতগতি অনুযায়ী একখানা দর্পণ প্রতিনিয়ত ঘুরে সর্বদাই সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মি, অর্থাৎ তার প্রতিচ্ছবি সংলগ্ন কোন স্পেক্ট্রোস্কোপ ↑ বা টেলিস্কোপ ↑ যন্ত্রের মধ্যে ফেলে। রাত্রিকালে গ্রহ-নক্ষত্রের অনুরূপ পর্যবেক্ষণও এতে চলে।

হিলিয়াম — একটি মৌলিক গ্যাস; সাংকেতিক চিহ্ন He; পারমাণবিক ওজন 4·003, পারমাণবিক সংখ্যা 2; অন্যতম ইনার্ট ↑ গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান (প্রায় দুই লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র)। কোন কোন স্থানে ভূ-গর্ভোত্থিত গ্যাসে হিলিয়াম পাওয়া যায়। গ্যাসটা অদাহ্য ও বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা বলে বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

হিস্টারেক্‌টামি —স্ত্রীলোকের গর্ভাধার (ইউটারাস ↑) ব্যবচ্ছেদ; গর্ভাধার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উদরস্থ যে আধারে ভ্রূণ পরিপুষ্ট হয়ে হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়) কেটে বাদ দিয়ে সন্তান-ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করবার প্রক্রিয়া। 'হিস্টার' মানে গর্ভাধার সম্বন্ধীয়।

হিস্টারিসিস — কোন ভৌত পরিবর্তনের পরে কোন বস্তুর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসায় বিলম্ব; যেমন, সুইচ তুলে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেও ইলেক্ট্রিক বাতির ফিলামেণ্ট ↑ কিছু সময় লাল থাকে, অপ্রদীপ্ত পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে কিছু বিলম্ব হয়। আবার কোন ইলেক্ট্রিক কয়েলের ↑ অভ্যন্তরে রাখলে লোহদণ্ড যে চৌম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়, কয়েলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেও সহসা সেই লোহদণ্ডটি তার অর্জিত চৌম্বক ধর্ম সম্পূর্ণ হারায় না, কিছু সময় তার চৌম্বকত্ব থাকে। এই অবস্থাকে বলে হিস্টারিসিস; আর

সাময়িক অর্জিত ধর্মের এই স্থিতি-কালকে বলে 'হিস্টোসিস পিরিয়ড'।

হিস্টোলজি - জীব-দেহের পেশীতন্তু (টিস্যু ↑) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। 'হিস্টো' মানে জৈব তন্তু সম্বন্ধীয়। দেহের কোথাও সজীব পেশী-তন্তু আহত, বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার **হিস্টামিন** নামক একটি 'অ্যামিনো অ্যাসিড ↑ উপাদান **হিস্টাডিন** নামক আর একটা জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় ; আর তার ফলে পেশীর সজীবতা ও কর্মক্ষমতা লোপ পায়।

হুইটস্টোন, স্যার চার্ল্স — বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ; গ্লসেস্টারে জন্ম 1802 খৃঃ, মৃত্যু 1875 খৃঃ। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধি ; বিশেষতঃ তড়িতের প্রতি-রোধ-শক্তি (রেজিস্টেন্স ↑) পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত 'হুইটস্টোন ব্রিজ' যন্ত্র আবিষ্কারে চিরস্মরণীয়। টেলিগ্রাফের ↑ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও ডায়নোমো ↑ যন্ত্রের উন্নতি বিধানে অসামান্য দান।

হুগো, ডাঃ থিয়োরেল — সুইডেন-বাসী জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী ; স্টকহোল্মে জন্ম 1903 খৃঃ, অদ্যাপি (1960 খৃঃ) জীবিত। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ; যৌবনেই পোলিও রোগে পদদ্বয় শীর্ণ হয়ে বিকলাঙ্গ ; ফলে চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ ও জৈব রাসায়নিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ। মাংসপেশীর রঙিন পদার্থ 'মাইয়োগ্লোবিন' সম্পর্কীয় গবেষণায় খ্যাতি অর্জন ; জীবদেহে এন্‌জাইমের ↑ কার্যকারিতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবিষ্কার। জৈব কোষের জীবন-রসায়ন স্বরূপ অক্সিজেন গ্রহণকারী নূতন এক এন্‌জাইম আবিষ্কারের জন্যে 1955 খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও শারীরবৃত্তের নোবেল পুরস্কার লাভ।

হেক্টো, হেক্টা — এক শত, বা এক শতগুণ বুঝাতে বিভিন্ন কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয় ; যেমন—হেক্টোমিটার, হেক্টাহেড্রন ইত্যাদি।

হেগেল, জর্জ উইল্‌হেল্ম্ ফ্রেডারিক —জার্মান দার্শনিক, জন্ম 1770 খৃঃ, মৃত্যু 1831 খৃঃ। প্রচারিত দার্শনিক মতবাদে কার্ল মার্ক্স প্রভাবিত হন ; মার্ক্সীয় (বস্তুতঃ হেগেলীয়) মতবাদে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

হেটারোজেনাস — যে পদার্থের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও বস্তুগত গঠন একরূপ নয়, বিভিন্ন গঠনের সংমিশ্রণ মাত্র। হোমোজেনাস ↑ শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। 'হেটারো' শব্দের অর্থ 'বিভিন্ন'।

হেপ্টা — সপ্তগুণ, বা 'সাত সংখ্যক' বুঝাতে বিভিন্ন কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয় ; যেমন—হেপ্টাগন, হেপ্ট্যাঙ্গুলার ইত্যাদি। **হেপ্টেন** হলো পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত সাতটা কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট একটা বিশেষ গঠনের তরল হাইড্রোকার্বন ↑।

হেপাটিক — শব্দার্থ হলো 'যকৃৎ সম্বন্ধীয়' ; যকৃতের নীলাভ-লাল বর্ণ-বিশিষ্ট। 'হেপাটিক ফিভার' হলো যকৃতের দোষে যে জ্বর হয়।

হেপারিন — সাধারণতঃ জীবের যকৃতে প্রাপ্ত এক রকম জৈব রাসায়-নিক পদার্থ ; যার আধিক্য ঘটলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।

হেভি ওয়াটার — হেভি হাইড্রো-জেনকে ↑ বলে ডয়েটেরিয়াম ↑ ; এই ডয়েটেরিয়ামের অক্সাইড (D_2O) হলো হেভি ওয়াটার। দৃশ্যতঃ সাধারণ জলের (হাইড্রোজেন অক্সাইড, H_2O) মত এটা একটা তরল পদার্থ। হেভি-হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনকে বলে 'ডয়টেরন'। এটা হাই-ড্রোজেনের একটা বিশেষ আইসো-টোপ ↑ , যার অ্যাটমিক ওয়েট হলো দুই ; পক্ষান্তরে সাধারণ হাইড্রো-জেনের অ্যাটমিক ওয়েট ↑ এক। বিশেষ এক রকম জটিল ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধারণ জলকে হেভি হাইড্রোজেন-বিশিষ্ট এরূপ ভারী জলে পরিণত করা যায়। অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে পদার্থের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসনের ↑ তীব্রতা মন্দীভূত করবার জন্যে এই 'হেভি ওয়াটার' মডারেটর ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (হাইড্রোজেন বম্ ↑)।

হেভি স্পার — খনিজ বেরিয়াম সালফেট, $BaSO_4$; সাদা অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ। একে সাধারণতঃ ব্যারাইটস্ বলা হয়।

হেভিসাইড কেনেলি লেয়ার— পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নো-স্ফিয়ার ↑ স্তরের একাংশ এই নামে পরিচিত। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 70 মাইল ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই স্তরে বেতার তরঙ্গ ক্রমাগত প্রতিফলিত হয়ে হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে বেঁকে আসে, তাই বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার-তরঙ্গ পৌছান সম্ভব হয়। এরূপ না হলে তরঙ্গগুলো সর্বদা ঋজু পথে অগ্রসর হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত, গোলাকার ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী স্থানে এদের পৌছান কখন সম্ভব হতো না। এই হেভিসাইড স্তরের বায়ু-কণিকা

বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন

হেভিসাইড লেয়ার

আয়নায়িত, বা তড়িতাবিষ্ট থাকার ফলেই বেতার-তরঙ্গের এরূপ ধারা-বাহিক প্রতিফলন সম্ভব হয়ে থাকে

এবং চলার পথে তা ক্রমাগত নিচের দিকে বেঁকে আসে, আর ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী স্থানে পৌছায়। বায়ুমণ্ডলে এই হেভিসাইড স্তরের অবস্থান অন্যান্য স্তরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে চিত্রে দেখান হলো।

হেভি হাইড্রোজেন — বিশেষ গঠনের ভারী হাইড্রোজেন গ্যাস; হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ ↑, যার বিশেষ নাম হলো 'ডয়টেরিয়াম'। সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট এক; কিন্তু এই **ডয়টেরিয়াম**, বা হেভি হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট দুই। এর নিউক্লিয়াস ↑ অর্থাৎ কেন্দ্রীনকে বলে **ডয়টেরন**, যা একটা প্রোটন ↑ কণিকা ও একটা নিউট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত হয়। সাধারণ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে কিন্তু কোন নিউট্রন কণিকা থাকে না। সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে এই ডয়টেরনকে সবিশেষ গতিযুক্ত করে অ্যাটম ভাঙ্গার (ফিসন ↑) জন্যে প্রয়োগ করা হয়। আবার **ট্রাইটিয়াম** নামক আর এক রকম হেভি হাইড্রোজেনও পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম উভয়ই হেভি হাইড্রোজেন; যা সাধারণ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ↑ মাত্র। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, মূলতঃ এই দু'রকম হেভি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন (ফিউসন) ঘটিয়েই হয়তো 'হাইড্রোজেন বম্' ↑ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

হেমলক — বিষাক্ত রসযুক্ত এক শ্রেণীর উদ্ভিদ। এগুলি চার পাঁচ ফুট উচু হয়, সাদা ফুল ফোটে। সারা ইউরোপে ও এশিয়ার কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মকালে জন্মে।

হেলিকপ্টার — বিশেষ এক শ্রেণীর বিমানপোত; যা সোজাসুজি উপরে উঠতে বা নিচে নামতে পারে। এর পাখা উপরদিকে সংবদ্ধ থাকে, এবং ব্লেডগুলো খোলের সমান্তরালভাবে ঘোরে, উপরে-নিচে বাতাস কাটে। হেলিকপ্টার বিমানপোত অল্প পরিসর স্থানে স্বচ্ছন্দে অবতরণ করতে পারে বলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ এরোপ্লেন যথেষ্ট সুবিধাজনক।

হেয়ার সল্ট — খনিজ হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সালফেট সল্টের [$Al_2(SO_4)_3.18H_2O$] বিশেষ নাম। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়।

হোমোজেনাস— যে পদার্থের গঠন সর্বাংশে সর্বত্র একই রূপ; রাসায়নিক হিসেবে, বা গঠন-বৈশিষ্ট্যে যার মধ্যে কোথাও কোনরূপ বিভিন্নতা নেই। হোমো শব্দের অর্থ 'সমান', বা একই রূপ। (হেটারোজেনাস ↑)

হোমোলগ — একই শ্রেণীর রাসায়নিক গঠন ও অনুরূপ ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের একটিকে

অপরটির 'হোমোলগ', অর্থাৎ সমধর্মী বা সমগোত্রীয় পদার্থ বলে ; যেমন, মিথেন ↑ (CH_4) ও ইথেন ↑ (C_2H_6) হলো পরস্পর পরস্পরের হোমোলগ কম্পাউণ্ড।

হোমোলগাস সিরিজ—এক বা সমগোত্রীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের শ্রেণী। যে সব পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও ধর্ম প্রায় একই রূপ, কেবল তাদের সংগঠক সমপর্যায়ের মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণু-সংখ্যার বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিভিন্ন জৈব যৌগিক পদার্থ হলো এরূপ হোমোলগাস, যেমন—মিথেন ↑ CH_4, ইথেন ↑ $CH_3.CH_3$ প্রোপেন,$CH_3.CH_2.CH_3$. ইত্যাদি হলো হোমোলগাস শ্রেণীর।

হোল্‌মিয়াম—বিশেষ দুষ্প্রাপ্য একটা মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Ho, পারমাণবিক ওজন 164, পারমাণবিক সংখ্যা 67 ; প্রকৃতপক্ষে ধাতুটা একক পরিচয়ে পৃথকভাবে পাওয়া যায় নি ; বর্ণালি-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'রেয়ার আর্থ' ↑ শ্রেণীর খনিজ পদার্থে এর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে মাত্র। সুইডিস বিজ্ঞানী ক্লিভ 1879 খৃষ্টাব্দে এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

হ্যাবার প্রোসেস—বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ↑ থেকে অ্যামোনিয়া ↑ উৎপাদন করবার বিশেষ একটা রাসায়নিক প্রণালী। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে অ্যামোনিয়া-ঘটিত সার (ফার্টিলাইজার ↑) প্রস্তুত করবার জন্যে এই প্রণালীতে বায়ুর নাইট্রোজেনকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংবদ্ধ করে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় (ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন ↑)। যান্ত্রিক কৌশলে অত্যধিক চাপে নাইট্রোজেন (বায়ুতে মিশ্রিত) ও হাইড্রোজেন গ্যাসের উত্তপ্ত সংমিশ্রণকে প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির অক্সাইডের সংমিশ্রণের উপর দিয়ে চালিত করা হয় ; এর ফলে ওই হাইড্রোজেন ও বায়ুর নাইট্রোজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাস পরে জলে দ্রবীভূত করে 'অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড' আকারে পৃথক করে নিয়ে বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম যৌগিক উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। এই পদ্ধতির হাইড্রোজেন পাওয়া যায় জল থেকে এবং নাইট্রোজেন বায়ু থেকে ; কাজেই এতে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন-ব্যয় পড়ে অতি কম।

হ্যামাটাইট — খনিজ ফেরিক ↑ অক্সাইড, Fe_2O_3 ; এই খনিজ থেকেই বেশির ভাগ ধাতব লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

হ্যালাইড — হ্যালোজেন ↑ শ্রেণীর যে কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে ধাতব বেসের ↑ রাসায়নিক মিলনে যে-সব 'বাইনারি কম্পাউণ্ড' ↑ উৎপন্ন হয়ে থাকে ; অর্থাৎ যে কোন হ্যালোজেন ↑ যুক্ত সল্টকেই হ্যালাইড বলা হয় ; যেমন —বিভিন্ন ধাতব পদার্থের ক্লোরাইড ↑ ব্রোমাইড ↑ আয়োডাইড ↑ প্রভৃতি সল্ট।

হ্যালো — সূর্য, অথবা যে কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে যে চক্রাকার আলোক-প্রভা দেখা যায়। সময় সময় কোন কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে এরূপ একাধিক জ্যোতিঃ-চক্রও দৃষ্ট হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জলীয় বাষ্প বা তুষার-কণিকার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ্কের বিকিরিত আলোকরশ্মি প্রতিসরিত (রিফ্র্যাকসন্ ↑) হয়ে প্রতিসরণের সাধারণ নিয়মানুসারে তারা সমভাবে বেঁকে যায় ; আর সেই বিচ্ছুরিত আলোকের ওইরূপ পরিমণ্ডল দৃষ্টি-গোচর হয়ে থাকে।

হ্যালোজেন — ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন, এই চারটি সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থকে এক-সঙ্গে 'হ্যালোজেন' বলে। এগুলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হলেও এদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের একটা পর্যায়ক্রমিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। এই হ্যালোজেন শ্রেণীর প্রত্যেকটি থেকে অনুরূপ ধর্মের হ্যালাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

হ্যালোজেনেটেড—যে-কোন একটা হ্যালোজেন ↑ সংযুক্ত পদার্থকে বলে 'হ্যালোজেনেটেড' পদার্থ ; যেমন, হ্যালোজেনেটেড রাবার। রাবারের সঙ্গে ব্রোমিন, ক্লোরিন বা আয়োডিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন হ্যালোজেন-ঘটিত এরূপ রাবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যে-কোন হ্যালোজেনেটেড রাবারের উপরিভাগ বিশেষ কঠিন ও মসৃণ হয়ে থাকে। কোন ধাতব জিনিসের গায়ে রাবার এঁটে লাগাতে হলে তাতে ব্রোমিন ↑ মিশিয়ে হ্যালোজেনেটেড করা হয়।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক শব্দের সচরাচর ব্যবহৃত সংক্ষেপ ও তার পরিভাষা

A.C	অল্টারনেটিং কারেন্ট	পরিবর্তী-প্রবাহ
A°	অ্যাব্সোলিউট টেম্পারেচার	পরম উষ্ণতা
At. No.	অ্যাটমিক নাম্বার	পারমাণবিক সংখ্যা
A. W.	অ্যাটমিক ওয়েট	পারমাণবিক ওজন
b.p.	বয়েলিং পয়েন্ট	স্ফুটনাংক
c.c.	(সি. সি.) কিউবিক সেণ্টিমিটার	ঘন সেণ্টিমিটার
C	সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার	সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা
conc.	কন্সেণ্ট্রেটেড	গাঢ়, ঘন
cgs	সেণ্টিমিটার গ্র্যাম-সেকেণ্ড	সেণ্টিমিটার গ্র্যাম সেকেণ্ড
cm	সেন্টিমিটার	সেণ্টিমিটার
DC	ডাইরেক্ট কারেন্ট	সম-প্রবাহ
EMF	ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স	তড়িচ্চালক বল
F	ফারেনহাইট টেম্পারেচার	ফারেনহাইট উষ্ণতা
ft	ফুট	ফুট
fps	ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড	ফুট পাউণ্ড সেকেণ্ড
gm	গ্র্যাম	গ্র্যাম
°K	ডিগ্রি কেলভিন (স্কেল)	পরম উষ্ণতামান ডিগ্রি
lb.	পাউণ্ড	পাউণ্ড
lat.	ল্যাটিচিউড	অক্ষাংশ
long.	লঙ্গিচিউড	দেশান্তর, দ্রাঘিমা
mm	মিলিমিটার	মিলিমিটার
mgm	মিলিগ্র্যাম	মিলিগ্র্যাম
mps	মাইল্স পার সেকেণ্ড	মাইল প্রতি সেকেণ্ড
m. p.	মেল্টিং পয়েন্ট	গলনাংক
S.G, sp. sg	স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি	আপেক্ষিক গুরুত্ব
Sq. m	স্কোয়ার মাইল	বর্গ মাইল
Sq. yd	স্কোয়ার ইয়ার্ড	বর্গ গজ
temp.	টেম্পারেচার	উষ্ণতা
wt	ওয়েট	ওজন

পরিশিষ্ট

মৌলিক পদার্থের তালিকা

[সাংকেতিক চিহ্ন, অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক ওয়েট]

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
অক্সিজেন	O	8	16·00
অস্‌মিয়াম	Os	76	190·20
অ্যাক্টিনিয়াম	Ac	89	227·00
অ্যান্টিমনি	Sb	51	121·76
অ্যামিরিসিয়াম	Am	95	241·00*
অ্যালুমিনিয়াম	Al	13	26·98
আর্সেনিক	As	33	74·91
আর্গন	A	18	39·94
অ্যাস্টেটাইন	At	85	210·00*
আর্বিয়াম	Er	68	167·20
আয়রন	Fe	26	55·85
আয়োডিন	I	53	126·91
ইউরোপিয়াম	Eu	63	152·0[illegible]
ইটার্বিয়াম	Yb	70	173·04
ইট্রিয়াম	Y	39	88·92
ইউরেনিয়াম	U	92	238·07
ইণ্ডিয়াম	In	49	114·76
ইরিডিয়াম	Ir	77	193·10
উলফ্রাম (টাংস্টেন)	W	74	183·92

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
কপার	Cu	29	63·54
কার্বন	C	6	12·01
কোবল্ট	Co	27	58·94
ক্যাড্মিয়াম	Cd	48	112·41
ক্যালসিয়াম	Ca	20	40·08
ক্যালিফোর্নিয়াম	Cf	98	246·00*
কুরিয়াম	Cm	96	242·00*
ক্লোরিন	Cl	17	35·46
ক্রিপ্টন	Kr	36	83·80
ক্রোমিয়াম	Cr	24	52·01
গোল্ড	Au	79	197·20
গ্যালিয়াম	Ga	31	69·72
গ্যাডোলিয়াম	Gd	64	156·90
জার্মেনিয়াম	Ge	32	72·60
জিঙ্ক	Zn	30	65·38
জির্কোনিয়াম	Zr	40	91·22
জেনন	Xe	54	131·30
টার্বিয়াম	Tb	65	159·20
টিন	Sn	50	118 70
টিটানিয়াম	Ti	22	47·90
টেক্নেসিয়াম	Tc	43	99·00*
টেলুরিয়াম	Te	52	127 61
ট্যাণ্টেলাম	Ta	73	180·88
ডিস্প্রোসিয়াম	Dy	66	162·46
থলিয়াম	Tl	81	204·39

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
থুলিয়াম	Tm	69	169·40
থোরিয়াম	Th	90	232·12
নাইট্রোজেন	N	7	14·01
নিকেল	Ni	28	58·69
নিয়ন	Ne	10	20·18
নিয়োডিমিয়াম	Nd	60	144·27
নায়োবিয়াম	Nb	41	92·91
নেপ্‌চুনিয়াম	Np	93	237·00*
পটাসিয়াম	K	19	39·10
পোলোনিয়াম	Po	84	210·00
প্যালাডিয়াম	Pd	46	106·70
প্ল্যাটিনাম	Pt	78	195·23
প্লুটোনিয়াম	Pu	94	239·00*
প্রাসিওডিমিয়াম	Pr	59	140·92
প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম	Pa	91	231·00
প্রোমেথিয়াম	Pm	61	145·00
ফস্‌ফরাস	P	15	30·98
ফ্রান্সিয়াম	Fr	87	223·00*
ফ্লোরিন	F	9	19·00
বার্কেলিয়াম	Bk	97	245·00*
বোরন	B	5	10·82
বিস্‌মাথ	Bi	83	209·00
বেরিলিয়াম	Be	4	9·01
ব্যারিয়াম	Ba	56	137·36
ব্রোমিন	Br	35	79·92

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
ভ্যানাডিয়াম	V	23	50·95
মার্কারি	Hg	80	200·61
মোলিব্‌ডেনাম	Mo	42	95·95
ম্যাঙ্গানিজ	Mn	25	54 93
ম্যাগ্নেসিয়াম	Mg	12	24·32
রেডিয়াম	Ra	88	226·05
রেনিয়াম	Re	75	186·31
রুথেনিয়াম	Ru	44	101·70
রুবিডিয়াম	Rb	37	85·48
রোডিয়াম	Rh	45	102·91
র‍্যাডন	Rn	86	222·00
লিথিয়াম	Li	3	6·94
লুটেসিয়াম	Lu	71	174·99
লেড	Pb	82	207·21
ল্যান্থেনাম	La	57	138·92
সাল্‌ফার	S	16	32·07
সিল্‌ভার	Ag	47	107·88
সিলিকন	Si	14	28·06
সেলেনিয়াম	Se	34	78 96
সোডিয়াম	Na	11	22·99
স্যামারিয়াম	Sm	62	150·43
স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	21	45·10
স্ট্রন্সিয়াম	Sr	38	87·63
হাইড্রোজেন	H	1	1·008
হিলিয়াম	He	2	4·003

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
হোল্‌মিয়াম	Ho	67	164·94
হ্যাফ্‌নিয়াম	Hf	72	178·60

উপরোক্ত তালিকায় * চিহ্নিত মৌলিক পদার্থগুলোর অ্যাটমিক ওয়েট সূচক সংখ্যায় ওইগুলোর সবচেয়ে স্থায়ী আইসোটোপের † মাস্‌-নাম্বার, বা আইসোটোপিক ওয়েট † প্রকাশিত হয়েছে।

রেডিও-অ্যাক্টিভ এলিমেণ্ট

[নাম ও অ্যাটমিক নাম্বার]

সামান্য রেডিও-অ্যাক্টিভ মৌলিক পদার্থ হলো: পটাসিয়াম 19, রুবি-ডিয়াম 37, সিজিয়াম 55, বিস্‌মাথ 83 ; আর বিশেষভাবে রেডিও-অ্যাক্টিভ মৌলিক হলো: টেক্‌নেসিয়াম 43, পোলোনিয়াম 84, অ্যাস্টেটাইন 85, র‍্যাডন 86, ফ্রান্সিয়াম 87, রেডিয়াম 88, অ্যাক্টিনিয়াম 89, থোরিয়াম 90, প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম 91, ইউরেনিয়াম 92, * নেপ্‌চুনিয়াম 93, প্লুটোনিয়াম 94, অ্যামিরিসিয়াম 95, কুরিয়াম 96, বার্কেলিয়াম 97, ক্যালিফোর্ণিয়াম 98.

* উপরোক্ত তালিকায় ইউরেনিয়ামের পরবর্তী এলিমেণ্ট ছয়টিকে বলে ট্রান্সইউরেনিক † এলিমেণ্ট।

রেয়ার-আর্থ এলিমেণ্ট

[নাম ও অ্যাটমিক নাম্বার]

স্ক্যাণ্ডিয়াম 21, ইট্রিয়াম 39, ল্যান্থেনাম 57, সিরিয়াম 58, প্রাসিওডিমিয়াম 59, নিওডিমিয়াম 60, প্রোমেথিয়াম 61, স্যামারিয়াম 62, ইউরোপিয়াম 63, গ্যাডোলিনিয়াম 64, টার্বিয়াম 65, ডিস্প্রোসিয়াম 66, হোল্‌মিয়াম 67, আর্বিয়াম 68, থুলিয়াম 69, ইটার্বিয়াম 70, লুটেসিয়াম 71.

মৌলিক পদার্থের পর্য্যায় সরণী

(পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে)

↓ পর্য্যায় / শ্রেণী →	0	1 a	1 b	2 a	2 b	3 a	3 b
প্রথম, হ্রস্ব	1 হাইড্রোজেন, 2 হিলিয়াম	3 লিথিয়াম	...	...	4 বেরিলিয়াম	...	5 বোরন
দ্বিতীয়, হ্রস্ব	... 10 নিয়ন	11 সোডিয়াম	...	...	12 ম্যাগ্নেসিয়াম	...	13 অ্যালুমিনিয়াম
প্রথম, দীর্ঘ (ক)	... 18 আর্গন	19 পটাসিয়াম		20 ক্যালসিয়াম	...	21 স্ক্যাণ্ডিয়াম	...
প্রথম, দীর্ঘ (খ)		...	29 কপার	...	30 জিঙ্ক	...	31 গলিয়াম
দ্বিতীয়, দীর্ঘ (ক)	... 36 ক্রিপ্টন	37 রুবিডিয়াম	...	38 ষ্ট্রন্সিয়াম	...	39 ইট্রিয়াম	...
দ্বিতীয়, দীর্ঘ (খ)		...	47 সিল্‌ভার	...	48 ক্যাড্‌মিয়াম	...	49 ইণ্ডিয়াম
তৃতীয়, দীর্ঘ (ক)	... 54 জেনন	55 সিজিয়াম	...	56 বেরিয়াম	...	57-71 রেয়ার আর্থ	...
তৃতীয়, দীর্ঘ (খ)		...	79 গোল্ড	...	80 মার্কারি	...	81 থলিয়াম
চতুর্থ, দীর্ঘ	... 86 র‍্যাডন	87 ফ্রান্সিয়াম	...	88 রেডিয়াম	...	89 অ্যাক্টিনিয়াম	...

21 স্ক্যাণ্ডিয়াম ও 39 ইট্রিয়াম ছাড়া 'রেয়ার আর্থ' ধাতু হলো 57 ল্যান্থানাম, 58 সিরিয়াম, 59 প্রাসিওডিয়াম, 60 নিওডিমিয়াম, 61 প্রোমেথিয়াম, 62 স্তামারিয়াম, 63 ইউরোপিয়াম, 64 গ্যাডোলিনিয়াম, 65 টার্বিয়াম, 66 ডিস্‌প্রোসিয়াম, 67 হোল্‌মিয়াম, 68 আর্বিয়াম, 69 থুলিয়াম, 70 ইটার্বিয়াম, 71 লুটেসিয়াম। আবার 93 নেপ্‌চুনিয়াম প্রভৃতি ট্রান্সইউরেনিক মৌলিকগুলিও 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর বলা যায় ; এগুলি আবার বিশেষ রেডিও-অ্যাক্টিভও বটে।

মৌলিক পদার্থের পর্যায় সরণী

(পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে)

	5 a	5 b	6 a				
		7 . নাইট্রোজেন	8 ... অক্সিজেন	9 ... ফ্লোরিন		...	
		15 ... ফস্ফরাস	16 ... সালফার	17 .. ক্লোরিন		...	
	23 ভ্যানাডিয়াম	...	24 ক্রোমিয়াম ...	25 ম্যাগ্নেসিয়াম ...	26 আয়রন	27 কোবল্ট	28 নিকেল
		33 ... আর্সেনিক	34 .. সেলেনিয়াম	35 ... ব্রোমিন		...	
	41 নিয়োবিয়াম	...	42 ...	43 টেক্নেসিয়াম ...	44 রুথেনিয়াম	45 রেডিয়াম	46 প্যালাডিয়াম
		51 ... অ্যান্টিমনি	52 .. টেলুরিয়াম	53 ... আয়োডিন		...	
	73 ট্যান্টালাম	...	74 টাংস্টেন ...	75 রেনিয়াম ...	76 অস্মিয়াম	77 ইরিডিয়াম	78 প্লাটিনাম
		83 ... বিস্মাথ	84 ... পোলোনিয়াম	85 .. অ্যাস্টেটাইন		...	
90 থোরিয়াম	91 প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম	...	92 ইউরেনিয়াম ... 93 ...নেপচুনিয়াম	94 প্লুটোনিয়াম 95 অ্যামেরিসিয়াম	96 কুরিয়াম	97 বার্কেলিয়াম	98 ক্যালিফোর্নিয়াম

মৃদু রেডিও-অ্যাক্টিভ মৌলিক হলো 19 পটাসিয়াম, 37 রুবিডিয়াম, 55 সিজিয়াম, 83 বিস্মাথ; আর তীব্র রেডিও-অ্যাক্টিভ হলো 84 প্লুটোনিয়াম, 86 র‍্যাডন, 87 ফ্রান্সিয়াম, 88 রেডিয়াম, 89 অ্যাক্টিনিয়াম, 90 থোরিয়াম, 91 প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম, 92 ইউরেনিয়াম। 93 নেপচুনিয়াম প্রভৃতি ট্রান্সইউরেনিক মৌলিকগুলিকে 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর বলা যেতে পারে; এগুলিও বিশেষ রেডিও-অ্যাক্টিভ বা তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি

আলোক-তরঙ্গ ঃ

দৃশ্য আলোকের (লাইট ↑) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা মোটামুটি হিসেবে (বেগুনি বর্ণের) 4×10^{-8} সেন্টিমিটার থেকে (লাল বর্ণের) 8×10^{-8} সেন্টিমিটার ধরা যেতে পারে। সাদা আলোকের সংগঠক প্রধান সাতটা বর্ণের (স্পেক্ট্রাম ↑, স্পেক্ট্রাম কালার ↑) বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরস্পর পার্থক্য সুনির্দিষ্টরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন বর্ণের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য-সীমা নিম্নে দেওয়া হলো :

আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 'অ্যাঙ্গস্ট্রম' এককে (A. U.) পরিমিত হয় ; 1 A.U. $= 10^{-8}$ অর্থাৎ ·00000001 সেন্টিমিটার।

লালবর্ণের রশ্মির		78C0 A. U.	থেকে	6400 A. U,
কমলা ,,	,,	6400 A. U.	,,	5900 A. U.
হল্‌দে ,,	,,	5900 A, U.	,,	5500 A. U·
সবুজ ,,	,,	5500 A. U.	,,	4900 A. U.
নীল ,,	,,	4900 A. U.	,,	4600 A. U.
গাঢ়নীল	,,	4600 A. U.	,,	4300 A. U.
বেগুনি	,,	4300 A. U.	,,	3800 A. U.

[7800 A, U. $= 7800 \times 10^{-8}$ সেন্টিমিটার

$= 7800 \times$ ·00000001 সেন্টিমিটার

$=$ ·000078 সেন্টিমিটার]

আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $2{\cdot}9978 \times 10^{10}$ সেন্টিমিটার $= 186{,}326$ মাইল। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে আলোক, বেতার, এক্স-রশ্মি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পৃথক ; কিন্তু গতি সকলেরই মোটামুটি সমান।

এক্স-রশ্মি ঃ

এক্স-রশ্মির তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও সুনির্দিষ্ট নয়; একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যসীমার মধ্যবর্তী বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সকল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই এক্স-রশ্মি নামে অভিহিত। মোটামুটি হিসেবে এই সীমা হলো 10^{-6} সেন্টিমিটার থেকে 10^{-9} সেন্টিমিটার; এর মধ্যবর্তী সকল দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোই এক্স-রশ্মি।

গামা-রশ্মি ঃ

গামা-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর; প্রায় 10^{-8} সেন্টি-মিটার থেকে 10^{-10} সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গগুলো গামা-রশ্মি।

রেডিও তরঙ্গ ঃ

রেডিও বা বেতার-তরঙ্গ সুবৃহৎ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার থেকে 20,000 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণতঃ সামান্য দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গগুলো র‍্যাডার যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। রেডিও স্টেশন থেকে সাধারণতঃ 10 মিটার থেকে 10.000 মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন রেডিও-তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে 10 থেকে 100 মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গগুলোকে বলে **সর্ট ওয়েভ**; 100 থেকে 1000 মিটারের গুলোকে বলে **মিডিয়াম ওয়েভ**, আর 1000 থেকে 10,000 মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোকে বলে **লঙ ওয়েভ**।

শব্দ-তরঙ্গ ঃ

বিভিন্ন ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑, অর্থাৎ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (যেমন আলোক, বেতার, গামারশ্মি প্রভৃতি) সম্পূর্ণ শূন্যস্থানে, অর্থাৎ কোন বস্তু-মাধ্যম ব্যতীতই প্রবাহিত হতে পারে। শব্দ-তরঙ্গ কিন্তু কোনরূপ বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে

পরিচালিত হতে পারে না ; কোন বস্তুর দ্রুত কম্পনের ফলে (সাউণ্ড ↑) সংলগ্ন মাধ্যম পদার্থে লঙ্গিটিউডিন্যাল আকারের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর কম্পন-সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি ↑) সেকেণ্ডে 30 থেকে 3000 পর্যন্ত হলে উৎপন্ন শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় (অডিবিলিটি-লিমিট ↑)। শব্দের গতি মাধ্যম-পদার্থের বিভিন্নতা ও তাপ-বৈষম্যের ফলে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপ ও চাপে (এন. টি. পি ↑) বায়ুর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 331·7 মিটার গতিতে প্রবাহিত হয় ; =প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল।

বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি

(প্রতি সেকেণ্ডে, মিটার এককে)

গ্যাসীয় মাধ্যমে (এন. টি. পি)		কঠিন ও তরল মাধ্যমে (20° সেন্টিগ্রেড)	
বায়ু	331·7	জল	1457
কার্বন ডাইঅক্সাইড	259	অ্যালকোহল	1210
হাইড্রোজেন	1262	অ্যালুমিনিয়াম	5100
অক্সিজেন	316	আয়রন	5000
কোল গ্যাস	490	প্ল্যাটিনাম	2700

গলনাংক, স্ফুটনাংক ও স্পেসিফিক হিট

(কয়েকটি সাধারণ মৌলিক পদার্থের)

পদার্থের নাম	সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (1 নর্মাল অ্যাটমস্ফিয়ার = 1·01325 বার)		স্পেসিফিক হিট (গ্রাম/সেন্টিমিটার/ক্যালোরি)	
	গলনাংক (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	স্ফুটনাংক (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	উষ্ণতার-স্তর (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	স্পেসিফিক হিট
অ্যালুমিনিয়াম	657	1800	17·1	·217
আয়রন	1530	2450	18·1	·113
আয়োডিন	113	184·4	9·98	·054
কার্বন	3500	4200	11	·160
কপার	1083	2310	15·1	·093
ক্যালসিয়াম	810	1170	·2	·149
গোল্ড	1063	2530	17·1	·031
জিঙ্ক	418	918	20	·0924
টিন	232	2270	20	·054
টাংস্টেন	3360	3700	20·1	·034
মার্কারি	−38·8	356·7	20	·0333
ম্যাগ্নেশিয়াম	651	1120	17·1	·247
লেড	327	1620	20·1	·0305
সিলভার	960	1955	15·1	·056
সোডিয়াম	97·5	877	0	·283
অক্সিজেন	−219	−182·9	−200	·35
আর্গন	−188	−186	—	—
নাইট্রোজেন	−210·5	−195·7	−208	·028
নিয়ন	−248·67	−245·9	—	—
হাইড্রোজেন	−259	−252·7	−253	6·0
প্ল্যাটিনাম	1773	3910	15·1	·0322
পটাসিয়াম	62·5	760	·56	·19

কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ডেন্সিটি

(কঠিন ও তরল পদার্থ)

নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থগুলোর ডেন্সিটি ↑ মোটামুটি হিসেবে সাধারণ উষ্ণতায় (17° থেকে 23° সেণ্টিগ্রেড) প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে ও গ্র্যাম এককে প্রদত্ত হয়েছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ উষ্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে পদার্থের ডেন্সিটির কিছু কিছু তারতম্য ঘটে থাকে।

পদার্থ	ডেন্সিটি গ্র্যাম / সি. সি.	পদার্থ	ডেন্সিটি গ্র্যাম / সি. সি.
অ্যালুমিনিয়াম	2·70	টিন	7·29
অ্যাণ্টিমনি	6·62	টাংস্টেন	19·30
আর্সেনিক	5·73	ম্যাগ্নেসিয়াম	1·74
আয়োডিন	4·95	ম্যাঙ্গানিজ	7·39
আয়রন (বিশুদ্ধ)	7·86	মার্কারি	13·56 / 15°
কপার	8·93	নিকেল	8·90
ক্যালসিয়াম	1·55 / 29°	নাইট্রোজেন (তরল)	·79/ – 196°
ক্রোমিয়াম	7·10		
ক্লোরিন (তরল)	2·49 / 0°	লেড	11·37
গোল্ড	19·32	সিলভার	10·50
জিঙ্ক	7·10	সিলিকন	2·30
পটাসিয়াম	·86	সোডিয়াম	97
প্ল্যাটিনাম	21·50	হাইড্রোজেন (তরল)	·07 (স্ফুটনাঙ্কে
অক্সিজেন (তরল)	1·27/ – 235°		

কয়েকটি সাধারণ যৌগিক পদার্থের ডেন্সিটি

গ্লিসারিন	1·26	আয়রন, কাস্ট	7 1—7·7
গ্ল্যাস (সাধারণ)	2·4—2·6	,, , রট	7·8—7 9
টার্পেণ্টাইন	·87	স্টিল	7·7—7·9
জল (0°)	·99987	পেট্রল	·68—·72
,, (4°)	1·00000	বরফ (0°)	·9168
,, (20°)	·99823		

কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থের ডেন্সিটি

প্রতি লিটারে (1000·028 সি. সি.) গ্র্যাম এককে ডেন্সিটি দেওয়া হলো ; উষ্ণতা 0° সেন্টিগ্রেড, চাপ 760 মিলিমিটার, অর্থাৎ এন. টি. পি. অবস্থায়।

গ্যাস	ডেন্সিটি (গ্র্যাম/লিটার)	গ্যাস	ডেন্সিটি (গ্র্যাম/লিটার)
বায়ু	1·2928	নাইট্রোজেন, N_2	1·2507
অ্যামোনিয়া, NH_3	0·7708	মিথেন, CH_4	0·7167
অক্সিজেন, O_2	1·4290	হাইড্রোজেন, H_2	0·0899
আর্গন, A	1·7809	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl	1·6390
কার্বন ডাই-অক্সাইড, CO_2	1·9968	হাইড্রোজেন সালফাইড, H_2S	1·5390
ক্লোরিন, Cl_2	3·2200	হিলিয়াম, He	0·1785
ক্রিপ্‌টন, Kr	3·6800	ব্রোমিন, Br_2	7·1390
জেনন, Xe	5·8500	ফ্লোরিন, F_2	1·6900
নিয়ন, Ne	0·9000		

বিভিন্ন উষ্ণতায় জল ও পারদের ডেন্সিটির তুলনা

উষ্ণতা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	জল (গ্র্যাম / সি. সি.)	পারদ (গ্র্যাম / সি. সি.)
0	·99987	13·5951
4	1·00000	—
10	·99970	13·5704
50	·98804	13·4725
100	·95835	13·3518

ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার

নির্দিষ্ট অনুপাতে কোন কোন পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে উষ্ণতা সবিশেষ হ্রাস পায়। এরূপ মিশ্রণকে বলে 'ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার'; বাংলায় বলা যায় হিমায়ী-মিশ্রণ। এরূপ কয়েকটা মিশ্রণের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো; এর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে মিশ্রণীয় পদার্থের নাম ও অনুপাত, তৃতীয় স্তম্ভে পদার্থগুলোর প্রাথমিক উষ্ণতা এবং চতুর্থ স্তম্ভে মিশ্রণের পরে উদ্ভূত নিম্নতাপ-সূচক উষ্ণতা 'ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড' স্কেলে দেখান হয়েছে :

পদার্থ ও অনুপাত	পদার্থ ও অনুপাত	প্রাথমিক উষ্ণতা	মিশ্রণের পরবর্তী উষ্ণতা
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl, 30	জল, H_2O, 100	13·3	−5·1
পটসিয়াম আয়োডাইড KI, 140	জল, H_2O, 100	10·3	−11·7
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl, 25	চূর্ণিত বরফ 100	−1	−15·4
খাদ্য লবণ, NaCl, 33	,, 100	−1	−21·3
জলীয় সালফিউরিক অ্যাসিড, $H_2SO_4+H_2O$ (66·1 % H_2SO_4) 1	,, 4·32	−1	−25·0
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও জল, $CaCl_2+6H_2O$, 1	,, ·61	0	−39·0
,, ,, 1	,, ·70	0	−54·0
,, ,, 1	,, ·81	0	−40·0
অ্যালকোহল, CH_3CH_2OH,	কার্বনডাইঅক্সাইড, CO_2 (কঠিন)	…	−72·0
ক্লোরোফর্ম, $CHCl_3$,	,, ,,	…	−77·0
ইথার, $(C_2H_5)_2O$,	,, ,,	…	−77·0
সালফার ডাইঅক্সাইড, SO_2 (তরল)	,, ,,	…	−82·0

সৌর পরিবার সম্পর্কীয় বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্যাদি

1 Km (কিলোমিটার) = 1093·611 গজ

1 Kgm (কিলোগ্র্যাম) = 2·204622 পাউণ্ড

গ্রহের নাম	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (10^6 Km)	নিরক্ষীয় ব্যাস (Km)	সূর্য পরিক্রমণ কাল (বছর) (দিনের হিসাবে)	মাস্ (ওজন) (10^{24} Kgm)	নিজ কক্ষে আবর্তন কাল	উপগ্রহ সংখ্যা।
মার্কারি	57·85	5000	87·97	0·312	—	0
ভেনাস	108·11	12400	224 70	4·9	30 ঘণ্টা	0
আর্থ	149·46	12756·6	365·26	6·0	23ঘ. 56মি.	1
মার্স	227·7	6783	686·98 (1 বছর 322 দিন)	0·65	24ঘ. 37মি 23 সে.	2
জুপিটার	777·6	142600	11 বছর 314 দিন	1901·4	9ঘ. 50মি.	9
স্যাটার্ণ	1426·0	119000	29 বছর 167 দিন	568·8	10ঘ. 14মি.	10এবং 3 বলয়
ইউরেনাস	2868·3	51500	84ব.5 দিন	87·7	10ঘ. 45মি.	4
নেপচুন	4494·3	49900	164 বছর 288 দিন	103	15ঘ. 48মি.	1
সূর্য		1 392 × 10^6	—	1·984 × 10^{30}	25 দিন 9·1 ঘ.	—
চন্দ্র	—	3478	—	7·36 × 10^{22}	27দি. 7ঘ. 43মি 11সে (চান্দ্র মাস)	

বায়ুমণ্ডলের উপাদান

সমুদ্রতলের উচ্চতায় (45° ল্যাটিচিউড) অবস্থিত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে ওজনের শতকরা হিসেবে সংমিশ্রিত বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান :

	%ওজন হিসাবে		%ওজন হিসেবে
নাইট্রোজেন—	75·5	নিয়ন—	$8·4 \times 10^{-4}$
অক্সিজেন—	23·2	জেনন—	3×10^{-6}
আর্গন—	0·92	হিলিয়াম—	7×10^{-5}
কার্বন ডাইঅক্সাইড—	0·3	হাইড্রোজেন—	7×10^{-6}
ক্রিপ্‌টন—	14×10^{-6}		

বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট পদার্থের আয়তন :

গোলাকার — $4\pi r^3/3$

চতুষ্কোণ — lbh

নলাকার — $\pi r^2 h$

সমবাহু চতুষ্কোণ — l^3 (কিউব)

ঘন (সলিড) কোণাকার— $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

উল্লিখিত সূত্রগুলিতে পদার্থটির দৈর্ঘ্য l, প্রস্থ b, উচ্চতা h, ব্যাসার্ধ r এবং $\pi = 3·1416$ ধরা হয়েছে।

আয়তনের বর্গ পরিমাণ

144 বর্গ ইঞ্চি	=	1 বর্গ ফুট	=	9·2903 বর্গ ডেসিমিটার
9 ,, ফুট	=	1 ,, গজ	=	0·8361 ,, মিটার
$30\frac{1}{4}$,, গজ	=	1 ,, পোল	=	25·293 ,, মিটার
40 ,, পোল	=	1 রুড	=	10·117 একর
4 রুড	=	1 একর	=	0·40468 হেক্টাএকর
640 একর	=	1 বর্গ মাইল	=	259·00 হেক্টাএকর

কয়েকটি ধ্রুবক রাশি

π (পাই) = 3·1415927

π^2 = 9·8696044

$1/\pi$ = 0·3183099

1 রেডিয়ান = 57·29578 ডিগ্রি

1° (ডিগ্রি) = 0·01745329 রেডিয়ান

μ (মিউ) মাইক্রন = 10^{-3} মিলিমিটার

A. U (অ্যাঙস্ট্রম ইউনিট) = 10^{-8} সেন্টিমিটার

বিভিন্ন একক পরিবর্তনের সহজ কৌশল :

1. ইঞ্চিকে সেন্টিমিটার করতে 5 দিয়ে গুণ করে 2 দিয়ে ভাগ ;
2. সেন্টিমিটারকে ইঞ্চি ,, 2 ,, ,, ,, 5 ,, ,, ;
3. পাউণ্ডকে কিলোগ্র্যাম, 11 ,, ,, ,, 5 ,, ,, ;
4. কিলোগ্র্যামকে পাউণ্ড ,, 5 ,, ,, ,, 11 ,, ,, ;
5. লিটারকে গ্যালন ,, 50 ,, ,, ,, 11 ,, ,, ,
6. গ্যালনকে লিটার ,, 11 ,, ,, ,, 50 ,, ,, ,
7. সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিকে ফারেনহাইট ডিগ্রি করতে
   9 দিয়ে গুণ করে 5 দিয়ে ভাগ করে 32 যোগ ;
8. ফারেনহাইট ডিগ্রিকে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি করতে
   বিয়োগ 32, তারপরে 5 দিয়ে গুণ করে 9 দিয়ে ভাগ।

বিভিন্ন একক পরিবর্তন

দৈর্ঘ্য :

1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার
1 গজ = 0·914399 মিটার
1 মাইল = 1·6093 কিলোমিটার

1 মিটার = 10 ডেসিমিটার (dm.)
= 100 সেন্টিমিটার (cm.)
= 1000 মিলিমিটার (mm.)
= 39 37 ইঞ্চি = 1·094 গজ

10 মিটার (m) = 1 ডেকামিটার (Dm.)
100 ,, ,, = 1 হেক্টোমিটার (Hm.)
1000 ,, ,, = 1 কিলোমিটার (Km.)
= 0·6214 মাইল

ওজন :

4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 1 ঘন সেন্টিমিটার (c.c.) বিশুদ্ধ জলের ওজন ধরা হয়েছে 1 গ্র্যাম :

1 গ্র্যাম = 0·035 আউন্স
1000 গ্র্যাম = 1 কিলোগ্র্যাম
= 2·205 পাউণ্ড

1 গ্রেন = 0·064799 গ্র্যাম (gm)
1 আউন্স = 28·35 গ্র্যাম
1 পাউণ্ড = 0·453592 কিলোগ্র্যাম
1 টন = 1016 কিলোগ্র্যাম (Kgm)

আয়তন ঃ

4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 760 মিলিমিটার বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 1 কিলোগ্র্যাম বিশুদ্ধ জলের আয়তন 1 লিটার :

1 লিটার = 1000·027 ঘন সেন্টিমিটার (c. c.)
= 1·000027 ঘন ডেসিমিটার (Cu. dm.)
= 33·81 আউন্স (ফ্লুইড) = 1·816 পাইণ্ট
1 গ্যালন = 4·545963 লিটার
1 ঘন ইঞ্চি = 16·387 ঘন সেন্টিমিটার (c.c.)
1 ঘন মিলিমিটার = 0·999972 ঘন সেন্টিমিটার

উষ্ণতা ঃ

উষ্ণতা পরিমাপের সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলে জলের হিমাংক যথাক্রমে 0°C ও 32°F ; স্ফুটনাংক যথাক্রমে 100°C ও 212°F ; সুতরাং এই সমান তাপীয় ব্যবধান সেন্টিগ্রেড স্কেলে 100° এবং ফারেনহাইট স্কেলে 180° হবে। কাজেই 1° ফারেনহাইট = 100/180, অর্থাৎ 5/9 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি। এভাবে ওর যে কোন একক থেকে অপর এককে নিম্নলিখিত সূত্রানুসারে সহজেই উষ্ণতার মান পরিবর্তন করা যেতে পারে :

$$F^\circ = 9/5\,(C^\circ) + 32$$

$$C^\circ = 5/9\,(F^\circ - 32)$$

এরূপ হিসেবে :

°C	°F	°C	°F
0	32	20	68
5	41	25	77
8	46·4	30	86
10	50	50	122
15	59	100	212

উষ্ণতা পরিমাপের একক হিসেবে সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট এককই সমধিক প্রচলিত ; রুমার স্কেলের ব্যবহার তেমন নেই।

বিভিন্ন সংখ্যার বর্গমূল ও ঘনমূল

বর্গমূল (স্কোয়ার রুট)			ঘনমূল (কিউব রুট)		
1	–	1·00	1	=	1·00
2	=	1·4142136	2	=	1·2599210
3	=	1·7320508	3	–	1·4422496
4	=	2·00	4	=	1·5874011
5	=	2·2360680	5	–	1·7099759
6	=	2·4494897	6	–	1·8171206
7	=	2·6457513	7	–	1·9129312
8	–	2·8284271	8	–	2·00
9	–	3·00	9	–	2·08008৩7
10	–	3·1622777	10	–	2·1544347

রোমান সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি

1 – I	6 = VI	20 – XX
2 – II	7 – VII	30 = XXX
3 – III	8 – VIII	50 – L
4 – IV	9 = IX	100 – C
5 – V	10 = X	500 – D
		1000 – M

কৌশলটা এই :

5 = V	, তা থেকে	…	4 – IV	আর	6 – VI
10 – X	, „ „	…	9 – IX	,	11 – XI
50 – L	, „ „	…	40 – XL	,	60 – LX
100 – C	, „ „	…	90 – XC	,	110 – CX
500 – D	, „ „	…	400 – CD	,	600 – DC
1000 = M	, „ „	…	900 = CM	,	1100 – MC

বিখ্যাত উদ্ভাবন ও উদ্ভাবক

উদ্ভাবিত জিনিস		উদ্ভাবন কাল		উদ্ভাবকের নাম
অটোমেটিক টেলিফোন	..	1889	...	স্ট্রোজার
আর্ক ল্যাম্প	...	1808	...	ডেভি
অ্যান্টিসেপ্টিক সার্জারি	...	1865	...	লিস্টার
ইলেক্ট্রিক ফ্যান	...	1886	..	হুইলার
„ ফার্নেস	...	1877	...	সিমেন্স
„ লাইট	...	1879	...	এডিসন
ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ	...	1896	...	মার্কোনি
„ টেলিফোন	...	1902	...	ফেসেণ্ডেন
এরোপ্লেন	...	1903	...	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়
এক্স-রে	...	1895	...	রণ্টগেন
কালার ফটোগ্রাফি	...	1892	...	লিপ্‌ম্যান
গ্যাস ম্যাণ্টেল	.	1885	.	ওয়েল্‌স ব্যাক
জাইরোকম্পাস	...	1905	..	আন্সকাট্‌জ
জাইরোস্কোপ	...	1817	...	বোনেন্‌বার্জার
টকি পিক্চার	...	1926	...	কেজ
টাইপ-রাইটার	..	1867	...	শোল্‌স
টেলিগ্রাফ	..	1837	...	মোর্স
টেলিভিসন	...	1927	..	বেয়ার্ড
টেলিফোন	...	1876	...	বেল
ডায়নামো	...	1831	...	ফ্যারাডে
ডিনামাইট	...	1867	...	নোবেল
ডিজেল ইঞ্জিন	...	1896	...	ডিজেল
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট	..	1827	...	অ্যাস্‌পডিল
পেনিসিলিন	...	1929	...	ফ্লেমিং
ফনোগ্রাফ (গ্রামোফোন)	...	1877	...	এডিসন
ফটোগ্রাফি	...	1827	...	নিপ্‌স
ফটোগ্রাফিক ফিল্ম	...	1887	...	গুড্‌উইন ইস্টম্যান
বাইসাইকল	...	1855	...	ল্যালিমেন
বুন্‌সেন বার্ণার	...	1855	...	বুন্‌সেন
বিসিমার প্রোসেস	...	1855	...	বিসিমার

উদ্ভাবিত জিনিস		উদ্ভাবন কাল		উদ্ভাবকের নাম
মোসন পিক্‌চার	...	1893	...	এডিসন
" " প্রোজেক্টর	...	1894	...	জেন্‌কিন্স
ম্যাচ (দেশলাই)	...	1827	...	ওয়েকার
		1829	...	হোলডেন
রেডিও	...	1896	...	মার্কোনি
রেয়ন	...	1855	...	অ্যাডেমার্স
রোটারি প্রিন্টিং	...	1847	...	হো
লাইনো টাইপ	...	1883	...	ম্যাগেন্থ্যালার
সায়েনাইড প্রোসেস	...	1890	...	ম্যাক্ আর্থার
সেলুলয়েড	...	1870	...	হায়াট
সেফ্‌টি ল্যাম্প	...	1815	..	ডেভি
সেফ্‌টি ম্যাচ	..	1844	...	পাস্‌ক
সিউইং মেসিন	...	1845	..	হায়োই
স্টিম ইঞ্জিন	..	1769	...	ওয়াট
" টার্বাইন		1882	.	ডি. লাভাল
স্ট্যাথিস্কোপ	...	1819	...	ল্যানেক
হাইড্রোপ্লেন	...	1911	...	কার্টিস
হাইড্রোফোবিয়া ইন্‌জেক্‌সন	.	1885	...	পাস্তুর
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	...	1944	...	ওয়াক্সম্যান

নোবেল পুরস্কার

সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যাল্‌ফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল 1896 খৃষ্টাব্দের 10 ডিসেম্বর মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত এক কোটি 75 লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি উইল করে একটি ন্যাস রক্ষক সমিতির (বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ) হস্তে অর্পণ করে যান। উইলের বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক সুদ থেকে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা (Physics) রসায়নবিদ্যা (Chemistry), চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Medicines), সাহিত্য (Literature) ও শান্তি (Peace) এই পাঁচটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও কৃতিত্বের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

জগতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী নোবেলের এই দান অতুলনীয়; নোবেল পুরস্কার লাভ করা জগতের বিভিন্ন দেশ ও জাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক-স্বরূপ। নোবেল প্রদত্ত সম্পত্তির বার্ষিক সুদ হয় প্রায় সওয়া ছয় লক্ষ টাকা—প্রতি বিষয়ে প্রতি বছরে প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের মূল্য মোটামুটি 1,25,000 টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানিগণের নাম, দেশের নাম, প্রাপ্তির বছর ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেওয়া হলো : —

পদার্থবিদ্যা

1901	উইল্‌হেল্‌ম কনার্ড রণ্টগেন	—	জার্মানি
1902	হেন্‌রিক আণ্টুন লরেঞ্জ ও পিটার জিম্যান	—	হল্যাণ্ড
1903	এণ্টনি হেন্‌রি ব্যাকেরেল, পিয়ের কুরি ও মেরি স্লোডোস্কা কুরি	—	ফ্রান্স
1904	লর্ড জন উইলিয়াম স্ট্রাট র‍্যালে	—	ইংল্যাণ্ড
1905	ফিলিপ লেনার্ড	—	জার্মানি
1906	জোসেফ জন টম্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড
1907	অ্যালবার্ট আব্রাহাম মিচেল্‌সন	—	আমেরিকা
1908	গ্যাব্রিয়েল লিপ্‌ম্যান	—	ফ্রান্স
1909	গুগ্লিয়েমো মার্কনি ও	—	ইটালি
	কার্ল ফার্ডিন্যাণ্ড ব্রন	—	জার্মানি
1910	জোহান্স ডিডেরিক ভ্যান্‌ডার ওয়াল্‌স	—	হল্যাণ্ড
1911	উইল্‌হেল্‌ম উইয়েন	—	জার্মানি
1912	গুস্তফ নিল্‌স ডালেন	—	সুইডেন
1913	হিক ক্যামার্লিং ওনেস	—	হল্যাণ্ড
1914	ম্যাক্স ভন ল'	—	জার্মানি
1915	স্যার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ ও উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগ	—	ইংল্যাণ্ড
1916	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1917	চার্লস গ্লোভার বার্কলার	—	ইংল্যাণ্ড
1918	ম্যাক্স ভন প্ল্যাঙ্ক	—	জার্মানি
1919	জোহান্স স্টার্ক	—	জার্মানি

1920	চার্লস এডুয়ার্ড গুইলাম	সুইজারল্যাণ্ড
1921	অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন	জার্মানি
1922	নিল্‌স বোর	ডেনমার্ক
1923	রবার্ট অ্যাণ্ড্রুস মিলিক্যান	আমেরিকা
1924	কার্ল ম্যান জর্জ সিগ্রন	সুইডেন
1925	জেম্‌স ফ্র্যাঙ্ক ও গুস্তভ হার্টজ	জার্মানি
1926	জিন ব্যাপ্টিস্ট পেরিন	ফ্রান্স
1927	আর্থার হোলি কম্পটন ও	আমেরিকা
	চার্লস টমসন রিজ উইলসন	ইংল্যাণ্ড
1928	ওয়েলস্ উইলিয়াম্‌স রিচার্ডসন	ইংল্যাণ্ড
1929	লুই ভিক্টর ডি' ব্রগিল	ফ্রান্স
1930	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন	ভারতবর্ষ
1931	পুরস্কার স্থগিত	...
1932	ওয়ার্নার হিসেনবার্গ	জার্মানি
1933	পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডিরাক ও	ইংল্যাণ্ড
	আরউইন স্ক্রডিঞ্জার	অস্ট্রিয়া
1934	পুরস্কার স্থগিত	...
1935	জেম্‌স চ্যাডউইক	ইংল্যাণ্ড
1936	কার্ল ডেভিড অ্যাণ্ডারসন ও	আমেরিকা
	ভিক্টর ফ্র্যান্স হেস	অস্ট্রিয়া
1937	ক্লিন্টন জোসেফ ডেভিডসন ও	আমেরিকা
	জর্জ পেগেট টম্‌সন	ইংল্যাণ্ড
1938	অ্যান্‌রিকো ফার্মি	ইটালি
1939	আর্নেস্ট আর্ল্যাণ্ডো লরেন্স	আমেরিকা
1940	পুরস্কার স্থগিত	
1941		
1942		
1943	অটো স্টার্ন	আমেরিকা
1944	ইসাডোর আইজাক রেবি	আমেরিকা
1945	উল্ফগ্যাং পলি	সুইজারল্যাণ্ড
1946	পার্সি ব্রিজম্যান	আমেরিকা

1947	স্যার এডোয়ার্ড অ্যাপ্লটন	—	ইংল্যাণ্ড
1948	প্যাট্রিক মনার্ড ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট	—	ইংল্যাণ্ড
1949	হিদেকি য়ুকাওয়া	—	জাপান
1950	সিসিল পাওয়েল	—	ইংল্যাণ্ড
1951	স্যার জন কক্রফ্ট ও	—	ইংল্যাণ্ড
	ই. টি. উল্টন	—	আয়ারল্যাণ্ড
1952	এড্ওয়ার্ড পার্শেল ও ফেলিক্স ব্লচ	—	আমেরিকা
1953	ডাঃ ফ্রিট্স জেরনিক	—	হল্যাণ্ড
1954	অধ্যাপক ম্যাক্সবার্ণ ও অধ্যাপক ওয়ালদার্ন বোথে	—	জার্মানি
1955	ডাঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব ও ডাঃ পলিকার্প কুশ	—	আমেরিকা
1956	উইলিয়াম শকলি, জন বার্ডিন ও ওয়াল্টার হাউসার	—	আমেরিকা
1957	ডাঃ সুং দাও লি এবং ডাঃ চেন নিং ইয়াং (চৈনিক)	—	আমেরিকা
1958	ডাঃ চেরেনকোভ, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ও অধ্যাপক টামান	—	রাশিয়া
1959	ডাঃ এমিলিও সেগ্রে (ইটালীয়) ও ডাঃ ওয়েন চেম্বারলেন	—	আমেরিকা
1960	অধ্যাপক ডোনাল্ড এ. গ্লেসার	—	আমেরিকা
1961	ডাঃ রবার্ট হফ্স্টাড্টার ও ডাঃ রুডল্ফ মোয়েসবার	—	আমেরিকা

রসায়ন বিদ্যা

1901	জ্যাকোবাস হেণ্ডিক ভ্যাণ্ট হফ	—	হল্যাণ্ড
1902	অ্যামিল ফিসার	—	জার্মানি
1903	সাণ্টে অগাষ্ট অ্যারেনিয়াস	—	সুইডেন
1904	স্যার উইলিয়াম র্যাম্সে	—	ইংল্যাণ্ড
1905	অ্যাডল্ফ ভন বেয়ার	—	জার্মানি
1906	হেন্রি ময়সাঁ	—	ফ্রান্স

1907	অ্যাডুয়ার্ড বুচ্‌নার	—	জার্মানি
1908	স্যার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড	—	ইংল্যাণ্ড
1909	উইলহেল্‌ম্‌ অষ্টওয়াল্ড	—	জার্মানি
1910	অটো ওয়ালাচ	—	জার্মানি
1911	মেরী স্লোডোস্কা কুরি	—	ফ্রান্স
1912	ভিক্টর গ্রিগ্‌নার্ড ও পল স্যাবাষ্টিয়ের	—	ফ্রান্স
1913	অ্যালফ্রেড ওয়ার্নার		সুইজারল্যাণ্ড
1914	থিয়োডোর উইলিয়াম রিচার্ডস		ইংল্যাণ্ড
1915	রিচার্ড উইল্‌ষ্ট্যাটার		জার্মানি
1916 1917	পুরস্কার স্থগিত		
1918	ফ্রিট্‌জ হ্যাবার	—	জার্মানি
1919	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1920	ওয়াল্টার নার্নষ্ট	—	জার্মানি
1921	ফ্রেডেরিক সডি	—	ইংল্যাণ্ড
1922	ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাষ্টন	—	ইংল্যাণ্ড
1923	ফ্রিট্‌জ প্রেগ্‌ল	—	অষ্ট্রিয়া
1924	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1925	রিচার্ডসিগ্‌মণ্ড	—	জার্মানি
1926	থিয়োডোর স্ভেড্‌বার্গ	—	সুইডেন
1927	হেন্‌রিচ অটো উইল্যাণ্ড	—	জার্মানি
1928	অ্যাডল্‌ফ উইণ্ডাস	—	জার্মানি
1929	স্যার আর্থার হার্ডে ও	—	জার্মানি
	হান্স ভন উইলার চেপ্‌লিন	—	সুইডেন
1930	হান্স ফিসার	—	জার্মানি
1931	কার্ল বস্‌ ও ফ্রেডরিক গুস্তব বার্গ্‌ইস	—	জার্মানি
1932	আর্ভিং ল্যাং মুর	—	আমেরিকা
1933	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1934	হ্যারল্ড ক্লেটন ইউরি	—	আমেরিকা

1935	ফ্রেডরিক জোলিও কুরি ও আইরিন জোলিও কুরি	—	ফ্রান্স
1936	পিটার জোসেফ উইলহেল্‌ম ডেবি	—	হল্যাণ্ড
1937	ওয়াল্টার নর্ম্যান হাওয়ার্থ ও	—	ইংল্যাণ্ড
	পল কারের	—	সুইজারল্যাণ্ড
1938	রিচার্ড কুন	—	জার্মানি
1939	অ্যাডল্‌ফ বুটেন্যাণ্ট্‌ ও	—	জার্মানি
	লিওপোল্ড রুজিকা	—	সুইজারল্যাণ্ড
1940 – 1942	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1943	জর্জ হেভেসি	—	হাঙ্গেরি
1944	অটো হ্যান	—	জার্মানি
1945	আর্তুরি বির্টান্যান	—	ফিন্‌ল্যাণ্ড
1946	ওয়েণ্ডেল ষ্ট্যান্‌লি, জন নর্থরাপ ও জেম্‌স সামার	—	আমেরিকা
1947	স্যার রবার্ট রবিন্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড
1948	আর্নে টেলিয়ুস	—	সুইডেন
1949	ডব্লিউ, এফ, জিয়াক	—	আমেরিকা
1950	অটো ডিয়েল্‌স ও কেণ্ট অ্যাডলার	—	জার্মানি
1951	অ্যাডুইন ম্যাক্‌মিলান ও প্লেন সিবোর্জ	—	আমেরিকা
1952	আচার জন পার্টনার মেরিন ও রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন	—	ইংল্যাণ্ড
1953	অধ্যাপক হ্যারম্যান ষ্টডিঞ্জার	—	জার্মানি
1954	ডাঃ লিনাস পলিং	—	আমেরিকা
1955	অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট ডু ভিগো	—	আমেরিকা
1956	স্যার সিরিল হিন্‌শেলউড	—	ইংল্যাণ্ড
	অধ্যাপক নিকোলাই সেমেনভ	—	রাশিয়া
1957	স্যার আলেকজাণ্ডার টড	—	ইংল্যাণ্ড
1958	অধ্যাপক ডাঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার	—	ইংল্যাণ্ড

1959	অধ্যাপক জারোস্লাভ হেরোভস্কি	—	চেকোশ্লোভাকিয়া
1960	উইলার্ড এফ. লিবি	—	আমেরিকা
1961	অধ্যাপক কেলভিন	—	আমেরিকা

চিকিৎসা বিজ্ঞান

1901	অ্যামিল ভন বেরি	—	জার্মানি
1902	স্যার রোন্যাল্ড রস	—	ইংল্যাণ্ড
1903	নিলস্ রাইবার্জ ফিন্‌সেন	—	ডেনমার্ক
1904	আইভ্যান পেট্রোভিচ্ পাভ্‌লভ	—	রাশিয়া
1905	রবার্ট কক্	—	জার্মানি
1906	ক্যামিলো গল্‌গি ও	—	ইটালি
	র‍্যামোনি কাজাল	—	স্পেন
1907	চার্লস লুইঅ্যালফোর্স ল্যাভেরন	—	ফ্রান্স
1908	পল আর্লিচ ও	—	জার্মানি
	অ্যালি মেচ্নিকফ	—	রাশিয়া
1909	অ্যামিল থিয়োডোর কোচের	—	সুইজারল্যাণ্ড
1910	অ্যাল্‌ফ্রেড কসেল	—	জার্মানি
1911	অ্যাল্‌ভার গলষ্ট্যাণ্ড	—	সুইডেন
1912	অ্যালেকিস ক্যারেন	—	আমেরিকা
1913	চার্লস বরার্ট রিচেট	—	ফ্রান্স
1914	রবার্ট ব্যারেনি	—	অষ্ট্রিয়া
1915—1918	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1919	জুলেস বোর্ডেট	—	বেলজিয়াম
1920	অগাষ্ট ক্রোঘ	—	ডেনমার্ক
1921	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1922	আর্চিবল্ড ভিভিয়ান হিল ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অটো মেয়ার হফ	—	জার্মানি
1923	ফ্রেড্যারিক গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং ও জন্ জেম্স রিচার্ড ম্যাক্লিয়ড	—	ক্যানাডা
1924	উইল্‌হেলম আয়েন্থোভেন	—	হল্যাণ্ড
1925	পুরস্কার স্থগিত	—	...

1926	জোহান্স অ্যাণ্ড্র গ্রিব	—	ডেনমার্ক
1927	জুলিয়াস ওয়াগ্নার জোরেগ	—	অষ্ট্রিয়া
1928	চার্লস জুলেস হেন্‌রি নিকোল	—	ফ্রান্স
1929	ক্রিশ্চিয়ান আইক্‌ম্যান ও	—	হল্যাণ্ড
	স্যার এফ, জি, ইপ্‌কিন্স	—	ইংল্যাণ্ড
1930	কার্ল ল্যাণ্ডষ্টিনার	—	আমেরিকা
1931	অটো হেন্‌রিচ ওয়ারবার্গ	—	জার্মানি
1932	অ্যাড্‌গার ডগ্‌লাস ফ্যাড্রিয়ান ও স্যার চার্লস স্কট শেরিংটন	—	ইংল্যাণ্ড
1933	টমাস হাণ্ট মর্গ্যান	—	আমেরিকা
1934	জর্জ রিচার্ডস মাউণ্ট, উইলিয়াম প্যারি মর্ফি ও জর্জ হোট হুইপ্‌ল	—	আমেরিকা
1935	হান্স স্পেম্যান	—	জার্মানি
1936	স্যার হেনরি হ্যালেট ডেল ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অটো লোয়ি	—	অষ্ট্রিয়া
1937	অ্যালবার্ট ভন্ সেণ্টিওর্গি ন্যাগিরাপোল্ট	—	হাঙ্গেরি
1938	কর্নিল হেম্যান্স	—	বেলজিয়াম
1939	জেরাাড ডোম্যাক	—	জার্মানি
1940—1942	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1943	এডওয়ার্ড অ্যাডেলনার্ট ডোইজি	—	আমেরিকা
	ও হেন্‌রিক ড্যাম	—	ডেনমার্ক
1944	জোসেফ আর্লাঙ্গার ও হার্বার্ট স্পেন্সার গ্যাসার	—	আমেরিকা
1945	স্যার আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং, স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নেস্ট চেইন	—	ইংল্যাণ্ড
1946	হার্ম্যান মুলার	—	আমেরিকা
1947	কার্ল কোরি ও গার্টি কোরি	—	চেকোশ্লোভাকিয়া
	বার্নাডো অ্যালবার্টো হাউসে	—	ব্রাজিল

1948	পল মুলার	—	সুইজারল্যাণ্ড
1949	রুডল্ফ হেস ও	—	সুইজারল্যাণ্ড
	অ্যান্টোনিও এগার মোনিজ	—	পর্তুগাল
1950	ফিলিপ হেন্চ ও এড্ওয়ার্ড কেণ্ডলি	—	আমেরিকা
	এড্ওয়ার্ড তাডিউজ রিষ্টিন	—	সুইজারল্যাণ্ড
1951	ম্যাক্স হিলার	—	আমেরিকা
1952	সেলম্যান. এ. ওয়াক্সম্যান	—	আমেরিকা
1953	ডাঃ ফ্রিজ এ. লিপম্যান ও ডাঃ হ্যান্স এ, ক্রেবস্	—	ইংলণ্ড ও আমেরিকা
1954	ডাঃ টমাস ওয়েলার, ডাঃ জন এফ্ অ্যাণ্ডার্স ও ডাঃ ফ্রেডারিক সি. রবিন্স	—	আমেরিকা
1955	হুগো থিয়োরেল	—	সুইডেন
1956	ডাঃ আঁদ্রে কুঁনা ও অধ্যাপক ডিকিন্স রিচার্ডস	—	বৃটেন
	ডাঃ ভের্নের ফর্সম্যান	—	জার্মানি
1957	অধ্যাপক ড্যানিয়েল বোভেট (সুইডিশ)	—	ইটালি
1958	অধ্যাপক ডাঃ জর্জ উইলিস, ডাঃ এডওয়ার্ড ক্যাটাস ও অধ্যাপক ডাঃ জস্যুয়া লেডারবার্গ	—	আমেরিকা
1959	ডাঃ সেভেরো ওচোয়া ও ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ	—	আমেরিকা
1960	অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ম্যাক্ফার্লিন বার্নেট	—	অষ্ট্রেলিয়া
	অধ্যাপক পিটার ব্রায়ান মেডাওয়ার	—	বৃটেন
1961	ডাঃ জর্জ ভন বেক্সে	—	হাঙ্গেরি

1961 পর্যন্ত কোন দেশ কতবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে :

দেশ	পদার্থ বিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা বিজ্ঞান	দেশ	পদার্থ বিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা বিজ্ঞান
ইংল্যাণ্ড	14	12	12	আয়ারল্যাণ্ড	1	—	—
জার্মানি	12	21	9	ডেনমার্ক	1	—	4
আমেরিকা	16	12	18	হাঙ্গেরি	—	1	2
ফ্রান্স	6	6	3	ফিন্‌ল্যাণ্ড	—	1	—
হল্যাণ্ড	5	2	2	স্পেন	—	—	1
ইটালি	2	—	2	রাশিয়া	1	1	2
সুইডেন	2	4	2	বেলজিয়াম	—	—	2
সুইজারল্যাণ্ড	2	3	4	কানাডা	—	—	2
অস্ট্রিয়া	2	1	3	ব্রেজিল	—	—	1
জাপান	1	—	—	চেকোস্লো-ভাকিয়া	—	1	2
অস্ট্রেলিয়া	—	—	1				
ভারতবর্ষ	1	—	—	পর্তুগাল	—	—	1

ব্যবহৃত পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা অনেক সময় প্রকৃত অর্থ-বোধক হয় না; কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দ গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, বা নিরর্থক মনে হয়। এজন্যে এ পুস্তকের অনেক স্থানেই ইংরেজী শব্দ বিশেষ তাৎপর্য্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাবে, ক্রমে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অসুবিধা দূর করবে বলে আমাদের ধারণা।

যে সব বাংলা পরিভাষা বহু প্রচলিত ও সহজবোধ্য বলে এ পুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যে সেগুলোর একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা মূল ইংরেজী শব্দ সহ নিম্নে দেওয়া হলো :

অক্ষ—axis
অক্ষদণ্ড—axle
অক্ষরেখা—latitude line
অক্ষিপট—retina
অগ্ন্যাশয়—pancreas
অঙ্গার—carbon
অজৈব—inorganic
অণু—molecule
অণুবীক্ষণ—microscope
অতি-বেগুনী—ultra-violet
অতিভুজ—hypotenuse
অধঃক্ষেপ—precipitate
অধিবৃত্ত—parabola
অনচ্ছ—opeque
অনন্ত—infinity
অন্ত্র—bowel, intestine
অন্তস্থ—internal (angle)
অনার্দ্র—anhydrous
অনুঘটক—catalyst
অনুঘটন—catalysis
অনুপাত—ratio
অনুপ্রভা—phosphorescence
অনুভূমিক—horizontal
অপেক্ষক—function
অপেরণ—aberration
অবতল—concave
অবলোহিত—infra-red
অবীজপত্রী—acotyledon
অভ্র—mica
অভিকর্ষ—gravity
অভিলম্ব—normal
অভিব্যক্তি—evolution
অয়নান্ত—solistice
অযুগ্ম—odd
আকর—mine
আকরিক—mineral
আকর্ষ—tendril
আকর্ষণ—attraction

আঙ্গিক—qualitative
আগ্নেয়—igneous
আণবিক—molecular
আর্দ্রতা—humidity
আত্তীকরণ—assimilation
আনুপাতিক—proportional
আপতিত রশ্মি—incident ray
আপতন কোণ—angle of incidence
আপাত—apparent
আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity
আপেক্ষিকতা বাদ—theory of relativity
আধান—charge
আবেশ—induction
আয়তন—area, volume
আয়তক্ষেত্র—rectangle
আয়নায়িত—ionised
আলকাত্‌রা—coal-tar
আলেয়া—ignis-fatuus
আসক্তি—affinity
আহিত—charged (electrically)
আহ্নিক—diurnal
ইক্ষু শর্করা—cane sugar
ইন্ধন—fuel
ঈষদচ্ছ—translucent
ঋজুরেখ—rectilinear
ঋণ তড়িৎ—negative electricity
উৎপাদক—factor
উত্তল—convex
উদ্‌বায়ী—volatile
উদ্ভিদ কুল—flora
উদর—abdomen
উদরপদ—gastropod
উদস্থিতি বিদ্যা—hydrostatics
উদাসীন—neutral
উপগ্রহ—satellite
উপক্ষার—alkaloid
উপজাত—by-product
উপচ্ছায়া—penumbra
উপবৃত্ত—ellipse
উপাদান—constituent
উভচর—amphibious
উল্কা—meteor
উল্কাপিণ্ড—meteorite
উষ্ণতা—temperature
একক—unit
এককেন্দ্রীয়—concentric
একতলীয়—coplanar
একবীজপত্রী—monocotyledon
একলিঙ্গ—unisexual
একান্তর—alternate (angle)
কক্ষ—orbit
কণিকা—particle
কর্কটক্রান্তি—summer solistice
কর্কটক্রান্তি বৃত্ত—tropic of cancer
করোটি—skull
কঠিন—solid
কষায়—astringent
কর্পূর—camphor
কলিচুন—quicklime
কাচীয়—vitreous
কিমিয়া—alchemy

কীটাণু—animalcule
কু-মেরু—south pole
কুণ্ডলী—coil
কৃষ্ণসীস—graphite
কেন্দ্র—centre
কেন্দ্রাতিগ—centrifugal
কেন্দ্রীন—nucleus
কেন্দ্রাভিগ—centripetal
কৈশিক—capillary
কোরক—bud
ক্বাথ—decoction
ক্ষরণ—discharge, secretion
ক্ষার—alkali
ক্ষারীয়, ক্ষারধর্মী—alkaline
ক্ষারকীয়—basic
ক্ষারক—base
ক্ষমতা—power
খরতা—hardness
খর জল—hard water
খল—mortar
খনিজ—mineral
খনিজ লবণ—rock salt
খমির—ferment
খ-গোল—celestial sphere
খড়ি—chalk
গতি বিদ্যা—dynamics
গতি—motion
গতীয়—kinetic, dynamic
গলন—fusion
গলনাংক—melting point
গন্ধক—sulphur
গর্ভকেশর—pistil
গড়—average
গালা—lac
গুণক—multiplier
গুণনীয়ক—factor
গোমেদ—zircon
গ্রহ—planet
গ্রহাণুপুঞ্জ—asteriods
গ্রহণ—eclipse
গ্যাসীয়—gaseous
ঘন—cube, cubic, solid
ঘনমূল—cube root
ঘনাংক—density
ঘনীভূত—condenced
ঘর্ষ-তড়িৎ—frictional electricity
ঘাত—index, power
চান্দ্র—lunar
চাপ (বৃত্ত)—arc
চাপ—pressure
চাপমান যন্ত্র—barometer
চাপিত—compressed
চুম্বক—magnet
চৌম্বক, চুম্বকীয়—magnetic
চুল্লী—furnace
চুন—lime
চুনাপাথর—lime stone
চিহ্ন—symbol, sign
ছত্রাক—fungus
ছেদ—intersection, section
ছেদক—secant
ছায়া—shadow
ছায়াপথ—galaxy
জলীয়—aqueous

জ্বলন—ignition
জ্বলনাংক—ignition point
জোয়ার—flow tide
জনন কোষ—germ-cell
জলচর, জলজ—aquatic
জড়—matter
জাড্য—innertia
জীববিৎ—biologist
জীব—organism, animal
জীবাণু—bacteria, microbe
জীবাশ্ম—fossil
জৈব—organic
জ্যা—chord
ঝালাই—soldering
টান—tension, strain
তল—surface, face
তরল—liquid
তরলীভবন—liquifaction
তরঙ্গ—wave
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—wave-length
তাপ—heat
তাপমাত্রা—temperature
তাপীয়—thermal
তড়িৎ—electricity
তড়িৎ-দ্বার—electrode
তড়িৎবিশ্লেষণ—electrolysis
তড়িৎ চক্র—electric circuit
তন্ত্র—system
তুলা যন্ত্র—balance
তুল্যাংক—equivalent
তেজস্ক্রিয়—radio-active
তেজস্ক্রিয়তা—radio-activity
তৌলিক—gravimetric
তুঁতে, তুঁতিয়া—blue vitriol, (copper sulphate)
তরুণাস্থি—cartilage
দণ্ড—rod
দল—petal
দহন—combustion
দাহ্য—combustible
দ্রব, দ্রবণ—solution
দ্রবিত—dissolved
দ্রাবক—solvent
দ্রাব্য—solute
দ্রবণীয়—soluble
দস্তা—zinc
দ্রাঘিমা—longitude
দূরবীক্ষণ—telescope
দোলক—pendulum
দোলন—oscillation
ধন-তড়িৎ—positive electricity
ধমনী—artery
ধাতু—metal
ধাতুকল্প—metalloid
ধাতুমল—slag
ধাতুবিদ্যা—metallurgy
ধাতু-সংকর—alloy
ধারকত্ব—capacity
ধ্রুবতারা—pole star
ধ্রুবক রাশি—constant quantity
নিরক্ষ রেখা—equator
নিরুদক—anhydride
নিরুদন—dehydration
নিয়ম—law

নিশাদল—sal-ammoniac
নমনীয়—plastic
নীলকান্ত, নীলা—sapphire
নীহারিকা—nebula
নিষ্কাশন—extraction
নিষ্ক্রিয়—inert, inactive
পদ্মরাগ—ruby
পরম—absolute
পরজীবী—parasite
পরমাণু—atom
পর্যায়ক্রমিক—periodic
পরিসীমা—perimeter
পরিবর্তী—alternating (current)
পরিবাহী—conductor
পরিবহন—conduction
পরিচলন—convection
পারদ—mercury
পারদ সংকর—amalgam
পারমাণবিক—atomic
পাতন—distillation
পান দেওয়া—tempering
প্লবতা—buoyancy
প্রতিক্রিয়া—reaction
প্রতিফলন—reflection
প্রতিবিম্ব—image
প্রতিবিষ—antitoxin
প্রতিসরণ—refraction
প্রতিজ্ঞা—proposition
প্রজননবিদ্যা—genetics
প্রবাহ—current
প্রাণিকুল—fauna
পিত্ত—bile
পিত্তাশয়—gall-bladder
পাকস্থলী—stomach
প্রচ্ছায়া—umbra
প্রশমন—neutralisation
ফট্‌কিরি—alum
ফল-শর্করা—fruit sugar
ফলক—blade
ফলিত বিজ্ঞান—applied science
বক যন্ত্র—retort
বলবিদ্যা—mechanics
বল—force
ব্যস্ত অনুপাত—inverse ratio
বর্গ, বর্গফল—square
বর্ণালি—spectrum
বৃত্ত—circle
বায়ুমণ্ডল—atmosphere
বাধা (তড়িৎ)—resistance
বেগ—velocity
বিকিরণ—radiation
বিচ্ছুরণ—scattering
বিকর্ষণ—repulsion
বিদ্যুৎ, তড়িৎ—electricity
বিবর্তন—deviation
বিবর্ধন—magnification
বিভব—potential (electric)
বিস্ফোরণ—explosion
বিশ্লেষণ—analysis
বিদাহী—caustic
ব্যবহারিক—applied
বেতার—wireless
বেলে পাথর—sand stone
বিষুব রেখা (বৃত্ত)—equator

বীজ, বীজাণু—germ
বীজঘ্ন—germicide
বীজবারক—antiseptic
বাতান্বিত—ærated
ভর—mass
ভরবেগ—momentum
ভার—weight
ভার কেন্দ্র—centre of gravity
ভূমি—base
ভস্ম—calx
ভস্মীকরণ—calcination
ভাস্বর—incandescent
ভূষা—lamp black
মৌলিক পদার্থ, মৌল—element
মিনা—enamel
মিনা করা—enamelling
মুদ্রা শঙ্খ—litharge
মরিচা—rust (iron-oxide)
মিশ্র, মিশ্রণ—mixture
মকরক্রান্তি—winter solistice
মঙ্গল গ্রহ—mars
মজ্জা—pith, marrow
মধ্য রেখা—meridian
মধ্যচ্ছদা—diaphragm
মমছাল, মনঃশিলা—realgar
মরীচিকা—mirage
মহাকর্ষ—gravitation
মাক্ষিক—pyrite
মান, মূল্য—value
মানচিত্র—map
মানমন্দির—observatory
মাত্রিক—quantitative
মাধ্যম—medium
মেরু—pole
মৃদু জল—soft water
মৃদু অ্যাসিড—diluted acid
রঞ্জক—dye
রঞ্জন—dying
রজন—resin
রশ্মি—ray
রক্তরস—plasma
রক্তকোষ—blood cell
রঙ্গ, রাং—tin
রসায়ন—chemistry
রসাঞ্জন—antimony sulphide
রসকর্পূর—corrosive sublimate
রাশি—quantity
রাসায়নিক—chemical, chemist
লঘু—dilute, light
লঘুকরণ—reduction, dilution
লম্ব—perpendicular
লসিকা—lymph
লাক্ষা, গালা—lac
লীন—latent
লৈখিক—graphical
শত করা—per cent
শক্তি—energy
শূন্য—vaccum, zero
শিশিরাংক—dew point
শোষণ—absorption
শীর্ষ—vertex
শর্করা—sugar
শিরা—vein
শ্বেতসার—starch

শনি গ্রহ—saturn
শুক্র গ্রহ—venus
শ্রেণী—series, class
শারীরবৃত্ত—physiology
শ্বাসতন্ত্র—respiratory system
সঞ্চারপথ—locus
সক্রিয়—active
সংপৃক্ত—saturated
সংপৃক্তি—saturation
সংশ্লেষণ—synthesis
সমবায়—combination
সমীকরণ—equation
সমানুপাত—proportion
সমাধান—solution
সফেদা—white lead
সীস সিন্দুর—minium
সীসা, সীসক—lead
সূচক—index, indicator
সূত্র—formula, law
সুগ্রাহী, সুবেদী—sensitive
সংকেত—formula
সংকর ধাতু—alloy
সীসাঞ্জন—galena
সীসশ্বেত—white lead
সেঁকো—white arsenic
সুষুম্না কাণ্ড—spinal chord
সোহাগা—borax
সোরা—saltpetre
সৌর কলঙ্ক—sun-spot
স্থিতিস্থাপক—elastic
স্নেহ পদার্থ—fat
স্থিতিবিদ্যা—statics
স্থৈতিক—potential (energy)
স্পন্দন—vibration
স্পন্দিত—vibrated
স্ফুটনাংক—boiling point
স্ফটিক—crystal
স্ফটিকীকরণ—crystallisation
স্ফটিকাকার—crystaline
হরিতাল—orpiment
হিঙ্গুল—cinnabar
হিমায়ী মিশ্রণ—freezing mixture
হিমায়ক যন্ত্র—refrigerator
হিমাংক—melting point
হিরাকস—green vitriol
হীরক—diamond

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত পরিভাষা অবলম্বনে)

Physics—পদার্থবিদ্যা

Absolute—পরম
Absorbent—শোষক
Absorption—শোষণ
Aberration—অপেরণ
Adjustment—উপযোজন
Achromatic—অবার্ণ
Adhesion—আসঞ্জন
Alternating current—পরিবর্তী প্রবাহ
Amplitude—বিস্তার
Apperatus—যন্ত্র
Astigmatism—বিষম দৃষ্টি
Asymmetric—প্রতিসম
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল
Balance—তুলা যন্ত্র
Barometer—চাপমান যন্ত্র
Beat—অধিকম্প
Bob—দোলক পিণ্ড
Boiling—স্ফুটন
,, point—স্ফুটনাংক
Buoyancy—প্লবতা
Calibration—ক্রমাঙ্কন
Capacity—ধারকত্ব
Capillary—কৌশিক
Charge—আধান
Charged—আহিত
Chord (music)—স্বর-সংগতি
Coefficient—গুণাঙ্ক
Cohesion—সংসক্তি
Coil—কুণ্ডলী
Colour—বর্ণ
Complementary—পরিপূরক
Compass—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র
Compensated pendulum—প্রতিবিহিত দোলক
Compression—সংনমন
Concave—অবতল
Concentration (of rays)—সমাহরণ
Concentrated—সমাহৃত
Condensation—ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Conduction—পরিবহণ
Conductivity—পরিবাহিতা
Conductor—পরিবাহী
Conservation of energy—শক্তির নিত্যতা
Constant—ধ্রুবক
Constant quantity—ধ্রুবরাশি
Contraction—সংকোচন
Convection—পরিচলন
Convergent—অভিসারী
Convex—উত্তল

Crystal—স্ফটিক
Crystalline—স্ফটিকাকার
Crystallisation—স্ফটিকীকরণ
Current—প্রবাহ
Diffused light—বিক্ষিপ্ত রশ্মি
Diflection—বিক্ষেপ
Density—ঘনত্ব, ঘনাংক
Dew point—শিশিরাংক
Diamagnetism—তিরশ্চুম্বকতা
Dip—বিনতি
Direct current—সমপ্রবাহ
Discharge—ক্ষরণ, মোক্ষণ
Dispersion (of light)—বিচ্ছুরণ
Divergent—অপসারী
Divisibility—বিভাজ্যতা
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
Elastic—স্থিতিস্থাপক
Electricity—তড়িৎ, বিদ্যুৎ
Electrode—তড়িদ্দ্বার
Electrolysis—তড়িদ্বিশ্লেষণ
Electromagnet—তড়িচ্চুম্বক
Energy, kinetic—গতিশক্তি
Energy, potential—স্থিতিশক্তি
Electromotive—তড়িচ্চালক
Evaporation—বাষ্পীভবন, বাষ্পীকরণ
Expansion—সম্প্রসারণ
Fluid—তরল, বায়ব
Fluorescence—প্রতিপ্রভা
Fluorescent—প্রতিপ্রভ
Formula—সংকেত
Freezing point—হিমাংক
Friction—ঘর্ষণ
Frictional electricity—ঘর্ষতড়িৎ
Gravitation—মহাকর্ষ
Green—হরিৎ
Heat—তাপ, তাপশক্তি
Horizontal—অনুভূমিক
Humidity—আর্দ্রতা
Hydraulic—ঔদক
Hydrostatics—উদস্থিতি বিদ্যা
Image—প্রতিবিম্ব
Image, real—সদ্বিম্ব
Image, virtual—অসদ্বিম্ব
Impenetrability—অভেদ্যতা
Incidence—আপতন
Incident Ray—আপতিত রশ্মি
Induction—আবেশ
Inertia—জাড্য, নিষ্ক্রিয়তা
Infra-red—অবলোহিত
Insulation—অন্তরণ
Insulated—অন্তরিত
Insulator—অন্তরক
Ionised—আয়নিত
Latent—লীন
Law—নিয়ম, সূত্র
Liquifaction—গলন, তরলীভবন
Lodestone—চুম্বক পাথর
Magnet—চুম্বক
Magnetic—চুম্বকীয়, চৌম্বক
Magnetism—চৌম্বকত্ব
Magnetisation—চুম্বকন
Magnification—বিবর্ধন

Matter—পদার্থ
Medium—মাধ্যম
Melting point—গলনাংক
Microscope—অণুবীক্ষণ
Mirage—মরীচিকা
Mirror—দর্পণ
Negative electricity—ঋণ-তড়িৎ
Neutral—উদাসীন
Non-conductor—অপরিবাহী
Normal—অভিলম্ব
Opeque—অনচ্ছ
Orange (colour)—নারঙ্গ
Oscillation—দোলন
Parallax—লম্বন
Pendulum—দোলক
Penumbra—উপচ্ছায়া
Period—পর্যায়, কাল
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Permeable—প্রবেশ্য
Phase—দশা
Phosphorescence—অনুপ্রভা
Phosphorescent—অনুপ্রভ
Piston—ডাঁটি, দণ্ড
Polarization (light)—সমবর্তন
Pole—মেরু
Porous—বহুরন্ধ্র, সরন্ধ্র
Porosity—সরন্ধ্রতা, সচ্ছিদ্রতা
Positive electricity—ধনতড়িৎ
Potential (electric)—বিভব
Pressure—চাপ
Pump—পাম্প
Radiation—বিকীরণ
Rarefication—তনুকরণ
Ray—রশ্মি
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Reflection—প্রতিফলন
Reflected—প্রতিফলিত
Refraction—প্রতিসরণ
Refracted—প্রতিসরিত
Refraction (angle of)—প্রতিসরণ কোণ
Refracting index—প্রতিসরণাংক
Refrigeration—হিমায়ন
Relative—আপেক্ষিক
Relativity—আপেক্ষিকতা
„ (theory of)—আপেক্ষিকতা বাদ
Repulsion—বিকর্ষণ
Resistance—রোধ
Resonance—অনুনাদ
Response—সাড়া
Saturation—সংপৃক্তি
Sensitive (balance)—সুবেদী
„ (photo plate)—সুগ্রাহী
Shade, Shadow—ছায়া
Solid—কঠিন, ঘনবস্তু
Solidification—ঘনীভবন,ঘনীকরণ
Source—উৎস, প্রভব
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
Spectrum—বর্ণালি
Standard—প্রমাণ
Strain—টান
Stress—পীড়ন

Suction—চোষণ
Symmetry—প্রতিসাম্য
Symmetrical—প্রতিসম
Synchronism—সমলয়
Telescope—দূরবীক্ষণ, দূরবীন
Television—দূরেক্ষণ
Temperature—উষ্ণতা
Tension—টান
Thermal—তাপীয়
Thermometer—উষ্ণতামান যন্ত্র
Translucent—ঈষদচ্ছ
Transparent—স্বচ্ছ
Ultraviolet—অতি-বেগুনী
Umbra—প্রচ্ছায়া
Unit—একক, মাত্রা
Vacuum—শূন্য
Vapour—বাষ্প
Vibration—কম্পন, স্পন্দন
Violet—বেগুনী
Viscosity—সান্দ্রতা
Viscous—সান্দ্র
Vortex—আবর্ত
Wave—তরঙ্গ
Wave-length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য
X'ray—এক্স-রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি
Yellow—পীত

Mechanics—বলবিদ্যা

Acceleration—ত্বরণ
Attraction—আকর্ষণ
Axle—অক্ষদণ্ড
Capacity—সামর্থ্য, ধারকত্ব
Centre of gravity—ভারকেন্দ্র
Centrifugal—কেন্দ্রাতিগ, অপকেন্দ্র
Centripetal—কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্দ্র
Conservation—নিত্যতা
Density—ঘনাংক
Dynamic—গতীয়
Dynamics (Kinetics)—গতিবিদ্যা
Elastic—স্থিতিস্থাপক
Energy—শক্তি
Equilibrium—সাম্য, স্থিতি
Force—বল
Friction—ঘর্ষণ
Fulcrum—আলম্ব
Gravitation—মহাকর্ষ
Gravity—অভিকর্ষ
Horizontal—অনুভূমিক
Impact—সংঘাত
Impulse, blow—ঘাত
Inclined—নত
Inertia—জাড্য
Kinematics—স্থিতিবিদ্যা
Kinetic—গতীয়, চল-
Kinetics (Dynamics)—গতিবিদ্যা
Mass—ভর
Matter—জড়
Moment—ভ্রামক

Momentum—ভরবেগ
Motion—গতি
Neutral—উদাসীন
Parallelogram of forces—বলসামন্তরিক
Pendulum—দোলক
Period—দোলনকাল, পর্যায়কাল
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Pitch, step (of screw)—থাক
Plane—সমতল
Plumb line—লম্বসূত্র, ওলন-দড়ি
Position—অবস্থিতি
Potential (energy)—স্থৈতিক
Power—ক্ষমতা
Pressure—চাপ
Pull—টান
Pulley—কপিকল
Push—ঠেলা
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Repulsion—বিকর্ষণ
Resistance—বাধা
Rest—স্থিতি
Resultant—ফল, লব্ধি
Retardation—মন্দন
Revolution—পরিক্রমণ
Speed—দ্রুতি
Stable—সুস্থিত, সুপ্রতিষ্ঠ
Static—স্থিতীয়
Statics—স্থিতিবিদ্যা
Tension—টান
Thrust—ঘাত
Unstable—অপ্রতিষ্ঠ, দুস্থিত
Velocity—বেগ
Vertical—উল্লম্ব, খাড়া
Weight—ভার, ওজন
Work—কার্য

রসায়ন বিদ্যা—Chemistry

Absolute alcohol—নির্জল [অ্যালকোহল
Active—সক্রিয়
Acid—অ্যাসিড
Acidimetry—অ্যাসিডমিতি
Affinity—আসক্তি
Alchemy—কিমিয়া
Alkali—ক্ষার
Alkalimetry—ক্ষারমিতি
Alkaline—ক্ষারীয়
Alkaloid—উপক্ষার
Alloy—সংকর ধাতু
Alum—ফট্‌কিরি
Amalgam—পারদ সংকর
Amorphous—অনিবন্ধী
Analysis—বিশ্লেষণ
„ gravimetric—তৌলিক
„ qualitative—আত্বিক
„ quantitative—মাত্রিক
„ volumetric—আয়তন
Anhydride—নিরুদক
Anhydrous—অনার্দ্র
Annealing—কোমলায়ন

Aqueous—জলীয়
Astringent—কষায়
Atom—পরমাণু
Atomic—পারমাণবিক
Balance—তুলা
Base—ক্ষারক
Basic—ক্ষারকীয়
Basic salt—ক্ষার লবণ
Bell metal—কাঁসা, কাংস্য
Bellows—হাপর, ভস্ত্রা
Bi-valent—দ্বিযোজী
Bleaching—বিরঞ্জন
Binary compound—দ্বিমৌল যৌগিক
Blow pipe—বাঁক-নল
Blue vitriol—তুঁতিয়া, তুথ
Bone black—অস্থি-অঙ্গার
Boiling—স্ফুটন, ফোটা
Boiling point—স্ফুটনাংক
Borax—সোহাগা
Bubble—বুদ্বুদ
Burner—দীপ
By-product—উপজাত
Calcination—ভস্মীকরণ
Calx—ভস্ম
Camphor—কর্পূর
Cane sugar—ইক্ষু শর্করা
Capillary—কৈশিক
Carbon—অঙ্গারক
Cast iron—ঢালাই লোহা
Catalyst—অনুঘটক
Catalysis—অনুঘটন
Caustic—বিদাহী
Caustic alkali—তীক্ষ্ণ ক্ষার
Charcoal—কাঠকয়লা
Chemical—রাসায়নিক
Chemical action—রাসায়নিক ক্রিয়া
Chemical affinity—রাসায়নিক আসক্তি
" activity— " সক্রিয়তা
" composition—" গঠন
" formula— " সংকেত
" law— " সূত্র
" method— " পদ্ধতি
" theory— " বাদ
Chemistry—রসায়ন
" analytical—বৈশ্লেষিক রসায়ন
" applied—ফলিত "
" physical—ভৌত "
" practical—ব্যবহারিক "
" theoretical—তত্ত্বীয় "
Cinnabar—হিঙ্গুল
Coal-tar—আলকাতরা
Combustion—দহন
Combustible—দাহ্য
Compound—যৌগিক পদার্থ
Composition—গঠন
Condenser—শীতক
Copper pyrites—তাম্র মাক্ষিক
" sulphate—তুঁতে, তুঁতিয়া
Corrosive—ক্ষায়ী, প্রদাহী
" sublimate—রস-কর্পূর
Crystal—স্ফটিক

Crystalline—স্ফটিকাকার
Decomposition—বিয়োজন
Decomposed—বিয়োজিত
Decoction—ক্বাথ, ক্বথন
Dehydrated—নিরুদিত
Dehydration—নিরুদন
Destructive distillation—অন্তর্ধূম পাতন
Decantation—আস্রাবন
Density—ঘনত্ব, ঘনাংক
Dilution—লঘুকরণ
Distil—পাতিত করা
Distillation—পাতন
Distilled—পাতিত
Disinfectant—বীজঘ্ন
Dissolve—দ্রবীভূত করা
Ductility—প্রসার্যতা
Dye—রঞ্জক
Dying—রঞ্জন
Ebullition—স্ফুটন
Effervescence—বুদ্‌বুদন
Efflorescent—উদ্‌ত্যাগী
Element—মৌলিক পদার্থ, মৌল
Electrode—তড়িৎ-দ্বার
Enamel—মিনা
Evaporation—বাষ্পীভবন
Extraction—নিষ্কাশন
Essential oil—উদ্বায়ী তৈল
Explosion—বিস্ফোরণ
Explosive—বিস্ফোরক
Fat—চর্বি, স্নেহপদার্থ
Ferment—খমির, কিণ্ব
Fermentation—সন্ধান
Fermented—সন্ধিত
Fertilizer—সার
Filtration—পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি
Filtered—পরিস্রুত
Fire-proof—অগ্নিসহ
Fixed alkali—স্থির ক্ষার
Flower of sulphur—গন্ধক-রজ
Fluorescence—প্রতিপ্রভা
Flame—শিখা
Formation—সংগঠন
Formula—সংকেত
Fruit sugar—ফল-শর্করা
Furnace—চুল্লী
Freezing point—হিমাংক
Fusion—গলন
Fume—ধূম
Fuming acid—ধূমায়মান অ্যাসি
Gaseous—গ্যাসীয়
Galena—সীসাঞ্জন
Grape sugar—দ্রাক্ষা-শর্করা
Glass—কাচ
„ rod—কাচ দণ্ড
„ tube—কাচ নল
Green vitriol—হিরাকস
Gravimetric analysis—তৌলিক বিশ্লেষ
Grind—পেষণ করা
Ground glass—ঘষা কাচ
Gun powder—বারুদ
Hard water—খর জল
Hardness—খরতা, কঠোরতা

Heat—তাপ
Heavy metal—গুরু ধাতু
Hydrochloric acid—লবণাম্ল
Hydrolysis—আর্দ্র-বিশ্লেষণ
Hygroscopic—জলাকর্ষী
Hypothesis—প্রকল্প
Ignition—জ্বলন
„ point—জ্বলনাংক
Inorganic—অজৈব
Inactivity—নিষ্ক্রিয়তা
Incandescence—ভাস্বরতা
Incombustible—অদাহ্যতা
Indicator—সূচক
Indigo—নীল
Ingredient—উপাদান
Inert, inactive—নিষ্ক্রিয়
Inflamble—দাহ্য
Insoluble—অদ্রাব্য
Iron—লোহা
" , ore—লৌহ আকরিক
" , soft—কাঁচা লোহা
" , wrought—পেটা লোহা
" , cast—ঢালাই লোহা
Isomorphous—সমাকৃতি
Kiln—ভাঁটি
Lac—লাক্ষা, গালা
Lactose—দুগ্ধ-শর্করা
Lamp black—ভূষা কালি
Law—নিয়ম, সূত্র
Limestone—চূনাপাথর
Liquid—তরল
Lead—সীসা, সীসক
Lead, black—কৃষ্ণ সীস
" , red—মেটে সিন্দুর
" , white—সফেদা
Litharge—মুদ্রাশঙ্খ
Lixiviation—দ্রাবণ
Malt—সীরা
Mercury—পারা, পারদ
Melting point—গলনাংক
Metal—ধাতু
„ , noble—বর-ধাতু
„ , base—অবর-ধাতু
Metallurgy—ধাতুবিদ্যা
Metalloid—ধাতুকল্প
Mineral—খনিজ মণিক
Mineralogy—মণিকবিদ্যা
Minium—মেটেসিন্দুর, সীসসিন্দুর
Mixture—মিশ্রণ
Moist—আর্দ্র
Molecule—অণু
Molecular—আণবিক
" formula—আণবিক সংকেত
Monobasic—একক্ষারীয়
Monvalent—একযোজী
Mortar—খল
Multivalent—বহুযোজী
Nascent—জায়মান
Natural water—প্রাকৃত জল
Neutralization—প্রশমন
Neutral—প্রশমিত
Nitre—সোরা
Non-metal—অধাতু
Non-volatile—অনুদ্বায়ী

Normal density—প্রমাণ ঘনত্ব
Occlusion—অন্তর্ধৃতি
Octahedron—অষ্টতলক
Opeque—অনচ্ছ
Organic—জৈব, অঙ্গারক
Orpiment—হরিতাল
Paraffin—খনিজ মোম
Passive iron—নিষ্ক্রিয় লৌহ
Perfect gas—আদর্শ গ্যাস
Periodic law—পর্যায় সূত্র
Phosphorescence—অনুপ্রভা
Physical change--ভৌত পরিবর্তন
Pigment—রঞ্জক-চূর্ণ
Plastic—নমনীয়
Precipitation—অধঃক্ষেপন
Pressure—চাপ
Poisonous—সবিষ
Polyvalent—বহুযোজী
Putrefaction—পচন
Purified—শোধিত
Pyrite—মাক্ষিক
Quadrivalent—চতুর্যোজী
Quick lime—কলি চুন
Quick silver—পারদ
Radio-active—তেজস্ক্রিয়
Rare earth—বিরল মৃত্তিকা
Reaction—বিক্রিয়া
Reactive—সক্রিয়
Reagent—বিকারক
Realgar—মোমছাল, মনঃশিলা
Reducing agent—বিজারক দ্রব্য
Reduction—বিজারণ
Resin—রজন
Retort—বকযন্ত্র
Rock salt—খনিজ লবণ
Ruby glass—লোহিত কাচ
Ruby—পদ্মরাগ, চুনি
Rust—মরিচা
Sal-ammoniac—নিশাদল
Salt—লবণ
" , common—খাদ্য লবণ
" , compound—যৌগ লবণ
Saltpetre—সোরা
Sapphire—নীলকান্ত
Saturation—সংপৃক্তি
Saturated—সংপৃক্ত
Sediment—গাদ, কল্ক
Slag—ধাতুমল
Smelting—বিগলন
Soft water—মৃদু জল
Solder—ঝাল
Soluble—দ্রবণীয়, দ্রব্য
Solubility—দ্রাব্যতা, দ্রবণীয়তা
Solution—দ্রব, দ্রবণ
Solute—দ্রবিত পদার্থ
Stable—স্থায়ী
Starch—শ্বেতসার
Standard solution—প্রমাণ দ্রব
Sublimation—ঊর্ধ্বপাতন
Sugar—শর্করা, চিনি
Sulpher—গন্ধক
Supersaturated—অতিপৃক্ত
Synthesis—সংশ্লেষণ
Synthetic—সাংশ্লেষিক

Symbol—চিহ্ন
Temperature—উষ্ণতা
Tempering—পান দেওয়া
Test tube—পরীক্ষা-নল
Theory—তত্ত্ব, বাদ
Theoretical—তত্ত্বীয়, বাদীয়
Tin—রাং, টিন
Triad, Trivalent—ত্রিযোজী
Trituration—বিচূর্ণন
Tube—নল
Tubular—নলাকার
Turpentine—তার্পিন
Union—সংযোগ
Univalent—একযোজী
Unsaturated—অসংপৃক্ত
Vapour—বাষ্প
Vinegar—সিরকা
Vermillion—সিন্দুর
Viscous—সান্দ্র
Viscosity—সান্দ্রতা
Vitreous—কাচীয়
Volatile—উদ্বায়ী
Vitriol, blue—তুঁতে
" , green—হিরাকস
Volume—আয়তন
Water, hard—খর জল
" , soft—মৃদু জল
Waterproof—জলাভেদ্য
Watertight—জলরোধক
Weak solution—ক্ষীণ দ্রব
White arsenic—সেঁকো
White lead—সফেদা, শ্বেতসীস
White heat—শ্বেততাপ
Wood charcoal—কাঠকয়লা
Zinc—দস্তা
Zircon—গোমেদ

গণিত—Mathematics

পাটীগণিত—Arithmetic
বীজগণিত—Algebra
জ্যামিতি—Geometry
ত্রিকোণমিতি—Trigonometry

Absolute—পরম
Abscissa—ভুজ
Abstract number—শুদ্ধ সংখ্যা
Adjacent angle—সন্নিহিত কোণ
Aliquot part—একাংশ
Acute angle—সূক্ষ্ম কোণ
Addition—যোগ, সংকলন
Altitude—উন্নতি
Alligation—মিশ্রণ
Alternate—একান্তর
Alternendo—একান্তর ক্রিয়া
Approximate value—আসন্ন মান
Alternative proof—বিকল্প প্রমাণ
Ambiguous—দ্ব্যর্থক
Antecedent—পূর্বরাশি
Annuity—বার্ষিক
Arc—চাপ

Area—কালি, ক্ষেত্রফল
Arithmetic series—সমান্তর শ্রেণী
Arm—ভুজ, বাহু
At par—সম-হার
Average—গড়
Axiom—স্বতঃসিদ্ধ
Axis—অক্ষ
Axis of projection—অভিক্ষেপাক্ষ
Base—ভূমি
Below par—উনহার
Binomial—দ্বিপদ
Bartar—বিনিময়
Bisector—দ্বিখণ্ডক
By (÷)—ভাজিত
Breadth—বিস্তার
Bill of exchange—হুণ্ডি
Brokerage—দালালি
Cardinal—অঙ্কবাচক
Capital—মূলধন
Centre—কেন্দ্র
Centre of Gravity—ভরকেন্দ্র
Centroid—ত্রিভুজকেন্দ্র
Chord—জ্যা
Circle—বৃত্ত
Circular measure—বৃত্তীয় মান
Circumcentre—পরিকেন্দ্র
Circumference—পরিধি
Circumscribed—পরিলিখিত
Co-axial—সমাক্ষ
Coefficient—গুণক, সহগ
Combination—সমবায়
Coincidence—সমাপতণ
Collinear—একরেখীয়
Commercial discount—ব্যাজ
Complex—জটিল
Commission—দস্তুরি
Compound—মিশ্র, যৌগিক
" , interest—চক্রবৃদ্ধি
Complementary angle—পূরক কোণ
Componendo—যোগক্রিয়া
Concrete number—বদ্ধ সংখ্যা
Constant—ধ্রুবক
Concentric—এককেন্দ্রীয়
Concurrent—সমবিন্দু
Co-ordinates—স্থানাংক
Cone—শঙ্কু
Conjugate—অনুবন্ধী
Convergent—অভিসারী
Converse—বিপরীত
Coplanar—একতলীয়
Corollary—অনুসিদ্ধান্ত
Cosecant—কোসিক্যান্ট
Cross section—প্রস্থচ্ছেদ
Creditor—উত্তমর্ণ
Cube—ঘন, ঘনফল
Cube root—ঘন মূল
Cubic—ঘন, ত্রিঘাত
Cyclic—বৃত্তস্থ বৃত্তীয়
Debtor—অধমর্ণ
Decimal—দশমিক
Deduction—সিদ্ধান্ত
Denominator—হর

Diagonal—কর্ণ
Diameter—ব্যাস
Difference—অন্তর
Differential Calculus—অন্তরকলন
Digit—অঙ্ক
Dimension—মাত্রা
Directrix—নিয়ামক
Divergent—অপসারী
Dividend—ভাজ্য, লভ্যাংশ
Dividendo—ভাগক্রিয়া
Division—ভাগ, হরণ
Divisor—ভাজক
Duo-decimal—দ্বাদশিক
Duty—শুল্ক
Eccentricity—উৎকেন্দ্রতা
Ellipse—উপবৃত্ত
Elimination—অপনয়ন
Enunciation—নির্বচন
Equation—সমীকরণ
Equated time—সমীকৃত কাল
Equivalent—তুল্য সমমূল্য
Equiangular—সদৃশকোণী
Equidistant—সমদূরবর্তী
Equilateral—সমবাহু
Equivalent—তুল্য
Error—ভুল
Even—যুগ্ম, জোড
Evolution—অবঘাতন
Escribed—বহির্লিখিত
Excentre—বহিঃকেন্দ্র
Exterior angle—বহিঃকোণ
External—বহিস্থ
External Bisector—বহির্দ্বিখণ্ডক
Expansion—বিস্তৃতি
Exponential Theorem-সূচকসূত্র
Expression—রাশি
Face—তল
Factor—উৎপাদক, গুণনীয়ক
Factorial—গৌণিক
Formula—সূত্র
Figure—চিত্র
Fraction—ভগ্নাংশ
Function—অপেক্ষক
Gain—লাভ
Graph—চিত্র, লেখ
Graphical—লৈখিক
Geometric series—গুণোত্তর শ্রেণী
Gradient—নতিমাত্রা
Harmonic Series—সমোত্তর শ্রেণী
Height—উচ্চতা
Hyperbola—পরাবৃত্ত
Hypotenuse—অতিভুজ
Hypothesis—কল্পনা, প্রকল্প
Highest common factor (H. C. F)—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ, সা, গু)
Homogeneous—সমসত্ত্ব
Horizontal—অনুভূম
Included angle—অন্তর্ভূত কোণ
Inscribed—অন্তর্লিখিত
Identity—অভেদ

Imaginary—কল্পিত
Improper fraction—অপ্রকৃত ভগ্নাংশ
Incentre—অন্তঃকেন্দ্র
Incommensurable—অমেয়
Index—সূচক
Infinite, Infinity—অসীম, অনন্ত
Integer—পূর্ণসংখ্যা
Integral calculus—সমাকলন
Into(×)—গুণিত
Internal—অন্তস্থ
Intersection—প্রতিচ্ছেদ, ছেদ
Irregular—বিষম
Isosceles—সমদ্বিবাহু
Inverse ratio—ব্যস্ত অনুপাত
Inversion—বিবর্তন
Involution—উদ্‌ঘাতন
Latus rectum—নাভিলম্ব
Length—দৈর্ঘ্য
Line—রেখা
Linear—রৈখিক
Liability—দেনা
Locus—সঞ্চার-পথ
Longitudinal section—দীর্ঘচ্ছেদ
Lowest common multiple (L. C.M)—লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল, সা, গু)
Magnitude—মান, পরিমাণ
Major axis—পরাক্ষ
Major arc—অধিচাপ
Minor axis—উপাক্ষ
Maximum—চরম, বৃহত্তম, গরিষ্ঠ
Mean—মধ্যক, সমক
Minus—বিযুক্ত
Minute—কলা, মিনিট
Minimum—অল্পতম, লঘিষ্ঠ
Mixed (fraction)—মিশ্র
Multiple—গুণিতক
Multiplicand—গুণ্য, গুণনীয়
Multiplication—গুণন, পূরণ
Multiplier—গুণক
Negative—ঋণাত্মক
Number—সংখ্যা
Numerator—লব
Normal section—লম্বচ্ছেদ
Odd—অযুগ্ম, বিষম
Oblique section—বক্রচ্ছেদ
Obtuse angle—স্থূল কোণ
Octahedron—অষ্টতলক
Opposite angle—বিপরীত কোণ
Order—ক্রম
Ordinate—কোটি
Ordinal—পূরণবাচক
Origin—মূলবিন্দু
Orthocentre—লম্ববিন্দু
Orthogonal—সমকৌণিক
Parabola—অধিবৃত্ত
Parallel—সমান্তরাল
Parallelogram—সামান্তরিক
Pedal triangle—পাদ ত্রিভুজ
Pentagon—পঞ্চভুজ
Perimeter—পরিসীমা
Perpendicular—লম্ব
Per cent—শতকরা

Percentage—শতকরা হার
Permutation—বিন্যাস
Plane—সমতল
Plus—যুক্ত
Point—বিন্দু
Pole—মেরু
Polygon—বহুভুজ
Polyhedron—বহুতলক
Postulate—স্বীকার্য
Positive—ধনাত্মক
Power—ঘাত
Practice—চলিত নিয়ম
Present worth—বর্তমান মূল্য
Prime—মৌলিক
Problem—সম্পাদ্য
Projection—অভিক্ষেপ
Product—গুণফল
Progression—প্রগতি
Promissory note—কোম্পানীর কাগজ
Proportion—অনুপাত
Proportional—আনুপাতিক
Proposition—প্রতিজ্ঞা
Quadratic—দ্বিঘাত
Quantity—রাশি
Quadrilateral—চতুর্ভুজ
Quotient—ভাগফল
Radian—রেডিয়ান
Radius—ব্যাসার্ধ
Rate—হার, দর
Ratio—অনুপাত
Rational—মূলদ
Reciprocal—বিপরীত
Rectangle—আয়ত ক্ষেত্র
Rectilinear—ঋজুরেখ
Recurring—আবৃত্ত
Reduction—লঘুকরণ
Reflex angle—প্রবৃদ্ধ কোণ
Regular—সুষম
Remainder—অবশিষ্ট, বাকী
Rhombus—রম্বস
Root—মূল
Right angle—সমকোণ
Rule of three—ত্রৈরাশিক নিয়ম
Side—বাহু, ভুজ, পক্ষ
Sign—চিহ্ন
Simplification—সরলীকরণ
Scalene—বিষমভুজ
Secant—ছেদক
Second—বিকলা, সেকেণ্ড
Section—ছেদ
Sector—বৃত্তকলা
Segment—বৃত্তাংশ
Semicircle—অর্ধবৃত্ত
Series—শ্রেণী
Share—অংশ
Significant—সার্থক
Size—আয়তন
Simultaneous equation—সহ-সমীকরণ
Solution—সমাধান
Square—বর্গ, বর্গক্ষেত্র
Square root—বর্গমূল

Solid—ঘন, ঘনবস্তু
Space—স্থান, দেশ
Spiral—সর্পিল
Stock—ষ্টক, মজুত মাল
Straight—সরল, ঋজু
,, angle—সরল কোণ
Subtended angle—সম্মুখ কোণ
Subtraction—বিয়োগ, ব্যবকলন
Sum—যোগফল, সমষ্টি
Superposition—উপরিপাত
Surd—করণী
Supplementary angle—সম্পূরক কোণ
Surface—তল, পৃষ্ঠ
Symmetry—প্রতিসাম্য
Symmetry, axis of—প্রতিসাম্য অক্ষ
Tangent—স্পর্শক
Tetrahedron—চতুস্তলক
Term—রাশি, পদ
Theorem—উপপাদ্য
Thickness—বেধ
Transversal—ভেদক
Transverse—তির্যক,
Trapezium—ট্রাপিজিয়াম
Triagle—ত্রিভুজ, ত্রিকোণ
Trigonometrical ratio—কোণানুপাত
Trisection—ত্রিখণ্ডন
True Discount—আসল বাটা
Unit—একক
Uniform—সম
Unitary method—ঐকিক নিয়ম
Value—মূল্য, মান
Variable—চল, পরিবর্তনশীল
Variation—ভেদ
Vertex—শীর্ষ
Vertical angle—শিরঃকোণ
Vertically opposite—বিপ্রতীপ
Volume—ঘনফল, ঘনমান, আয়তন
Vulgar (fraction)—সামান্য
Zero—শূন্য

জ্যোতির্বিদ্যা—Astronomy

Aberration—অপেরণ
Alpheratiz—উত্তর ভাদ্রপদ
Altitude—উন্নতি
Annual motion—বার্ষিক গতি
Antares—জ্যেষ্ঠা
Apparent—আপাত
Aphelion—অপসূর
Apogee—অপভূ
Aquila—আকুইলা
Ascending node—উদ্‌বিন্দু, উচ্চপাত
Aquarius—কুম্ভরাশি
Asteriods—গ্রহাণুপুঞ্জ
Auriga—প্রজাপতি মণ্ডল
Autumnal equinox—জলবিষুব
Axis—অক্ষ

Azimuth—দিগংশ
Bellatrix—কার্তিকেয়
Binary star—যুগ্মতারা
Cancer—কর্কট
Canopus—অগস্ত্য
Celestial equator, equinoctial—খ-বিষুবরেখা, খ-বিষুববৃত্ত
Celestial latitude—ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ
" longitude—ক্রান্ত্যংশ, ভুজাংশ
" sphere—খগোল
Chromosphere—বর্ণমণ্ডল
Collimation—অক্ষীকরণ
Comet—ধূমকেতু
Constellation—নক্ষত্র, তারামণ্ডল
Corona—ছটামণ্ডল
Culmination—মধ্যগমন
Cycle—চক্র
Declination—বিষুবলম্ব
Denebola—উত্তরফাল্গুনী
Descending node—অববিন্দু, নিম্নপাত
Deviation—চ্যুতি
Diurnal—আহ্নিক, দৈনিক
Ebb tide—ভাঁটা
Eclipse—গ্রহণ
" , annular—বলয়গ্রাস
" , partial—খণ্ডগ্রাস
" , total—পূর্ণগ্রাস
Ecliptic—ক্রান্তিবৃত্ত
Equator—নিরক্ষরেখা, ভূ-বিষুববৃত্ত
Equatorial—নিরক্ষীয়
Equinox (time)—বিষুব
Flow tide—জোয়ার
Focus—নাভি
Full moon—পূর্ণিমা
Galaxy—ছায়াপথ
Great bear—সপ্তর্ষি মণ্ডল
Great circle—গুরু বৃত্ত
Geocentric—ভূকেন্দ্রীয়
Gemenii—মিথুনরাশি
Heliocentric—সূর্যকেন্দ্রীয়
Horizon (circle)—দিগন্ত
" (plane)—ক্ষিতিজ
Horizontal—অনুভূম
Inferior planet—অন্তর্গ্রহ
Interstellar space—ভান্তঃপ্রদেশ
Jupiter—বৃহস্পতি
Leap-year—অধিবর্ষ
Libra—তুলারাশি
Local time—স্থানীয় সময়
Lunar—চান্দ্র
Lunation—চান্দ্রমাস
Mars—মঙ্গল
Markab—পূর্বভাদ্রপদ
Mean time—মধ্যকাল
Mercury—বুধ
Meridian—মধ্যরেখা
" plane—মধ্যতল
Meteor—উল্কা
Meteorite—উল্কাপিণ্ড
Milky way—ছায়াপথ
Moon—চন্দ্র

Nadir—কুবিন্দু
Neap-tide—লঘুস্ফীতি, মরা কটাল
Nebula—নীহারিকা
Neptune—নেপচুন
New moon—অমাবস্যা
Node—পাত
Nutation—অক্ষবিচলন
Observatory—মানমন্দির
Orbit—কক্ষ
Orion—কালপুরুষ
Parallax—লম্বন
Penumbra—উপচ্ছায়া
Perigee—অনুভূ
Perihelion—অনুসূর
Phase—কলা
Photosphere—আলোক মণ্ডল
Planet—গ্রহ
Pleiades—কৃত্তিকা
Polar axis—ধ্রুবাক্ষ
" distance—লম্বাংশ
Pole—মেরু
Pole star—ধ্রুবতারা
Pollux—পুনর্বসু
Precession—অয়নচলন
" vertical—পূর্বাপরবৃত্ত
Progression—অগ্রগতি
Regression—পশ্চাদ্‌গতি
Right ascension—বিষুবাংশ
Sagittarus—ধনুরাশি
Satellite—উপগ্রহ
Saturn—শনি
Scorpion—বৃশ্চিকরাশি
Season—ঋতু
Siderial time—নাক্ষত্রকাল
Sirius—লুব্ধক
Solstice—আয়নান্ত
Spica—চিত্রা
Spring-tide—গুরুস্ফীতি, তেজ কটাল
Star—নক্ষত্র, তারকা
Summer Solstice—কর্কট ক্রান্তি
Sun—সূর্য
Sun-spot—সৌর কলঙ্ক
Sun-dial—সূর্যঘড়ি
Superior planet—বহির্গ্রহ
Synodic period—যুতিকাল
Tide—জোয়ার-ভাটা, জলস্ফীতি
Temperate zone—নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডল
Torrid zone—উষ্ণমণ্ডল
Transit circle—মধ্যবৃত্ত
Tropic of cancer—উত্তরায়ন বৃত্ত
Twilight—সন্ধ্যালোক
Umbra—প্রচ্ছায়া
Ursa major—সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa minor—শিশুমার
Vega—অভিজিৎ
Venus—শুক্র
Vernal equinox—মহাবিষুব
Vertical—উলম্ব, উর্ধ্বাধঃ
Vertical circle—লম্ববৃত্ত
Virgo—কন্যারাশি
Winter solstice—মকরক্রান্তি
Zenith—খ-মধ্য, খবিন্দু
Zenith distance—নতাংশ

শারীরবৃত্ত—Physiology, স্বাস্থ্যবিদ্যা—Hygiene

Abdomen—উদর
Adam's apple—কণ্ঠমণি
Adenoids—গলরস-গ্রন্থি
Alimentary canal—পৌষ্টিক নালী
Anæmia—রক্তাল্পতা
Anatomy—শারীরস্থান
Antiseptic—বীজবারক
Antitoxin—প্রতিবিষ
Anus—পায়ু
Auorta—মহাধমনী
Appetite—ক্ষুধা
" , loss of—ক্ষুধামান্দ্য
Artery—ধমনী
Artificial—কৃত্রিম
" feeding—কৃত্রিম খাদন
" respiration—কৃত্রিম শ্বসন
Aseptic—নির্বীজ
Assimilation—আত্তীকরণ
Auricle—অলিন্দ
Balanced diet—সুষম খাদ্য
Bile—পিত্ত
Bladder—বস্তি
Blood—রক্ত
Blood pressure—রক্তপ্রেষ
" vessel—রক্তবাহ
Bone—অস্থি, হাড়
Bowel—অন্ত্র
Breast bone—উরঃফলক
Brain—মস্তিষ্ক
Breathing—শ্বসন, শ্বাসকার্য
Bronchus—ক্লোমশাখা
Capillaries—জালক
Cardiac end—আগম দ্বার
Carpal " —করকূর্চাস্থি
Cartilage—তরুণাস্থি
Cerebellum—লঘুমস্তিষ্ক
Cerebrum—গুরুমস্তিষ্ক
Chest—বক্ষ
Choroid coat—কৃষ্ণমণ্ডল
Chyme—পাকমণ্ড
Circulation of blood—রক্ত সংবহন
Clotting of "—রক্ত তঞ্চন
Clavicle—কণ্ঠাস্থি
Coccyx—অনুত্রিকাস্থি
Collar bone—অক্ষকাস্থি
Colon—মলাশয়
Conjunctiva—নেত্রবর্ত্মকলা
Cornea—অচ্ছোদপটল
Corpuscles, blood—রক্ত কণিকা
" , red—লোহিত কণিকা
" , white—শ্বেত কণিকা
Cranium—করোটিকা
Cuticle—কৃত্তিক
Dermis—অন্তত্বক্
Diaphragm—মধ্যচ্ছদা
Digestion—পরিপাক, হজম
Discharge—স্রাব
Disease—রোগ, ব্যাধি
" , contagious—সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ

Disease, infectious—সংক্রামী রোগ
" , water-borne—জলবাহিত রোগ
Disinfectant—বীজঘ্ন
Disinfection—নির্বীজন
Ducts, thoracic—মুখ্যা রসকুল্যা
Duodenum—গ্রহণী
Epidermis—উপচর্ম
Epiglottis—অধিজিহ্বা
Eyeball—চক্ষুগোলক
Enzyme—এঞ্জাইম
Fainting মূর্চ্ছা
Femur—উর্বস্থি
Ferment—কিণ্ব, খমির
Fibula—অনুজঙ্ঘাস্থি
Foramen magnum—মহাবিবর
Fundus—আমাশয় স্কন্ধ
Gall bladder—পিত্তাশয়
Ganglion—নার্ভগ্রন্থি
Gastric juice—পাচক রস
Germ—বীজ, রোগবীজ
Gland—গ্রন্থি
Gullet—গ্রাসনালী
Gum—মাড়ি
Hard pallet—তালু
Heart—হৃৎপিণ্ড
" beat—হৃৎস্পন্দন
Hip bone—নিতম্বাস্থি
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি
Immune—অনাক্রম্য
Innominate bone—জঘনাস্থি, কপাল
Inspiration—প্রশ্বাস
Instep—পদপৃষ্ঠ
Intestine—অন্ত্র
" , large—বৃহদন্ত্র
" , small—ক্ষুদ্রান্ত্র
Iris—কনীনিকা
Joint—সন্ধি
Kidney—বৃক্ক
Knee—জানু
Knee-cap—জানুকাপালিক
Larynx—স্বরযন্ত্র
Ligament—সন্ধিবন্ধনী
Liver—যকৃত
Loin—কটি
Longsightedness—দূরবদ্ধ দৃষ্টি
Lungs—ফুসফুস
Lymph—লসিকা
Lymphatic vessel—লসিকানালী
Membrane—ঝিল্লী
Metacarpals—করভাস্থি
Metamarsal—পদতলাস্থি
Microbe—জীবাণু
Mucus—শ্লেষ্মা
" , membrane—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী
Muscle—পেশী
" , voluntary—ঐচ্ছিক পেশী
" , involuntary—অনৈচ্ছিক "
Nasal passage—নাসাপথ
Neck—গ্রীবা
Nerve—নার্ভ
" , afferent—অন্তর্মুখ নার্ভ
" , efferent—বহির্মুখ "

Nerve, motor—চেষ্টিয় নার্ভ
Nerve, sensory—সংবেদ "
Nose cavity—নাসাবিবর
Nostril—নাসারন্ধ্র
Nourishment, nutrition—পুষ্টি
Œsophagus - গ্রাসনালী
Organ—যন্ত্র
„ digestive—পাচন যন্ত্র
„ excretory—রেচন যন্ত্র
„ respiratory—শ্বাসযন্ত্র
Ovary—অণ্ডাশয়, গর্ভাশয়
Pancreas—অগ্ন্যাশয়
Parasite—পরজীবী
Pelvis—শ্রোণীচক্র
Pericardium—হৃদ্ধরা কলা
Peristalsis—ক্রমসংকোচ
Perspiration—ঘর্ম
Phalanges—অঙ্গুলিনলক
Pharynx—গলবিল
Plasma—রক্তরস
Pleura—ফুস্‌ফুসধরা কলা
Poison - বিষ
Poisonous—সবিষ
Poisoned—বিষিত
Poisoning—বিষণ
Prevention—বারণ, প্রতিরোধ
Pulmonary—ফুস্‌ফুসীয়
Pulse—নাড়ী
Pupil—তারারন্ধ্র
Pus—পুঁজ
Putrefaction—পচন, শটন
Pyloric end—নির্গমদ্বার (আমাশয়ের)

Quarantine—সঙ্গরোধ
Radius—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Rectum - মলদ্বার
Reflex action—প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া
Respiration—শ্বসন
Retina—অক্ষিপট
Rib—পাঁজরা, পর্শুকা
Rigor mortis—মরণ-সংকোচ
Sacrum—ত্রিকাস্থি
Saliva—লালা
Salivary gland—লালাগ্রন্থি
Sanitation—স্বাস্থ্যবিধান
Scapula—অংসফলক
Sclerotic coat—শ্বেতমণ্ডল
Secretion- ক্ষরণ
Sense-organ—ইন্দ্রিয়স্থান
Sensory centre—সংজ্ঞাকেন্দ্র
Sepsis—বীজদূষণ
Septic tank—মলশোধনী
Serum—রক্তমস্তু, রক্তরস
Shank—জঙ্ঘা
Shortsightedness—অদূরবদ্ধ দৃষ্টি
Shoulder-blade—অংসফলক
Skin—চর্ম
Skull—করোটি
Socket—কোটর
Spinal chord সুষুম্নাকাণ্ড
Spinal column—মেরুদণ্ড
Spleen—প্লীহা
Spore—বীজগুটি
Sterilization- নির্বীজন
Sterilised—নির্বীজিত

Sternum—উরঃফলক
Stomach—পাকস্থলী
Sweat-gland—স্বেদগ্রন্থি
System—তন্ত্র
„ , alimentary—পৌষ্টিক তন্ত্র
„ , circulatory রক্তসংবহন „
„ , digestive—পাচন „
„ , respiratory—শ্বসন „
„ , sensory—সংজ্ঞা „
Tarsal—চরণ-সন্ধ্যাস্থি
Tendon—কণ্ডরা
Thigh—উর্বস্থি, উরু
Throat—কণ্ঠ
Tibia—জঙ্ঘাস্থি
Tissue—কলা তন্তু
„ , epithelial—আচ্ছাদক তন্তু
Tooth—দন্ত, দাঁত
„ , bicuspid—দ্বিশীর্ষ দন্ত
„ , canine—ছেদক দন্ত
„ , incisor—কৃন্তক দন্ত
„ , molar—পেষক দন্ত
Trachea—ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী
Trunk—মধ্যশরীর, ধড়

Tympanum—কর্ণপটহ
Ulna—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Ureter—গবিনী
Urethra—মূত্রনালী
Uvula—আলজিব
Vein—শিরা
Vena cava—মহাশিরা
„ „ , inferior—অধরা „
„ „ , superior—উত্তরা „
Ventilated—বাতায়িত
Ventilation—বায়ুচলন
Ventricle—নিলয়
Vertebra—কশেরুকা
Vertebral column—মেরুদণ্ড
Villus—ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষকযন্ত্র
Viscera—আন্তর যন্ত্র
Vitamin—খাদ্য-প্রাণ
Voice-box—স্বর-কক্ষ
Windpipe—শ্বাসনালী, ক্লোমনালিকা
Waste—বর্জ্য, জঞ্জাল
Waste product—বর্জ্য পদার্থ
Worm—কৃমি
Wound—ক্ষত
Wrist—মনিবন্ধ, কব্জি

Biology--জীববিদ্যা

Zoology—প্রাণিবিদ্যা

Abiogenesis—অজীবজনি
Abortive—লুপ্ত
Acotyledon—অবীজপত্রী
Acquatic—জলজ, জলচর
Acquired character—লব্ধ গুণ
Acuminate—দীর্ঘশীর্ষ
Adaptation—অভিযোজন, প্রতিযোজন
Adventitious—আস্থানিক
Aerial root—অবরোহ
Aerobic—বায়ুজীবী
Aggregate fruit—গুচ্ছফল
Air-bladder—পটুকা, বায়ুস্থলী
Albuminous—বহিঃসার (বীজ)
Algæ—শেওলা
Alytes—ধাত্রী ব্যাং
Amphibious—উভচর
Anabolism—উপচিতি
Anærobic—অবায়ুজীবী
Angiosperm—গুপ্তবীজী
Animalcule—কীটাণু
Analogous—সমবৃত্তি
Ancestral—কৌলিক
Annual—বর্ষজীবী
Anther—পরাগধানী
Antenna—শুঙ্গ
Anterior—অগ্র, পুরঃ
Ape—বনমানুষ

Botany—উদ্ভিদবিদ্যা

Appendage—উপাঙ্গ
Apey—আগা
Arthropod—সন্ধিপদ
Articulated—গ্রথিত, গ্রন্থিল
Asexual—অযৌন
Assimilation—আত্তীকরণ
Biogenesis—জীবজনি
Biologist—জীববিৎ
Bisexual—উভলিঙ্গ
Bark—বল্কল
Blade—ফলক
Bract—মঞ্জরীপত্র
Branching—শাখা বিন্যাস
Bat—চামচিকা, বাদুর
Beak, bill—চঞ্চু
Biped—দ্বিপদ
Bladder—স্থলী
Boa—অজগর
Breeding—প্রজনন
Buccal cavity—মুখগহ্বর
Bud—কোরক, মুকুল
Budding—কোরকোদ্গম
Bufo—কুনো ব্যাং
Burrow—গর্ত, বিবর
Burrowng—গর্তকারী, গর্তবাসী
Butterfly—প্রজাপতি
Bulb—কন্দ
Cell—কোষ

Cell wall—কোষ প্রাচীর
Cephalopod—শীর্ষপদ
Calyx—বৃতি
Carpel—গর্ভপত্র, গর্ভকেশর
Canine—শ্বান
Carapace—বর্ম
Carnivorous—মাংসাশী
Caterpillar—শূক, শুঁয়াপোকা
Climber—রোহিণী
Cordate—তাম্বূলাকার
Corolla—দল
Corona—মুকুট
Centiped—শতপ। বিছা বৃশ্চিক
Cotyledon—বীজপত্র
Character—লক্ষণ
Chactopod—শূকপদ
Cocoon—গুটি
Cold-blooded—অনুষ্ণশোণিত
Colouration—বর্ণগ্রহ
Compound eye—পুঞ্জাক্ষি
Crayfish—চিংড়ি
Creeper—ব্রততী
Crenate—সভঙ্গ
Cricket—ঝিঁঝিঁ, ঝিল্লী
Crustacean—কবচী
Cruciform—ক্রুসাকার
Cryptogam—অপুষ্পক উদ্ভিদ
Class—শ্রেণী
Classification—শ্রেণী বিভাগ
Colony—সংঘ
Contractile—সংকোচী
Culture—কৃষ্টি
Culm—তৃণকাণ্ড
Curved venation—ধনুঃশিরা
Cyme—স্তবক
Daughter cell—অপত্যকোষ
Deciduous (leaf)—পাতী
„ (tree)—পর্ণমোচী
Dentate—দন্তুর
Defensive—রক্ষাকর
Degeneration—আপজাত্য
Dermis—অধিত্বক্
Descent—উদ্ভব
Diandrous—দ্বিকেশর
Differentiation—বিভেদ
Distribution—বিস্তারণ, সংস্থান
Diclinous, unisexual—একলিঙ্গ
Dicotyledon—দ্বিবীজপত্রী
Digitate—অঙ্গুলাকার
Dioecious—ভিন্নবাসী
Dominate—প্রকট
Dormant, latent—অব্যক্ত, লীন
Dorsal—পৃষ্ঠ্য, পৃষ্ঠ
Drone—পুং-মধুপ
Earthworm—কেঁচো
Ecology—বাস্তব্যবিদ্যা
Egg—ডিম্ব, অণ্ড
Embryo—ভ্রূণ
Embryology—ভ্রূণবিদ্যা
Endocarp—ফলের অন্তস্ত্বক্
Endogenous—অন্তর্জনিষ্ণু
Endoskeleton—অন্তঃকঙ্কাল
Endosperm—শস্য, অন্তর্বীজী
Entomology—পতঙ্গবিদ্যা

Environment—প্রতিবেশ
Epicarp—বহিঃফলত্বক
Ephemeral—ক্ষণস্থায়ী
Epicalyx—উপবৃতি
Epiplyte—বৃক্ষরুহা
Evergreen—চিরহরিৎ
Evolution—অভিব্যক্তি
Exalbuminous—অন্তঃসার (বীজ)
Exoskeleton—বহিঃকঙ্কাল
Exotic—বিদেশীয়
Extinct—লুপ্ত
Eye, compound—পুঞ্জাক্ষি
Family—গোত্র
Fang—বিষদন্ত
Fauna—প্রাণিকুল
Feather—পালক
Feline—বৈড়াল
Fertilization—নিষেক, গর্ভাধান
Fin—পাখ্না
Flora—উদ্ভিদকুল
Fœtus—ভ্রূণ
Forelimb—অগ্রপদ
Fossil—জীবাশ্ম
Fossilized—অশ্মীভূত, শিলীভূত
Frugivorous—ফলাশী
Fungus—ছত্রাক
Fusiform—মূলকাকার
Gamete—জনন কোষ
Gamopetalous—যুক্তদল
Gamosepalous—যুক্তবৃতি
Gastropod—উদরপদ
Germination—অঙ্কুরোদ্গম
Generation—জনি
Genetics—প্রজননবিদ্যা
Genus—গণ
Germ cell—জনন-কোষ
Gill—ফুল্কো
Gill flap—কান্কো
Gregarious—যূথচর, যূথচারী
Growth—বৃদ্ধি
Gymnosperm—ব্যক্তবীজী
Gynandrous—যোষিৎপুংস্ক
Habit—আচরণ, বৃত্তি
Habitat—বসতি
Hereditary—বংশগত
Heredity—বংশগতি
Hermaphrodite—উভয়লিঙ্গ
Heliotropism—সূর্যাবৃত্তি
Hedgehog—কাঁটাচুয়া
Herbivorous—শাকাশী, তৃণভোজী
Hind limb—পশ্চাৎপদ
Hibernation—শীতঘুম
Histology—কলাস্থান
Homogamous—সমপরিণত
Homologous—সমসংস্থ
Host—পোষক
Hybrid—সংকর
Imago—সমঙ্গ
Inflorescence—পুষ্পবিন্যাস
Insect—পতঙ্গ
Insectivorous—পতঙ্গাশী
Internode—পর্ব
Invertebrate—অমেরুদণ্ডী
Irritability—উত্তেজিতা

Katabolism—অপচিতি
Kernel—অন্তর্বীজ
Kingdom—সর্গ
Larva—শূক, লার্ভা
Labiate—ওষ্ঠাকার
Lanceolate—ভল্লাকার
Latex—তরুক্ষীর
Leaf—পত্র, পর্ণ
Leaf bud—পত্রমুকুল
Legume—শিম্ব
Leg, jointed—সন্ধিত-পদ
Lobster—গলদা চিংড়ি
Life cycle—জীবন চক্র
Life history—জীবন বৃত্তান্ত
Littoral—বেলাবাসী
Marine—সামুদ্র, সামুদ্রিক
Mane—কেশর
Mammal—স্তন্যপায়ী
Mersupial—অঙ্কগর্ভ
Mersocarp—ফলের মধ্যত্বক্
Metabolism—বিপাক
Metabolic—বিপাকীয়
Metamorphosis—রূপান্তর
Micropyle—ডিম্বক রন্ধ্র
Millepede—সহস্রপদ, কেন্নো
Mimicry—অনুকৃতি
Monoclinous—উভলিঙ্গ
Monocotyledon—একবীজপত্রী
Monoecious—সহবাসী
Molusc—কম্বোজ
Modification—পরিবর্তন
Morphology—অঙ্গসংস্থান
Moth—নিশাচর প্রজাপতি
Mould—ছাতা, চিতি
Moulting—নির্মোচন
Mutation—পরিব্যক্তি
Natural selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন
" history—জীববৃত্তান্ত
Naturalist—নিসর্গবেদী, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী
Neuter—ক্লীব
Nectar—মকরন্দ, মধু
Nucleus—কেন্দ্রীন
Node—পর্বসন্ধি
Omnivorous—সর্বাশী
Ontogeny—ব্যক্তিজনি
Order—বর্গ
Order, sub—উপবর্গ
Organism—জীব
Oviparous—ডিম্বজ
Ostrich—উটপাখি
Oyster—ঝিনুক, শুক্তি
Ovary—ডিম্বাশয়
Ovate—ডিম্বাকৃতি
Ovum—ডিম্বক
Ovule—ডিম্বকোষ
Palmate venation—করতল শিরা
Parental care—জনিতৃযত্ন
Parthenogenesis—অপুংজনি
Parasite—পরজীবী
Parent—জনিতা
Palæontology—প্রত্নজীববিদ্যা
Pedigree—কুলজি

Pelagic—সমুদ্রচর
Perenial—বহুবর্ষজীবী
Perianth—পুষ্পপুট
Pericarp—ফলত্বক্
Petal—দল, পাপড়ি
Petiole—বৃন্ত
Phylum—পর্ব
Phanerogam—সপুষ্পক উদ্ভিদ
Photosynthesis—সালোকসংশ্লেষ
Pinnate—পক্ষল
Pistil—গর্ভকেশর
Pith—মজ্জা
Placenta—অমরা, ফুল
Plumule—ভাবী কাণ্ড
Pollen—পরাগ
Pollination—পরাগসংযোগ
Polycotyledon—বহুবীজপত্রী
Polygamous—বিমিশ্র
Porcupine—শজারু, শল্লকি
Prawn—বাগদা চিংড়ি
Prehensile—গ্রাহী
Proboscis—শুণ্ড, শুঁড়
Pseudopodium—ক্ষণপদ
Quadruped—চতুষ্পদ
Radicle—ভাবীমূল
Race—জাতি
Reticulate venation—জালশিরা
Root—মূল
„ fibrous—গুচ্ছ মূল
Reproduction—জনন
Response—সাড়া, প্রতিক্রিয়া
Reversion—পূর্বানুবৃত্তি
Reptile—সরীসৃপ
Rhacophorus—গেছো ব্যাঙ
Rodent—তীক্ষ্ণদন্ত
Rotund—চক্রাকৃতি
Ruminant—রোমন্থক
Sac—স্থলী
Scale—শল্ক, শকল, আঁশ
Sea cucumber—সমুদ্রশসা
Seed—বীজ
Selection—নির্বাচন
Sensitive—সুবেদী
Sepal—বৃতাংশ
Serrate—ক্রকচ
Shark—হাঙর
Shell—খোলক
Shrew—ছুঁচো
Shrub—গুল্ম
Species—প্রজাতি
Spine—শলা, কণ্টক
Spore—রেণু
Stamen—পুংকেশর
Stem—কাণ্ড
Sterile—বন্ধ্যা
Stigma—নিষেকরন্ধ্র
Stimulus—উদ্দীপক
Stigma—গর্ভমুণ্ড
Sting—হুল, অল
Stoma—রন্ধ্রপথ (উদ্ভিদ-পত্রে)
Style—গর্ভদণ্ড
Slough—খোলস, নির্মোক
Snail—শামুক, শম্বুক
Snout—তুণ্ড

Sucker—চোষক
Survival—উদ্বর্তন
Symbiosis—মিথোজীবিতা
Talons—নখর
Tendril—আকর্ষ
Thalamus—পুষ্পাধার
Tribe—জাতিরূপ
Transpiration—প্রস্বেদন
Testes—শুক্রাশয়
Tusk—প্রদণ্ড
Unisexual—একলিঙ্গ
Vertebrate—মেরুদণ্ডী
Viviparous—জরায়ুজ
Variation—প্রকারণ
Variety—প্রকার
Ventral—অঙ্কীয়
Web-footed—জালপদ, লিপ্তপদ
Whale—তিমি
Worker—কর্মী
Worm—কৃমি

Psychology—মনোবিদ্যা Philosophy—দর্শন

Miscellaneous—বিবিধ

Aberration—অপেরণ
Abnormal—অস্বভাবী
Absolute—পরম
Abstinence—উপরতি
Abstract—বিমূর্ত, সংক্ষেপ
Abstraction—বিমূর্তন
Abstruse—নিগূঢ়
Accessory—আনুষঙ্গিক, উপকরণ
Accident—আপতন
Accidental—আপতিক
Accommodation—উপযোজন
Accretion—উপলেপ
Adaptation—অভিযোজন
Advocate—অধিবক্তা
Aesthetic—কান্ত
Aesthetics—কান্তবিদ্যা
Aetiology—নিদান
Afferent—অন্তর্মুখ
Agnosticism—অজ্ঞাবাদ
Aggregate—সমূহ
Aggrement—ঐক্য
Altercation—বিতণ্ডা
Alternative—বিকল্প, অনুকল্প
Altruism—পরার্থিতা, পরার্থবাদ
Ambiguous—দ্ব্যর্থক
Ambivalence—উভবলতা
Ambivalent—উভবল
Amnesia—অস্মার
Ampullar sensation—দিগ্‌বেদন
Anaesthesia—অবেদন
Analogous—সমবৃত্তি
Analogy—উপমা
Analysis—বিশ্লেষণ
Ancestor—উদ্‌বংশীয়, পূর্বপুরুষ

Animism—সর্বপ্রাণবাদ
Anomalous—ব্যতিক্রান্ত
Anomaly—ব্যতিক্রম
Anthropology—নৃবিদ্যা
Anthropomorphism—নরত্বারোপ
Anticipation—অগ্রজ্ঞান, পূর্বজ্ঞান
Antipathy—দ্বেষ, বিরোধ
Anxiety—উৎকণ্ঠা
Apathy—অনীহা
Aphorism—সূত্র
Apotheosis—দেবত্বারোপ
Apparent—আপাত
Application—প্রয়োগ
Approximate—আসন্ন
Approximation—আসত্তি
Archoeology—প্রত্নবিদ্যা
Archetype—আদিরূপ
Argument—যুক্তি
Armistice—অবহার
Asexual—অযৌন
Aspiration—উৎকাঙ্ক্ষা
Assemblage—সমূহকরণ
Assimilation—আত্তীকরণ
Association—অনুষঙ্গ
Assumption—অঙ্গীকার
Assymetrical—অপ্রতিসম
Atavism—পূর্বগানুকৃতি
Atheism—অনীশ্বরবাদ
Attribute—গুণ, ধর্ম, লক্ষণ
Auditory—শ্রাবণ
Authentic—প্রামাণিক
Automatic—স্বতঃক্রিয়
Awkwardness—অপাটব
Axiom—স্বতঃসিদ্ধ
Back ground—পশ্চাদভূমি
Behaviour—ব্যবহার, চেষ্টিত
Being—সত্তা
Bias—পক্ষপাত
Broadcast—সম্প্রচার
By-product—উপজাত
Capacity—সামর্থ্য
Castration—উপস্থচ্ছেদ
Casual—আপতিক, আকস্মিক
Category—পদার্থ, জাতি
Categorical—নিরপেক্ষ, জাতিগত
Causality—কারণতা
Cause—কারণ
Causal—কারণিক
Censor—প্রহরী
Certain—নিশ্চিত
Certainty—নিশ্চয়
Certificate—প্রশংসাপত্র, সংসাদেশ
Chance—আকস্মিকতা
Chaos—সংপ্লব
Clairvoyance—আলোকদৃষ্টি
Clearness—বৈশদ্য, বিশদতা
Cleptomania—চৌর্যোন্মাদ
Climax—পরাকাষ্ঠা
Code—সংহিতা
Coexistence—সহস্থিতি
Coextension—সহব্যাপ্তি
Cognitive—জ্ঞানীয়
Coincidence—সমাপতন
Common sense—কাণ্ডজ্ঞান

Comparative—তৌলনিক, তুলনাত্মক
Compassion—অনুকম্পা
Compatible—সংগত, অবিরুদ্ধ
Complementary—পূরক
Complex—জটিল
Composite—সংযুক্ত
Composition—সংযুক্তি
Comprehension—ধারণা
Compromise—সন্ধি
Concatenation—শৃঙ্খলা
Concept—ধারণা, প্রত্যয়
Conception—ধারণা
Concomitant—সহভাবী
Concrete—মূর্ত
Concurrence—সমাপাত, সহঘটন
Concurrent—সহঘটমান, সহগামী
Conditional—সাপেক্ষ
Congenital—সহজাত
Congruity—সংগতি, সামঞ্জস্য
Connotation—জাত্যর্থ
Conscience—বিবেক
Conscious—সজ্ঞান
Consciousness—সংবিৎ, চেতনা
Consequence—পরিণাম, অনুক্রম
Consequent—অনুবর্তী
Constitution—সংস্থান
Contempt—অবমতি, তাচ্ছিল্য
Context—প্রকরণ
Contiguity—সন্নিধি
Continuity—অনবচ্ছেদ
Continuum—সন্ততি
Contour—পরিণাহ
Contrary—বিপরীত
Contrast—বৈসাদৃশ্য
Controversy—বিবাদ
Convention—প্রচল
Converse—বিপরীত
Coordination—সমন্বয়, স্বন্বয়
Correlation—অনুবন্ধ, পারস্পর্য
Correspondence—প্রতিষঙ্গ
Counterpart—প্রতিরূপ
Crime—অপরাধ, দুষ্ক্রিয়া
Criminal—দুষ্ক্রিয়
Criterion—নির্ণায়ক
Crucial—বিনিশ্চয়ক
Culture—সংস্কৃতি, কৃষ্টি
Cynic—অসূয়ক
Data—উপাত্ত
Day-dream—জাগরস্বপ্ন
Decadence—অবক্ষয়
Decaying—জরিষ্ণু
Deduction—অবরোহ, অনুমান
Definition—সংজ্ঞার্থ, লক্ষণ
Defined—নিরুক্ত
Degenerate—অপজাত
Degeneration—আপজাত্য
Deism—ঈশ্বরবাদ
Delusion—ভ্রান্তি
Demensia—চিত্তভ্রংশ
Demoralisation—নীতিভ্রংশ
Denotation—ব্যক্ত্যর্থ, বিশেষাভিধান
Depreciation—অপচয়

Design—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য
Despondency—নির্বেদ
Destiny—নিয়তি
Deviation—চ্যুতি, ব্যত্যয়
Diagnosis—নিদান
Die-hard—দুর্মর
Dilemma—উভয় সংকট
Direct—সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ
Discipline—বিনয়, শৃঙ্খলা
Displacement—অভিক্রান্তি
Disquisition—নিবন্ধ
Dissociation—বিষঙ্গ
Divine—দিব্য
Doctrine—মত, বাদ
Dualism—দ্বৈতবাদ
Duet—যমল গান
Effeminacy—স্ত্রীভাব
Effeminate—স্ত্রীময়, নারীসুলভ
Efferent—বহির্মুখ
Efficacy—সাধকতা, নৈপুণ্য
Effort—প্রযত্ন
Ego—অহম্
Egoism, egotism—আত্মবাদ, অস্মিতা
Elimination—অপনয়
Emaciated—কৃশিত
Emotion—প্রক্ষোভ
Empirical—প্রায়োগিক, প্রয়োগজ
Entity—সত্তা, সত্ত্ব
Environment—প্রতিবেশ, পরিসম
Envy—ঈর্ষা, অসূয়া
Eolithic—আদ্যোপলীয়
Ephemeral—ঐকাহিক
Equilibrium—সাম্য, সুস্থিতি
Equivalent—তুল্য
Equivocation—বাক্‌ছল
Eternal—শাশ্বত, নিত্য, চিরন্তন
Ethics—নীতিবিদ্যা
Ethnology—নৃকুলবিদ্যা
Etiology—নিদানবিদ্যা
Eugenics—সুপ্রজনবিদ্যা
Evolution—অভিব্যক্তি
Exception—ব্যতিক্রম
Expectation—প্রত্যাশা
Expediency—উপযুক্তি
Extract—নিষ্কর্ষ, কাথ
Fact—তথ্য, ঘটনা
Faculty—শক্তি
Fallacy—হেত্বাভাস
Fanaticism—ধর্মোন্মত্ততা
Feeling—অনুভূতি
Feigning—ভান
Fetish—ভক্তিমন্ত্র
Fetishism—বস্তুরতি
Fine art—ললিতকলা
Finite—পরিমেয়, সান্ত
Foreground—পুরোভূমি
Form—আকার
Formal—বিধিবৎ
Formality—শিষ্টাচার
Formula—সূত্র
Fortuitious—আকস্মিক
Free will—ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য
Function—বৃত্তি, ধর্ম

Fundamental—মৌলিক, প্রধান
General—সামান্য, সাধারণ
Generalization—সামান্যীকরণ
Generic—জাতীয়
Gregarious—যূথচর, যূথচারী
Gustatory—রাসন
Habit—অভ্যাস
Hallucination—মায়া, অমূলপ্রত্যক্ষ
Hate—দ্বেষ
Hedonism—প্রেয়োবাদ
Hereditary—বংশগত
Heridity—বংশগতি
Heterogeneous—অসমসত্ত্ব
Homogenous—সমসত্ত্ব
Hypnosis, hypnotism—সংবেশন
Hypothesis—প্রকল্প
Idea—ভাব
Ideal—আদর্শ
Idealism—ভাববাদ
Identity—একত্ব, অভেদ
Identification—অভেদন
Idiot—জড়ধী
Illusion—অধ্যাস
Image—প্রতিরূপ
Imagination—কল্পনা
Immanence—ব্যাপিতা
Immediate—অব্যবহিত
Immolation—বলি
Impersonal—অব্যক্তিক
Implication—লক্ষণা
Impulse—আবেগ
Imputation—আরোপ
Inborn—সহজাত, অন্তর্জাত
Incarnation—অবতার
Incest—অজাচার
Incidental—প্রাসঙ্গিক,
Incipient—উপক্রান্ত
Incompatible—বিরুদ্ধ
Inconsistent—অসঙ্গত
Indefinite—অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত
Indicative—সূচক
Indirect—পরোক্ষ
Individual—ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, প্রাতিস্বিক
Individuality—ব্যক্তিতা
Induction—আরোহ, উপগম
Industry—শিল্প, শ্রমশিল্প
Industrial—শিল্পীয়
Inertia—জাড্য
Inference—অনুমিতি, অনুমান
Inferiority complex—হীনমন্যতা, হীনতাভাব
Infinite—অনন্ত, অমেয়
Infinity—আনন্ত্য, অমেয়তা
Inherence—অধিষ্ঠান
Inheritance—উত্তরলব্ধি
Inhibition—বাধ
Innate—সহজাত
Inner—আন্তর
Insight—পরিজ্ঞান
Instability—অনবস্থা, অনবস্থ
Instinct—সহজ প্রবৃত্তি

Instinctive—সাহজিক
Instrumentality—করণতা
Intellect—বুদ্ধি
Interaction—মিথস্ক্রিয়া
Introspection—অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
Intuition—স্বজ্ঞা
Inversion—বিপর্যয়
Irrelevant—অপ্রাসঙ্গিক
Jealousy—ঈর্ষা, অসূয়া
Judgement—বিচার, সিদ্ধান্ত
Kinaesthesis—চেষ্টাবেদন
Law—নিয়ম, বিধি, সূত্র
Lethergy—জড়িমা
Limit—সীমা, অবধি
Local—স্থানীয়
Logic—যুক্তিবিদ্যা
Logical—যৌক্তিক
Logos—শব্দব্রহ্ম
Longing—অনুকাঙ্ক্ষা
Lust—রিরংসা
Luxury—বিলাস
Magic—জাদু, ইন্দ্রজাল
Major—প্রধান, মুখ্য
Malice—পৈশুন্য
Manifest—নিয়ম, বিধি, সূত্র
Masochism—মর্ষকাম
Masochist—মর্ষকামী
Material—ভৌতিক, জড়, অচিৎ
Material cause—মূল কারণ
Materialism—জড়বাদ, দেহাত্মবাদ
Maximum—চরম, বৃহত্তম
Mean—মধ্যক, সমক
Meditation—ধ্যান
Memory—স্মৃতি
Mentality—মানসতা
Mental Science—মানসবিজ্ঞান
Measurement—পরিমাপ
Metaphysical—আধিবিদ্যক
Metaphysics—আধিবিদ্যা
Method—প্রণালী, পদ্ধতি
Migration—অভিপ্রয়াণ
Mind—মন
Minimum—অবম, অল্পতম
Minor—অপ্রধান লঘু
Misogynist—স্ত্রীদ্বেষী
Modal—প্রকারাত্মক
Monism—অদ্বৈতবাদ
Monotony—একাবয়
Moral—নৈতিক
Morality—নীতি
Morbid—ব্যাধিত
Mystic—অতীন্দ্রিয়
Myth—অতিকথা
Mythology—পুরাণ, ঐতিহ্য
Narcissism—স্বকাম
Negative—নঞর্থক
Neolithic—নবোপলীয়
Normal—স্বভাবী
Notion—প্রত্যয়, মতি
Object—বিষয়
Objective—বিষয়মুখ
Observation—অবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ
Obsession—আবেশ

Obversion—প্রতিবর্তন
Occasional—কাদাচিৎক
Omnipotent—সর্বশক্তিমান
Omnipresent—সর্বব্যাপী, বিভু
Ontology—তত্ত্ববিদ্যা
Origin—উৎপত্তি, প্রভব
Orthodox—নৈষ্ঠিক
Outer—বাহ্য
Outline—পরিলেখ
Output—উৎপাদ
Over-population—অতিপ্রজন
Over-ruled—প্রতিদিষ্ট
Paleolithic—পুরোপলীয়
Panorama—পরিদৃশ্য
Pantheism—সর্বেশ্বরবাদ
Paradox—কুটাভাস, কুট
Parallelism—সহচার, সহচরবাদ
Passive—ভোগবৃত্ত, নিষ্ক্রিয়
Percept—প্রত্যক্ষ, রূপ
Perfection—পরোৎকর্ষ
Period—কাল, পর্যায়
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Persistence—নিবদ্ধতা
Persistent—নিবদ্ধ
Personality—অস্মিতা, ব্যক্তিত্ব
Personification—নরত্বারোপ
Pessimism—দুঃখবাদ
Phase—দশা
Phobia—আতঙ্ক
Portable—সুবহ
Positive—সদর্থক
Positivism—দৃষ্টবাদ, প্রত্যক্ষবাদ
Postulate—স্বীকার্য
Practical—ব্যবহারিক, ফলিত
Pragmatism—প্রয়োগবাদ
Pragmatic—প্রায়োগিক
Precaution—প্রাগ্‌বিধান
Precocity—বালপ্রৌঢ়ি, অকালপক্কতা
Predicate—বিধেয়
Principle—তত্ত্ব
Probable—সম্ভাব্য
Problem—সম্পাদ্য
Profile—পার্শ্বচিত্র
Projection—অভিক্ষেপ
Prologue—পূর্বরঙ্গ
Propensity—প্রবণতা
Propitiation—প্রসাদন
Proposition—প্রতিজ্ঞা
Psycho-analysis—মনঃসমীক্ষণ
Psychology—মনোবিদ্যা
Psychologist—মনোবিৎ
Punctuality—সময়নিষ্ঠা
Puritanism—অতিনৈতিকতা
Rationalism—যুক্তিপদ
Rationalization—যুক্ত্যাভাস
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Real—বাস্তব, যথার্থ
Realism—বাস্তবতা, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ
Reason—বুদ্ধি, হেতু
Receptive—গ্রাহী
Receprocity—ব্যতিহার
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
Reconciliation—সমন্বয়

Recreation—বিনোদন
Redundancy—অতিরেক
Reflex—প্রতিবর্তী
Relative—আপেক্ষিক, সাপেক্ষ
Relativity—আপেক্ষিকতা
Relaxation—শ্লথন
Repetition—আবৃত্তি
Repression—অবদমন
Reproduction—জনন
Resident—আবাসিক
Resistance—বাধা, প্রতিবন্ধক
Response—প্রতিক্রিয়া, সাড়া
Rhythm—ছন্দ
Sacrament—সংস্কার
Sadism—ধর্ষকাম
Sadist—ধর্ষকামী
Safe-conduct—অভয়পত্র
Sanctimonious—ধর্মধ্বজ
Scepticism—সন্দেহবাদ
School—সম্প্রদায়
Scientist—বিজ্ঞানী
Self-contempt—স্বাবমানন
Self-evident—স্বতঃপ্রমাণ
Self-supporting—স্বয়ম্ভর
Sensation—সংবেদন
Sense—জ্ঞানেন্দ্রিয়
Sense-organ—ইন্দ্রিয়স্থান
Sensitive—সুবেদী
Sentiment—রস
Sex—লিঙ্গ
Sexual—যৌন, কামজ, লৈঙ্গিক
Sexuality—যৌনতা,কামিতা,কামধর্ম
Simultaneous—যুগপৎ
Sociology—সমাজবিদ্যা
Sodomy—পায়ুকাম
Somnambolism—স্বপ্নচারিত
Space—দেশ
Speculation—দূরকল্পনা
Spontaneity—স্বতঃবৃত্তি
Smell—ঘ্রাণ
Standard—প্রমাণ
Statistics—পরিসংখ্যান
Stimulus—উদ্দীপক
Stupor—স্তম্ভ, ব্যামোহ
Subconscious অন্তর্জ্ঞানীয়
Subject—বিষয়
Subjective—বিষয়মুখ
Sublimation—উদ্‌গতি
Substitution—প্রতিকল্পন
Suggestion—অভিভাব, অভিভাবন
Superintendent—অধিকর্মী
Supernatural—অতিপ্রাকৃত
Suppression—নিরোধ
Syllogism—ন্যায়, অনুমান বাক্য
Symbol—প্রতীক
Symbolism—প্রতীকতা
Symmetry—প্রতিসাম্য
Sympathy—সমবেদনা
Synthesis—সংশ্লেষণ
Taboo—নিষিদ্ধ, টাবু
Tactile—স্পার্শন
Taste—স্বাদ
Technique—কৌশল
Teleology—উদ্দেশ্যবাদ

Texture—গ্রথন
Theism- ঈশ্বরবাদ
Theorem—উপপাদ্য
Theory—সিদ্ধান্ত, বাদ
Theoritical—তত্ত্বিয়, বাদীয়
Tint—আভা
Trance—সমাধি
Transendental—তুরীয়
Type—জাতিরূপ
Unconscious—নিজ্ঞাত, অজ্ঞাত
Undermining—অধঃকরণ
Universal—সার্বিক, সর্বগত
Utilitarianism—উপযোগবাদ
Utility—উপযোগ
Utopia—রামরাজ্য
Will—সংকল্প
Wish—ইচ্ছা
Vision—দর্শন, দৃষ্টি, ছায়া
Visionary—কল্পিত, ভৌতক

Geology—ভু-তত্ত্ব

Alluvium—পলি
Alluvial—পাললিক, পলিজ
Antipodal—প্রতিপদ
Avalanche—হিমানী-সম্প্রপাত
Azoic—অজীবীয়
Barysphere—গুরুমণ্ডল
Basin—অববাহিকা
Calcareous—চুনা, চূর্ণকময়
Conglomerate—সামষ্টিকরণ
Contour—সমোন্নতি রেখা
Coral island—প্রবাল দ্বীপ
Crater—জ্বালামুখ
Defile—গিরি সংকট
Deposition—অবক্ষেপ
Diatom—দ্বি-অণু
Delta—ব-দ্বীপ
Earth's crust—ভূ-ত্বক
Estuary—খাড়ি
Erotion- ক্ষয়
Fault—স্তরচ্যুতি, ধ্বংস
Felspar—ফেলস্পার
Fissure—ফাটল
Fold—ভাঁজ, বলি
Fold mountain—বলিত পর্বত
Fossil—জীবাশ্ম
Geyser—উষ্ণ প্রস্রবণ
Glacier—হিমবাহ
Gorge—গিরিখাত
Harbour—পোতাশ্রয়
Hemisphere—গোলার্ধ
Horizontal—সমান্তরাল, অনুভূম
Hydrosphere—বারিমণ্ডল
Iceberg—হিমশৈল
Igneous—আগ্নেয়
Isobar—সমপ্রেষ-রেখা
Isohyet—সমবর্ষণ-রেখা
Isotherm—সমোষ্ণ-রেখা
Lagoon—উপহ্রদ

Landslip—ভূমিস্খলন, ধস
Latitude—অক্ষাংশ
Lithosphere—অশ্মমণ্ডল
Limestone—চুনাপাথর
Loam—দোআঁশ মাটি
Mesozoic—মধ্যজীবীয়
Metamorphic—রূপান্তরিত
Mica—অভ্র
Monsoon—মৌসুমী বায়ু
Movement—আন্দোলন
Palacozoic—পুরাজীবীয়
Petroleum—খনিজ তৈল
Plutonic—পাতালিক
Promontory—শৈলান্তরীপ
Quartz—কোয়ার্টজ
Relief—বন্ধুরতা, উচুনিচু
Ridge—শৈলশিরা
Rock—শিলা
Sand stone—বেলেপাথর
Sedimentary rock—পাললিক শিলা
Silt—পঙ্ক
Seimic Belt—প্রকম্পন কটিবন্ধ
Seismograph—ভূকম্পন-লেখ
Slag—ধাতুমল
Sedimentary—পালল
Shale—কর্দমশিলা
Stratum—স্তর
Topography—ভূসংস্থান
Tornado—ঘূর্ণবাত
Volcano—আগ্নেয়গিরি
Zone—বলয়

'বিজ্ঞান-ভারতী' ১ম সংস্করণ
অভিমত ঃ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঃ ······আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি এই অভিধান থেকে সহজে আয়ত্ত করতে পারবে······ ।

দেশ ঃ ······বিজ্ঞান-ভারতী বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিধান। এক বিষয়ে একে পূর্ণাঙ্গ বলা যায়, কেননা উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক যা কিছু সচরাচর আমাদের জানবার প্রয়োজন হয় বিজ্ঞান-ভারতীতে তা পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থ সকল শিক্ষাক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহীদের হাতে থাকা উচিত······ ।

বসুমতী ঃ ······গ্রন্থকার শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কাছেও বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন। এই শ্রমসাধ্য কার্য্য বিশেষ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচায়ক······ ।

শনিবারের চিঠি ঃ ······বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় ও বিজ্ঞানের গ্রন্থপাঠে বইখানা সকলের সহায় হইবে। এইরূপ একখানা বইয়ের অভাব আমরা দীর্ঘদিন অনুভব করিতেছিলাম······ ।

আনন্দ বাজার ঃ ······বিজ্ঞান সম্পর্কে নাতিশিক্ষিত জনসাধারণের মনে অধুনা ব্যাপক কৌতূহল দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিদেশী ভাষায় দুরতিক্রম্য মাধ্যমের দরুণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে সাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন সহজসাধ্য নয়। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান-ভারতী অভিধানখানা মস্ত একটি অভাব পূরণ করবে······ ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ